যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্) পি-এইচ্. ডি.
কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী, বিদ্যার্ণব ।

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা • • • ১৯৪৮

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড,
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম মুদ্রণ : কলিকাতা, ১৯৪৮

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ জানা
মর্ম্মবাণী প্রেস
১৭এ, ঘোষপাড়া বাই লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশনা জগতের স্মরণীয় পুরুষ
এই গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণাস্বরূপ
আমার অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী
অগ্রজোপম অশেষবিদ্যানুরাগী

স্বর্গত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের

তৃপ্তি কামনায় তাঁরই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে
'যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' উৎসর্গ করলাম।

—গ্রন্থকার

গৌরচন্দ্রিকা

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অলৌকিক জীবনকাহিনী নিয়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য জীবনী, কাব্য, নাটক, যাত্রাপালা প্রভৃতি রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং নতুন করে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার কি প্রয়োজন ছিল? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের জীবন ও কর্মের যথাযথ মূল্যায়ন এখনও হয় নি। এই গ্রন্থ তারই দীন প্রয়াস।

সদ্য-প্রয়াত ফার্মা কেএলএম-এর কর্ণধার কানাইলাল মুখোপাধ্যায় একদা তাঁর অফিসে বসে বলেছিলেন, চৈতন্যদেবকে নিয়ে অনেকে ভক্তিতে গদগদ হয়ে তাঁকে ভগবান বানিয়েছেন, অনেকে আবার দুহাতে তাঁর গায়ে কাদা ছিটিয়ে তাঁর লোকোত্তর মহিমাকে ধূলিসাৎ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কি ছিলেন? সমাজে সংস্কৃতিতে তাঁর দান কতটুকু? তিনি কি অনেকানেক ধর্মগুরুর মত একদল শিষ্যভক্ত নিয়ে 'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' করতে করতে নাচ-গান করে কাটিয়েছেন? তাঁর জীবনী ও কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটি বই লিখে দিতে পারেন? কানাইবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু বিষয়টি তাঁর মনকে এতই অধিকার করেছিল যে তিনি মাঝে মাঝেই গ্রন্থরচনার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। প্রকাশনার কাজ যখন চলছে তখনও প্রুফ দেখার সময়ে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থের প্রকাশ যখন সমাসন্ন, তখনই তিনি অকস্মাৎ ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। গ্রন্থটির প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারলেন না, এ আক্ষেপ রইলো চিরন্তন।

কানাইবাবুর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে যথাসাধ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যের জীবন ও সাধনাকে বিচার করতে প্রয়াসী হয়েছি। এই কার্যে প্রধানতঃ অনুসরণ করেছি শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ও ভক্ত মুরারি গুপ্তের কড়চা নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ কাব্য, কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্ মহাকাব্য ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল। এইগুলিই চৈতন্যচরিতের আকর গ্রন্থরূপে

পরিচিত। এ ছাড়াও মধ্যযুগে বহু বৈষ্ণব মোহান্তের জীবনী রচিত হয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে অনেক গ্রন্থেই শ্রীচৈতন্যের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় আধুনিক কালে বহু দেশী বিদেশী পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছেন। এই সকল গ্রন্থের যেটিকে সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাকেই আমি কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু প্রধান অসুবিধা এই যে আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকের রচনায় যেমন স্ববিরোধিতা বর্তমান, তেমনি আবার বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্যও সুস্পষ্ট। অনেকের রচনাই একদেশদর্শী। আবার আকরগ্রন্থগুলিতেও স্ববিরোধ যথেষ্ট, একের বিবরণের সঙ্গে অপরের বিবরণের অনেক গরমিল, চৈতন্যজীবনের সকল ঘটনা সকল গ্রন্থে স্থান পায় নি। লেখকগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে চৈতন্যচরিত রচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে শ্রীচৈতন্যের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সুযোগ যেমন যথেষ্ট, তেমান যথার্থ সত্যটি নিরূপণ করাও দুঃসাধ্য। অনেকেই তাই চৈতন্যচরিতের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছেন, নির্মাণ করেছেন মনগড়া থিয়োরী।

আরও একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা, চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সংশয়। কোন্ গ্রন্থে কতটা হস্তাবলেপ ঘটেছে—নির্ণয় সম্ভব নয়। গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর প্রামাণিকতায় সন্দেহ অনেকেরই। এমন কি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ ও সহপাঠী মুরারিগুপ্তের কড়চাকেও অনেকে খাঁটি রচনা বলতে কুণ্ঠিত। কড়চা মানে দিনপঞ্জী বা Diary। মুরারির কড়চা নামক গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যের আকারে পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থটি মুরারির মৌলিক রচনা কিনা, অথবা কতটা বা তাঁর নিজের তা নির্ণয় করাও সম্ভব নয়।

সুতরাং মতারণ্যের দুর্গমতার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করা নিরর্থক জেনেই প্রাচীন অর্বাচীন বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ সকল গ্রন্থেরই বক্তব্য আলোচনা করেছি, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতি দিয়ে লেখকদের বক্তব্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি এবং বৈপরীত্যের মধ্য থেকে সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য সূত্রটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি। শ্রীচৈতন্যের জীবনের যে সকল ঘটনা পণ্ডিত সমাজে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, বিশেষভাবে সেই বিতর্কিত বিষয়গুলি বিচার বিশ্লেষণে

প্রয়াসী হয়েছি। আমার সিদ্ধান্ত যে সর্বথা অভ্রান্ত সে দাবী করা সম্ভব নয়, সর্বত্রই যে প্রকৃত সত্যটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে তাও নয়; তথাপি কোন প্রকার মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যের জীবনসাধনা আলোচনার চেষ্টা করেছি, এই আমার সান্ত্বনা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত একজন সন্ন্যাসী আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, মহাপ্রভুর পাঞ্চভৌতিক দেহ ছিল না। তিনি ছিলেন চিন্ময়বিগ্রহ, এই আলোকে চৈতন্যচরিত বিচার করা কর্তব্য। মহাপ্রভুর অলৌকিক চরিত্র ও কার্যাবলী তাঁকে ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঠিকই—ঘরে ঘরে তাঁর বিগ্রহও পূজিত হচ্ছে। তাঁর বিগ্রহকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক সাফল্যও গোপন ব্যাপার নয়, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক দেহ নিয়েই শচীমাতার গর্ভ থেকে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এ ঘটনা ত কল্পনা নয়। শ্রীচৈতন্যের অপার্থিব সাধনার রহস্যোপলব্ধি সাধারণ মানুষের দুরধিগম্য। তাঁর মানবিক লীলা প্রত্যক্ষ করেই আমরা ধন্য।

এই গ্রন্থে তাই শ্রীচৈতন্যের মানবিক লীলার বিচার বিশ্লেষণই গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রীচৈতন্য তাঁর জীবৎকালেই ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর ভক্ত জীবনীকারগণ তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপেই দেখেছেন এবং উপাসনা করেছেন। তাই তাঁর মর্ত্যলীলাতেই বৃন্দাবনলীলা আরোপিত হয়েছে, ভক্ত কবিগণ কৃষ্ণ-বিষ্ণুর বরাহ-নৃসিংহাদি অবতার, চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজ মূর্তি, সুদর্শনধারী কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপ্রভুর বিভিন্ন ভাবপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। এ সকল বিষয় ভক্তের অনুভূতির বিষয়, প্রাকৃতজনের অধিকার বহির্ভূত। গভীর অনুভূতি প্রত্যয় ও নিষ্ঠাসম্পন্ন ভক্তজনের মনে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা নিয়ে অনেক গ্রন্থই রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু তাঁর চরিতগ্রন্থ সমূহে তাঁর যে মানবিক মূর্তিটি প্রকাশিত অলৌকিকতা বাদ দিয়েও তার মহিমা সাধারণ নয়। মর্তের মানুষ হিসাবে বিশ্বম্ভর মিশ্র তথা সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনের ঘটনাবলী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দেশের সমাজে সংস্কৃতিতে সাহিত্যে তাঁর যে অপরিমেয় দান, তন্নির্দেশিত সহজ ধর্মাচরণের পথ, তৎসম্পর্কিত ভক্তগণ কর্তৃক সৃষ্ট বিচিত্র তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি এই গ্রন্থের আলোচ্য। আমার ধারণা, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের এত বিস্তৃত মূল্যায়ন ইতঃপূর্বে কোন গ্রন্থে করা হয় নি।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে অখণ্ড বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক,

সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে ভয়াবহ বিপর্যয়, যে সার্বিক অধোগতি ও অবক্ষয় তা থেকে মুক্তির পথনির্দেশের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল পরিত্রাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যের ভূমিকাটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থের নামকরণ করেছি যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যুগের প্রয়োজনে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হলেও শুধু তাঁর যুগেই নয়, তাঁর বহুব্যাপ্ত প্রভাব যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত হয়ে সর্বদেশে সর্বকালের মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ করে চলেছে এবং চলবে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনাদর্শ এবং শিক্ষা বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী বিস্মৃত হয়েছে। আগামী ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের দোল পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর পঞ্চশত আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন শোনা যাচ্ছে দিকে দিকে। কিন্তু পথভ্রষ্ট লক্ষ্যহারা বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা পথের সন্ধান দিক, সঞ্জীবনী মন্ত্রের কাজ করুক—এই আকাঙ্ক্ষা আজ সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের সামগ্রিক জীবন সাধনা ও চরিত্রাদর্শের ব্যাপক আলোচনা যদি কিছু সংখ্যক মানুষেরও শুভবুদ্ধি জাগ্রত করে, তাঁর সম্পর্কে কারো মন থেকে যদি ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়, তবেই সফল জ্ঞান করবো আমার প্রয়াস, আর স্বর্গত কানাইবাবুর সদিচ্ছা।

এই গ্রন্থ রচনায় দুর্লভ বৈষ্ণবীয় গ্রন্থগুলি দেখবার ও পড়বার সুযোগ দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ বংশাবতংশ প্রভুপাদ শ্রীনিমাই চাঁদ গোস্বামী তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে। তাই তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেখা মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের শব্দসূচী প্রস্তুতে সহায়তা করে আমার শ্রম লাঘব করেছে। তার আন্তরিক কল্যাণ কামনা করি। বন্ধুবর ডঃ রামজীবন আচার্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যের কোষ্ঠীবিচার করে গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণপ্রমাদের অতর্কিত আক্রমণ মাঝে মাঝে বিব্রত করার জন্য সহৃদয় পাঠকের কাছে মার্জনাপ্রার্থী।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

সোনার গৌরাঙ্গ, নবদ্বীপ

ষড়ভুজ চৈতন্য, ভুবনেশ্বর

বিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ নবদ্বীপ

শ্যামানন্দ পূজিত চৈতন্য মূর্তি, কানপুর

প্রথম অধ্যায়
দেশ ও কাল

১২০০ অথবা ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী নদিয়া বা নবদ্বীপ জয় করলে বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন ক'রে আরও কিছুকাল, সম্ভবতঃ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। লক্ষ্মণসেনের পরেও তাঁর বংশধরগণ অন্ততঃপক্ষে অর্ধশতাব্দীকাল পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। কবি উমাপতিধর ও কবি শরণের রচিত দুটি শ্লোক এবং লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ-সেন ও কেশবসেনের তাম্রলিপি থেকে মুসলমানদের সঙ্গে লক্ষ্মণসেন ও তাঁর পুত্রদ্বয়ের সংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্র বঙ্গদেশ মুসলমান শক্তির দ্বারা বিজিত হয়েছিল।[১] বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী নবদ্বীপ লুণ্ঠন করেছিলেন, কিন্তু অধিকার করতে পারেন নি। ৬৫৩ হিজরায় (১২৫৫ খ্রীঃ) অথবা তার কিয়ৎকাল পূর্বে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীগ্‌-উদ্দিন যুজবক্‌ নবদ্বীপ জয় করে বিজয়ের স্মৃতি হিসাবে নূতন মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন।[২] বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর নবদ্বীপ অধিকার সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত: "বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি লক্ষ্মণাবতী নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সামান্য ভূমিমাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুকালে বরেন্দ্রভূমির কিয়দংশমাত্র তাঁহার পদানত হইয়াছিল। এই সময়ে গঙ্গাতীর হইতে দেবকোট পর্যন্ত পঞ্চশত ক্রোশ পরিমিত ভূমি তাঁহার অধিকার-ভুক্ত ছিল।"[৩]

---

১ "মনে হয়, ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ কোন রকম করিয়া মুসলমানাধি-কারের হাত হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল,—কোথাও সেনবংশীয় রাজাদের নায়কত্বে কোথাও অন্য কোন স্থানীয় রাজা বা সামন্তের নায়কত্বে।... ত্রয়োদশ শতকের পর বাংলাদেশের কোথাও আর কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র হিন্দু নরপতির নাম শোনা যাইতেছে না।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব—নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫১৬)

২ বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—২য়, পৃঃ ৬-৮

৩ তদেব, পৃঃ ৭

অতঃপর ধীরে ধীরে বাঙ্গালাদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রসারিত হতে থাকে। সুলতান গিয়াস-উদ্দিন ইউয়জের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণাবতী দিল্লীর সুলতানের শাসনাধীন হয়। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উজবক নিহত হন। "সপ্তগ্রাম অঞ্চল বিজিত হয় আরও প্রায় বছর চল্লিশেক পরে। এ কাজ করেছিলেন রুকন্ কৈকাউস (১২৯১—১৩০২ খ্রীঃ)। এঁর সেনাপতি জাফর খাঁ পাণ্ডুয়া ত্রিবেণী অঞ্চলের মন্দির প্রাসাদ ইত্যাদি ধ্বংস ক'রে মসজিদ বানিয়েছিলেন ৬৯৮ হিজরায় (১২৯৮ খ্রীঃ)। ······পূর্ববঙ্গ অধিকার করতে মুসলমানদের ত্রয়োদশ শতাব্দী পেরিয়ে যেতে হয়েছিল।"[১] দক্ষিণবঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় ৮৭০ হিজরায় বা তার কিছুপূর্বে সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯—৭৪ খ্রীঃ)। কৈকায়ুস শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান শমস্-উদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (হিজরা ৭০২-২২ অর্থাৎ ১৩০২—১৩২২ খ্রীঃ) পূর্ববঙ্গ বিজিত হয়।[২]

দিল্লীর শাসনকালে বাঙ্গালাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়েছিল। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে সমসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ লখ্নৌতির সিংহাসনে আরোহণ ক'রে ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করলে বাঙ্গালার রাজনৈতিক জীবনে স্থায়িত্ব আসে। ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪০৯ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বাঙ্গালাদেশে রাজত্ব করেছিলেন। এরপর রাজা গণেশ ও তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্র জালালুদ্দিন ও পৌত্র আহমদ শাহ্ ১৪৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজা গণেশের বংশধরদের রাজত্বের অন্তে ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান ঘটে নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ শাহের (১৪৪২—৫৯ খ্রীঃ) রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে। এই বংশের শেষ রাজা জালালুদ্দিন ফতে শাহ্ (১৪৮২—৮৭ খ্রীঃ)। মাহ্মুদশাহী-বংশ নামে এই বংশ ইতিহাসে সুপরিচিত। অতঃপর ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বৎসর হাব্শী ক্রীতদাসরা একের পর এক বাঙ্গালার মসনদে বসে অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি ক'রে গেছেন। শেষ হাব্শী রাজা সামসুদ্দিন মুজাফরের অত্যাচার সম্পর্কে ঐতিহাসিকের অভিমত: "But his rule was a fitting climax to the infamous Abyssinian epoch in Bengal for his was a perfect reign of terror.

১ বঙ্গভূমিকা—ডঃ সুকুমার সেন—পৃঃ ১৩৮

২ বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য়, পৃঃ ৮

Anxious to root out all opposition, he was not satisfied with merely purging the government, but commenced a ruthless destruction of the noble and learned men of the capital. His sword equally fell on the Hindu nobility and princes suspected of opposition to his sovereignty."[১]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জালালুদ্দিন ফতে শাহের রাজত্বকালে। কিন্তু তাঁর কর্ম ও সাধনার সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। এই সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনকালে বাঙ্গালী হিন্দু-বৌদ্ধের উপরে অত্যাচার অবিচারের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। মঠ মন্দির দেব-বিগ্রহ ধ্বংস করা বা অপবিত্র করা, নির্বিচারে বিধর্মী কাফেরকে হত্যা করা অথবা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা বিজেতা জাতির পবিত্র কর্তব্য কর্মে পর্যবসিত হয়েছিল। এই সময়ে উৎপীড়ন-অত্যাচার-অবিচারের বিবরণ যেমন সমকালীন কাব্যে সুলভ, তেমনি আধুনিক কালের পণ্ডিতবর্গও এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই মুসলমান শাসকের সৈন্যদল এবং পীর ফকির গাজীদের উপদ্রবে হিন্দুসমাজ উৎসন্নে যাবার উপক্রম হয়েছিল, শাসককুল পরাজিত হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করে কখনও বা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকেন। হিন্দুদের প্রাণত্যাগ ও ধর্মত্যাগের মধ্যে একটি বেছে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। হিন্দুকে স্বধর্মে আনয়ন করা ছিল মুসলমানের পবিত্র কর্ম। হোসেন শাহের পূর্ব পর্যন্ত একই রীতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ধর্মান্তরীকরণ, হিন্দুর মন্দির, বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও দেব বিগ্রহ ধ্বংস করা এবং মন্দির, সঙ্ঘারামের ভগ্নাংশ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করাও সমানভাবে চলেছে। সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৮৯ খ্রীঃ) বহু মন্দির সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিয়ে তদ্দ্বারা মসজিদ্ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ইউসুফ্ শাহের আমলে পাণ্ডুয়ার সূর্যমন্দির ও নারায়ণ মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হয়েছিল।[২]

আর একজন পণ্ডিতের মন্তব্য: "দেশ আতঙ্কপূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড রাজ্যে

১ History of Bengal—vol. II, Ducca University, p. 140.

২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য়, পৃঃ ২৪২-২৪৩

বিভক্ত। তাহার উপর উপদ্রব লাগিয়াই আছে। রাজপুষ্ট ব্রাহ্মণ কবি পণ্ডিত এখন অনাথ, সমৃদ্ধ বৌদ্ধ বিহারগুলিও বিধ্বস্ত।"[১]

সিকান্দার শাহ কর্তৃক গৌড়-পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

"৺রজনী কান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের মতানুসারে একটি বৌদ্ধ স্তূপ ধ্বংস করিয়া ইহা নির্মিত হইযাছিল। আদিনার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে পাষাণ নির্মিত বহু হিন্দু দেবদেবী ও মন্দিরের উপকরণ আবিষ্কৃত হইযাছে। আদিনা মসজিদে বেদীর (মিম্বর) নিম্নে ভগ্ন সোপানাবলী মধ্যে অল্পদিন পূর্বে একটি ভগ্ন দশভূজা মূর্তি দেখিতে পাওযা যাইত।"[২]

শুধু কি তাই? "হুগলী ত্রিবেণীতে জাফর খাঁর আস্তানা বা সমাধি মন্দিরে ব্যবহৃত পাথরগুলিতে বহু দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ। এই আস্তানার অভ্যন্তরে উৎকীর্ণ টুকরো টুকরো লিপি থেকে জানা যায় যে জাফর খাঁর আস্তানাটি পূর্বে একটি বিষ্ণু মন্দির ছিল। মন্দিরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য চিত্রাবলী খোদাই করা ছিল।"[৩]

সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর শক্তিশালী হিন্দু সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে এবং হিন্দু নিধন যজ্ঞে এই জাফর খাঁ নায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ৬৯৮ হিজরার একটি শিলালিপিতে জাফর খাঁ গাজীকে সিংহবিক্রম এবং অবিশ্বাসীদের খড়্গ ও ভল্ল দিয়ে নিধনকারী বলে উল্লিখিত আছে।[৪]

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় আদিনা মসজিদ সম্পর্কে লিখেছেন, "মুসলমান আমলে হিন্দু মন্দিরের উপকরণে যে সমস্ত মসজিদ তৈরি হত, তাতে সাধারণতঃ দেবদেবীর মূর্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন বা বিকৃত করা হত। অথবা উল্টে রাখা হত, কিন্তু আদিনা মসজিদের মধ্যে যে সব দেবদেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় তাদের অধিকাংশই অবিকৃত এবং সেগুলি সোজাসুজিভাবে বসানো আছে, তাদের অনেকগুলি মসজিদের বাইরের দেওয়ালে ও ভেতরে বেশ ভাল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বিতীয়ত, এই মসজিদের কয়েকটি দরজার উপরের

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম, পূর্বার্ধ—ডঃ সুকুমার সেন, ৪র্থ সং, পৃঃ ৮১

২ বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস, ২য়, পৃঃ ১১৩

৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ—পৃঃ ৪৮০

৪ তদেব, পৃঃ ৪৯১

প্যানেলে খুব সুন্দরভাবে হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে ; ঐ প্যানেল-গুলি বাইরের থেকে আনা হয়েছে বলে মনে করা শক্ত, কারণ এগুলি দরজার মাপের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।"[১]

মাহমুদ শাহী বংশের ইউসুফ সাহ অত্যন্ত হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর আমলেই হুগলী পাণ্ডুয়ার হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি হয়েছিল, নারায়ণ ও সূর্য মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হয়েছিল।[২] অধিকাংশ মুসলমান রাজাই হিন্দুদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দুদের উপরে নির্মম অত্যাচার করতেন। এমন কি, রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে জালালুদ্দিন নামে গৌড়ের সিংহাসনে বসে হিন্দুর উপরে অত্যাচার করেছিলেন।

এই সময়ে পীর ফকির দরবেশ প্রভৃতি ইসলাম ধর্ম প্রচারকরাও বলপূর্বক ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যে এবং হিন্দু নিধনে পশ্চাৎপদ হতেন না। এঁরা নানা কৌশলে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা হিন্দু সমাজের নিম্ন বর্ণের মধ্যে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এঁরা হিন্দুর মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে দরগা-খানকা স্থাপন করতেন, আবার মুসলমান শাসকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তরবারি হস্তে হিন্দু নিধনেও যোগ দিতেন।[৩] পাণ্ডিত্য ও ধার্মিকতার জন্য এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য খ্যাত অনেক সুফী সাধক হিন্দু তান্ত্রিক সাধকদের স্থান গ্রহণ ক'রে স্ব স্ব প্রভাবে ও উপদেশে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতেন। এ সম্বন্ধে বহুতর ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। শ্রীহট্টের শাহ জালাল পীর ৩৬০ জন দরবেশ সেনা নিয়ে শ্রীহট্টের রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করেছিলেন। ইব্রাহিম মালিক বাজু নামে এক ফকির রোটাসগড়ের রাজকুমার হংসকুমারকে আক্রমণ করায় উভয়েই নিহত হয়েছিলেন। মুকুটরায় নামক এক জমিদার ধর্মান্তরীকরণে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। হামিজুদ্দিন নামে এক গাজী বীরভূমের বহু হিন্দুকে মুসলমান করেছিলেন।[৪]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পীর, দরবেশদের কীর্তি সম্পর্কে লিখেছেন, "There is a tradition that Sāh Jalal, a Sufi Darvish, under his preceptor's orders and in the company of 700 of the latter's disciples, engaged in many wars, conquered many small Hindu

---

১ বাংলার ইতিহাসের দুশ' বছর, পৃঃ ৫৪ ২ বাংলার ইতিহাসের দুশ' বছর, পৃঃ ২১৪
৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম, পৃঃ ২৪৪ ৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম, পৃঃ ২৪৫

kingdoms and established Islam in those territories. At the end he defeated the king of Sylhet, occupied the country and settled down there with his followers. He very likely won the battle with the help of the army of the sultan of Bengal. Some Pīrs were appointed governors by the Sultan and there are instances of Muslim generals, being decorated with the title Pīr on the conquest of a Hindu kingdom, and receiving the honour and distinction of a Pīr. It would thus appear that the Pīrs were as deft in the use of arms as they were learned in the scriptures. They helped in the expansion of Muslim authority in Bengal and also in the spread of Islam there as much by their religious preachings as by their participation in military actions."[১]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' নামক কাব্যে যাবনিক অত্যাচারের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন—

কতহুঁ তুরক বরকর,
বাট জাইতেঁ বেগার ধর ॥
ধরি আনএ বাঁভন বুড়য়া।
কোট চাট জনউ তোড়,
উপর চড়াব এ চাহ ঘোড় ॥
ধা আ উড়িধানে মদিরা সাঁধ,
দেউল ভাগি মসীদ বাঁধ ॥
গোরী গোমঠ পূরলি মহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার,
ছোটে ও তুরুকা ভভকী মার ॥

—(অনুবাদ) কত তুরুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গরুর রাঙ। কোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার

১ History of Mediaeval Bengal—R. C. Majumdar, p. 192.

উপব চায চডাতে। ধোয়া উড়ি ধানে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙ্গে মসজিদ বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ। পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে দূরে নিকালো। তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়।

বিনা কারণেই তুরুকেরা কুপিত হয, আর তাদের বদন হয তপ্ত তামার টাটের মত লাল—"বিনু কাবণহি কোহাএ বএন তাতল তমুকুণ্ডা" তুরুক সোযার হাটে ঘুরে বেড়ায় ফড়া অর্থাৎ তোলা মাগে ; তারা আড়দৃষ্টিতে চায, দাড়ি আঁচড়ায আর থুথু ফেলে—

তুরুক তোখারহি চলল হাট ভমি ফেরা মাঙ্গই।
আড়ী-দাঠি নিহারি দবলি দাবী থুক বাহই॥

অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং ভযে অনেক হিন্দুই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। রাজা গণেশের পুত্র যদু ধর্মান্তরিত হয়ে জালালুদ্দিন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসে হিন্দুর উপরে অত্যাচারও করেছেন, বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিতও করেছেন।

"তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্ম-মুসলমানদের চেয়েও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেই তিনি অনেক হিন্দুর উপর অত্যাচার করেন, এ কথা দুটি বিবরণীতে পাই। 'রিযাজ-উস-সালাতীনে' পাই, তিনি বহু হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁর শুদ্ধি অনুষ্ঠানে স্বর্ণনির্মিত গাভীর অংশ নিয়েছিল, তাদের যন্ত্রণা দিয়ে শেষপর্যন্ত গোমাংস খেতে বাধ্য করেন বুকাননের বিবরণীতে পাই, 'সিংহাসন অধিকার করে জালালুদ্দিন হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে সুরু করেন এবং তাদের মুসলমান হতে বাধ্য করেন, ফলে অনেক হিন্দু করতোয়া নদীর ওপারে কামরূপ দেশে পালিয়ে যায়।"[৩] জালালুদ্দিনের পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ শাহও অত্যাচারী ছিলেন। " 'রিয়াজ' এ পাওয়া যাচ্ছে তিনি অত্যন্ত বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাসু ছিলেন। বিনা কারণে তিনি রক্তপাত করতেন, এবং গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরতেন।"[৪]

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে বাঙ্গালার সুলতান ছিলেন জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ। ইনিও অন্যান্য অনেক হিন্দুদ্বেষী মুসলমান নরপতির মতই হিন্দুর উপরে

---

১ মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী গ্রন্থে ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক উদ্ধৃত ও অনূদিত—পৃঃ ৬ ৭
২ তদেব, পৃঃ ৭
৩ বাংলার ইতিহাসের দুশ' বছর—পৃঃ ১৬৭ ৪ বাংলার ইতিহাসের দুশ' বছর—পৃঃ ১৬৭

অত্যাচার করতেন। তারপর অত্যাচারী কুখ্যাত হাব্‌সীদের শাসনকাল। এই সময়ে নবদ্বীপের তথা বাঙ্গালা দেশের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্যে। জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে নবদ্বীপে মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের বিবরণ আছে :

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লএ তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘরদ্বার লুটে তার লৌহপাশে বান্ধে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
জীবন ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট মাঠ যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥[১]

এই সময়ে নবদ্বীপ অঞ্চলে গুজব রটেছিল যে গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে। এই গুজব তৎকালীন গৌড়ের সুলতানের কানেও উঠেছিল। সুতরাং নদীয়ায় যাবনিক অত্যাচার চরমে উঠেছিল। নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামের (বর্তমান পারুলিয়া ?) মুসলমানগণও এই সুযোগে হিন্দু নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছিল।

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবনে।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণে॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপ কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপের বিপ্র তুমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকিহ প্রমাদ হএ পাছে॥
নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ধর প্রজা॥

১ চৈতন্য মঙ্গল—৫।১৭-২১

এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল ।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল ॥[১]

এই অত্যাচারে নবদ্বীপে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই ভিটা-মাটি ত্যাগ করেছিলেন। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম সপরিবারে নবদ্বীপ ত্যাগ করে উড়িষ্যা চলে গিয়েছিলেন।

বিশারদ সুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য
সবংশে উৎকল গেল ছাড়ি গৌড়রাজ্য ॥[২]

বাসুদেবের পিতা মহেশ্বর বিশারদও কাশীবাসী হয়েছিলেন—

বিশারদ নিবাস করিল বারানসী ॥[৩]

ঈশান নাগর-রচিত 'অদ্বৈত প্রকাশ'-এ মুসলমানদের অত্যাচারের অনুরূপ বিবরণ আছে। যবন হরিদাস অদ্বৈত আচার্যের কাছে অত্যাচারের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—

দেব প্রতিমা ভাঙ্গি করে খণ্ড খণ্ড।
দেব-পূজার দ্রব্য সব করে লণ্ড ভণ্ড ॥
শ্রীমদ্ ভাগবত আদি ধর্মশাস্ত্রগণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুনে ॥
ব্রাহ্মণের শঙ্খঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়।
অঙ্গের তিলক মুদ্রা বলে চাটি খায় ॥
শ্রী তুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে ।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্ট মনে ॥
পূজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুরে তাড়না করে বলিয়া পাগল ॥
হেনমতে কত শত দুষ্ট ব্যবহারে।
অবহেলে সর্ব ধর্ম কর্ম নষ্ট করে ॥[৪]

এই সকল ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে। Von Nero লিখিত Life of Akbar গ্রন্থে পাঠান আমলের হিন্দু-নিপীড়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে মুসলমান রাজস্ব সংগ্রাহকগণ রাজস্ব আদায়-কালে যদি কোন হিন্দুর মুখে থুথু ফেলতে ইচ্ছা করতো হিন্দুদের হাঁ করতে হোত।[৫]

---

১ চৈ. ম. ২ তদেব, ৫।২৮ ৩ তদেব, ৫।৩০ ৪ অ: প্র: ৯ অ:

৫ Chaitanya and his age—Dr. D. C. Sen—p. 54

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে (মনসা মঙ্গল কাব্য) হাসান-হোসেন পালায় হিন্দুর উপর মুসলমানদের অত্যাচারের যে বিবরণ আছে, তা পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের ইতিহাসের একটি কলংকিত চিত্র। বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

তুলসীর পত্র পাএ যাহার মাথাতে।
চুলে ধরি আনে তারে আপনা সাক্ষাতে॥
সোগার তলে মাথা থুইয়া মারে উভাকিল।
ঝড়ে যেন আকাশ হতে পড়ে দারুণ শিল॥
ব্রাহ্মণে অপমান করে পৈতা পাইয়া কান্ধে।
প্যাদা সকলে তারা হাতে গলে বান্ধে॥[১]

রাখালদের সঙ্গে বিবাদের পরিণামে মোল্লার দল হিন্দু নিধনে যাত্রা করে হুসন কাজীর সঙ্গে। তারা বলতে থাকে,—

যদি গিয়া লাগ পাম যতেক হিন্দুয়া।
জাতি নাশ করিব আজি গোস্ত খিলাইয়া।[২]

বিজয়গুপ্তের পুঁথির একটি পাঠান্তর :—

বাছিয়া বাছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা যাহার কান্দে।
পেদীগণ পাইলে লাগ হাতে গলায় বান্দে॥
কেহ নেয় ঝাড়ি পাটী কেহ নেয় পাটা।
লণ্ডভণ্ড করে কেহ লোহায় কোটা॥
ব্রাহ্মণ পাইলে হয় বড়ই কৌতুক।
কেহ গায়ে ভাত ঘসে কেহ দেয় থুক॥[৩]

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর গ্রন্থে বিজয় গুপ্তের হাসান হোসেন পালার যে পাঠান্তর উল্লেখ করেছেন, তাও এখানে উদ্ধৃত করছি :

হাসান হোসেন তারা দুই ভাইর নাম।
দুইজনে করে তারা বিপরীত কাম॥
কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালি রীত॥

---

১ পদ্মাপুঃ, ক বি.—পৃঃ ১২২ ২ তদেব, পৃঃ ১২৭ ৩ তদেব, পৃঃ ১১২

এক বেটা হালদার তার নাম ভুলা।
বড় অহঙ্কারে করে হোসেনের শলা॥
সর্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।
তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে॥
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝরে পড়ে শিল॥

* * *

যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলা বান্ধে॥
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে এ বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর। কালজ্ঞাপক পয়ার অনুসারে ১৪০৬ শকে অর্থাৎ ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজত্বকালে বিজয়গুপ্ত কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ। তাই কোন কোন পণ্ডিত কালজ্ঞাপক পয়ারটি ভুল মনে করে ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ বিজয় গুপ্তের কাব্য রচনাকাল বলে স্থির করেছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতে অত্যাচারী শাসক জালালুদ্দিন ফতে শাহের রাজত্বকালে ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য রচিত হয়েছিল। এবং বিজয়গুপ্তের কাব্যে বর্ণিত অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল জালালুদ্দিন ফতে শাহের আমলে।[২]

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে শ্রীচৈতন্য দেশের ভবিষ্যৎ দুর্দিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

যবনে উচ্ছন্ন করিবেক বারানসী॥
পূজা চর্য্যা হরিবেক জত দেবালয়।
তীর্থ অগম্য হরিবেক জানিহ নিশ্চয়॥

১ বাংলার ইতিহাসের দুশ' বছর—পৃঃ ১২২ ২ তদেব—পৃঃ ২২১

দেউল দেহারা মঠ ভাঙ্গিবে যবনে।
সন্ধ্যা বেদ দেবার্চনা ছাড়িবে ব্রাহ্মণে ॥[১]

এই বিবরণ ভাবীকালের নয়—সমকালের চিত্র। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে যাবনিক অত্যাচারের বিবরণ অন্যান্য চৈতন্য রচিত গ্রন্থেও সুলভ। শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বে শ্রীবাস পণ্ডিত যখন তিন ভ্রাতার সঙ্গে নিজের ঘরে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম গান করতেন, তখন যবন রাজার অত্যাচারের ভয় করেছিল অবৈষ্ণব পাষণ্ডীগণ —

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎখাত ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥[২]

বৃন্দাবনের চৈতন্য-ভাগবতে দেখা যায় যে, গঙ্গাদাস পণ্ডিতও একসময়ে যবন-রাজার ভয়ে দেশ (নবদ্বীপ) ছেড়ে পালিয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন শ্রীবাসের গৃহে সেই পলায়নের কথা গঙ্গাদাসকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—

গঙ্গাদাসে দেখি বোলে, তোর মনে জাগে।
রাজভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে ॥
সর্ব পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথায় নাহিক নৌকা পড়িলা সংকটে ॥
রাত্রি শেষ হৈল তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া ॥
আর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।
গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥[৩]

যখন যবন হরিদাসকে হরিনাম সংকীর্তন করার অপরাধে বন্দী করা হোল সেই সময়ে অনেক বড় বড় লোক সম্ভবতঃ হিন্দু জমিদার বা ধনী বন্দীশালায় ছিলেন। তাঁরা হরিদাসের বন্দীশালায় আগমনে উৎফুল্ল হয়েছিলেন।

---

১ চৈ. ম বিজয়খণ্ড—১।১১-১৩ ২ চৈতন্য ভাগবত—আদি, ২ অঃ।
৩ চৈতন্য ভাগবত—মধ্য ৯ অঃ

হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন।
হরিষ বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥
বড় বড় লোক যত আছে বন্দিঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥[১]

যবন হরিদাস কৃষ্ণভজনা করতেন বলে তাঁর উপরে কাজির আদেশে মুলুকের পতি যে অত্যাচার করেছিল তাও কম ভয়াবহ নয়। কাজি মুলুকের অধিপতির কাছে বলেছিল—

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥[২]

তারপর কাজির আদেশে বাইশ বাজারে সর্বসমক্ষে হরিদাসকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হয়েছিল।

পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশ ভ্রমণ করে যে ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছিলেন তাতে দেখা যায় যে সেই সময়ে একদল লোক হিন্দু বালকদের চুরি করে মুসলমান বণিকদের কাছে বিক্রী করতো এবং পরে সেই বালকদের খোজা করা হোত। খোজা করার পর যারা বেঁচে থাকতো তাদের বড় করে বিশ বা ত্রিশ ডুকাট দামে বিক্রী করে দিত ইরাণীদের কাছে, ইরাণীরা এদের নিয়োগ করতো স্ত্রীদের রক্ষক হিসাবে।[৩]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে এক মুসলমান রাজদূত ছেলেধরা বালক নিমাইকে চুরি করে পালাবার সময় পথ ভুল করে নিমাই-এর কাছে উচিত শিক্ষা পেয়েছিল।[৪] অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে সেকালের কোন কোন সুলতান হিন্দুবালকদের অপহরণ করিয়ে খোজা বানিয়ে বড় করতেন ভবিষ্যতে নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য।[৫]

মুসলমান সুলতানগণ সকলেই অত্যাচারী ছিলেন না। কোন কোন সুলতান হিন্দুদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারও করতেন। কিন্তু সুলতানদের অধীনস্থ কাজী মুলুকপতি প্রভৃতি কর্মচারীবৃন্দও সুযোগমত হিন্দুদের উপরে অত্যাচার চালাতেন। গয়া প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণায় নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনামের ধ্বনি উঠলে

১ চৈতন্য ভাগবত আদি ১৪ অঃ ২ তদেব ৩ বাংলার ইতিহাসের দুশ' বছর—পৃঃ ৪১৬-১৭
৪ চৈ. ম. নদীয়া—১৯ ৫ বাংলা ইতিহাসের দুশ' বছর—পৃঃ ২৩৬

স্থানীয় মুসলমানগণ কাজীর কাছে নালিশ করে। ফলে কাজীও ক্রুদ্ধ হয়ে কীর্তন নিষিদ্ধ করে।

শুনিঞা ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন।
কাজিপাশে আসি সবে কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজি এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিযা লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুয়ানী।
এবে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি॥

*　*　*

আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিযা তার জাতি যে লইমু॥
হরিনাম কোলাহল চতুর্দিগে মাত্র।
শুনিঞা স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বোলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচায্য॥[১]

নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন—

কাজি নামে যবন প্রতাপ অতিশয়।
নবদ্বীপ আদি তার অধিকার হয়॥
গৌড়েতে যবন রাজা তার প্রিয় অতি।
কাজিরে লঙ্ঘিতে নাহি কাহার শকতি॥
এদেশের লোক সব কাঁপে তার ডরে।
দেবপূজা স্বচ্ছন্দে করিতে কেহ নারে।[২]

শ্রীবাস পণ্ডিত যখন কীর্তন করছেন, তখনও গুজব রটেছে যে নৌকা করে রাজার লোক আসছে বৈষ্ণব ধরে নিয়ে যাবার জন্য।

এইমত কথা হৈল নগরে নগরে।
রাজ নৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে॥[৩]

---

১ চৈতন্য চরিতামৃত—আদি ১৭ পরি　　২ ভক্তি রত্নাকর, ২য় তরঙ্গ—পৃঃ ৫৪

৩ চৈ. ভা. মধ্য, ২ অঃ

এই জনরবকেও সকলে বিশ্বাস করে ও ভয় করে —

যেই কথা শুনে সেই প্রত্যয় তাঁহার।
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়॥[১]

রামচন্দ্র খান রাজাকে কর না দেওয়ার অপরাধে মুসলমান উজির তাঁকে সায়েস্তা করতে তাঁর ঘরে আস্তানা গেড়ে তাঁর জাতি ধর্ম নাশ করেছিল।

দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গা মণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল॥
স্ত্রীপুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিনদিন অবধ্য রন্ধন।
আর দিন সভা লইয়া করিল রন্ধন॥
জাতি জন মানের সকল লইল।
বহুদিন পযন্ত গ্রাম উজাড় হইল॥[২]

জয়ানন্দের বিবরণ অনুসারে গৌরীদাস পণ্ডিত মুসলমানের ভয়ে সাতদিন জলে লুকিয়ে ছিলেন—

কাজি সনে বাদ করি প্রেম-উন্মাদে।
সাতদিন গৌরী দাস ছিলা গঙ্গা হ্রদে॥[৩]

গদাধর দাস প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ ধর্মত্যাগে বাধ্য হওয়ায় দুঃখে —

কাজি সনে বিবাদ করি গদাধর দাস।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলা দেখি লোকে ত্রাস॥[৪]

শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা থেকে গৌড়ে আগমনকালে গৌড় রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করলে রাজকর্মচারী তাঁকে বলেছিল—

মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥

---

১ চৈ. ভা. মধ্য, ২ অঃ　　২ চৈ. চ. অন্ত্য, ৬ পরি
৩ চৈ. ম. উত্তর—১৬৯　　৪ তদেব—১৭১

পিছলদা পর্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হতে নারে পার ॥[১]

যদিও শ্রী চৈতন্যের সমকালীন গৌড়েশ্বর সুলতান হোসেন শাহ মোটামুটি হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন, তথাপি তাঁর আমলেও হিন্দুদের যবনভীতি দূরীভূত হয় নি। হোসেন শাহ তাঁর প্রথম জীবনের প্রতিপালক প্রভু সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেছিলেন পত্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে।[২] তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে উড়িষ্যার দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির ধ্বংস করেছিলেন—

যে হুসেন সর্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে ॥[৩]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন গৌড়ে আগমন করেন তখন হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে কেশব খানকে চৈতন্য বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন ॥
কে বলে গোসাঞি, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরী গরিব বৃক্ষের তলবাসী ॥[৪]

যদিও গৌড়েশ্বর মহাপ্রভুর মহিমা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর রাজ্যে নিরুপদ্রবে স্বেচ্ছামত অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন, তথাপি ভক্তবৃন্দ নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারেন নি। হোসেন শাহ এখন যদিও উদার মনোভাব প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কারো কুমন্ত্রণা পেলে তিনি আবার হিন্দুদ্বেষী হয়ে উঠতে পারেন, এই আশঙ্কায় ভক্তগণ সমবেত হয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন —

স্বভাবেই রাজা মহাকাল যবন।
মহা তমো গুণ বৃদ্ধি জন্মে ঘন ঘন ॥
ওড্র দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ ॥
দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঁই ভাল কহিলেক আমা সভাস্থানে ॥

---

১ চৈ চ মধ্য, ১৬ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য, ২৫ পরি ৩ চৈ ভা. অন্ত্য. ৪ অঃ
৪ তদেব

আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥[১]

জয়ানন্দ লিখেছেন যে রাজা (হোসেন শাহ) মহাপ্রভুকে ধরে আনতে বলায় মহাপ্রভু উত্তর বঙ্গ ছেড়ে শান্তিপুরে চলে গিয়েছিলেন।

রাজা বলে কেশব খাঁ ধরিয়া আন এথা।
কেমন কৃষ্ণ চৈতন্য তারে গাছে মুণ্ডাএ মাথা ॥
তা শুনি নিবর্ত হইল চৈতন্য ঠাকুর।
সর্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা শান্তিপুর ॥[২]

শাসক শক্তির অত্যাচার এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ছাড়াও জাতিভেদ প্রথা অধ্যুষিত হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও ঘৃণা-মিশ্রিত মনোভাব ও আচরণ অনেক নিম্নবর্ণের হিন্দুকে শ্রেণীহীন সাম্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল স্বাভাবিকভাবেই। এই সুযোগে অনেক পীর ফকির নিম্নবর্ণের হিন্দুকে উদার শ্রেণীহীন ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে আসার জন্য প্রলুব্ধ করছিলেন। একজন ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে লিখেছেন—"In Bengal the suppressed and un-orthodox lower classes nursed a grievance against the Brahmanas......But it is a fact that a large number of un-touchables and socially repressed people of Bengal accepted Islam partly lured by prospect of bettering their social and economic status and partly attracted by the magnetic personality and sincere piety of some of the early Muslim saints "[৩]

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই সময়ে উদার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হিন্দুসমাজে ফিরে আসার পথ খুলে না রেখে আত্মরক্ষার তাগিদে শম্বুক বৃত্তির অনুসারী হওয়ায় সমাজের গণ্ডীকে আরও কঠোর, আরও সংকীর্ণ ক'রে তুলছিলেন স্মৃতিশাস্ত্রের পর স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করে।[৪]

---

১ চ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৪ অঃ   ২ চৈ. ম. বিজয়—৪

৩ Islam and its impact on India—K R. Kanungo, p. 26

৪ "......the proselytising zeal of Islam strengthened conservatism in the orthodox circles of the Hindus, who with a view to fortifying their position against the spread of the Islamic faith, increased the stringency of the caste rules and formulated a number of rules in

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে নিরঞ্জনের রুস্মা শীর্ষক অধ্যায়ে ধর্ম ঠাকুর কর্তৃক যবনরূপ ধারণ করে অন্যান্য দেবতাদের সহযোগিতায় হিন্দুর মন্দির দেববিগ্রহ ধ্বংস করার কৌতুককর বিবরণ আছে :

ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথা এ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবন লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখে ত বলে ত দম্বদাব।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল স্থলপানি।
গণেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবী তিহঁ হৈল্যা হায়্যা বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নুর।
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল যাজপুর।

---

the Smriti works. The most famous writers of this class were Madhava of Vijayanagara, whose commentary on a Parasara Smriti work entitled Kalanirnaya was written between A. D. 1335-1360; Visves'vara, author of Madanaparijata, a smriti work written for king Madanapala (A. D. 1360-1370); the famous commentator of Manu, Kulluka, a Bengali author belonging to Beneras school by domicile; and Raghunandana of Bengal, a contemporary of Chaitanya". (Advanced History of India, 1953, p. 403)

দেউল দেহারা ভাঙ্গে   কাড্যা ফিড্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল॥

শূন্যপুরাণের এই কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণটি সম্পর্কে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, যে সকল নিম্নবর্ণের হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে নি, অথচ উচ্চবর্ণের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব পোষণ করতো, তাদেরই মনোভাব এখানে প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমানের হিন্দুর প্রতি অত্যাচারে তাদের সন্তোষ এখানে সুস্পষ্ট।[১]

পর্তুগীজ বণিক বারবোসার বিবরণে (১৫১৪ খ্রীঃ) হিন্দুদের স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উল্লেখ আছে।[২] মুসলমান রাজসরকারের উচ্চপদ লাভের আশায় অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, বারবোসা তারই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মুসলমান-স্পৃষ্ট খাদ্য পানীয় গ্রহণ করলেই জাতিভ্রষ্ট হতে হতো, এমন কি নিষিদ্ধ মাংসের গন্ধ আঘ্রাণ করলেও জাতিচ্যুতি ঘটতো। হিন্দু সমাজের এই সংকীর্ণ মনোভাবও মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।[৩]

এইভাবে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা-দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কেউ কেউ বাঙ্গালাদেশ ছেড়ে পালিয়েছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী তখনও যারা ছিল, তারাও তখন নিরাশ্রয়,—হিন্দুসমাজ তাদের স্থান দেয় নি। নেড়ানেড়ী নামে তারা ছিল অবজ্ঞার পাত্র। পরে নিত্যানন্দ-তনয় বীরভদ্র এই নেড়ানেড়ীদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

মিন্হাজ-উদ্দিনের বিবরণ অনুসারে নূদিয়া ছিল মহারাজ লক্ষ্মণসেনের

---

১ Those among the lower classes out-side the pale of Brahmanism who did not renounce their religion, nevertheless, rejoiced over the destruction of the Brahmanas and their temples by the yavanas as we read in the curious old Bengali poem named S'unyapurana"—p. 26

২ "এই অঞ্চলগুলির পৌত্তলিকরা প্রত্যহই অনেকে মুর (মুসলমান) হয়ে যায় শাসকদের অনুগ্রহ পাবার জন্য।"—বাঙ্গালার ইতিহাসের দুশো বছর—পৃঃ ৪৯৭।

৩ History of Mediaeval Bengal—R. C. Majumdar—p 120

রাজধানী। আইন-ই-আকবরীতে এই সংবাদের সমর্থন মেলে।[১] এই নুদিয়াকেই পণ্ডিতরা পরবর্তীকালের নবদ্বীপ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[২] জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে একসময়ে নবদ্বীপ বাঙ্গালাদেশের রাজধানী ছিল—পূর্বে যেন ছিল নবদ্বীপ রাজধানী।[৩] জয়ানন্দের বিবরণে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বে নবদ্বীপ একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল। নবদ্বীপের বর্ণনায় জয়ানন্দ লিখেছেন—

নানা চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী
নানা জাতি বস্ত্রে তথা।
চূর্ণ বিলেপিত দেউল দেহারা
নানা বর্ণে বৃক্ষলতা॥

* * *

প্রতি ঘরের উপরি বিচিত্র কলস
চঞ্চল পতাকা উড়ে।
পূর্বে যেন ছিল অযোধ্যা নগরী
বিজুরী ছটাকে পড়ে॥
নাট পাঠশাল দীঘি সরোবর
কূপ তড়াগ সোপান।
মঠ মণ্ডপ সুযন্ত্রিত চত্বর
কুন্দ তুলসী উদ্যান॥
ইষ্টকা রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন
সুযন্ত্রিত গৃহদ্বার।
হিঙ্গুল হরিতালে কাচ চাল
চৌখণ্ডী চৌবার শাল॥[৪]

---

১ "At that time (Raja Neo=Nanja) when the cup of life was filled to the brims was succeeded in the government by Luckmeenyah (Lakshmaneya), the son of Luckmen. At that time Nuddea (Nadia) was the capital of Fengal, when it abounded with wisdom."—Ain i Akbari.

২ "এই নুদিয়া বা নোদিয়া স্পষ্টতই গঙ্গাতীরে এবং পরবর্তী কালের নদীয়া ও নবদ্বীপের পূর্বরূপ।"—বঙ্গভূমিকা—ডঃ সুকুমার সেন—পৃঃ ১৩৪

৩ চৈ. ম. নদীয়া—৪।৪৫ ৪ চৈ. ম.—নদীয়া—৩

জয়ানন্দের কাব্যে নবদ্বীপে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও কারিগরের বিবরণ আছে। নবদ্বীপ সেকালে বাণিজ্যের কেন্দ্রও ছিল। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "নবদ্বীপ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল বলিয়াই সেখানে পঞ্চদশ শতাব্দে চাটিগাঁ ও সিলেট প্রভৃতি স্থান হইতে ধনী ও সংস্কৃতিমান্ ব্যক্তিদের অনেকে উঠিয়া আসিয়া বাস করিয়াছিল। ইহার পিছনে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় থাকাও সম্ভব।"[১]

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতেও নবদ্বীপ অট্টালিকা-বেষ্টিত একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। বিখ্যাত পর্যটক ট্রাভারনিয়ের নবদ্বীপের উপর দিয়ে গঙ্গাপথে যাওয়ার কালে নবদ্বীপ সহরের উল্লেখ করেছেন—"On the 19th February, 1666, I passed a large town called Nadia, and it is the farthest point to which the tide reaches."[২]

মুসলমান শাসনকালে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। সেন রাজাদের আমল থেকেই হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ দৃঢ়তর—শ্রমজীবী শ্রেণী অবজ্ঞাত।

হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা

এই যুগের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য: "সামন্ততন্ত্র সমভাবে সক্রিয়। উত্তরোত্তর ভূমির চাহিদা বাড়িতেছে, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরাও ভূমি সংগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন. সমাজ ক্রমশঃ ভূমিনির্ভর কৃষিনির্ভর হইয়া উঠিতেছে। অথচ রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে ক্ষেত্রকর বা কৃষক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত।......স্পষ্টই দেখিতেছি, সেন-যুগে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।"[৩] এই সংকীর্ণদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণতর হয়ে আসতে থাকে। সুতরাং জাতিভেদের গণ্ডীও দৃঢ়তর হতে থাকে। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "স্বাধীন সুলতানদের আমলে ব্রাহ্মণশাসিত উচ্চবর্ণের সমাজ ধীরে ধীরে আপনাকে গুছাইয়া লইতেছিল। বৃহস্পতি স্মৃতিরত্নহার রচনা করিয়াছিলেন। আরও অনেকে স্মৃতি লিখিলেন। জাতিভেদের গণ্ডীর প্রসার বাড়াইয়া শূদ্রের মধ্যে 'সৎ' 'অসৎ' বিচারপূর্বক বিবিধ কম্পার্টমেন্টে ভাগ করিয়া হিন্দুর ছত্রিশ জাতি মানিয়া লওয়া হইল। সব জাতির পক্ষেই সংস্কার ব্যবস্থা করা হইল।"[৪]

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ২৫০

২ Travernier's Travels in India—vol. I

৩ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫১৭

৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ২৫০

এই অবস্থায় উচ্চবর্ণের দ্বারা অবহেলিত অবজ্ঞাতশ্রেণী সহজেই ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে পেরেছিল। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুসমাজের সংকীর্ণ মনোভাব সম্পর্কে লিখেছেন, "প্রথমত তাহারা স্মার্ত হিন্দু সমাজের নিকট মনুষ্যত্বের সামান্যতম অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। ইতিপূর্বেই হিন্দু সমাজে যাহারা 'অধম সঙ্কর' বলিয়া নিন্দিত ছিল—অর্থাৎ চাঁড়াল, বারুই, চামার, দুলে, মালো প্রভৃতি অন্ত্যজগণ—বর্ণহিন্দুর জীবনাদর্শের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না। তাই ইহাদের পক্ষে নব মানবতার বাণী উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। উপরন্তু হিন্দুসমাজে অশ্রদ্ধেয় পাষণ্ডী বৌদ্ধগণও নানাদিক দিয়া এমনভাবে নিপীড়িত হইতেছিলেন যে, বাংলায় কেবলমাত্র ইসলাম কেন, যেকোন হিন্দু বিরোধী রাষ্ট্র শক্তির আবির্ভাব হইলেই এই নিম্ন শ্রেণীর জনসমূহ তাহাকে বরণ করিয়া লইত।………পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রবাসী রামচন্দ্র কবিভারতী (১৩শ শতকের মধ্যভাগ) বৌদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু সমাজের উৎপীড়নে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া সিংহল যাত্রা করিতে হইয়াছিল। গণেশের পুত্র যদু প্রথমবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর পিতা 'সুবর্ণ ধেনু' নামক প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন; তথাপি যদু (জালালুদ্দিন) হিন্দু সমাজে গৃহীত হন নাই। ইহার প্রতিক্রিয়ায় তিনি পীর ফকিরদের প্ররোচনায় হিন্দুর উপর নির্মম অত্যাচার করিয়াছিলেন; কালা পাহাড়ের কাহিনীর অনেকটা গল্প হইলেও ইহার পশ্চাতে হিন্দু সমাজের অন্ধ সংকীর্ণতার ঐতিহাসিক চিত্রই প্রকটিত হইয়াছে।"[১]

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, "হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সহিত গৌড়ে ও বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ প্রচলিত কঠোর সমাজ শাসনে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ হিন্দু সমাজে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। নব প্রচলিত ধর্মে বর্ণাশ্রম বিচার ছিল না। পূর্বে সমাজভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিত। বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। ইহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙ্গালাদেশে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত ছিল।"[২]

---

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম, পৃঃ ২৪৭

২ বাঙ্গালার ইতিহাস—২য়, পৃঃ ২৪৭

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত এককালের রাজধানী নবদ্বীপেও কিছু বৌদ্ধের বাস ছিল। চূড়ামণি দাসকৃত গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্যে নবদ্বীপে পঞ্চদশ শতকে বৌদ্ধদের বসবাসের উল্লেখ পাই—

বৌদ্ধ তার্কিক মৈমাংসিক বৈদান্তিক।
সভাকার নাটে কহে ইবে দেখি ধিক॥[১]

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত পাষণ্ডীগণ বৌদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। বিলীয়মান বৌদ্ধ মহাযান বজ্রযান কালচক্রযান মতবাদের প্রভাব—বিকৃত তান্ত্রিক আচার—মদ্যাসক্তি—সহজিয়া প্রভাবান্বিত ধর্মচর্যার নামে ব্যাভিচারের ব্যাপকতা—ধর্মের নামে নিষ্প্রাণ লৌকিক আচারসর্বস্বতা—লৌকিক দেবদেবীর পূজা—লৌকিক দেবদেবীর মঙ্গলগান—আমোদপ্রমোদ স্মৃতিশাস্ত্র-শাসিত হিন্দুসমাজের দৃঢ়বন্ধনকে ক্রমাগত আঘাত হেনে দুর্বল করে ফেলছিল। অপরদিকে প্রাচীন বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি পৌরাণিক পূজাপার্বণও উচ্চবর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত ছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সেন-রাজত্বের অবসানের পরে বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের ধর্মাচরণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[২] খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ধর্মার্চনা সম্পর্কে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "The decline of faith in the vedic sacrifices and rituals, and the substitution in its place of sectarian religious and numerous ceremonies and festivals connected therewith, continued during the middle age. Buddhism as a religious sect practically vanished, though some scholars trace its influence, or even survival in the worship of Dharma Thakur, referred to in the S'unya Purāṇa, prevalent among the lower classes of people. Jainism maintained a precarious existence inBengal. S'aivism, S'aktism and Vaishṇavism with numerous sub-sects became very popular, though less papular sects of old like Saura, Gāṇapatya, Pāśupata, Pancharātra, Kāpālika etc. were not altogether unknown. The Tantrik religion also flourished very much and its mantras, mudrās and mandalas acquired wide popularity."[৩]

---

১ গৌ. বি.—পৃঃ ১৪ ২ বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব—পৃঃ ৬৭৭-৭৮
৩ History of Mediaeval Bengal—p. 195.

পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সমাজের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। তিনি লিখেছেন—

ধর্মকর্ম লোক সব এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থকাল যায় ॥
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিত্র সব।
তাহারাই না জানে সব গ্রন্থ অনুভব ॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি মরে ॥
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না কবে কথন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি ॥[১]

ভক্তিধর্মের প্রসার সেকালে ছিল না। ছিল আমোদ প্রমোদ আর ধর্মের নামে তামসিকতা ও দেবপূজার নামে অনাচার। তাই বৃন্দাবন আরও বলেছেন,

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে ॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল ॥

বৃন্দাবন আর একস্থানে লিখেছেন—

সকল নদীয়া মত্ত ধনপুত্ররসে ॥
শুনিলেই কীর্তন করয়ে পরিহাস ।[৩]

---

১ চৈ. ভা. আদি—২ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি—২ অঃ
৩ তদেব—৯ অঃ

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থার উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে বৃন্দাবনের বর্ণনায়:—

ধর্মকর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত॥[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করে জাগরণ
তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ॥[২]

মদ্যমাংসে দানব পূজা যক্ষপূজা যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি ভূত প্রেত ডাকিনী শাকিনীতে বিশ্বাসও ছিল। তাই ডাকিনী-শাকিনীর ভয়ে শচী দেবী পুত্রের নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ভয়ে নাম থুইল নিমাই॥[৩]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে কলিযুগে পৃথিবীর দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে বসুন্ধরা বলছেন—

কপটী লোলুপ দ্বিজ শূদ্রান্নভোজন।
সর্বলোক হইল শিশ্নোদর পরায়ণ॥
ব্রত উপবাস নাঞি কার শক্তি।
গঙ্গা তুলসীর সেবা নাঞি বিষ্ণুভক্তি॥
বাপ মা ছাড়িল পুত্র স্বতন্ত্রা যুবতী।
পরদারে রত হইল সত্যে নিজ সতী॥
স্নান সন্ধ্যা দেবার্চন ছাড়িল ব্রাহ্মণে।
শূদ্রের জীবিকা করে ভয় নাঞি মানে॥

১ চৈ. ভা. অন্ত্য—২অ:　　২ চৈ. চ. আদি—৭ অ:　　৩ চৈ. চ. আদি—১৩অ:

শূদ্র স্ত্রী সঙ্গম করে শূদ্র ভক্ষ্যে রত।
মৎস্য মাংসে লোলুপ ব্রাহ্মণ সব যত ॥[১]

চোর দস্যুর উপদ্রব যেমন ছিল, তেমনি দস্যুরা মদ্যমাংস দিয়ে চণ্ডীপূজা করতো। এইরূপ একটি দস্যুদলকে উদ্ধার করেছিলেন নিত্যানন্দ।[২] মহাপ্রভুর মুখে ভবিষ্যৎকালে দেশের অনাচার বর্ণনা প্রসঙ্গে জয়ানন্দ বলেছেন—

ব্রাহ্মণে হরিবেক বেদ ইন্দ্র হরিবেক জল।
নানা ছলে রাজা অর্থ হরিবে সকল ॥
পৃথিবী হরিবেন শস্য রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
কপিলা হরিবে ক্ষীর স্বতন্ত্রা যুবতী ॥
ব্রাহ্মণ হরিবেক বেদ শূদ্র বৈশ্যাচার।
ভগিনী হরিবেক ভাই যুগের বেভার ॥

*　　*　　*

দেউল দেহারা মঠ ভাঙ্গিবে যবনে।
সন্ধ্যা বেদ দেবার্চনা ছাড়িবে ব্রাহ্মণে ॥

*　　*　　*

পৃথিবী ছাড়িব অবধূত যতি সতী।
মৎস্য মাংস খাবে সব বিধবা যুবতী ॥
পিতা লঙ্ঘিবেক পুত্র গুরু লঙ্ঘিবেক শিষ্য।
বিধবা ব্রাহ্মণী সব খাইব আমিষ্য ॥
স্বামী লঙ্ঘিবে স্ত্রী কপটী সংসার।
ভাল বংশে জন্মিআ হবেক দুরাচার ॥

*　　*　　*

কন্যা বেচিবেক যে সর্বশাস্ত্র জানে ॥
ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ি পারশ্য কহিবে।
মোজা পাগড়ি হাথে কামান ধরিবে ॥
মনসবি আবৃত্তি করিব দ্বিজবরে।[৩]

---

১ চৈ. ম. আদি—৫।৯-১৪　　২

৩ চৈ. ম. বিজয়—৫-৭, ১৩, ১৬-১৮

বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের এই চিত্র সমকালীন যুগচিত্র। বিজেতা মুসলমান শাসকের অত্যাচার ও নিষ্পেষণে সন্ত্রস্ত, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের উপেক্ষামূলক মনোভাবে পীড়িত এবং শুষ্ক জ্ঞানচর্চায় ও নিরর্থক ব্যয়বহুল উৎসবে প্রমোদে নিমগ্ন ধর্মনীতিভক্তিহীন নবদ্বীপের সমাজ তখন সর্বপ্রকার অবক্ষয় ও অধোগতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের অবস্থাও এর থেকে ভাল ছিল না।[১] মুসলমান শাসকশক্তির নিপীড়ন ও সমাজের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বিবরণ দিয়েছেন M. T. Kennedy : "Hindu temples had been transformed into mosques in large numbers in the early days of Moslem rule and instances were not lacking of continuing 'will to power' of the Islamic rulers, expressed in rigorous suppression or aggression, forced conversions and the like. Hinduism was hated by them and heartily despised ; its festivals, images and worship tolerated with difficulty, its obliteration desired. Naturally, the religious life of the people was not wholly at ease.

Within Hinduism itself the oppressive aspects of the caste system were not lacking. To the tyranny without was added a social tyranny within out of the more or less chaotic conditions left by a disintegrating Buddhism, the Brāhmaṇa architects of Hinduism had sought to ensure stability by laying caste foundations solid and strong."[২]

M. T. Kennedy চৈতন্যপূর্ব বঙ্গদেশে মুসলমান শাসক শক্তির প্রচণ্ড নিপীড়ন এবং হিন্দু সমাজে উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে বৈষম্য ও পারস্পরিক বিদ্বিষ্ট মনোভাব এবং তৎকালীন বাঙ্গালীর ধর্মচর্যার বৈচিত্র্য ও আনর্থক্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। বিলীয়মান বৌদ্ধধর্মের সাথে সাথে লৌকিক দেবদেবী পূজার ব্যাপকতা এবং তান্ত্রিক ধর্মচর্যার প্রসার ও তান্ত্রিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারেরও তিনি বিবরণ দিয়েছেন।[৩]

---

১ "Hindu society, Hindu religion, Hindu culture were in a chaotic condition under the Moslem rule"—Sri Chaitanya's concept of Theistic Vedanta by Bhakti Vilas Tirtha—p. 18

২ The Chaitanya Movement—pp. 1-2

৩ Ibid —p. 3,

শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বেই নবদ্বীপের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল। ন্যায় বেদান্ত স্মৃতি ব্যাকরণ কাব্য ইত্যাদি চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল নবদ্বীপ; বিশেষভাবে হয়েছিল নব্যন্যায় চর্চার পীঠস্থান। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা নরহরি বিশারদ বা মহেশ্বর বিশারদ, বিশারদের জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুদেব ও অপর পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি, বাসুদেব-শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নব্যন্যায়ের সর্বজনবন্দিত পণ্ডিতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।[১] নবদ্বীপের এই জ্ঞানগরিমার উল্লেখ করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

নবদ্বীপে ন্যায়চর্চা

নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥[২]

অধ্যাপকের সংখ্যা উল্লেখের ব্যাপারে অতিশয়োক্তি আছে অবশ্যই। তবে নবদ্বীপের বিদ্বৎসমাজ সেকালে যে দিগন্তব্যাপী যশের অধিকারী হয়েছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিদ্যা ছিল শুষ্ক জ্ঞানচর্চা—নব্যন্যায়ের কূট তর্কের জটিলতায় আধ্যাত্মিকতা চাপা পড়ে গিয়েছিল, দেবভক্তি ঈশ্বর ভক্তি মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। বৃন্দাবনের মতে ন্যায়ের তর্কে বালকেও দক্ষ ছিল।

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥[৩]

কিন্তু যে গুণে লৌকিক বিদ্যা শুষ্ক জ্ঞানে মাত্র পর্যবসিত না হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে—সেই ভক্তিগুণ অধ্যাপকদের ছিল না। তাই আক্ষেপ করেছেন বৃন্দাবন,—

যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তাঁরা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥[৪]

সেকালের সমাজ ও অধ্যাপক-পণ্ডিতদের ভক্তিহীনতা সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস আরও লিখেছেন,—

---

১ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান—দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

২ চৈ. ভা. আদি, ২ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি, ২অঃ ৪ চৈ. চ. অন্ত্য, ৪অঃ

ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল বিচার॥
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন ব্যয়।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধর্ম কেহো না জানয়॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা কিছুই না মানে॥
যদি বা পড়ায় কেহো ভাগবতগীতা।
সে হো না বাখানে ভক্তি করে শুষ্ক চিন্তা॥[১]

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধে বৃন্দাবন আরও লিখেছেন—

না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥
যেথা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥[২]

যে কয়জন বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁরাও ছিলেন উপহাসের পাত্র—"সকল পাষণ্ডী মিলি বৈষ্ণবেরে হাসে।"[৩]

সুতরাং চৈতন্যভক্ত বৃন্দাবন স্বাভাবিকভাবেই আক্ষেপ করেছেন—

বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইল সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার॥[৪]

নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু লোকমুখে গৌড়দেশের যে সংবাদ পেয়েছিলেন সেখানেও ভক্তিবিহীন জ্ঞানচর্চার বিবরণ পাই।

কেহো কহে গৌড়দেশে নাহি হরিনাম।
সজ্জন দুর্জন লোকের নাহি পরিত্রাণ॥

১ চৈ. ভা. মধ্য, ২২ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ২অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ১অঃ
৪ তদেব

কেহ কহে ভক্তিছাড়ি আচার্য্য গোসাঞি।
মুক্তিকে প্রধান করি লওয়াইলা ঠাঞি ঠাঞি॥[১]

নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে অধ্যাপক কেনেডি লিখেছেন, "The spirit of its learning largely secularistic, its chief interest being academic rather than..."[২]

ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবিলাসতীর্থ নবদ্বীপের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে Godless education অর্থাৎ নিরীশ্বরবাদী শিক্ষা বলেছেন। পণ্ডিতরা পরস্পর পাণ্ডিত্যের বিতর্কে উল্লসিত, শিক্ষা থেকে ঈশ্বরভাবনা নির্বাসিত, শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধিকাংশই হয় সংশয়বাদী, নয়ত বহু দেবতায় বিশ্বাসী। পাণ্ডিত্যের অহংকার ও ঐহিক সুখের বাসনা নবদ্বীপকে নীতিহীনতার পংকে নিমজ্জিত করেছিল। কুসংস্কার ও ইন্দ্রিয়সুখ হয়েছিল সাধারণের ধর্ম।[২]

সমাজের শিরোমণিস্বরূপ পণ্ডিতসমাজ যদি নাস্তিক্যবাদী বা সংশয়বাদীতে পরিণত হন, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় পাবে ভক্তির অমৃতাস্বাদন? সাধারণ মানুষ তাই জ্ঞান-ভক্তির অভাবে আপন আপন মত ও বিশ্বাস মতো অর্থহীন অনুষ্ঠান ও ব্যয়বহুল আমোদ প্রমোদকেই ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল। তাই সমাজের উচ্চকোটি থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্রই তমোগুণ অধিকার করেছিল। বৃন্দাবন এই সময়ের নবদ্বীপের অবস্থা সম্পর্কে আরও লিখেছেন—

কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছেন কত॥
কেহ না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্তন।
না করুক ব্যাখা আরো নিন্দে সর্বক্ষণ॥[৩]

নৈতিক অধোগতিও দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুসমাজকে গ্রাস করেছিল, অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল বাঙ্গালী সমাজ। তান্ত্রিক সাধনার ব্যাপকতায়

নৈতিক অধোগতি

ছদ্মবেশে নরনারীর ব্যভিচার বিষাক্ত দুষ্টক্ষতের মত সমাজদেহে প্রসারিত হয়েছিল। সহজিয়া সাধনার ছদ্মবেশে ধর্মের নামে নরনারীর ইন্দ্রিয়চর্চা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। হিন্দু রাজারাও

১ প্রেমবিলাস—১ম বিলাস
২ Sri Chaitanya's concept of Theistic Vedanta—p. 19.
৩ চৈ. ভা.

এই দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন না। কিম্বদন্তী এই যে সম্রাট বল্লালসেনের রক্ষিতা পদ্মিনী নাম্নী সুন্দরী চণ্ডালকন্যা প্রধানা মহিষীরও অধিক মর্যাদা ভোগ করতো এবং রাজা চণ্ডালী-পরিবেষ্টিত খাদ্য সভাসদবর্গকে ভোজন করতে বাধ্য করতেন।[১] সেকশুভোদয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী লক্ষ্মণ-সেনের সভায় নৃত্য করতেন।[২] জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী সম্পর্কে আর একটি কিম্বদন্তী এই যে পদ্মাবতী পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সেবাদাসী ছিলেন, সেখান থেকে জয়দেব তাঁকে সঙ্গিনী হিসাবে নিয়ে আসেন।[৩] খ্যাতনামা বৈষ্ণব অভিরাম গোস্বামীর সঙ্গিনী ছিল মালিনী।[৪] হিন্দুরাজত্বের অবসানের পরে এই নৈতিকতাহীন ধর্মচর্যা সমাজদেহের সর্বাঙ্গে প্রসারিত হয়েছিল। চর্যাপদে যে শিথিলবদ্ধ সমাজের চিত্র পাই তা প্রধানতঃ শবর, চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতি নিম্ন-বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে, মঙ্গলকাব্যে শিবের কোচনী-ডোমনী চণ্ডালী সংসর্গে সমাজের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা উচ্চতর নৈতিকতার ধারণা জন্মায় না। সেকশুভোদয়ায় পরিবেশিত একটি উপাখ্যানে বিদ্যুৎপ্রভা নাম্নী বারাঙ্গনা প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে উন্মুক্ত বক্ষ প্রদর্শনের দ্বারা বিদেশী সেখকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছে। যদিও সেকশুভোদয়ায় বর্ণিত ঘটনা সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত প্রসিদ্ধ স্মার্ত হলায়ুধ মিশ্রের রচনা বলে প্রচলিত, তথাপি পণ্ডিতবর্গের মতে এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।

রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মনৈতিক সকল দিক থেকেই বাঙ্গালী হিন্দু ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। যুগের এই সংকটজনক মুহূর্তে আবির্ভাব যুগাবতার মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের।

নবদ্বীপে বৈষ্ণব পরিমণ্ডল—শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই নবদ্বীপে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছিল। বীরভূমের কেন্দুবিল্ব-নানুর থেকে অজয়ের তীর ধরে কাটোয়া-নবদ্বীপ-শান্তিপুর পর্যন্ত একটি বৈষ্ণবীয় আবহাওয়া গড়ে

---

১ Chaitanya and his age—Dr. D. C. Sen—p. 6

২ সেকশুভোদয়া—৭ম অঃ

৩ Chaitanya and his age—p. 7 ৪ Ibid

৫ Sekasubhodaya—Intrduction—by Dr. S. K. Sen, Asiatic Sociaty —p. X.

উঠেছিল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ যদিও অবিশ্বাসী পাষণ্ডী ও বিধর্মী শাসকদের দ্বারা উৎপীড়িত হতেন, তবু তাঁদের প্রভাব ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছিল। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন অদ্বৈত আচার্য। বিভিন্ন স্থান থেকে বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপে সমবেত হচ্ছিলেন।

কার জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ় উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥
সব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ গ্রামে।
কোন মহাপ্রিয়দাসের জন্ম অন্যস্থানে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত॥
ভবরোগনাশে বৈদ্য মুরারী নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল তা সবার পরকাশ;
বুঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥[১]

বৃন্দাবন দাস পুনর্বার বলেছেন—

নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥

অদ্বৈত আচার্যের জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে নরহরি চক্রবর্তীপ্রদত্ত বিবরণ:

অদ্বৈতের পিতামহাদি বিখ্যাত।
বঙ্গে বাস পূর্বে শান্তিপুরে গতায়াত॥
বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
সর্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম॥

---

১ চৈ. ভা আদি, ২অ:　　২ চৈ. আ. আদি, ২ অ:

তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয়।
মিশ্র পণ্ডিতাচার্য এ খ্যাতি তাঁর হয়॥

* * *

নাভা নামে শ্রীকুবের মিশ্রের ঘরণী।
অতি পতিব্রতা তেঁহো অদ্বৈত জননী॥

* * *

নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ॥[১]

বিবাহের পরে অদ্বৈত শান্তিপুরে আগমন করেন। নবদ্বীপেও তাঁর একটি ডেরা ছিল।

ঐছে রহে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায়॥
প্রায় শ্রীবাসের গৃহে অদ্বৈতের স্থিতি।
কৃষ্ণ রসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি॥
কভু শান্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায়।
কৃষ্ণ বিনা কথোদিন উদ্বেগে গোঙায়॥[২]

নিত্যানন্দ দাসের মতে শ্রীহট্টের লাউড় রাজ্যে কুবের মিশ্র এবং নাভাদেবী বাস করতেন। নাভাদেবীর ছয় পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাটি জন্মের পরেই মারা যায়। ছয় পুত্রের নাম শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল দাস ও কীর্তিচন্দ্র। ছয় জনেই তীর্থ পর্যটনে গমন করেছিলেন। তন্মধ্যে চারজন তীর্থপর্যটনকালেই লোকান্তরিত হন। অপর দুজন ফিরে আসেন কুবের নবগ্রাম ত্যাগ করার পর। পুত্রশোকে কাতর হয়ে কুবের ও নাভাদেবী নবগ্রাম ত্যাগ করে শান্তিপুরে এসে বসবাস করেন।

পুত্রশোকে নাভাদেবী কুবের মহামতি।
গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে করিলা বসতি॥[৩]

শান্তিপুরেই অদ্বৈতের জন্ম হয়। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কমলাকান্ত, পরে নাম হয় অদ্বৈত আচার্য। স্মৃতি, বেদ, পুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি পাঠ সমাপনের পরে পিতৃবিয়োগের পর বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমণ ক'রে অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে ফিরে এসে মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে

১ ভক্তি রত্নাকর—১২ তরঙ্গ ২ ভ. র.—১২ তরঙ্গ ৩ প্রেমবিলাস—২৪ বিলাস

আগমন করলে অদ্বৈত তাঁর কাছে গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন—

দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র দীক্ষা তাঁর স্থানে।
মাধবেন্দ্র-শিষ্য অদ্বৈত সর্বলোকে মানে॥[১]

ভক্তি রত্নাকর অপর একস্থানে বলেছেন যে, কুবের ও নাভাদেবী গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

দোঁহে শান্তিপুরে আসি গঙ্গা সন্নিধানে।
নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা আলাপনে॥[২]

তারপর নাভাদেবী গর্ভবতী হলে কুবের নবগ্রামে ফিরে আসেন এবং অদ্বৈতের জন্মের কিছুকাল পরে তিনি বন্ধুবর্গের সঙ্গে শান্তিপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন। অদ্বৈতপ্রকাশের বিবরণে কুবেরের অনেকগুলি পুত্রসন্তান মারা যাওয়ার পরে তিনি শান্তিপুরে এসে বসবাস করতে থাকেন।[৩] পরে দিব্যসিংহ নরপতির রাজত্বকালে কুবের লাউড়ের নবগ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন ভার্যার সঙ্গে। সেখানেই অদ্বৈতের জন্ম হয়। অদ্বৈত দ্বাদশ বৎসর বয়সে শান্তিপুরে এসেছিলেন ষড়্‌দর্শন অধ্যয়ন করতে।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম শান্তিপুরে গেলা।
ষড়্‌দর্শন শাস্ত্র ক্রমে পড়িতে লাগিলা॥[৪]

কিছুকাল পরে সস্ত্রীক কুবের শান্তিপুরে এসে পুত্রের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। অদ্বৈত আচার্যের জন্ম শ্রীহট্টেই হোক আর শান্তিপুরেই হোক, তিনি শান্তিপুরেরই অধিবাসী ছিলেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরে মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তৎকালীন নদীয়ায় বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

তবে কৃষ্ণমন্ত্ররাজ লৈল প্রভু পুরীরাজস্থানে।
তবে লোক শিক্ষাইতে প্রভু সযতনে॥[৫]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রিয় অতিশয়॥
সর্বমতে জ্যেষ্ঠ তাঁর বাস বঙ্গদেশে।

---

১ প্রেমবিলাস—২৪ বিলাস ২ ভ. র.—৫।২০৪৪ ৩ ভ. র.—১।২০৭০-৭২

৪ অদ্বৈতপ্রকাশ—২য় অধ্যায় ৫ অদ্বৈতপ্রকাশ—৫ম অধ্যায়

চক্রশালা নামে গ্রাম চাটিগ্রাম পাশে ॥
মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপেও স্থিতি হয়।
নবদ্বীপে আছে তাঁর অপূর্ব আলয় ॥[১]

প্রেমবিলাসের মতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পুণ্ডরীক ঘোর বিষয়ীর মত রাজসিক জীবন যাপন করতেন। নবদ্বীপেও তাঁর একটি বাড়ী ছিল। এখানে তিনি মাঝে মাঝে বাস করতেন।

চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার।
অতি ধনবান হয় অতি শুদ্ধাচার ॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয় কুলাংশে উত্তম।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তার নাম ॥

* * *

নবদ্বীপে তার এক আছয়ে আবাস।
মাঝে মাঝে নবদ্বীপে আসি করে বাস ॥

* * *

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয়।
বাহে সদা বিষয়ীর ব্যবহার কয় ॥

* * *

অতি গাঢ় কৃষ্ণভক্তি আছয়ে অন্তরে।
বিরক্ত বৈষ্ণব বোলি কেহ চিনিতে না পারে ॥[২]

চট্টগ্রামের বেলেটী গ্রাম নিবাসী পুণ্ডরীকের সহপাঠী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য মাধব মিশ্র বা মাধবাচার্যও নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

তাঁর প্রিয় সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয়।
চট্টগ্রামে বেলেটি গ্রামে তাঁহার আলয় ॥
অতি শুদ্ধাচার ইহোঁ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
পরম বৈষ্ণব ইহোঁ কুলাংশে উত্তম ॥

* * *

নবদ্বীপে আসি তিঁহো করিলা আলয়।
মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয় ॥[৩]

---

১ ভ. র.—১২।১৮০১-৩ ২ প্রে. বি.—২২ বি ৩ প্রে. বি.—২২ বি

শ্রীবাস পণ্ডিতেরও আদি বাড়ি শ্রীহট্ট—শ্রীবাসের পিতা জলধর পণ্ডিত শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। শ্রীবাসের চার ভাই নবদ্বীপে ও কুমারহট্টে থাকতেন।

শ্রীহট্টনিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত।
নবদ্বীপে বাস করে হইয়া সস্ত্রীক ॥
তাঁর পাঁচ পুত্র হৈল বিদ্বান।
রূপে গুণে শীলে ধর্মে অতি গুণবান্ ॥
সর্বজ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয়।
যাঁহার কন্যার নাম নারায়ণী হয় ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীপতি পণ্ডিত আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত ॥
শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি হয়।
চারি সহোদর কৃষ্ণভক্ত অতিশয় ॥
কুমারহট্টে বাস নবদ্বীপে আর।
নবদ্বীপে কুমারহট্টে গতায়াত সভার ॥
অধিক সময় নবদ্বীপে করয়ে বসতি।
কথন কথন কুমারহট্টে করে অবস্থিতি ॥[১]

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ লীলায় অন্য দুই সঙ্গী মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত নবদ্বীপে এসেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে।

চট্টগ্রাম দেশ চক্রশাল গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে বসতি করয় ॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত ॥
দুইভাই কৃষ্ণভক্ত জানে সর্বজন।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন ॥
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর প্রিয় দাস ॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়।
প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্বদায় ॥[২]

১ প্রে. বি.—২১ বি ২ প্রে. বি.—২২ বি

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃপঞ্চকের মত প্রসিদ্ধ বৈদ্য চিকিৎসক এবং শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ভক্ত মুরারী গুপ্ত, শ্রীচৈতন্যের মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বাস করেছিলেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীং ম পণ্ডিত।
চন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারী নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার।[১]

চন্দ্রশেখর আচার্য নীলাম্বর চক্রবর্তীর কনিষ্ঠা কন্যা সর্বজয়াকে বিয়ে করে সস্ত্রীক নবদ্বীপে এসে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর কাছে বাস করেছিলেন। বল্লভ ঘোষ, চৈতন্য লীলার কাব্যকার ভক্ত কবি বাসু ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ শ্রীহট্টে পঞ্চখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।[২] কবি-কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের পিতা শিবানন্দ সেন শ্রীহট্ট জেলার চৌয়াল্লিশ পরগণার আদিপাশা গ্রাম থেকে এসে কুমারহট্টে বসবাস করেছিলেন। এমন কি, বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতামহ দুর্গাদাস মিশ্রও শ্রীহট্ট থেকে এসে নবদ্বীপে বসবাস করেছিলেন।

শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি।
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিলা বসতি ॥[৩]

গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, "শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালেরাই নিমাইয়ের জন্মের পূর্বে নবদ্বীপে প্রাক্ চৈতন্য বৈষ্ণব আবেষ্টনটি গড়িয়া তুলিয়াছিল— পরিপুষ্ট করিয়াছিল।"[৪]

নানাস্থান থেকে আগত বৈষ্ণবগণের যে সম্মেলন ঘটেছিল নবদ্বীপে তার নেতৃস্থানীয় ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। বৈষ্ণবগণ সংখ্যালঘু এবং উৎপীড়িত হলেও কৃষ্ণনামকীর্তন ইত্যাদিতে বিরত ছিলেন না। শ্রীবাসাদি চারিভ্রাতা নিজগৃহে কৃষ্ণনাম গান করতেন—

সর্বকাল চারিভাই গায়ে কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গা স্নান ॥[৫]

---

১ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ

২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ—ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য—পৃঃ ১০৪

৩ প্রেমবিলাস

৪ চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ১৩

৫ চৈ. ভা.—আদি ২ অঃ

শ্রীবাসের কীর্তনগানে স্থানীয় ব্যক্তিরা যবন ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীবাসকে শাস্তি দেবার পরামর্শ করছে শুনে অদ্বৈত আচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মর্তে অবতীর্ণ করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করলেন—

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জলে।
দিগম্বর হই সব বৈষ্ণবেরে বোলে॥
শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্বনয়নগোচর॥[৩]

দেশের মানুষের দুঃখ দৈন্য দুর্দশা সহ্য করতে পারছিলেন না অদ্বৈত আচার্য। তাই তিনি সাধনা করছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মর্তাবতারের।

স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার॥[১]

প্রতিদিন বৈষ্ণবগণ অপরাহ্নে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে সমবেত হয়ে কৃষ্ণনামগানে কালযাপন করেন—

বিকাল হৈলে আসি ভাগবতগণ।
অদ্বৈত সভায় সবে হয়েন মিলন॥
যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
কেহ নাহি জানি কেবা পড়ে কোন ভিত॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥
হুঙ্কার করয়ে কেহ মালসাট মারে।
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পায়ে ধরে॥
এই মতে উঠয়ে পরমানন্দ সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ॥[২]

অদ্বৈত সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকর বলছেন—

কৃষ্ণ বিনা কথোদিন উদ্বেগে গোঙায়॥

---

১ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ৯ অঃ

কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষ প্রকারে।
হইলা প্রকট কৃষ্ণ অদ্বৈত হুঙ্কারে ॥[১]

মাধবেন্দ্র-শিষ্য আচার্য অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সহ যখন নিপীড়নভীত হয়ে গোপনে স্বগৃহে হরিনাম সংকীর্তন করছিলেন আর পরিত্রাতার আবির্ভাবের জন্য তপস্যা করছিলেন সেই সময়ে যবন হরিদাস এসে অদ্বৈতের সহিত সম্মিলিত হলেন। জন্মভূমি বূঢ়ন গ্রাম থেকে হরিদাস এসে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে বসবাস করতে থাকেন।

বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ ॥
কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায় শান্তিপুরে ॥[২]

হরিদাস শান্তিপুরে ফুলিয়ায় গঙ্গাস্নান করতেন আর হরিনাম করতেন—

গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্বস্থান ॥[৩]

তিনি দৈনিক প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম জপ করতেন—

হরিদাস ঠাকুর শাখায় অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥[৪]

নিত্যানন্দ দাসের বিবরণে হরিদাস শান্তিপুরে অদ্বৈতের কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং অদ্বৈতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রে দৈনিক তিন লক্ষ নামজপে দিন অতিবাহিত করতেন।

কোন একদিন আইলা শ্রীশান্তিপুরে ॥
অদ্বৈত প্রভুর পদে লইলা শরণ।
তাঁর ঠাঞি ভক্তিশাস্ত্র কৈল অধ্যয়ন ॥
অদ্বৈতের স্থানে তিঁহো হইলা দীক্ষিতী ।
তিন লক্ষ হরিনাম জপে দিবা রাতি ॥
লক্ষ হরিনাম মনে লক্ষ কানে শুনে।
লক্ষ নাম উচ্চ করি করে সঙ্কীর্তনে ॥[৫]

---

১ ভ. র.—১২।১৭৯০-৯১ ২ চৈ. ভা. আদি ১৪ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ১৪ অঃ
৪ চৈ. চ. আদি ১০ পরি ৫ প্রেমবিলাস—২৪ বি

দুই পরম বিষ্ণুভক্তের মিলন বৈষ্ণব আন্দোলনের পক্ষে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। হরিদাসের শান্তিপুর ফুলিয়ায় আগমনে বৈষ্ণবদের নিঃসন্দেহে শক্তি বর্ধিত হয়েছিল। অদ্বৈত ও হরিদাস মিলে কৃষ্ণকথা রসে কাল কাটাতে থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় হরিদাস ও অদ্বৈতের মিলনদৃশ্য :

আচার্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জনে তারে দিল।
ভগবদ্গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল॥
আচার্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্বাহণ।
দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন॥[১]

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতদেব সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্রতরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা তীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥[২]

হরিদাস ও অদ্বৈত—এই দুই মহাসাধকের সাধনায় 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। দুই মহাসাধকের একই উদ্দেশ্য,—ভগবানের অবতার আশু প্রয়োজন।

জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তার মন॥
দুইজনের ভক্তে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার॥[৩]

দুই ভক্ত সাধক যখন আর্তত্রাতা ভগবানের আবির্ভাবের জন্য কঠোর সাধনায় রত সেই সময়ে শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের অবিরত নাম সংকীর্তনে নবদ্বীপ-শান্তিপুরে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল যে একটু একটু করে প্রসারিত হচ্ছিল এবং শক্তিসঞ্চয় করছিল তা অনুমান করা যায়।

---

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি   ২ চৈ. ভা. আদি ১৪ অঃ   ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি

দ্বিতীয় অধ্যায়

বংশ পরিচয়

শ্রীচৈতন্যের পিতৃব্য কংসারি মিশ্রের পুত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র রচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো-দয়াবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষদের বিবরণ প্রসঙ্গে তাঁদের আদি নিবাস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

আসীচ্ছ্রী হট্টমধ্যস্থো মিশ্রঃ মধুকরাভিধঃ।
পাশ্চাত্যো বৈদিকশ্চৈব তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
বারণাপ্তৈব তেনেহ কিয়দ্ভূমি করোৎকরা।
বরগঙ্গেত্যতো দেশঃ সজ্জনৈঃ পরিগীয়তে॥[১]

—শ্রীহট্টদেশ মধ্যে মধুকর নামে জিতেন্দ্রিয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীভুক্ত মধুকর নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বারণাতে কিছু পরিমাণ ভূমি লাভ করে বসবাস করেন। সজ্জনগণ ঐ স্থানকে বরগঙ্গা (বরুঙ্গা) বলে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলীর সম্পাদক ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির চতুশ্চত্তারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন (১৩৫৪ বাং ১০ই পৌষ) আহ্বায়কগণের অভিভাষণে পাওয়া যায় যে বরুঙ্গা গ্রামের প্রাচীন পুঁথি ও বংশাবলীতে উল্লেখ আছে, এতদঞ্চলের কোন রাজার আমন্ত্রণে মিথিলা হইতে বৎস গোত্রীয় মধুকর মিশ্র ঐ গ্রামের হিরণ্যগর্ভের কন্যা চণ্ডীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।"[২]

প্রদ্যুম্ন মিশ্র বলেন, মধুকরের চার পুত্র ও এক কন্যা ছিল, তাদের নাম কীর্তিদ, রঙ্গদ, উপেন্দ্র, কীর্তিবাস ও ফণী।

চত্বারস্তস্য পুত্রাস্তু সকন্যৈক পঞ্চ বৈ।
কীর্তিদো রঙ্গদোপেন্দ্রো কীর্তিবাসস্তথা ফণী॥[৩]

তন্মধ্যে উপেন্দ্র মিশ্র কৈলাসের নিকটবর্তী ইক্ষু নদীর ধারে গুপ্ত বৃন্দাবনে ভার্যা শোভার সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। উপেন্দ্রমিশ্রের সাতটি গুণবান পুত্র

---

১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী—১।৩-৪ ২ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী—পৃঃ ৪

৩ ঐ ১।৫

জন্মেছিল—সাতটি পুত্রের নাম : কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন, ত্রিলোকনাথ—

বভূবুঃ সপ্তপুত্রাশ্চ তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ।
ব্রাহ্মণ্যগুণসম্পন্না নারায়ণপরায়ণাঃ॥
কংসারিঃ পরমানন্দো জগন্নাথস্ততঃ পরঃ।
সর্বেশ্বরঃ পদ্মনাভো জনার্দনস্ত্রিলোকপঃ॥[১]

নিত্যানন্দ দাস প্রেমবিলাসে মহাপ্রভুর বংশ পরিচয় সম্পর্কে লিখেছেন—

বাৎস্যমুনি বংশ্য বৈদিক বিশুদ্ধ মিশ্র নাম।
যাঁর পুত্র মধুমিশ্র শ্রীহট্টে কৈল ধাম॥
ব্রাহ্মণের বসতি স্থান বড়গঙ্গা গ্রামে।
বিয়ে করি মধু মিশ্র রৈল সেই গ্রামে॥
ক্রমে চারিপুত্র হৈল পণ্ডিত প্রধান।
উপেন্দ্র রঙ্গদ কীর্তিদ কীর্তিবাস নাম॥
উপেন্দ্রমিশ্রের পত্নী কমলাবতী নাম।
সপ্তপুত্র হৈল তাঁর পণ্ডিতপ্রধান॥
কংসারি পরমানন্দ আর জগন্নাথ।
পদ্মনাভ সর্বেশ্বর জনার্দন ত্রৈলোক্যনাথ॥
জগন্নাথের হৈল মিশ্র পুরন্দর পদ্ধতি।
গঙ্গাতীরে আসি নবদ্বীপে করিল বসতি॥[২]

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গ্রন্থে উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নীর নাম শোভা দেবী ও নিত্যানন্দের গ্রন্থে কমলাবতী। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ উপলক্ষ্যে তাঁর পূর্বপুরুষদের নামের যে তালিকা প্রদত্ত হয়েছে, সেই তালিকার সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত তালিকা দুটির মিল নেই। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গঙ্গাজলে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করেছিলেন; জয়ানন্দ সেই তর্পিত পিতৃ-পুরুষদের নাম উল্লেখ করেছেন :—

পিতামহ জনার্দন মিশ্র মহাশয়।
প্রপিতামহ রাজগুরু মিশ্র ধনঞ্জয়॥

---

১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী—১।১৪-১৫ ২ প্রে. বি.—২৪ বি

দিগ্বিজয়ী রামকৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ।
তার পিতা বিরূপাক্ষ কবীন্দ্র বিগ্রহ ॥
তার পিতা ক্ষীরচন্দ্র অভিনব ব্যাস।
দিব্যরথে আইলা সভে দেখিতে সন্ন্যাস ॥
গঙ্গাজল তর্পণে তুষিলা একে একে।[১]

এই তালিকায় মহাপ্রভুর পিতামহের নাম জনার্দন মিশ্র ও প্রপিতামহের নাম ধনঞ্জয় মিশ্র। কিন্তু মুরারি গুপ্ত তাঁর কড়চা নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে বংশতালিকা দিয়েছেন তদনুসারে কৃষ্ণদাস কবিরাজও বংশতালিকা দিয়েছেন। কৃষ্ণদাসের বিবরণে—

শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণ প্রধান ॥
সপ্ত পুত্র তাঁর হয় সপ্তঋষিবর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্বেশ্বর ॥
জগন্নাথ জনার্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ বসুদেব রূপগুণের সাগর ॥[২]

কবিকর্ণপূরও গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীচৈতন্যের পিতামহের নাম উপেন্দ্র মিশ্র ও পিতামহীর নাম কমলাবতী বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] চৈতন্যো-দয়াবলী, প্রেমবিলাস, মুরারির কড়চা এবং চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ একই প্রকার। সুতরাং এই বিবরণই যথার্থ। শ্রীচৈতন্যের পিতামহ জনার্দন মিশ্র নয়, উপেন্দ্র মিশ্র। তবে জনার্দন উপেন্দ্রের নামান্তর হতে পারে।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও নিত্যানন্দ দাসের মতে জগন্নাথ মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস শ্রীহট্ট জেলার বরগঙ্গা বা বরুঙ্গা গ্রাম, কিন্তু জয়ানন্দের মতে শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রাম।

শ্রীহট্ট দেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম।
সর্বসুখময় স্থান ক্ষিতি অনুপাম ॥

---

১ চৈ. ম. সন্ন্যাস—৫।৩-৬ ২ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি

৩ গৌরগণোদ্দেশ- বহরমপুর সং—৩৫-৩৬ শ্লোক

*　　*　　*

জয়পুরে যত যত ব্রাহ্মণের ঘর।
দিব্যমূর্তি মহাবিদ্যা মহাধনেশ্বর॥

*　　*　　*

হেন বংশে জগন্নাথ মিশ্রের উৎপত্তি।[১]

শ্রীহট্ট থেকে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি নবদ্বীপ চলে আসেন খুব সম্ভব কোন কোন রাজনৈতিক উপদ্রবের জন্যই। এই সময়ে শ্রীহট্টের অবস্থা সম্পর্কে জয়ানন্দ লিখেছেন—

অনাচার দেশে বসতিযোগ্য নহে।
শ্রীহট্টে উত্তম জন তিলার্ধ না রহে॥

সুতরাং—

নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে॥[২]

মতান্তরে শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষগণ শ্রীহট্টজেলার ঢাকাদক্ষিণ বা ঠাকুর বাড়ী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[২] প্রদ্যুম্ন মিশ্র জানিয়েছেন যে উপেন্দ্র মিশ্র জগন্নাথকে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন করার পর অধিকতর বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপ পাঠিয়েছিলেন—

ধীমন্তং স্বসুতং বীক্ষ্য জগন্নাথং গুণার্ণবম্।
কাতন্ত্রাদীনি শাস্ত্রাণি পাঠয়ামাস স দ্বিজঃ॥
আবেশং তস্য তত্রৈব দৃষ্ট্বা মিশ্র প্রতাপবান্।
প্রস্থাপয়ামাস চ তং নবদ্বীপে মনোরমে॥[৩]

শ্রীহট্ট থেকে জগন্নাথের নবদ্বীপে আগমনের কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিদ্যার্জনের স্পৃহা দুইই হতে পারে। যে কারণে পরবর্তীকালে (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে দামিন্যা ত্যাগ করে মেদিনীপুর যেতে হয়েছিল, অনুরূপ কোন কারণেই সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের জ্ঞানিগুণী ব্যক্তিরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসে বসতি করেছিলেন। জয়ানন্দের কাব্যানুসারে শ্রীহট্টে দুর্ভিক্ষ অনাচার মড়ক ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব হওয়াতেই জগন্নাথ মিশ্র, নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্রীহট্ট ত্যাগ করে নবদ্বীপে এসেছিলেন।

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—১।১　　২ চৈ. ম. নদীয়া—২।২৩　　৩ চৈতন্যোদয়াবলী—২।১-২

শ্রীহট্ট দেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল।
ডাকা চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিয়া।
নানা দেশে সর্বলোক গেল পালাইয়া॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথে।
সবান্ধবে জয়পুরে ছাড়িল উৎপাতে॥[১]

বিদ্যাবত্তা এবং ব্যবসাবাণিজ্যের স্থান হিসাবে নবদ্বীপের খ্যাতিই যে এঁদের নবদ্বীপে আকর্ষণ করে এনেছিল সন্দেহ নেই। জয়ানন্দ আর একটি নূতন সংবাদ দিয়েছেন। তাঁর মতে শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে বাস করতেন। উড়িষ্যধিপ রাজা ভ্রমরের অত্যাচারে তাঁরা উড়িষ্যা থেকে শ্রীহট্টে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ
আছিল জাজপুরে।
শ্রীহট্ট দেশেরে পালাইয়া গেল
রাজা ভ্রমরের ডরে॥[২]

রাজা ভ্রমরকে অনেকে উৎকলাধীশ কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৩৫-৬৬) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন, কারণ রাজা কপিলেন্দ্রদেবের ভ্রমর উপাধি ছিল।[৩] কপিলেন্দ্রদেবের সময়ে উড়িষ্যা রাজ্যের আয়তন বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু জয়ানন্দ ব্যতীত অন্য কোন্ চরিতকার এই ঘটনার উল্লেখ করেন নি। জয়ানন্দ কথিত বিবরণ যথার্থ হলে এই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষদের উড়িষ্যা থেকে শ্রীহট্টে এবং শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। এরূপ ঘটনা সম্ভব মনে হয় না। জয়ানন্দ অনেক উদ্ভট কাহিনী পরিবেশন করেছেন। উড়িষ্যা থেকে রাজভয়ে পালিয়ে এলে উড়িষ্যা-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গেই যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বাস করা স্বাভাবিক। উড়িষ্যা থেকে যাত্রা করে শ্রীহট্টে গিয়ে বাস করার সঙ্গত কারণ বোঝা যায় না। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী অনুসারে গৌরাঙ্গদেবের বংশ পাশ্চাত্যবৈদিক শ্রেণীভুক্ত। ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্র বাৎস্য

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—২ ২ চৈ. ম. নদীয়া—২
৩ History of Orissa—Harekrishna Mahatab

গোত্রীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, মিথিলা থেকে এসে শ্রীহট্টের বরগঙ্গা নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মুরারির কড়চাতেও তিনি বাৎস্যগোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীভুক্ত।[১] মিথিলায় চৈতন্যের পূর্বপুরুষদের বাসের সংবাদ ভট্টাচার্য মহাশয় কোথায় কিভাবে পেয়েছেন জানি না। তবে উড়িষ্যায় পাশ্চাত্যবৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ না থাকায় জয়ানন্দের বিবরণ সমর্থিত হয় না।[২]

যাই হোক্, শ্রীচৈতন্য যে একটি মহৎ বংশে জন্মেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। জগন্নাথ মিশ্র একজন প্রতিভাবান্ জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের বিবরণে উপেন্দ্র মিশ্র কলাপ ব্যাকরণ সমাপ্ত করার পরে বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপে প্রেরণ করেছিলেন। নবদ্বীপে এসে জগন্নাথ বেদাদি পাঠ করে গুরুর প্রশংসা-ভাজন ও সর্বজনের প্রিয় হয়েছিলেন—

অধ্যেষ্ট বেদং খলু সাম সন্ততং।
সংধ্যায় নারায়ণমাদি দৈবতম্॥
বিদ্যার্থিভিঃ পুণ্যনিকেতনো যুবা।
ধন্যো গুরোঃ সর্বজনপ্রিয়শ্চ সঃ॥[৩]

—তিনি সতত বেদ, বিশেষতঃ সামবেদ অধ্যয়ন করতেন, আদিদেব নারায়ণকে ধ্যান করে বিদ্যার্থিগণের পুণ্য আবাস স্বরূপ গুরুর নিকট তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন এবং সকলের প্রিয় হয়েছিলেন।

মুরারি গুপ্ত জানালেন যে জগন্নাথ মিশ্র সকল গুণযুক্ত কৃষ্ণভক্ত এবং বেদাচার্য ছিলেন। গুরু তাঁর প্রতি প্রীত হয়ে পুরন্দর মিশ্র উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন—

জগন্নাথস্তস্মিন্ দ্বিজকুলপয়োধীন্দুসদৃশো
হ্যভবদ্বেদাচার্য্যঃ সকলগুণযুক্তোগুরুসমঃ।
স কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি ধ্যানপ্রবলতরযোগেন মনসা
বিশুদ্ধঃ প্রেমার্দ্রো নবশশিকলেবাশু ববৃধে॥[৪]

—জগন্নাথ সেই বংশে দ্বিজকুল সমুদ্রে চন্দ্রসদৃশ সকলগুণসম্পন্ন গুরুতুল্য বেদাচার্য হয়েছিলেন। তিনি প্রবলতরযোগে মনে মনে কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে পবিত্ররূপে কৃষ্ণপ্রেমসাগরে নবশশিকলার মত বর্ধিত হতে থাকেন।

অথ তস্য গুরুশ্চক্রে সর্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ।
পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্ মিশ্র পুরন্দরঃ॥[৫]

---

১ মু. কড়চা—১।৩।২০ ২ জয়ানন্দের চৈ. ম. ভূমিকা—পৃঃ xxvii
৩ চৈতন্যোদয়াবলী—২।৪ ৪ মু. ক.—১।১।২৪ ৫ মু. ক.—১।২।১

—অনন্তর সকল শাস্ত্রার্থে অভিজ্ঞ জগন্নাথের তত্ত্বজ্ঞ গুরু তাঁকে মিশ্র পুরন্দর উপাধি দিয়েছিলেন।

কবিকর্ণপূর জগন্নাথ সম্পর্কে লিখেছেন,—

বভৌ মহাবংশসমুদ্ভবঃ সুধী
রনেকবিদ্যাম্বুধিপার পণ্ডিতঃ।
দ্বিজাতিবংশৈকাবতংসবদ্ যতঃ
শ্রীমান্ জগন্নাথ ইতীহ বিশ্রুতঃ॥[১]

—মহাবংশে জাত সুধী, অনেক বিদ্যাসমুদ্রের পারে উপনীত, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণকুলের অলংকার স্বরূপ শ্রীমান্ জগন্নাথ এই নামে বিখ্যাত শোভা পেতে লাগলেন।

রঘুনন্দন গোস্বামী জগন্নাথের গুণাবলী সম্পর্কে লিখেছেন,—

গাম্ভীর্যেণ নদীপতিং করুণয়া শ্রীরন্তিদেবং নৃপং
ধৈর্যেণামরভূধরং সুষময়া শ্রীযামিনীবল্লভম্।
বিদ্যাভির্দিবিষদ্গুরু মুররিপৌ ভক্ত্যা কয়াধোঃ সুতম্
সৎপুত্রপ্রসবেন কশ্যপমুনিং যোঽসৌ বিজিগ্যেভৃশম্॥[২]

—তিনি ধৈর্যের দ্বারা সমুদ্রকে, করুণার দ্বারা রাজা রন্তিদেবকে, ধৈর্যের দ্বারা সুমেরু পর্বতকে, সৌন্দর্যের দ্বারা চন্দ্রকে, বিদ্যার দ্বারা দেবগুরু বৃহস্পতিকে, ভক্তির দ্বারা কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদকে এবং সৎপুত্রদানের দ্বারা কশ্যপমুনিকে অত্যধিক জয় করেছিলেন।

সকল চরিতকারই জগন্নাথের বংশমর্যাদা পাণ্ডিত্য এবং ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভক্তির প্রশংসা করেছেন। জগন্নাথ মিশ্রের উদার প্রশস্তি করেছেন বৃন্দাবন দাসও:—

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহ স্বধর্মে তৎপর॥
উদার চরিত্র তেঁহ ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
কি কশ্যপ দশরথ বসুদেব নন্দ।
সর্বময় তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র॥[৩]

---

১ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্—২।১৩ ২ গৌরাঙ্গচম্পূ—৩।২ ৩ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ

জগন্নাথ মিশ্রের পাণ্ডিত্যের নিদর্শন হিসাবে সুন্দর হস্তাক্ষরে ত্রুটীহীন একটি সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্বের জগন্নাথকৃত অনুলিখনের উল্লেখ করেছেন আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন। আচার্য সেনের ভাষাতেই তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি :—

"A copy of the Ādiparva of the sanskrit Mahābhārata written in Jagannath Miśra's own hand bearing his signature and date of copying, is in the possession of Mahāmahopādhyāy Ajit Nāth Nāyaratna of Nadia. The date is Saka 1890 (1468 A. D.) or 17 years before the birth of Chaitanya. The hand writing is beautiful......The copy is free from errors... A few years ago Lord Carmichael paid a visit to Pandit's house at Nadia with the intension of seeing the sacred book. The copy of Mahābhārata substantiates the statement made by biography that Jagannath Miśra was thoroughly learned in Sanskrit, not a single grammatical error or spelling mistake is met with in this large volume."[1]

'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থেও দীনেশচন্দ্র এই বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।[2] জগন্নাথ সম্পর্কে জয়ানন্দের বক্তব্য :

জগন্নাথ মিশ্র হইল মিশ্র পুরন্দর।
সৎকবি পণ্ডিত মহা তার্কিক সুন্দর॥
উগ্র তপ দেখি সর্বলোক চমৎকার।
স্নান সন্ধ্যা নিত্য শ্রাদ্ধ দেব আচার॥
বলি হোম জপ সন্ধ্যা পূজা ধূপ দীপে।
শ্রীভাগবত পাঠ গোবিন্দ সমীপে॥[3]

বিবাহের পাত্র হিসাবে জগন্নাথ অবশ্যই শ্লাঘ্য। সুতরাং নীলাম্বর চক্রবর্তী স্বীয় কন্যা শচীর জন্য পাত্র হিসাবে জগন্নাথকেই মনোনীত করলেন—

নিষম্য গুণরূপাণি শ্রীল বৈদিকসত্তমঃ।
নীলাম্বরো দ্বিজবরো দ্রষ্টুং তং প্রযযৌ মুদা॥

---

১ Chaitanya and his age—pp. 103-4   ২ বৃহৎ বঙ্গ—পৃঃ ৬৯৮

৩ চৈ. ম নদীয়া—৪।১১-১০

দৃষ্ট্বা তং নরশার্দূলং চক্রবর্তী স্বধর্মরাট্‌।
তস্মৈ কন্যাং প্রদাস্যামি সুশীলায় মহাত্মনে ॥[১]

—বৈদিকশ্রেষ্ঠ নীলাম্বর জগন্নাথের রূপগুণ শুনে সানন্দে তাঁকে দেখতে গেলেন। স্বধর্মনিরত চক্রবর্তী নরশার্দূলকে দেখে এই সুশীল মহাত্মাকে কন্যা দান করবো বলে স্থির করলেন।

গুণৈঃ সমস্তৈরয়মেব শুদ্ধধী-
রধীত বেদো বরণীয় এব হি।
ইতীহ নীলাম্বর চক্রবর্তিনা
বরায় যস্মৈ সুধিয়া সুতার্পিতা ॥[২]

—সমস্ত গুণের আধার শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন বেদে পারদর্শী সুতরাং বরণীয়, —এই ভেবে নীলাম্বর চক্রবর্তী সেই বরে কন্যা সমর্পণ করলেন।

মুরারি লিখেছেন,—

তমেকদা সৎকুলীনং পণ্ডিতং ধর্মিণাং বরম্‌।
শ্রীমন্নীলাম্বরো নাম চক্রবর্তী মহামনাঃ ॥
সমাহূয়াদদৎ কন্যাং শচীং স কুলকৃৎসদঃ।[৩]

—সৎকুলীন, পণ্ডিত, ধার্মিকগণের শ্রেষ্ঠ জগন্নাথকে মহাত্মা নীলাম্বর চক্রবর্তী আহ্বান করে কন্যা শচীকে প্রদান করলেন।

নীলাম্বর চক্রবর্তীর দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তাঁর প্রথম সন্তান যোগেশ্বর পণ্ডিত, দ্বিতীয় সন্তান শচী, তৃতীয় রত্নগর্ভাচার্য ও চতুর্থ সর্বজয়া। নীলাম্বর শচীদেবীকে দান করলেন জগন্নাথের হাতে এবং সর্বজয়াকে দান করলেন চন্দ্রশেখর আচার্যের হাতে।

বেল পুখুরিয়া গ্রামে বাড়ি হয় তাঁর।
দুই পুত্র দুই কন্যা হইল তাঁহার ॥
প্রথম যোগেশ্বর পণ্ডিত, দ্বিতীয় শচী হয়।
তৃতীয় রত্নগর্ভাচার্য চতুর্থ সর্বজয়া কয় ॥

* * *

---

১ চৈতন্যোদয়াবলী—২।৬-৭ ২ কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য—২।১৪
৩ মু. ক.—২।২-৩

শচীরে বিবাহ কৈলা মিশ্র পুরন্দর।
সর্বজয়ায় বিয়ে করে শ্রীচন্দ্রশেখর ॥[১]

জগন্নাথ মিশ্রের বংশ যেমন পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিল, নীলাম্বর চক্রবর্তীর বংশও তেমনি পাণ্ডিত্যের গরিমায় উজ্জ্বল। শচীদেবী ছিলেন সেবাপরায়ণা গৃহিণী, ভক্তিমতী রমণী। গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চা অনুসারে তিনি ছিলেন শান্তমূর্তি ও খর্বাকৃতি।[২] শচীর মত পবিত্রহৃদয়া গুণবতী সাধ্বী নারী সর্বকালেই দুর্লভ। কবিকর্ণপূর শচী সম্বন্ধে লিখেছেন—

শচীতি নাম্নাতিশুচেরকণ্ঠপদ্
গুণেন সৌশীল্যরসেন তেহনয়া।
প্রতিষ্ঠয়া শুদ্ধতমাং গরিষ্ঠতাং
শচী হি যাং নাপ পুরন্দরপ্রিয়া ॥[৩]

—নামে তিনি শচী, অতি পবিত্রতা দিয়ে নির্মিত, গুণে সুশীলতায় প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধতমা গরিষ্ঠা ; সেই শচীকে ইন্দ্রভার্যা শচীও অতিক্রম করতে পারেন নি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংক্ষেপে বলেছেন—তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।[৪] বৃন্দাবন দাস শচীকে মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি বলে উল্লেখ করেছেন—

তান পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা ॥[৫]

মুরারীর বর্ণনায় ধর্মশীলা ভক্তিমতী শচীকে লাভ করে পরম ধার্মিক জগন্নাথের ধর্ম বর্ধিত হয়েছিল।

তাং প্রাপ্য সোহপি ববৃধে শচীমিব পুরন্দরঃ ॥
ততো গেহে নিবসতস্তস্য ধর্মো ব্যবর্ধত।
আতিথৈঃ শান্তিকৈঃ শৌচৈর্নিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ ॥[৬]

রঘুনন্দন গোস্বামী বলেছেন—

তয়া সহ বসন্ স খলু মিশ্র চূড়ামণি
শ্চচার ভবনোচিতং সকলমেব ধর্মং সদা।[৭]

১ প্রেমবিলাস—২৪ বি. পৃঃ ২৪২ ২ গোবিন্দদাসের কড়চা—ক. বি.—পৃঃ ১২
৩ চৈ. চ. মহাকাব্য—২।১৫ ৪ চৈ. চ. আদি ১৩পরি ৫ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ
৬ মু. ক. ২।৩-৪ ৭ গৌরাঙ্গ চম্পূ—৩।৪

—মিশ্র চূড়ামণি শচীদেবীর সঙ্গে গৃহে বাস করে সর্বদা গার্হস্থ্যোচিত সকল ধর্মেরই অনুষ্ঠান করতে লাগলেন।

পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা পিত্রাদীনাং তর্পণং বা বলিশ্চ।
পঞ্চৈব স্থার্থে মহান্তো মখান্তে মিত্রেণামী লঙ্ঘিতা নো কদাপি ॥[১]

—শাস্ত্রপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, পিতৃপুরুষদের তর্পণ এবং বলি বা প্রাণিগণকে খাদ্যদান—গৃহস্থের এই পাঁচটি মহৎ যজ্ঞ (কর্তব্যকর্ম) মিশ্র কখনও লঙ্ঘন করতেন না।

পরম ভক্ত মিশ্র দম্পতির একটি মহৎ দুঃখ ছিল। তাঁদের পর পর আটটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারা যায়—

তত্র কালেন কিয়তা তস্যাষ্টৌ কন্যকাঃ শুভাঃ।
বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ...... ॥[২]

—কালক্রমে তাঁর আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দৈববশে ক্রমে তারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

অষ্টৌ কুমারিকা স্তস্যাং ক্রমাৎ ভূত্বা দিবং যযুঃ ॥[৩]
তয়োর্গৃহে সংবসতোঃ সতোঃ সদা।
গৃহস্থধর্মঃ সহৃদার সাসদৎ॥
ক্রমেণ চাষ্টৌ তনুজাঃ পুরোঽভবন্।
তথৈব পঞ্চত্বমুপাযযুশ্চ তাঃ ॥[৪]

—তাঁরা (জগন্নাথ ও শচী) গৃহে বসবাসকালে সর্বদা উদার গার্হস্থ্য ধর্ম আচরণ করতেন। ক্রমে তাঁদের আটটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর উদরে।
অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥[৫]

সুতরাং মিশ্র দম্পতির দুঃখের অন্ত নেই। তাঁরা দীর্ঘজীবী সন্তান কামনায় ঈশ্বর আরাধনায় নিরত হলেন।

ততশ্চ তৌ সন্ততমেব দম্পতী
বভূবতুর্দুঃখিতমৌ মহত্তমৌ।

---

১ গৌরাঙ্গ চম্পূ—৩।৫ ২ মু. ক.—২।৫ ৩ চৈতন্যোদয়াবলী—২।১৩
৪ চৈ. চরিতামৃত মহাকাব্য—২।১৭ ৫ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি

প্রযত্নমাদায় সুতার্থমীয়তুঃ
প্রভোঃ পদাব্জং শরণং কৃপাময়ম্ ॥[১]

—তারপর সেই দম্পতি মহত্তম দুঃখে কাতর হয়ে করুণাময় ঈশ্বরের চরণপদ্মে শরণ গ্রহণ করলেন।

বাৎসল্যদুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিম্।
পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্ পিতৃযজ্ঞং চকার সঃ ॥[২]

—বাৎসল্য দুঃখে তপ্ত শ্রীমান্ জগন্নাথ মনে মনে পুত্রের নিমিত্ত হরির শরণ গ্রহণ করলেন এবং পিতৃযজ্ঞ সম্পাদন করলেন।

কিছুকাল পরে তাঁরা এক রূপবান্ প্রতিভাবান্ পুত্র লাভ করলেন। এই পুত্রের নাম রাখা হোল বিশ্বরূপ। শচীদেবীর অষ্টকন্যার অকালমৃত্যু এবং বিশ্বরূপের জন্ম সম্পর্কে ঈশান নাগর রচিত অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে একটি অদ্ভুত গল্প আছে। প্রতিবার শচী গর্ভবতী হওয়ার পরে অদ্বৈত শচীকে প্রণাম করতেন এবং অদ্বৈতের প্রণামের ফলেই শচীর গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হোত –

জগন্নাথ মিশ্র পত্নী শচীর গর্ভগণ।
অদ্বৈতের প্রণাম ক্রমে হইল পতন ॥[৩]

সুতরাং বংশ রক্ষার জন্য জগন্নাথ ও শচী অদ্বৈতের বাড়ী গিয়ে কেঁদে পড়লেন—

দয়া করি প্রভু মোর দেহ এই ভিক্ষা।
মো হেন অভাগার যৈছে বংশ রক্ষা ॥[৪]

পরদিন অদ্বৈতাচার্য মিশ্রগৃহে গিয়ে শচীকে পুত্রবর দান করলেন—প্রভু কহে বাছা তুমি হও পুত্রবতী।[৫] অদ্বৈতাচার্য আদেশ করলেন গঙ্গাস্নান করে এসে মিশ্র দম্পতিকে দীক্ষা গ্রহণ করতে; তাহলেই তাঁরা গুণবান পুত্র লাভ করবেন।

প্রভু কহে একমন্ত্র পাইনু স্বপনে।
ভক্তি করি সেই মন্ত্র লহ দুহুঁজনে ॥
সর্ব অমঙ্গল তব অবশ্য খণ্ডিবে।
পরম পণ্ডিত দিব্য তনয় লভিবে ॥[৬]

১ চৈ. চ. মহাকাব্য—২।১৮ ২ মু. ক.—২।৬ ৩ অ. প্র. ১০ অঃ
৪ অ. প্র. ১০ অঃ ৫ অ. প্র. ১০ অঃ ৬ তদেব

শচী ও জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করে এলে অদ্বৈত তাঁদের দিলেন গৌর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা—

দোঁহাকারে দিলা শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
চতুরাক্ষর শ্রীগৌর গোপাল মহামন্ত্র ॥[১]

এই উদ্ভট গল্প আর কোন চৈতন্যজীবনীতে নেই। গৌরাঙ্গের জন্মের পূর্বেই গৌরগোপালমন্ত্রে গৌরাঙ্গের পিতামাতাকে দীক্ষা দান রামজন্মের পূর্বেই রামায়ণ রচনার মত ঘটনা।

যাই হোক বিশ্বরূপ ও বংশের ধারা অনুযায়ী অল্প বয়সেই অসাধারণ মেধা পাণ্ডিত্য ও ভগবদনুরক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিশ্বরূপ

স বিশ্বরূপঃ শুভরূপগর্বিতাং
তনুং বহংশ্চন্দ্র ইব প্রকাশবান্।
নিপঠ্য কালেন লঘীয়সাপ্যসৌ
সমস্ত বিদ্যাম্বুধি পারমাযযৌ ॥[২]

—সেই বিশ্বরূপ প্রকাশিত চন্দ্রের মত সুন্দর রূপবান্ শরীর ধারণ করে অত্যল্প কালের মধ্যে পাঠ শেষ করে সমস্ত বিদ্যাসাগরের পরপারে গিয়েছিলেন।

শিশুঃ স আসীদ্বয়সা লঘীয়সা
সুধীরধীতাগম বেদসঞ্চয়ঃ।
সরস্বতীয়ং রসনাগ্রনর্তকী
বভূব বশ্যের সদাস্তনির্ভয়ম্ ॥[৩]

—অল্প বয়সেই শৈশবে সুধী বিশ্বরূপ বেদ আগম সমূহ অধ্যয়ন করলেন। সরস্বতী যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে নৃত্য করতেন, তাঁর মুখে ভয় করে বশীভূত হয়েই থাকতেন।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

জন্ম হৈতে বিশ্বরূপ হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল শাস্ত্রেতে হইল স্ফূর্তি ॥[৪]

বিশ্বরূপ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান, অল্প বয়সেই তিনি পাণ্ডিত্যের

১ অঃ প্রঃ ১০ অঃ
২ কবিকর্ণপূরের চৈ. চ. মহাকাব্য—২।২০
৩ তদেব—২।২১
৪ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ

অধিকারী ছিলেন। পিতামাতার মতই তিনি ছিলেন হরিভক্তি পরায়ণ,—ভাগবত রসাস্বাদনে নিরত—পরোপকারী—

বেদাংশ্চ ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ জ্ঞাতঃ সদ্‌যোগ উত্তমঃ।
স সর্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্বেষামুপকারকঃ॥
হরের্ধ্যান পরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোন্মনঃ।
শ্রীমদ্‌ভাগবতরসাস্বাদমত্তো নিরন্তরম্॥[১]

বিশ্বরূপের অসাধারণ ধীশক্তি ও বিষ্ণুভক্তির বিবরণ বৃন্দাবন দাস বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন।

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্বগুণের নিধান॥
সর্বশাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণুভক্তি।
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কার শক্তি॥
শ্রবণে বদনে মনে সর্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনু আর না বলে না শুনে॥[২]

বিশ্বরূপ ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের অনুরাগী ভক্ত। এখানেই তিনি ভক্ত-সভায় কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করতেন। বৃন্দাবনের ভাষায় বিশ্বরূপের জীবনাচরণ—

উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈতসভায় আসি হন উপস্থান॥
সর্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তিসার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে॥[৩]

মুরারি সংক্ষেপে বিশ্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে :—

শ্রীমদ্ বিশ্বরূপঃ সর্বগুণনিধিঃ ষোড়শাব্দোঽতি শুদ্ধঃ।
প্রাপাচার্যত্বমাশুশ্রবণমননতঃ শব্ধধীঃ প্রেমভক্তিঃ॥[৪]

—সকল গুণের আধার ষোড়শ বৎসর বয়স্ক অতি পবিত্র শ্রীমান্ বিশ্বরূপ আচার্যত্ব লাভ করেছিলেন, শ্রবণ ও মননহেতু তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রেমভক্তি পূর্ণতা লাভ করেছিল।

---

১ মু. ক. ২।৯-১০   ২ চৈ. ভা. আদি ৬অ: ৩ চৈ. ভা. আদি ৬ অ: ৪ মু. ক. ২।৭।৮

অনন্যসাধারণ ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কৈশোর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই সংসারে বীতরাগ হওয়ায় জনক জননী পুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ করতে থাকেন। আর এই সংবাদ পেয়ে সংসার বন্ধনে বদ্ধ হওয়ার আশংকায় বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

জনকো বিজনে বিচিন্ত্য তৎতনয়স্যোদ্বহনোচিতাং বধূম্।
মনসা পরিচিন্তয়ন্ স্বয়ং বুবুধে তৎসকলং দ্বিজাত্মজঃ ॥
স বিশ্বরূপঃ পিতুরিত্থমনস্তশ্চেষ্টাং বিদিত্বা সকলং তিতিক্ষুঃ।
ত্যক্ত্বা গৃহং স্বর্গনদীং প্রতীর্য্য জগ্রাহ সন্ন্যাসমশক্যমন্যৈঃ ॥[১]

—পিতা নির্জনে পুত্রের বিবাহযোগ্য বধূর বিষয় চিন্তা করছিলেন। মনে মনে চিন্তা করে পুত্র সকলই বুঝতে পারলেন। সেই বিশ্বরূপ পিতার এইরূপ চেষ্টা জেনে সবকিছু ত্যাগ করার ইচ্ছায় গঙ্গানদী পার হয়ে অন্যের পক্ষে অসাধ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

স বিশ্বরূপঃ পিতবং তথাবিধৈ
র্মনোরথৈরুৎসুকমাকলয্য তম্।
গৃহং বিহায় দ্যুনদীঞ্চ সন্তরন্
যযৌ জিজ্ঞাসুঃ সকলং মহাশয়ঃ ॥
চকার সন্ন্যাসমদভ্রবিভ্রমো
গুণাম্বুধিঃ সোঽধিসমাপিতক্রিয়ঃ।
ন নিস্পৃহাণাং জগতীহ নিষ্ফলে
মহাধিয়াং ধাবতি চিত্তবিভ্রমঃ ॥[২]

—মহদাশয় বিশ্বরূপ পিতাকে অনুরূপ (বিবাহ বিষয়ে) ইচ্ছায় উৎসুক জেনে সকল পরিত্যাগ করার বাসনায় গৃহত্যাগ করে গঙ্গা সন্তরণপূর্বক প্রস্থান করলেন। গুণসাগর বিপুল বিলাস পরায়ণ তিনি যথাবিধি কার্য সম্পন্ন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্ন নিস্পৃহ ব্যক্তিগণের নিষ্ফল জগতে চিত্ত বিভ্রম ঘটে না।

বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা।

১ মু. ক.—২।৭।৫-৬ ২ কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য—২।৯৩-৯৪

ছাড়িব সংসার বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
চলিবাঙ বনে মাত্র এই মনে জাগে ॥
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কতদিনে ॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্তপথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥[১]

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলেও অনুরূপ বিবরণ আছে।[২] জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে বিশ্বরূপ কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁর গুরু প্রদত্ত নাম শঙ্করারণ্য—

মাএ দণ্ডবৎ বাপে নমস্করি।
গঙ্গা পার হঞা গেল কাটোয়া নগরী ॥
কাটোয়াঞ কেশব ভারতী নিবন্ধে।
বিশ্বরূপ তার স্থানে লভিল সন্ন্যাসে ॥
গুরু নাম থুইল তার শঙ্করারণ্য।[৩]

নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিলাসে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ঈশ্বরপুরীর কাছে। সন্ন্যাসকালে শচীদেবীর ভ্রাতা রত্নগর্ভ আচার্যের পুত্র লোকনাথকে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং মাতুলপুত্র শিষ্য হয়ে স্বামী শংকরারণ্যের সেবা করেছিলেন।

ঈশ্বরপুরীর স্থানে দীক্ষিত হইল ॥
রত্নগর্ভাচার্যপুত্র নাম লোকনাথ।
বিশ্বরূপ মনে কৈল তাঁরে নিতে সাথ ॥
ইচ্ছামাত্র লোকনাথ আসিয়া মিলিল।
তাঁরে নিয়া বিশ্বরূপ দক্ষিণদেশে গেল ॥
সন্ন্যাস করিয়া নাম শঙ্করারণ্য পুরী।
মাতুল ভাই লোকনাথ শিষ্য হৈল তাঁরি ॥[৪]

মাত্র ষোল বৎসর বয়সে অসীম পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বংশে অসাধারণ মণীষা, ঈশ্বর-ভক্তি ও সন্ন্যাসের বীজ পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সুতরাং জগন্নাথ মিশ্রের আত্মজ ও বিশ্বরূপের অনুজ হিসাবে তিনি যে অনন্যসাধারণ ধীশক্তি ও প্রেম-ভক্তির পরিচয় দিয়ে যুগান্তরস্থায়ী কীর্তি স্থাপন করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি?

১ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ ২ চৈ. ম. আদি পৃঃ ২০ ৩ চৈ. ম. নদীয়া—২০।১৫-১৭
৪ প্রে. বি—২৪ বিলাস

তৃতীয় অধ্যায়

জন্ম ও পৌগণ্ডলীলা

বিশ্বরূপের জন্মের পর জগন্নাথ ও শচী আর একটি পুত্র লাভ করলেন ১৪০৭ শকাব্দে বা ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে।

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্বসুলক্ষণ।
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন॥[১]

সেইদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ, হরিধ্বনিতে সন্ধ্যাকালে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল, হরিধ্বনি মুখরিত নবদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হলেন পতিতের ভগবান গৌরচন্দ্র—

শচী গর্ভে বসে সর্বভুবনের দাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে যত সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল॥
সংকীর্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥[২]

তস্য জন্মসময়েঽমুশশাংকং রাহুরগ্রসদলং ত্রপয়ৈব।[৩]

জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে সেইদিন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ছিল—ফাল্গুন মাসে রাহু চন্দ্রে সর্বগ্রাস।[৪]

কবিকর্ণপুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঈশান নাগর প্রভৃতি জীবনীকারগণ বলেন যে মহাপ্রভু তেরো মাস ছিলেন মাতৃজঠরে।

ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়োধিকাঃ
সমীয়ুরাসন্নতরা সমাপ্ততাম্।
তপস্তমাসশ্চরমঃ সুমঙ্গলো
বভূব তেষাং জগতঃ সুখৈকভূঃ॥[৫]

১ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি ২ চৈ. ভা. আদি ২ অঃ ৩ মু. ক. ৫।১০
৪ চৈ. ম. উত্তর খণ্ড ৫ চৈ. চ. মহাকাব্য—২।২৪

—ক্রমে তেরো মাস অতীত হলে সন্তানজন্ম আসন্নতর হয়ে এলো, মঙ্গলকর জগতের সুখহেতু ফাল্‌গুন মাস এসে উপস্থিত হোল।

কৃষ্ণদাস বললেন যে শচীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছিল ১৪০৬ শকে (১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) মাঘ মাসে—

চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে॥[১]

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়েছিল—"চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্‌গুন।"[২] সুতরাং হিসাব মত তেরোমাস শিশুর গর্ভবাস হয়—

হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥[৩]

ঈশান নাগর জানিয়েছেন যে শচী-দেবীর পিতা জ্যোতিষজ্ঞ নীলাম্বর চক্রবর্তী গণনা করে জানালেন, শচীর গর্ভস্থিত মহাপুরুষ ত্রয়োদশ মাসে জন্মগ্রহণ করবেন।

কবিকর্ণপুর সম্ভবতঃ এই কাহিনীর উদ্ভাবক। কারণ শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ও পার্ষদ মুরারি গুপ্ত এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নি। বাঙ্গালা ভাষায় চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস এবং জীবনীকার জয়ানন্দও এ বিষয়ে নীরব। লোচনের বক্তব্যমতে স্বাভাবিকভাবেই দশমাসে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব—দশমাস পূর্ণগর্ভ ভেল দশদিশে।[৫] শ্রীচৈতন্যের অতিলৌকিকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তাঁর ত্রয়োদশমাস গর্ভবাসের কাহিনীর উদ্ভাবনা। নচেৎ সমকালীন ভক্তকবিদের রচনায় এই অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ থাকার সম্ভাব্যতা ছিল।

আর একটি অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত হয়েছে ঈশান নাগর প্রণীত অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে। এই গল্পে জন্মের পরই শচীনন্দন চক্ষু মুদ্রিত করে পড়ে রইলেন,—মাতৃদুগ্ধ পান করলেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মমাত্রে মহাযোগীপ্রায়।
নয়ন মুদিয়া রৈল দুগ্ধ নাহি খায়॥[৬]

শচীদেবী সদ্যোজাত পুত্রের অবস্থা দেখে কাঁদছেন, এমন সময় অদ্বৈত আচার্য এসে শিশুকে প্রণাম করে শচীমাতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শিশুর কাছে গেলেন দেখতে। সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ হেসে উঠেছিলেন অদ্বৈতকে দেখে।

---

১ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি ২ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি ৩ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি
৪ অঃ প্রঃ ১০ অঃ ৫ চৈ. ম. আদিখণ্ড ৬ অঃ প্রঃ ১০ অঃ

প্রেমে ডগমগ্ অঙ্গ অদ্বৈত দেখিয়া।
গৌররূপী শ্রীগৌরাঙ্গ উঠিলা হাসিয়া॥[১]

অদ্বৈত নবজাত শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু তোমার জন্যই বাহান্ন বৎসর অপেক্ষা করে আছি, তুমি দুধ খাচ্ছ না কেন? শিশু বললেন আচার্যকে—

মাতা দীক্ষা হৈলা না শুনিলা হরিনাম।
তেঞি তান দুগ্ধ মুঞি নাহি কৈলোঁ পান॥[২]

তখন অদ্বৈতের প্রশ্নের উত্তরে নবজাতক জানালেন নিত্যসিদ্ধ হরিনাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

তিনি অদ্বৈতকে নির্দেশ দিলেন শচীকে মন্ত্রদান করতে! প্রভুর বচন শুনে অদ্বৈতাচার্য শিশুকে কোলে নিয়ে গেলেন নিমতলায়, শচীকে প্রদান করলেন হরিনাম মহামন্ত্র, শচীর কোলে দিলেন সদ্যোজাত দিব্যশিশুকে। এবার শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করলেন। নিম্ববৃক্ষতলে শিশু মাতৃস্তন্য পান করেছিলেন বলে আচার্য শিশুর নাম রাখলেন নিমাই।

এই উদ্ভট অবিশ্বাস্য উপন্যাস যে কেবলমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান বানানোর চেষ্টাতেই কল্পিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আর কোন চরিতকার এমন হাস্যকর গল্প পরিবেশন করেন নি। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে শিশুজন্মের একমাস পরে গঙ্গাপূজা ও ষষ্ঠীপূজা হয়; এই সময়ে পতিব্রতা নারীগণ শিশুর নাম রেখেছিলেন নিমাই, কারণ তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট নিমপাতা যম ভোজন করবেন না—এই স্ত্রীজনোচিত বিশ্বাস। শচীমাতার অনেকগুলি কন্যা ইতঃপূর্বে মারা গেছে, নিমাই নাম রাখলে মৃত্যু জাতককে স্পর্শ করবে না।

ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই।
শেষে যে জন্মায় তার নাম সে নিমাই॥[৩]

নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রভৃতি বিদ্বদ্বর্গ শিশুর নাম রাখেন বিশ্বম্ভর।[৪]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে জাত-কর্মানুষ্ঠান সমাপনের সময় শিশুর নামকরণ হয়। শিশুর অপূর্ব দিব্যকান্তি দেখে অপদেবতার উপদ্রবের ভয়ে অদ্বৈতভার্যা সীতা ঠাকুরাণী নাম রেখেছিলেন নিমাই—

১ অঃ প্রঃ ১০ অঃ ২ অঃ প্রঃ ১০ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ৪ অঃ
৪ চৈ. ভা. আদি ৪ অঃ

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ভয়ে নাম থুইল নিমাই ।[১]

অতঃপর শুভলগ্নে মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী শিশুর দেহে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখে নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর—

সর্বলোকে করিবে এই ধারণ পোষণ ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এই ত কারণ ॥

জয়ানন্দ বলেন জন্মের ষষ্ঠ দিবসে সূতিকা ষষ্ঠীর পূজা হয়, বিংশতিতে হয় বিশ্বম্ভর নামকরণ, কিন্তু শিশু নিমাই পণ্ডিত নামেই পরিচিত হন ।

বিশ্বম্ভর নাম হইল বিংশতি দিবসে ।
নিমাঞি পণ্ডিত নাম জগতে প্রকাশে ॥[২]

সীতাদেবী বা অন্য কোন শুভার্থিনী নারী নিমাই নাম রেখেছিলেন, এ তথ্যই বিশ্বাস্য । নিমাই নামের সঙ্গে নিমের সংযোগ থাকার জন্যই নিম গাছের কাহিনীটি কল্পিত হয়েছে । সংস্কৃত ভাষায় রচিত জীবনী গ্রন্থগুলিতে নিমাই নামের উল্লেখ নেই, বিশ্বম্ভর নামকরণের কথাই বলা হয়েছে । সম্ভবতঃ নিমাই শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর সম্ভব নয় বলেই এই সুপ্রচলিত নামটি সংস্কৃত গ্রন্থে অনুল্লিখিত । মুরারি গুপ্ত বললেন, এই শিশু পুরাকালে জগৎ ধারণ করেছিলেন বলে জগন্নাথ স্বয়ং পুত্রের নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর—

পুরা বিভর্ত্যসৌ বিশ্বমিতি চক্রে পিতা স্বয়ং ।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভর ইতি নাম তস্য সুশোভনম্ ।[৩]

কবিকর্ণপূরেরও মতে জগন্নাথ স্বয়ং পুত্রের বিশ্বম্ভর নাম রেখেছিলেন । অদ্বৈতপ্রকাশকারের মতে বিশ্বম্ভর নাম নীলাম্বর চক্রবর্তী প্রদত্ত, জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের নাম দিয়েছিলেন গৌর, গৌরাঙ্গ, শচী দেবী ডাকেন গোরা বলে, নারীবৃন্দ বলেন গৌরহরি এবং ভক্তগণ নাম দিলেন গৌরগোবিন্দ ।

বিশ্বম্ভর নাম রাখে দ্বিজ নীলাম্বর ।
গর্গসম জ্যোতিষে যাঁহার অধিকার ॥
জগন্নাথ পুত্রের দেখি গৌরবর্ণ অঙ্গ ।
বাৎসল্যে রাখিলা নাম শ্রীগৌরগৌরাঙ্গ ॥

১ চৈ. চ. আদি ১৪ পরি ২ চৈ. ম. নদীয়া—৮।৫ ৩ মু. ক.—১।৬।৩

শচীদেবী শুদ্ধ স্নেহে আপন অর্ভকে।
কভু গোরাচাঁদ কভু গোরা বলি ডাকে॥

* * *

অপূর্ব স্বভাব গৌরের দেখি সভ নারী।
আনন্দে রাখিলা তাঁর নাম গৌরহরি॥
প্রেমানন্দে মত্ত হঞা শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ।
মহাপ্রভুর নাম রাখে শ্রীগৌরগোবিন্দ॥[১]

শিশুর যে-নাম যিনিই প্রদান করুন, জগন্নাথ মিশ্র নন্দন বিশ্বম্ভর, নিমাই, গৌরাঙ্গ, গৌর প্রভৃতি নামে কথিত ও পরিচিত হয়েছিলেন।

ছয় মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন হোল।[২] শিশু নিমাই বড় হতে থাকেন। শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত দুরন্ত। তাঁর দুরন্তপনার বিবরণ প্রত্যেক চরিতকারই অল্পবিস্তর দিয়ে গেছেন। তাঁর দুরন্তপনা প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র পথে। কখনও গৃহাগত অতিথি ব্রাহ্মণের খাদ্য অন্ন ভক্ষণ করছেন শিশু নিমাই, কখনও সমবয়স্ক বালকদের সাথে খেলা করতে করতে গাছের ডালপালা দিয়ে তাদের প্রহার করেছেন, কখনও বা অন্যের গৃহে গিয়ে কিংবা দেবগৃহ থেকে খাদ্য দ্রব্য চুরি করে খাচ্ছেন।

কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়॥
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে॥
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়॥
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥
দৈবযোগে যদি কেহ পায়ে ধরিবারে।
তবে তার পায় ধরি করে পরিহারে॥
এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার॥[৩]

১ অঃ প্রঃ ১০ অধ্যায় ২ জয়ানন্দের চৈ. ম. নদীয়া—৮।৬ ৩ চৈ. ভা. আদি ৪ অঃ

কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্যসদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে ॥
শিশু সব লৈয়া পাড়া পড়শীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥
শিশু সব শচী স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন ॥
কেনে চুরি কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে ॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হৈয়া ঘর-ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥[১]

অনুরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী মুরারি গুপ্ত :—

বয়স্যৈর্বালকৈঃ সার্দ্ধং বিহরংস্তরুপল্লবৈঃ।
আহতাঃ শিশবঃ সর্বে বিচক্রু পুরতো মুদা ॥
ভুবি তিষ্ঠন্ পাদৈকেন জানুনান্যস্য জানুকম্।
পস্পর্শ মর্কটিং লীলাং কুর্বন্ মায়ার্ভকো হরিঃ ॥
একদা ধর্তুমাত্মানমুদ্যতাং জননীং রুষা।
বীক্ষ্য কোপপরিপূর্ণো ভাজনানি বভঞ্জ সঃ ॥[২]

—বয়স্য বালকদের সঙ্গে বিহার করতে করতে গাছের ডালপাতা দিয়ে শিশুগণকে আঘাত করলেন, তাদের সামনে সানন্দে একপদে ভূমিতে অবস্থান করে জানুর দ্বারা অন্যের জানু স্পর্শ করে মায়া বালক হরি মর্কটীলীলা প্রকাশ করতেন। একদিন নিজেকে ধরতে উদ্যতা জননীকে দেখে কোপে পূর্ণ হয়ে তিনি পাত্রসমূহ ভেঙ্গে ফেললেন।

কবিকর্ণপূরের বিবরণ :—

খেলা বিলাসেন বয়স্যবালকৈঃ
বিহর্তুকামঃ কমনীয় বিগ্রহঃ।
নবৈর্নবৈঃ পল্লবসঞ্চয়ৈরমূন্
জঘান তৈস্তৈর্মৃদিতৈঃ স চাহতঃ ॥

---

১ চৈ. চ. আদি ১৪ পরি ২ মু. ক.—১।৫।৯-১১

তমেকদা তৈঃ শিশুভির্নিরন্তরম্
খেলন্তমেনং জননী বিলোক্য সা।
অভূদ্বিধতুঃ কৃতকৈতবং রুষা
সমুত্থিতা তং ক্ষণমত্যুদারধীঃ ॥
বিলোক্য তামিত্থমসৌ রুষান্বিতো
বভঞ্জ ভাণ্ডানি বহূনি সত্বরম্।
তমীদৃশং তত্র বিলোক্য সা শচী
ববন্ধ ভীতা স্বয়ম্যাতি স্ফুটম্ ॥
উপর্যুপর্যাহিতভাণ্ড সংহতৌ
স্বগর্হিতোচ্ছিষ্টবিসর্জন স্থলে।
জগাম মাতুঃ পুরতো মহাপ্রভুঃ
প্রকাশয়ন্ জ্ঞানপরাং স বিজ্ঞতাম্ ॥[১]

—খেলা বিলাসহেতু সমবয়স্ক বালকদের সঙ্গে বিহার করতে ইচ্ছুক কোমল-দেহ গৌরাঙ্গ নবপল্লবসমষ্টির দ্বারা বালকদের আঘাত করতে লাগলেন, তাদেরও নিক্ষিপ্ত পল্লব দ্বারা আহত হলেন। একদিন সেই শিশুদের সঙ্গে নিরন্তর খেলা করতে দেখে জননী রুষ্ট হলে তিনি বহু ভাণ্ড বাসন ভাঙ্গতে লাগলেন, তাঁকে এইভাবে দেখে শচী ভীত হয়ে বেঁধে ফেললেন। তারপর উপর্যুপরি ভাণ্ডসমূহে আকীর্ণ অপবিত্র উচ্ছিষ্টদ্রব্য ত্যাগ করার স্থানে মহাপ্রভু মায়ের সম্মুখেই জ্ঞানপূর্ণ বিজ্ঞতা প্রকাশ করে উপস্থিত হলেন।

জয়ানন্দও নিমাই-এর বাল্য দুরন্তপনার সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন—

পঢ়িতে পড়ুয়া সঙ্গে করিল কন্দল।
গুরুগৃহে ভাঙ্গি কুম্ভ অনেক সকল ॥
জলেতে ভাসিল যত পড়ুয়ার পুস্তক।
অকথ্য দেখিআ দিল চৌদিকে ঝক্কক ॥
কার দেব মন্দিরে বসিয়া সিংহাসনে।
দেবতা প্রতিমা লয়্যা গেলাএ প্রাঙ্গনে ॥
কাহার মন্দির চূড়ে বসিয়া সত্বরে।
গড়াগড়ি দিয়া ভূমে পড়ে বিশ্বম্ভরে ॥

১ চৈ. চ. মহাকাব্য—২।৬৭-৭০

*   *   *

কাহার মন্দিরে দেবতার দ্রব্য খাএ।
দ্বারে কপাট দিআ হাসি গড়ি জাএ।।
কুহু কুহু ধ্বনি করে মন্দির ভিতরে।
পারাবত ধ্বনি হেন হংসবত করে।।

*   *   *

উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে করে জাএ রড় দিয়া।
রন্ধনশালাএ কার প্রবেশ এ গিয়া।।
দেবতাপূজার দ্রব্য গন্ধমাল্যধূপে।
নৈবেদ্যাগ্রভাগ লয়্যা পেলে অন্ধকূপে।।
উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে কার যজ্ঞসূত্র পেলে।
উদ্দণ্ড বালক নিমাঞি কেহো কেহো বলে।।[১]

মাকে বিপন্ন করার জন্য অপবিত্র আঁস্তাকুড়ে উচ্ছিষ্ট হাঁড়িকুঁড়ির গাদায় বসে থাকা নিমাই-এর একটি কৌতুককর খেলা ছিল। এইজন্য মায়ের দ্বারা ভর্ৎসিত হয়ে একদিন তিনি মাকে ঢিল মেরে মূর্ছিত করে দিলেন। জীবনীকারেরা প্রায় সকলেই এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। কবিকর্ণপূর বলেছেন—ইতীহ লোষ্ট্রেণ জঘান মাতরম্।[২] মুরারির বিবরণ :—

অথ কতিপয়ে কালে মৃন্ময়দভাণ্ডসংহিতৌ।[২]
উপবিষ্টং সুতং বীক্ষ্য শচী বাগ্‌ভিরতাড়য়ৎ।।
অপবিত্রে নিষিদ্ধেঽপি স্থানে ত্বং মন্দধীঃ কথম্।
তিষ্ঠসীতি বচঃ শ্রুত্বা মাতুঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।।

*   *   *

ইত্যুক্ত্বা বদনে তস্যা ইষ্টকং প্রাহিণোৎ রুষা।
তদাঘাতেন ব্যথিতা মূর্ছিতা নিপপাত সা।।[৩]

—অনন্তর কোন সময়ে মাটির হাঁড়িকুড়ির গাদায় উপবিষ্ট পুত্রকে দেখে শচী তিরস্কার করলেন,—অপবিত্র নিষিদ্ধস্থানে, দুষ্ট, তুমি কেন বসেছ?—মায়ের এই কথা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন।……এই বলে মায়ের মুখে ক্রোধে ইট ছুঁড়ে

১ চৈ. ম. নদীয়া—২৩।২-৫, ৯-১০, ১৩-১৫   ২ চৈ. চ. মহাকাব্য—২।৭৯
৩ মু. ক. ১।৬।১৯-২০, ২২

মারলেন, সেই আঘাতে ব্যথিত হয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। কবিকর্ণপূরও লিখেছেন—

তদা তদাঘাতকৃতব্যথার্দিতা।
পপাতভূমৌ মৃদুলা স্বভাবতঃ ॥[১]

—তখন সেই আঘাতে ব্যথিত হয়ে স্বভাবতঃ কোমলা শচী ভূমিতে পড়ে গেলেন।

জয়ানন্দ লিখেছেন—

আর একদিনে বালক সঙ্গে।
মন্দির বেড়িয়া নাচে ত্রিভঙ্গে ॥
উছাল মারিল মায়ের মুখে।
রক্ত বায়্যা পড়ে শচীর বুকে ॥
মূর্ছা গেল শচী আম্বাল কেশ।
মা এর কোলে কহিল উপদেশ ॥[২]

আর একদিনের ঘটনায় জয়ানন্দ লিখেছেন, ক্রীড়ারত গৌরাঙ্গকে মা যখন গৃহে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেইসময়—

রাজপথ দিয়া নিজ গৃহ প্রবেশিতে।
হুঙ্কার দিয়া পড়ে উচ্ছিষ্ট কুণ্ডেতে ॥
সকল উচ্ছিষ্ট হাঁড়ি একত্র করিয়া।
ব্রহ্ম বাখানিল তার উপরে বসিয়া ॥[৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংক্ষেপে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন—

কভু মৃদু হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতারে মূর্ছিত দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥[৪]

মাতাকে ইষ্টক প্রহারে মূর্ছিত করা, স্বগৃহে মৃৎপাত্রভাঙ্গার গল্প লোচনদাস ঠাকুরও বিবৃত করেছেন। তীর্থ প্রত্যাগত এক ব্রাহ্মণ অতিথির জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে স্বপাক অন্ন ভোজন করার পূর্বেই দুরন্ত বালক নিমাই উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

তীর্থভ্রমণশীলস্ত দ্বিজস্যান্নং জনার্দনঃ।
ভুক্ত্বা খং কারয়ামাস নন্দগেহকুতূহলম্ ॥[৫]

---

১ চৈ. চ. মহাকাব্য—২।৮০ ২ চৈ. ম. নদীয়া—১০।১০৩ ৩ চৈ. ম. নদীয়া—১১।১২-১৩
৪ চৈ. চ. আদি ১৪ পরি ৫ মু. ক.—১।৬।৮

—তীর্থ ভ্রমণশীল এক ব্রাহ্মণের অন্ন জনার্দন নিমাই ভোজন করে নন্দগৃহের খেলার অনুকরণ করলেন।

কৃষ্ণদাস ও বলেছেন,—অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইতে তিনবার।[১] বৃন্দাবন তিন তিন বার নিমাই কর্তৃক বিপ্রের অলক্ষ্যে তাঁর অন্ন উচ্ছিষ্ট করার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।[২] নিমাই বাস্তবিকই চাঁদ চাওয়া ছেলে। বৃন্দাবন বলেন—

অদ্ভুত ক্রীড়া করেন শ্রীগৌর সুন্দর।
যখন যে চাহে সেই পরম দুষ্কর ॥
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী তাহা চায়।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায় ॥
ক্ষণে চাহে আকাশের তারাচন্দ্রগণ।
হাত পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন ॥[৩]

লোচনও তাই বলেছেন—

মায়ের গলা ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর রায়।
খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায় ॥
ক্ষণে খটি ক্ষণে খুটি মায়ের চুল ছিণ্ডে।
ধূলায় ধূসর কর হানে নিজ মুণ্ডে ॥[৪]

শুধু কি তাই? বালক জেদ ধরেন জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে একাদশীতে বিষ্ণু পূজার বহু উপকরণে সজ্জিত নৈবেদ্য খাবেন। তাঁর কান্না থামে না। সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। সকলের প্রশ্নের উত্তরে নিমাই জানালেন তাঁর প্রার্থিত বস্তুর কথা।

প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত ॥
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥

---

১ চৈ. চ. আদি ১৪ পরি ২ চৈ. ভা. আদি ৪অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ৫অঃ
৪ চৈ ম. আদি খণ্ড

সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াই ॥[১]

এই সংবাদ শুনে পণ্ডিতদ্বয় বিষ্ণুপূজার নৈবেদ্য এনে নিমাইকে খাইয়েছিলেন। বৃন্দাবন জানিয়েছেন যে হরিনাম কীর্তন করলেই নিমাই-এর দুরন্তপনা থেমে যেত।

বয়স একটু বাড়লে গঙ্গার ঘাটে প্রসারিত হয় বালকের উপদ্রব। স্নানার্থী নর-নারীদের নিমাই সদলে বিরক্ত করতে থাকেন।

সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে ॥
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দর শরীর।
সবাকার গায়ে লাগে চরণের নীর ॥
সবে মানা করে তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে ॥
পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারো ছোঁয় কার অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥[২]

সুতরাং উপক্রুত পুরুষগণ পিতা জগন্নাথের নিকট নালিশ জানাতে আসে:—

ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান ॥

* * * *

কেহ বলে মোর শিব লিঙ্গ করে চুরি।
কেহ বলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী ॥
কেহ বলে পুষ্প দূর্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন ॥
আমি করি স্নান হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পক্রি তবে করে পলায়নে ॥

১ চৈ. ভা. আদি—৫ অঃ ২ তদেব

কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লইয়া যায় চরণে ধরিয়া।।
কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহ বলে আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥
কেহ বলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় আবার॥
কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞি রে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
কেহ বলে বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রীবাসে পুরুষবাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল॥[১]

মানুষকে বিরক্ত ও বিব্রত করার বিচিত্র উদ্ভাবনী প্রতিভা নিমাই-এর শৈশবেই প্রকটিত হয়েছে। ভবিষ্যতে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেবেন তার আভাস বাল্যের দুরন্তপনাতেই প্রকাশ পেয়েছে। শুধু পুরুষরা নয়, কুমারী বালিকারাও শচীদেবীর কাছে পর্বতপ্রমাণ অভিযোগ নিয়ে আসে। তাদের নালিশ :

বসন করয়ে চুরি বলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল সহ করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে।
অলক্ষিতে আনি কর্ণে বলে বড় বোল।
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥

১ চৈ. চ. আদি—১৪অ:

ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে।
কেহ বলে মোরে চায় বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার॥[১]

কুমারীদের সঙ্গে নিমাই-এর এই রসিকতা লক্ষণীয়। বাল্যকালেই কোন কোন বালিকাকে বিয়ে করতে চাওয়াটা অকালপক্কতা বলেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যাঁরা লোকোত্তর চরিত্র, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিপক্কতা অল্প বয়সেই দেখা যায়। তাঁদের এই ধরণের আচরণ বোধ হয় অসাধারণ প্রতিভারই বহিঃপ্রকাশ!

এই দুরন্ত অথচ রূপবান বালকটির হাতে উৎপীড়িত হয়েও সকলে তাকে ভালবাসতো। জগন্নাথ যখন বহুজনের মুখে নালিশ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেকে শাসন করতে গঙ্গার তীরে চলেছেন তখন কুমারীরা বিশ্বম্ভরকে পালাবার জন্য সাবধান করে দিচ্ছে।

কুমারিকা সভে বলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইলেন এই পালাহ সত্বর॥[২]

নিমাই কিন্তু সঙ্গীদের শিখিয়ে দিলেন, পিতা এলে যেন তারা বলে যে নিমাই স্নানে আসে নি, পড়াশুনা করে এই পথে বাড়ী গেছে। আর গৌরচন্দ্র ভাল মানুষটির মত পুঁথি বগলে বাড়ী ঢুকলেন।

আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুথি যেন শশধর॥
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥
জননী বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে যাই সিনান করিতে॥[৩]

চতুরতায় নিমাই এর জুড়ি নেই। জগন্নাথ স্নানের ঘাটে উপদ্রবের জন্য পুত্রকে ভৎর্সনা করলেন। পুত্র কিন্তু নির্জলা মিথ্যা বলে পিতার ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষার পথ করে নিলেন।

১ চৈ. চ. আদি—৫ অঃ ২ চৈ. ভা অন্ত্য—৫অঃ ৩ তদেব

প্রভু বলে আজি আমি যাই নাই স্নানে।
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে॥
সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলে ও সবে দোষ কহেন আমার॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে করিব সবার অব্যভার॥
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গাস্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে॥[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও গঙ্গার ঘাটে কন্যাদের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের আচরণের কৌতুকপ্রদ বিবরণ দিয়েছেন—

কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥
কন্যাগণে কহে আমা পূজ দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চালু কলা॥
ক্রোধে কন্যাগণ বলে শুন হে নিমাই।
গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমা সভাকার ভাই॥
আমা সবার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতা সজ্জ না কর অন্যায়॥
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবাকার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর॥[২]

কেউ কেউ বর লাভ করে তুষ্ট হয়, কেউ পূজার নৈবেদ্য নিয়ে পালায়। কিন্তু নিমাই এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন, যে পালাবে তার বুড়ো বর হবে আর চার সতীন থাকবে।

কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী॥[৩]

---

১ চৈ. ভা আদি—৫ অঃ ২ চৈ. চ. আদি—১৪ পরি ৩ তদেব

সুতরাং মেয়েরা ভয় পেয়ে নিমাইকে নৈবেদ্য অর্পণ করে।

ঘরে বাইরে সর্বত্রই নিমাই-এর প্রবল দৌরাত্ম্য। জগন্নাথ-শচী পুত্রকে সংযত করতে পারেন না কোন প্রকারেই।

নিরন্তর চপল হা করে সবা সনে।
মায়ে শিখালেও তবু প্রবোধ না মানে ॥
শিখাইলে হয় আর দ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল ॥
ভয়ে আর কিছু না বলয়ে বাপ মায়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায় ॥[১]

জয়ানন্দ বলেন, নিমাই একদিন ভোজনরত পিতার যজ্ঞোপবীত কেড়ে পলায়ন করেছিলেন।

মিশ্র পুরন্দর ভোজন করে ॥
বাপের যজ্ঞসূত্র লইল কাড়ি।
রড় দিয়া গেলা মামার বাড়ী ॥[২]

লোচনের কথায় জানা যায় জগন্নাথ পুত্রের শান্তভাব কামনায় উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দিয়ে যজ্ঞ স্বস্ত্যয়ন করিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুই ফললাভ হয় নি।

একদিন মুরারি গুপ্ত পথে সঙ্গীর সঙ্গে জ্ঞানমার্গে তর্জার ব্যাখ্যা করতে করতে চলেছিলেন, বিশ্বম্ভর চললেন সঙ্গীদল সহ পিছনে পিছনে ভেংচি কাটতে কাটতে। এতে মুরারি 'কুবচন বলিল রুষিয়া।' মুরারির রুষ্ট বাক্য শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ—

ভ্রূকুটি বদন করি বোলে বাক্ চাতুরি
জানাইব ভোজনের ক্ষণে ॥[৩]

প্রতিশোধ নিলেন গৌরচন্দ্র মুরারির ভোজনের কালে। এইভাবে প্রতিশোধ নেওয়া অবশ্যই শিশুর উপযোগী, কিন্তু রুচিবিগর্হিত।

মধ্যাহ্ন ভোজনবেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা
থাল ভরি এ মুত মুতিল ॥[৪]

দেবতার ভোগ বা নৈবেদ্যের প্রতি আকর্ষণ বালক নিমাই-এর দুর্নিবার ছিল বরাবরই। তাঁর এই পেটুকতার কথা উল্লেখ করেছেন রঘুনন্দন গোস্বামী।

১ চৈ. ভা আদি ৬ অ: ২ চৈ. ম. নদীয়া—১৫০   ৩ লোচনের চৈ. ম. আদিখণ্ড
৪ লোচনের চৈ ম. আদিখণ্ড

কচিদ্ ভুঙ্ক্তে দেবার্চন বিহিতনৈবেদ্যমখিলং।
কচিৎ পিত্রর্চার্থং চিতমতিমুদা বস্তু সকলম্।
ক্বচিদ্ গঙ্গাপূজা-বিরচনকৃতে কল্পিতমহো
ক্বচিদ্ স্বাস্বাদার্থং নিহিতমতি যত্নেন রহসি।।[১]

—তিনি কখনও দেবপূজার জন্য প্রস্তুত সকল নৈবেদ্য, কখনও পিতৃপুরুষের অর্চনার জন্য সানন্দে সংগৃহীত বস্তুসকল, কখনও গঙ্গাপূজার জন্য প্রস্তুত দ্রব্যসমূহ, কখনও বা নিজের আস্বাদের নিমিত্ত অতি যত্নে গোপনে রক্ষিত দ্রব্যাদি ভোজন করতেন।

শচীদেবী ষষ্ঠীব্রত অনুষ্ঠান করছিলেন। এখানেও নিমাই-এর নৈবেদ্যে লোভ। তিনি বললেন মাকে,

ক্ষুধায় আমার পোড়য়ে অন্তর
নৈবেদ্য খাইব আমি।
ইহা বলি ধরি সেই গৌর হরি
নৈবেদ্য পূরল মুখে।।[২]

নিমাই-এর শৈশব ও বাল্যের চাপল্য ও দুরন্তপনার মধ্যে নিত্যনূতন উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় মেলে। চূড়ামণি দাস নিমাই-এর আর একটি দুষ্টবুদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন।

আর দিন প্রভাতে উঠিয়া গৌর রায়ে।
বালকের সঙ্গে রঙ্গে গঙ্গাতীরে জান॥
বসিয়া করয়ে যুক্তি বালকের সাত।
চোরি গিয়া ঘাটে পরদ্রব্যজাত।।
গঙ্গাস্নান করে জত এ পুরুষনারী।
ঘটি বাটি সাজী বস্ত্র সবে ঘাটে ধরি।।
প্রকারে হরিব দ্রব্য কেহ না জানিব।
কৌতুক করিয়া জার দ্রব্য তারে দিব।।
এত যুক্তি করি প্রভু গৌর বিশ্বম্ভর।
শিশু খেলে গঙ্গাজলে প্রবেশে সত্বর।।
বারকোণা ঘাটে গিয়া মিলে গৌররাজ।
যথা স্নান করে নারী পুরুষ সমাজ।।

১ গৌরাঙ্গ চম্পূ—৬।৩৮ ২ লোচন. চৈ. ম. আদি

হরিল সকল দ্রব্য কেহ নাঞি জানে।
হরিয়া রাখিল নিঞা বাঙড়ের বনে ॥[১]

স্নানের পরে কেউই কোন দ্রব্য খুঁজে পেল না। দ্রব্যাদি চুরি যাওয়ার ক্ষোভ নিয়ে হায় হায় করতে করতে সকলে ঘরে ফিরে গেল। শ্রীগৌরাঙ্গের মনে দয়া হোল, তিনি হৃতস্ব ব্যক্তিদের কাছে সংবাদ দিলেন, আমরা খেলতে খেলতে বাঙড়ের বনে অনেক চোর দেখলাম, তারা আমাদের দেখে হৃতদ্রব্য ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে সকলেই বাঙড়ের বনে গিয়ে স্ব স্ব হৃত দ্রব্য ফিরে পেয়েছিল।

ইহা শুনি সর্বলোক বাঙড়েরে ধাএ।
জার জেই দ্রব্য সর্বলোক গিয়া পাএ ॥[২]

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যের আচরণে যেমন ছিল নানাবিধ দৌরাত্ম্য এবং সেই দৌরাত্ম্যের মধ্যে নব নব উন্মেষশালিনী সহজাত প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি ছিল সকল কিছুকেই উপহাস বা উপেক্ষা করার বিদ্রোহী মনোভাব এবং অকুতোভয় দুঃসাহস। পরবর্তীকালে যিনি প্রবল পরাক্রান্ত শাসককুলের ভ্রূকুটিকে অনায়াসে উপেক্ষা করেছিলেন এবং উচ্চনীচের দুর্ভেদ্য প্রাচীর বিচুর্ণিত করে প্রেম ও সাম্যের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনিই শৈশবে ও বাল্যে সকল প্রকার শাসন ভয় অগ্রাহ্য করে অপবিত্র পরিত্যক্ত হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে বসে শুচি অশুচির বৈষম্যকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন। জীবনীকাররা এই সময়ে আস্তাকুড়ে উপবিষ্ট বালক নিমাই-এর মুখে শুচি অশুচি ভেদের নিরর্থকতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব কথা বসিয়েছেন। বালক নিমাই-এর মুখে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা হয়ত জীবনীলেখকদের স্বকপোল-কল্পিত, কিন্তু উত্তরকালে তিনি মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, শৈশবেই পরিত্যক্ত মৃদ্‌ভাণ্ডের স্তূপকে শুচি বলে উপবেশন করার মধ্যে ভাবীকালের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের বীজ আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং চূড়ামণি দাস যথার্থই বলেছেন,—

লোক কয়ে বালকের অদ্ভুত চরিত।
যত যত কর্ম করে মহা বিপরীত ॥[৩]

১ গৌরাঙ্গ বিজয় এঃ সোঃ সং পৃঃ ৫৫   ২ তদেব
৩ গৌরাঙ্গ বিজয়—পৃঃ ৫৩

শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যার্জন

অদ্বৈতপ্রকাশকার জানিয়েছেন, গৌরাঙ্গের পাঁচ বৎসর বয়সে জগন্নাথ পুত্রের হাতে খড়ি দিয়ে বিদ্যারম্ভ করিয়েছিলেন—

গৌরের বয়স যবে পাঁচ বৎসর হৈল।
শুভক্ষণে মিশ্র তাঁর হাতে খড়ি দিল ॥
লোকে শ্রুতিধর বড় গৌরাঙ্গ শ্রীমান্।
অল্প কালেতে তাঁর হৈল সর্বজ্ঞান ॥[১]

বর্ণপরিচয় কোন্ গুরুর কাছে হয়েছিল ঈশান নাগর সে তথ্য জানান নি। সম্ভবতঃ পিতা জগন্নাথই পুত্রকে বর্ণপরিচয় করিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস নিমাই-এর হাতে খড়ি, তৎপরে কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ সংস্কারের বিবরণ দিয়েছেন। তিনিও গুরুর নামোল্লেখ করেন নি, বিদ্যারম্ভের কালে বিদ্যার্থীর বয়সেরও উল্লেখ করেন নি। সাধারণতঃ পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভের বিধি প্রচলিত থাকায় অদ্বৈত প্রকাশকারের বিবরণ যথার্থ মনে হয়। বৃন্দাবন লিখেছেন—

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল ॥
শুভ দিনে শুভক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর ॥
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ ॥[২]

নিমাই-এর প্রতিভা বিদ্যারম্ভ থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। বৃন্দাবন লিখেছেন,—

দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্বজনে চায় ॥
দিন দুই তিনেতে পড়িলা সর্বফলা।[৩]

১ অ: প্র: ১০ অ: ২ চৈ ভা আদি ৫ম অ: ৩ চৈ. ভা. আদি, ৫অ:

জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে বিদ্যারম্ভের গুরু ছিলেন সুদর্শন ওঝা (পণ্ডিত)। গৌরাঙ্গ স্বয়ং একদিন প্রভাতে দলবল সঙ্গে করে সুদর্শনের বাড়ী গিয়ে বর্ণজ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

আর দিন প্রভাতে বালক সব সঙ্গে।
সুদর্শন পাত্রের বাড়ী গেল নিজরঙ্গে॥
ক খ চৌতিশাক্ষর কাঠনেতে দেখি।
হামাকুড়ি দিয়া পড়ে গুরুমাত্র দেখি॥
ক খ ইহার নাম গুরুরে জিজ্ঞাসে।
আস্ক আসখ পড়িয়া অট্ট অট্ট হাসে॥[১]

এ গল্পে আতিশয্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সুদর্শন পণ্ডিত যে গৌরচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষাগুরু হতে পারেন না তা নয়। মুরারি গুপ্ত এবং কবিকর্ণপূর সুদর্শন পণ্ডিত, বিষ্ণুপণ্ডিত ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে শ্রীচৈতন্যের লৌকিক বিদ্যা অর্জনের কাহিনী বিবৃত করেছেন। এই দুই জীবনচরিতকারই বলেছেন যে, নিমাই প্রথমে সুদর্শন পণ্ডিত ও বিষ্ণু পণ্ডিতের কাছে পড়েছেন ও পরে গঙ্গাদাসের কাছে পড়েছেন। কিন্তু মুরারি বলেন, পিতার মৃত্যুর পূর্বেই নিমাই গুরুগৃহে বাস করে বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন।

গুরোর্গৃহে বসন্ বিষ্ণুর্বেদান্ সর্বানধীতবান্।[২]

অতঃপর জগন্নাথের লোকান্তরের পর পূর্বোক্ত তিন পণ্ডিতের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুপণ্ডিতাৎ।
সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতাৎ॥[৩]

কবিকর্ণপূর লিখেছেন, বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের পরে নিমাই লেখাপড়া করে পিতামাতার পরিচর্যা করে ও সমবয়স্ক সঙ্গী বালকদের সঙ্গে খেলা করে কাল কাটাতেন।

পঠন্ সপর্য্যাপর এব সর্বদা
তয়োর্মহাকারুণিকঃ সুখাবহঃ।
বয়স্যভাবেন বয়স্যবালকৈ-
র্নিরন্তরং খেলতি খেলয়ত্যপি॥[৪]

---

১ চৈ. ম —নদীয়া—১৫।১৩ ২ মু. ক.—১।৮।১২ ৩ মু. ক—১।৮
৪ চৈ. চ. মহাকাব্য—২।১০২

—মহাকারুণিক সুখাবহ শ্রীগৌরাঙ্গ সর্বদা পিতামাতার সেবায় তৎপর হয়ে লেখাপড়া করতে করতে সখ্যভাবে বয়স্ক বালকদের সঙ্গে নিরন্তর খেলা করতে লাগলেন।

তারপর জগন্নাথের স্বর্গগমনের পর যৌবনারম্ভে নিমাই বিষ্ণুপণ্ডিত, সুদর্শন পণ্ডিত ও বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসের নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন।

পপাঠ সৎপণ্ডিতবিষ্ণুনাম্নঃ
সুদর্শনাদপ্যতি হর্ষভাজঃ।
গুরুত্বমাকল্প্য মহানুকম্পাং
চকার হর্ষাদনয়োঃ কিমেষঃ।
ততশ্চ বৈয়াকরণাৎ স গঙ্গা
দাসাদভূৎ প্রত্যনুভূতবিদ্যঃ ॥[১]

—বিষ্ণু নামক সৎপণ্ডিত এবং অতি আনন্দভাজন সুদর্শনের নিকট তিনি পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি কি মহৎ অনুকম্পাবশতঃ তাঁদের গুরুত্বে বরণ করেছিলেন? তারপর তিনি বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসের নিকটে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন।

বিশ্বম্ভরের সহপাঠী মুরারির বিবরণ সর্বপ্রথম গ্রাহ্য। মুরারি ও কবিকর্ণপুরের বিবরণ অনুসারে বিষ্ণুপণ্ডিত বা সুদর্শন পণ্ডিত গৌরচন্দ্রের প্রাথমিক পর্যায়ের গুরু হতে পারেন না। কবিরাজ গোস্বামী খুব স্বল্প কথায় শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যার্জনের উল্লেখ করেছেন, তিনি বৃন্দাবনের উপরে ভারার্পণ করে কর্তব্য সমাধা করেছেন।

কতদিনে মিশ্রপুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশকলা অক্ষর শিখিল ॥[২]

লোচন দাস ঠাকুরের বিবরণে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের পরে জগন্নাথ কনিষ্ঠ পুত্রের কর্ণবেধ, চূড়াকরণ ও নবমবর্ষে উপনয়ন দেওয়ার পর ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

চূড়াকরণ কর্ণবেধ করিল তখন।
আনন্দিত হৈল সব নদীয়া নগরী।
বিশ্বম্ভর মুখ দেখি আপনা পাসরি ॥

---

১ চৈ. চ. মহাকাব্য—৩।২-৩ ২ চৈ. চ. আদি

* * *

নবম বরিখ পুত্রের যোগ্য সময়।
উপবীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয় ॥[১]

অতঃপর জগন্নাথের মৃত্যুর পর শচী দেবী বালক নিমাইকে নিয়ে পণ্ডিতদের হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

একদিন শচীকর ধরি গৌরহরি।
পঢ়িতে গৌরাঙ্গ দিল নিয়োজিত করি ॥
সকল পণ্ডিত স্থানে পুত্র সমর্পিয়া।
বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া ॥
পিতৃশূন্য পুত্র মোর পিরিতি করিবে।
আপন তনয় হেন ইহায়ে জানিবে ॥

* * *

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
পঢ়িবারে গেলা বিষ্ণু পণ্ডিতের ঘর ॥
সুদর্শন আর গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে।
পঢ়িলা জগত-গুরু তা সভার হিতে ॥[২]

লোচন, মুরারি ও কবিকর্ণপূরকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পূর্বে নিমাই-এর বিদ্যারম্ভ হয়েছিল কিনা তা বলেন নি। তবে নয় দশ বৎসর পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে নিরক্ষর থাকা সম্ভব বলে মনে হয় না। 'অদ্বৈত প্রকাশ' অনুসারে পাঁচ বৎসরে হাতে খড়ি দেওয়ার অল্প পরে বর্ণজ্ঞান সমাপ্ত হলে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে পড়তে দিয়েছিলেন; দুই বৎসরে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে তবে গৌরের উপনয়ন হয়েছিল।

নিমাই এর প্রতিভার প্রকাশ

তবে মিশ্র গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
পড়িতে দিলেন গৌরে করিয়া যতনে ॥
দুই বর্ষে গোরা ব্যাকরণ সমাপিলা।
দেখি পণ্ডিতের চিত্ত চমৎকার হৈলা ॥
কানে তান ভারতী দিলেন যজ্ঞসূত্র।
শাস্ত্রমতে মিশ্ররাজ দিলা বিষ্ণুমন্ত্র ॥[৩]

১ চৈ. ম. আদিখণ্ড ২ তদেব ৩ অ. প্র. ১০ অঃ

বালক নিমাই-এর বিদ্যার্জন সম্পর্কে সঠিক তথ্য কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মনে হয় শৈশবে হাতে খড়ির পরে বর্ণবোধ বা প্রাথমিক বিদ্যা তাঁর বাড়ীতে পিতার কাছেই হয়েছিল। পরে বিষ্ণু পণ্ডিত, সুদর্শন পণ্ডিত ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু কার কাছে কি পড়েছিলেন, এবং কার কাছে আগে ও কার কাছে পরে পড়েছিলেন সে তথ্য অন্ধকারেই থেকে যায়। নিমাই-এর বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। কিন্তু বৃন্দাবন সুদর্শন পণ্ডিত বা বিষ্ণু পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি কেবল বলেছেন যে অন্যান্য বালকদের সঙ্গে নিমাই নানা স্থানে পড়তে যেতেন।

সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে ॥[১]

তিনি আরও বলেছেন, বিদ্যারম্ভের পর শৈশবেই নিমাই লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী হয়েছিলেন—অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী।[২] শিশু পড়ুয়া গৌরসুন্দরের একটি মনোরম বর্ণনাও আছে চৈতন্য ভাগবতে—

ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রী গৌরসুন্দর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে মনোহর ॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে ॥[৩]

বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করার পরে নিমাই-এর দৌরাত্ম্য অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল। পিতামাতার সঙ্গে থাকা এবং লেখাপড়া করা এই দুটি তাঁর প্রধান কাজ হয়েছিল।

খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে।
একবার যে সূত্র পড়ি প্রভু যায়।
আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥
দেখিয়া অপূর্ব সবেই প্রশংসে।
সবে বলে ধন্য পিতামাতা হেন বংশে ॥

চৈ. ভা. আদি ৫অ: ২ চৈ ভা. আদি ৫অ: ৩ চৈ. ভা. আদি ৫অ:

সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে।
তুমি ত কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে।।
এ হেন সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইবে অধ্যয়নে।।
শুনিলেই সর্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে।[১]

কিন্তু জগন্নাথের মনে জাগে আশংকা। প্রতিভাবান পুত্র অল্প বয়সেই প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। এই রকম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বিশ্বরূপ। তিনি ও বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেই সংসার অনিত্য জেনে যতিধর্ম গ্রহণ করেছেন।

নিমাইকে লেখাপড়া শেখাতে জগন্নাথের অনিচ্ছা

এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্বশাস্ত্র।
জানিল সংসার সত্য নহে তিলমাত্র।।
সর্বশাস্ত্রমর্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির।।[২]

সুতরাং সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে বিশ্বম্ভরও যদি অগ্রজের পন্থা অনুসরণ করে এই আশংকায় ব্যাকুল হয়ে জগন্নাথ বললেন,—

অতএব ইহার পড়িয়া কার্য নাঞি।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি।।[৩]

শচী মা বাঙ্গালী মায়ের মত উত্তর দিয়েছিলেন, মূর্খ পুত্রের বিয়ে হবে না যে।

শচী বলে মূর্খ হৈলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে ত কন্যাও দিবে না কোন জনে।।[৪]

কিন্তু স্নেহাতুর পিতার মন যুক্তি মানলো না। তিনি বোঝেন, বিদ্যায় ধনলাভ হয় না। জীবের খাদ্য যোগানোর ভার নিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বিদ্যায় যদি ধনী হওয়া যেত তবে জগন্নাথও ধনবান হতে পারতেন।

সাক্ষাতেই এই কেন দেখ ত আমাত।
পড়িয়াও আমার কেন ঘরে নাহি ভাত।।
ভ লমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে।।
অতএব পড়িয়া নাহিক কার্য বলিল তোমারে।[৫]

১-৫ চৈ. ভা. আদি, ৬ অঃ

পুত্র বিশ্বম্ভরকেও ডেকে জগন্নাথ লেখাপড়া নিষিদ্ধ করে দিলেন·—

এত বলি পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বলে শুন বাপ আমার উত্তর॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর শপথ আমার॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাই দিব আমি।
গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি॥[১]

পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করতে না পেরে লেখাপড়া ছেড়ে নিমাই মনোদুঃখে পুনরায় উদ্ধতভাবে দুরন্তপনা করে বেড়াতে লাগলেন। এই দুরন্তপনা আগের দৌরাত্ম্যকে ছাড়িয়ে গেল। বৃন্দাবন লিখছেন—

কিবা নিজ ঘরে প্রভু কিবা পর ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্বরাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী॥
যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে॥
গরুজ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ শিশু-সংহতি পালায়
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্বী গৃহস্থে করিতে না পারে॥
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ প্রভু উঠিয়া পলায়॥[২]

এত দৌরাত্ম্যের সংবাদেও জগন্নাথ অচল অটল। একদিন পুরাতন পদ্ধতি মত পরিত্যক্ত হাঁড়ির গাদায় বসে পড়লেন বিশ্বম্ভর। অন্যান্য বালকদের মুখে সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন শচী মাতা, তিরস্কার করলেন দুরন্ত পুত্রকে,

---

১ চৈ. ভা. আদি ৬অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ৬অঃ

অশুচিস্থানে বসলে স্নান করতে হবে। বিশ্বম্ভর উত্তর দিলেন মূর্খ ব্যক্তি কেমন করে জানবে, কে শুচি আর কে অশুচি?

প্রভু বলে তোরা মোরে না দিস পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিবে কেমতে॥
মূর্খ আমি না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান।
সর্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান॥[১]

শচী মায়ের অনুনয় ব্যর্থ হোল, নিমাই উঠলেন না নোংরা হাঁড়ির গাদা থেকে।

প্রভু বলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি না যাইমু কহিল তোমাতে॥[২]

এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে পাড়ার লোকজন শচীকে দোষারোপ করতে থাকে। ছেলেকে পড়তে দেয় না, এ কেমন বাপ-মা?

যত্ন করি কেহ নিজ বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে পড়িতে আপনে শিশু চায়॥[৩]

জননী স্নেহভরে নিজ দুলালকে ঘরে নিয়ে এসে স্নান করালেন। জগন্নাথ গৃহে ফিরে সব শুনলেন। পাড়ার লোক জগন্নাথকে অনুরোধ করে—নিমাইকে পড়তে দাও, বালক পড়তে চায় এত মহাভাগ্য! তারা উপদেশ দেয়—ছেলের উপনয়ন দাও, তারপর গুরুর কাছে পাঠাও। জগন্নাথ পুত্রের উপনয়ন দিলেন। উপনয়নের পরে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের ইঙ্গিতে বিখ্যাত বৈয়াকরণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পুত্রকে ভর্তি করে দিলেন জগন্নাথ।

নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপনি॥
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তার ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত॥
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস দ্বিজঘর॥[৪]

গঙ্গাদাস গৌরচন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত করে কাছে রেখে শেখাতে লাগলেন, ছাত্রের তীক্ষ্ণ মেধায় আকৃষ্ট হয়ে অনুরাগ ভরে বিদ্যাদান করলেন।

১-৪ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ

দেখিয়া অদ্ভুতবুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্বশিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত ॥[১]

বৃন্দাবন দাসের বিবরণ পড়ে মনে হয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—একান্ত তথ্যগত বর্ণনা। অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্যে॥ চূড়ামণি দাসের কাব্যে নিমাই দুরন্তপনা করে খেলে বেড়াচ্ছেন বলে শচীমাতা স্বামীর কাছে অনুযোগ করেন,—

বালক চঞ্চল পুত্র খেলে সর্বক্ষণ।
ব্রাহ্মণ কুমার হৈয়া না করে অধ্যয়ন ।।
তোমার গোষ্ঠীতে যত মহা অধ্যাপক।
বেদবেদান্ত সর্ববিদ্যা এ ক্ষপক ।।[২]

কিন্তু জগন্নাথ যথারীতি আপত্তি জানালেন,

মিশ্র কহে এক পুত্র পড়িয়া শুনিঞা।
বৈষ্ণবের সঙ্গে বুলে কি বিদ্যা জানিঞা॥
পড়িবার কাজ নাঞি থাকুক মূর্খ হৈয়া।
জে জে পাকে বর্তিবে নিজধন খাইয়া ।।[৩]

পিতামাতার কথোপকথন শুনে বিশ্বম্ভরের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপলো। তিনি সঙ্গীসাথী নিয়ে মানুষ পশুর হাড় সংগ্রহ করে এনে গঙ্গার জলে ফেলতে লাগলেন। এ অদ্ভুত খেলার সংবাদ পেলেন শচী দেবী, পেলেন মিশ্র পুরন্দর। শচী দেবী নিষেধ করলেন পুত্রকে। গৌরাঙ্গ উত্তরে মাকে বললেন,—

না পড়ি না করি কার্য বসি অন্ন খাই।
পরলোক কার্য্য কিছু করিবার চাই ।।

এই বৃত্তান্ত শুনে জগন্নাথ পুত্রকে লেখাপড়া করার অনুমতি দিলেন।

মোর বাক্য বিশ্বম্ভর শুন মন দিয়া।
পরম যত্নেতে তুমি শাস্ত্র পড় গিয়া ।।
গঙ্গাদাস চক্রবর্তী পণ্ডিত মহান।
সমর্পি এড়িব গিয়া চল তার স্থান ।।[৪]

১ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ ২ গৌ. বি.—পৃঃ ৫৬ ৩ গৌরাঙ্গ বিজয়—পৃঃ ৫৬
৪ গৌরাঙ্গ বিজয়—পৃঃ ৫৬

এই বিবরণ অনুসারে গৌরচন্দ্রের একমাত্র গুরু ছিলেন গঙ্গাদাস চক্রবর্তী। গঙ্গাদাসের কাছেই নিমাই সর্ববিদ্যাবিশারদ হয়েছিলেন। তখনও বিশ্বরূপ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন নি, —নিমাই-এর উপনয়নও হয়নি। গঙ্গাদাসের কাছে পাঠ শেষ করার পরে নিমাই-এর উপনয়ন হয় এবং পরে বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করেন। নিমাইকে পড়াতে জগন্নাথের আপত্তির কারণ বিশ্বরূপ পণ্ডিত হয়ে বৈষ্ণবদের সঙ্গে ঘোরে। এই ব্যাপারটি মোটেই বিশ্বাস্য নয়। জগন্নাথ নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং কৃষ্ণভক্ত। জয়ানন্দ বলেন, জগন্নাথ "গর্ভাষ্টমে যজ্ঞসূত্র দিল বিশ্বম্ভরে"—গর্ভ ধরে আট বৎসরে অর্থাৎ সাত বৎসর বয়সে বিশ্বম্ভরের উপনয়ন হয়। কিন্তু লোচনের মতে নয় বৎসর বয়সে বিশ্বম্ভর যজ্ঞসূত্র ধারণ করেছিলেন। অনুমান হয় বিশ্বরূপ নিমাই অপেক্ষা দশ বৎসরের বড়। বিশ্বরূপের ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগের সময় নিমাই-এর বয়স ছয় বৎসর।[১] পাঁচ সাত বৎসর বয়স বালকের বিদ্যারম্ভের সময়। এই সময়ের মধ্যে কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতি মীমাংসা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হওয়া সম্ভব নয়। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে জগন্নাথের দেহান্ত হয়। নিমাই-এর বয়স তখন দশ এগার হওয়াই সম্ভব। সুতরাং বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পরে নিমাই-এর গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হওয়া, জগন্নাথের মৃত্যুকালে নিমাই-এর ছাত্রজীবন এবং চার পাঁচ বৎসর পরে ষোল বছর বয়সে ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তির বিবরণই অপেক্ষাকৃত সম্ভাব্য। হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গলে' আবার বিশ্বম্ভরের জন্ম হয়েছিল বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে। এ বিবরণ অবশ্যই গ্রহণীয় নয়।

নিজের পছন্দমত গুরু পেলেন বিশ্বম্ভর। গঙ্গাদাসের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে নিজের প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পেলেন তিনি। অনন্ত সাধারণ ধীশক্তি বলে তিনি গুরুকৃত ব্যাখ্যা ওলট পালট করতে থাকেন।

যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন ॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥[২]

---

১ বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী—পৃঃ ৫৩

২ চৈ. ভা আদি ৭ অঃ

শুধু তাই নয় তিনি সতীর্থদেরও নিয়ে খেলা শুরু করেছেন —

যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে ॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান ॥
সভারে চালেন প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বলে হাসিয়া ॥[১]

গঙ্গার ঘাটে স্নানরত পড়ুয়াদের সঙ্গেও কলহ সুরু করেন তিনি তাঁদের বিদ্যাবত্তা নিয়ে। পড়ুয়ারা বললে, কলহ না করে পাঁজি টীকায় শুদ্ধি বিচার করে বুদ্ধির পরীক্ষা হোক—"বৃত্তি পাঁজি টীকায় কে জানে দেখি শুদ্ধ।" গৌরাঙ্গ বললেন, তোমাদের ইচ্ছামত প্রশ্ন কর।

ধাতুসূত্র বাখানহ বলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বলে বাখানিয়ে শুন মন দিয়া ॥
সর্বশক্তি সমন্বিত প্রভু ভগবান।
করিলেন সূত্র ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ ॥
ব্যাখ্যা শুনি সবে বলে প্রশংসা বচন।
প্রভু বলে এবে শুন করিয়ে খণ্ডন ॥
যত ব্যাখ্যা কৈল তাহা দূষিল সকল।
প্রভু বলে স্থাপ এবে কার আছে বল ॥
চমৎকার সবাই ভাবেন মনে মনে।
প্রভু বলে শুন এবে করি এ স্থাপনে ॥
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্বমতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ ॥
যত সব প্রামাণিক পঢ়ুয়ার গণ।
সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন ॥[২]

আহারাদির পরে শ্রীগৌরাঙ্গ পুঁথি নিয়ে বসে পড়েন—রচনা করেন ব্যাকরণ সূত্রের টিপ্পনী।

---

১ চৈ. ভা.—আদি ৭ অঃ ২ চৈ. ভা আদি ৭ অঃ

ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জনে॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তকরসে সব দেব-মণি॥[১]

বৃন্দাবন আরও বলেছেন—

পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম।
বিদ্যারস তার হইয়াছে সর্বধর্ম॥[২]

কবিরাজ গোস্বামী সংক্ষেপে শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যার্জনের উল্লেখ করেছেন—

গঙ্গাদাস পণ্ডিতস্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈল পঞ্জীটীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥[৩]

গঙ্গাদাসের গৃহে চতুষ্পাঠীতে পাঠকালে শ্রীগৌরাঙ্গের দুরন্তপনার একটি নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন জয়ানন্দ। নিমাই সহপাঠীদের বললেন, আমার ব্যাখ্যা যদি কেউ খণ্ডন করতে পারে তবে তার কাঁধে চেপে মাথায় টোকর মারবো। একথা শুনে গঙ্গাদাস নিমাই-এর মাথায় পুঁথি দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে নিমাইও পুঁথি ছিঁড়ে কাঁদতে কাঁদতে পালালেন। পরে জগন্নাথ আবার পুত্রকে এনে গঙ্গাদাসের হাতে সঁপে দিলেন।[৪] নিমাই এর সুতীক্ষ্ণ মেধায় গুরু গঙ্গাদাস বিস্মিত হয়ে ভাবলেন—

অহো! কিমাশ্চর্যমিদং ময়া সকৃদ্য-
দুচ্যতে শাস্ত্রমতীব দুর্গমম্।
তদপ্যয়ং মিশ্রপুরন্দরাত্মজঃ
সমগ্রমভ্যস্যতি যত্নমন্তরা॥[৫]

—আহা! কী আশ্চর্য! আমি একবারমাত্র অত্যন্ত দুর্বোধ্য শাস্ত্র যা বলছি, এই পুরন্দর মিশ্রের পুত্র তা বিনা যত্নেই সমস্ত আয়ত্ত করে ফেলেছে।

সতীর্থদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় নিমাই-এর বিতর্ক ও পরিহাসের কথা কবিকর্ণপুরও বলেছেন—

---

১ চৈ. ভা আদি ৭ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি. ৭ অঃ ৩ চৈ চ আদি ১৫ পরি
৪ চৈ ম. নদীয়া—১৬ ৫ গৌরাঙ্গ চম্পূ—১১।৪১

সতীর্থবৃন্দৈঃ পরিহাসবদ্ভি-
র্হসন্ বিশেষং সবদাবদেন
ততান লীলা প্রতিভানবার্তা-
মুর্বী সদুর্বী সুরবংশরত্নম্ ॥[১]

—ব্রাহ্মণকুলরত্ন গৌরচন্দ্র পরিহাসকারী সতীর্থদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় কথায় বিতর্ক করতে করতে প্রতিভানুরূপ মহতী লীলা বিস্তার করতে লাগলেন।

গৌরচন্দ্র অত্যন্ত পরিহাসরসিক ছিলেন। সতীর্থদের সঙ্গে তিনি সততই পরিহাস করতেন। মুরারিগুপ্ত গৌরাঙ্গের বিদ্যার্জন ও পরিহাস রসিকতা সম্পর্কে লিখেছেন—

ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিদ্যাং যে পণ্ডিতমহত্তমাঃ।
তেষাং মহোপকারায় তেভ্যো বিদ্যাং গৃহীতবান্ ॥
লোকশিক্ষামনুচরন্ মায়ামনুজবিগ্রহঃ।
ততঃ পঠন্ পণ্ডিতেষু শ্রীমৎ সুদর্শনেষু চ ॥
সতীর্থৈঃ প্রহসন্ বিপ্রৈর্হসদ্ভিঃ পরিহাসকম্।
উবাচ বঙ্গজৈর্বাক্যৈ রসজ্ঞঃ সস্মিতাননঃ ॥[২]

—যে সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে বিদ্যাদান করতেন, তাঁদের মহৎ উপকার করার উদ্দেশ্যেই বিশ্বম্ভর তাঁদের কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন। মায়ায় মনুষ্যদেহধারী লোকশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ সুদর্শন পণ্ডিতের নিকট পড়ে সতীর্থ বিপ্রগণের দ্বারা উপহসিত হয়ে হাস্যমুখে রসজ্ঞ গৌরাঙ্গ বঙ্গাল ভাষায় পরিহাসজনক বাক্য বলতেন।

মুরারির বক্তব্য থেকে মনে হয়, সুদর্শন পণ্ডিত, বিষ্ণু পণ্ডিত ও গঙ্গাদাস পণ্ডিত ভিন্ন অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছেও নিমাই পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। বৃন্দাবন গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেছেন।

ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন ॥
বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশ।
স্বতন্ত্র যে পুঁথি তারে করে হাস ॥

১ চৈ. চ মহা.—৩।৪ ২ মু. ক.—২।৯।২ ৪

প্রভু বলে ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন ॥
সন্ধিকার্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা ॥[১]

সহপাঠী বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারি গুপ্তকে নিয়েও তিনি পরিহাস করতে ছাড়েন নি।

প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা নিযা গিয়া রোগী কর দড় ॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ, পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥[২]

নিমাই-এর বিদ্যাবত্তার অহংকার ছিল যথেষ্ট। নিজের পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি সর্বদাই প্রকাশ করতেন।

কতরূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্বক্ষণ ॥
প্রভু কহে সন্ধিকার্য নাহিক যাহার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার ॥
হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্টমিশ্র পদবী সবার ॥[৩]

মাত্র ষোল বৎসর বয়সেই নিমাই এর বিদ্যার্জন সমাপ্ত হয়েছিল; তিনি বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়ে অধ্যাপনা সুরু করেছিলেন। প্রথমে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতেই তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেছিলেন।

---

১ চৈ. ভা. আদি ৯ অঃ ২ তদেব ৩ তদেব

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাবত্তা

এই প্রসঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতবাদ অদ্যাপি বর্তমান। এক মতে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকরণ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারেন নি। অপর মতে তাঁর পারদর্শিতা ছিল ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রে। অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, "মহাপ্রভুর লৌকিক শিক্ষা ব্যাকরণ শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া যায় নাই।"[১] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বম্ভরের অধীত বিদ্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা না করলেও তাঁর ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যের কথাই উল্লেখ করেছেন।[২] অনুরূপ ইঙ্গিত আচার্য সুকুমার সেনের গ্রন্থেও লভ্য।[৩] ডঃ সুশীলকুমার দে'র মতে মহাপ্রভুর লৌকিক বিদ্যা সীমাবদ্ধ ছিল কলাপ ব্যাকরণ, সম্ভবতঃ কিছু সাহিত্য ও অলংকারের মধ্যে।[৪] স্বনামধন্য ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপ্রভুর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ ও বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়নের উল্লেখ করেছেন।[৫] M. T. Kennedy-র মতে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যাকরণ, অলংকার ও ন্যায় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য

---

১ বাঙালীর সারস্বত অবদান—পৃঃ ৯১

২ "চৈতন্যদেব কিশোর বয়সে ব্যাকরণের সূত্র ও টীকা এমনভাবে আয়ত্ত করিলেন যে অল্প বয়সেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল।"—'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ২য় পৃঃ ১৯৬।

৩ "মেধাবী ও প্রত্যুৎপন্নমতি চৈতন্যের ব্যাকরণ ও অলংকার বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি ও যশলাভের আগেই জগন্নাথ স্বর্গারোহণ করিলেন।"—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—১ম খণ্ড পূর্বার্ধ —পৃঃ ২৭৯

৪ '...his studies appear to have been chiefly confined to Grammar, especially Kalapa Grammar, and possibly, some literature and Rhetoric to which allusion is made."—Vaisnava faith and movement—p. 71.

৫ বাংলার ইতিহাস—২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯

অর্জন করেছিলেন।[১] ডঃ অমূল্য সেনের অভিমত: নিমাই ব্যাকরণ, কিছু কাব্যনাটক ও অলংকার পাঠ করে কিছুদিন স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেই ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে সুরু করেছিলেন, অন্য কিছু অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন নি।[২] কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী শ্রীগৌরাঙ্গের গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ পাঠেরই মাত্র উল্লেখ করেছেন।[৩]

অপরদিকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের এবং ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রের টীকা রচনার কথা উল্লেখ করেছেন 'অমিয় নিমাই চরিত' (১ম খণ্ড) ও Lord Gauranga গ্রন্থদ্বয়ে। আবার ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন Chaitanya and his Age গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের কাব্য ব্যাকরণ ন্যায় প্রভৃতি বহু বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভের কাহিনী গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। প্রভুপাদ নিমাই চাঁদ গোস্বামীও ব্যাকরণ, ন্যায় স্মৃতিশাস্ত্র সহ বহুবিষয়ে শ্রীচৈতন্যের গভীর পাণ্ডিত্যের কাহিনীকে যথার্থ সত্য বলে স্বীকার করেছেন।[৪]

পণ্ডিত সমাজে এরূপ মতপার্থক্যের কারণ শ্রীচৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলিতে গার্হস্থ্য জীবনে তাঁর বিদ্যার্জনের সুস্পষ্ট বিবরণের অভাব এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিবরণের বিভিন্নতা। তবে গৌরাঙ্গদেবের ব্যাকরণে গভীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কেউ সংশয় প্রকাশ করেন নি। গৌরাঙ্গদেব যে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, পঞ্জীটীকাও আয়ত্ত করেছিলেন এবং ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে পণ্ডিতদের বিব্রত করতেন তাই নয়, তিনি নিজেও যে একটি ব্যাকরণের টীকা রচনা করেছিলেন তার উল্লেখ কয়েক স্থানেই মেলে। শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গদেশে গমন করলে সেখানকার বিদ্যার্থীরা তাঁকে বলেছিল—

উদ্দেশ্যে আমরা সবে তোমার টিপ্পনি।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি ॥[৫]

---

১ "It is said that by the time he was ten years of age, he had become proficient in Sanskrit Grammar and rhetoric...He seems to have confined his study largely to grammar and the logic for which the Nabadwip tols had become famous."—The Chaitanya Movement.—pp. 14 15

২ ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ৫৪

৩ নবদ্বীপ মহিমা—পৃঃ ২১৬

৪ নিত্যানন্দ শক্তি মা জাহ্নবা

৫ চৈ. ভা আদি ১২ অঃ

শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্তী ব্যাকরণ পাঠ ও ব্যাকরণের টীকা রচনার কথা উল্লেখ করেছেন—

এই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী হয়।
ব্যাকরণ পড়ে এথা শচীর তনয়॥
* * *
দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার।
ব্যাকরণে করে যে টিপ্পনী আপনার॥[১]

রঘুনন্দন গোস্বামী বিশ্বম্ভরকৃত কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের টীকার উল্লেখ করেছেন—তদেবমধ্যয়নাধ্যাপন কুতুকেন কাতন্ত্রটীকা বিরচনেন হরতিরস্কারি-বিদ্যে বিশ্বম্ভরে॰॰।[২] অদ্বৈত প্রকাশে শ্রীচৈতন্যকৃত বিদ্যাসাগর টীকার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুরারি বা কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুকৃত ব্যাকরণের টীকার উল্লেখ করেন নি। সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর লৌকিক বিদ্যার বিবরণ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের তেমন আগ্রহ ছিল না। ব্যাকরণে পাণ্ডিত্যের উল্লেখ অবশ্য সকল চরিতগ্রন্থেই সুলভ। চৈতন্য ভাগবতের বিবরণে নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর কাব্যে ব্যাকরণ দোষ ধরেছিলেন—

একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া।
হাসি দুষিলেন ধাতু না লাগে বলিয়া॥
প্রভু বলে এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয়॥[৩]

ব্যাকরণের কূট প্রশ্নে তিনি সকলকে বিব্রত করে তুলেছিলেন—

ব্যাকরণ শাস্ত্রে সবে বিদ্যায় অবদান।
ভট্টাচার্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান॥[৪]

সহপাঠী মুকুন্দ তীক্ষ্ণধী নিমাইকে বিদ্যায় পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষায় নিমাইকে ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন বলে ঈষৎ অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।

মনে ভাবে মুকুন্দ আজি জিনিব কেমনে।
ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে॥[৫]

---

১ ভক্তি রত্নাকর—১২।২১৮৫ ৮৬ ২ গৌরাঙ্গ চম্পু—১১ আষাঢ়
৩ চৈ. ভা. আদি ৮ অঃ ৪ চৈ. ভা. আদি ১০অঃ ৫ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ

দিগ্বিজয়ী পরাজয় অধ্যায়ে কবিরাজ গোস্বামী দিগ্বিজয়ীর মুখে নিমাই পণ্ডিতের ব্যাকরণ জ্ঞানের কথা অবজ্ঞার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোক তব কহে গুণগ্রাম ॥
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিলে ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥
প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেহো না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥[১]

দিগ্বিজয়ার সঙ্গে বিতর্ককালেও দিগ্বিজয়ী বললেন নিমাইকে অবজ্ঞাভরে—

ব্যাকরণীয়া তুমি নাহি পড় অলংকার।
তুমি কি জানিব এই কবিত্বের সার ॥[২]

শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরী তর্কে পরাজিত হয়ে বলেছিলেন—

শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ
সে মোহরে জিনে হেন বিধির ঘটন ॥[৩]

গৌরচন্দ্রের কলাপ ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তির কথা জয়ানন্দও উল্লেখ করেছেন—

সুবন্ত জ্ঞান কার পড়িল ষট্কারক।
সটীক কলাপ পড়ি সবার ব্যাপক ॥[৪]

গৌরাঙ্গসুন্দরের কলাপ ব্যাকরণ পাঠের বিবরণ জয়ানন্দ অন্যত্রও দিয়েছেন—

গৌরাঙ্গ সুন্দর পড়ে নিরন্তর
ভোট কম্বলে বসিয়া।
কলাপে আলাপ কয় এ প্রলাপ
ঈষৎ হাসিয়া ॥[৫]

এই সকল উল্লেখও বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে শ্রীগৌরাঙ্গ কলাপ

---

১ চৈ. চ. আদি ১৬ পরি ২ চৈ চ. আদি ১৬ পরি ৩ ভ. র.—১২ তরঙ্গ
৪ চৈ ম. নদীয়া—১৬।০ ৫ চৈ ম. নদীয়া—৩১।২

ব্যাকরণেই প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং এই ব্যাকরণেরই সম্ভবতঃ তিনি টীকা রচনা করেছিলেন।

কিন্তু ব্যাকরণ ছাড়া অন্য কোন কোন বিষয়ে নিমাই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন চরিতগ্রন্থগুলি থেকে তার কিছুটা আভাস মাত্র পাওয়া যেতে পারে। কাব্য ও অলংকারে নিমাই পণ্ডিতের অধিকার বোধ হয় অস্বীকার করা যায় যায় না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন যে মুকুন্দ নিমাই-এর তর্কযুদ্ধে নামার আগে স্থির করেছিলেন, ব্যাকরণে অভিজ্ঞ নিমাইকে অলংকার জিজ্ঞাসা করে ঠকাবেন—ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলংকার।[১] মুকুন্দ তরুণ দম্ভী বৈয়াকরণকে অলংকার সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। বৈয়াকরণও পরাজিত না হয়ে মুকুন্দ কথিত অলংকারগুলির দোষ ব্যক্ত করতে লাগলেন।

বিষম বিষম যত কবিত্ব প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলংকার॥
সর্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি দোষে সর্ব অলংকার॥[১]

বিশ্বম্ভরের অলংকার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের সবিশেষ বিবরণ আছে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর পাণ্ডিত্যের লড়াইএর কবিরাজ গোস্বামী প্রদত্ত বিবরণে। চৈতন্যভাগবতকার দিগ্বিজয়ী পরাভব উপাখ্যান অত্যন্ত সংক্ষেপেই উল্লেখ করেছেন। নবদ্বীপে সমাগত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিমাই-এর সঙ্গে বাক্ যুদ্ধে স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে যে গঙ্গাস্তোত্র রচনা করেছিলেন, গৌরাঙ্গদেব সেই স্তবে অলংকারের দোষ দেখিয়ে দিগ্বিজয়ীকে পরাভূত করেছিলেন।

ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদিমধ্য অন্তে তিন স্থানে॥
প্রভু বলে এ সকল শব্দ অলংকার।
শাস্ত্র মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার॥[২]

কবিরাজ গোস্বামী এই অলংকারের বিচার বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে। দিগ্বিজয়ী রচিত গঙ্গাস্তোত্রের পাঁচটি শ্লোকে বিশ্বম্ভর অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ, বিধেয়াংশ, বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম ও পুনরুক্ত দোষ দেখিয়ে দোষগুলি প্রত্যেকটি বিচার

---

১ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ ২ তদেব

বিশ্লেষণ করেছিলেন। অলংকার বিচারে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

মুরারি গুপ্ত এবং কবিকর্ণপুর দিগ্বিজয়ী পরাভবের কাহিনী উল্লেখ না করায় এবং বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ দিগ্বিজয়ীর নাম উহ্য রাখায় ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন যে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে এই কাল্পনিক কাহিনী উদ্ভূত হয়েছিল এবং কিম্বদন্তীমূলক এই কাহিনী বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাস লিপিবদ্ধ করেছেন।[১] তিনি আরও মনে করেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর অলংকার শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য মহাপ্রভুর অলংকার বিচার প্রসঙ্গে প্রদর্শন করেছেন।[২]

ডঃ মজুমদারের বক্তব্য যথার্থ এ কথা স্বীকার করা কঠিন। কোন কোন গ্রন্থে কোন ঘটনার অনুল্লেখ সেই ঘটনার অনস্তিত্ব প্রমাণ করে না। মুরারি বা কবি কর্ণপুর চৈতন্যজীবনের প্রতিটি ঘটনা খুঁটিনাটি বর্ণনা করেন নি। মুরারি ছাড়া চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী জীবনীকার আর কেউই ছিলেন না। অপরাপর চরিতকাররা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে শুনে নিজ নিজ আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে চৈতন্যচরিত রচনা করেছেন। নিজ নিজ বিশ্বাস ও ভক্তি অনুসারে আরাধ্যের চরিত বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জন স্বাভাবিক, কিন্তু সাধক প্রকৃতির ভক্ত কবিরা নিছক মিথ্যা ঘটনা লিপিবদ্ধ করবেন তা মনে হয় না। অথচ এই চারখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ ছাড়া শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী জানার আর কোন উপায় নেই।

কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণ যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে শ্রীগৌরাঙ্গ কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব প্রভৃতির রচনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন বলে মানতেই হবে। কারণ, করুণার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ পরাজিত দিগ্বিজয়ীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—

ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাষ ॥[৩]

দক্ষিণভারত পরিক্রমণকালে শ্রীচৈতন্য ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

---

১ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ২০৯ ২ তদেব—পৃঃ ২১০

৩ চৈ. চ. আদি ১৬ পরি

ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাইয়া।
দুই পুস্তক লইয়া আইলা উত্তম জানিয়া॥[১]

বিদ্যাপতি জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কাব্য শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ সহ তিনি এই তিন কবির রচনা আস্বাদ করতেন—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥[২]
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীত গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥[৩]
যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥[৪]

রায় রামানন্দের জগন্নাথ বল্লভ নাটক এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্য ও মহাপ্রভুর প্রিয় গ্রন্থ ছিল। মালাধর বসুর বাসভূমি কুলীনগ্রামকে মহাপ্রভু পুণ্যতীর্থের মত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কুলীনগ্রামের অধিবাসীদেরও তিনি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি বলতেন—

গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥[৫]

সুতরাং বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত কাব্যে শ্রীচৈতন্যের অধিকার ছিল, একথা বোধ হয় স্বীকার অযৌক্তিক নয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। রূপ গোস্বামী-সংকলিত পদ্যাবলীতে মহাপ্রভু রচিত দশটি শ্লোক সংকলিত হয়েছে।

জয়ানন্দের মতে কাব্য, নাটক, স্মৃতি, তর্কসাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে মহাপ্রভু পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

---

১ চৈ চ. মধ্য ১ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ১০ পরি ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ১৫ পরি
৪ তদেব অন্ত্য ২০ পরি ৫ তদেব ১৫ পরি

চন্দ্র সারস্বত নব কাব্য নাটকে।
স্মৃতি তর্ক সাহিত্য পড়িল একে একে ।[১]

মহাপ্রভুর শিক্ষাগুরু বিষ্ণুপণ্ডিত, সুদর্শন পণ্ডিত ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের মধ্যে কার কাছে কি শিখেছিলেন জানা সম্ভব না হলেও গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে বহু বিষয়ে কৃতবিদ্য ছিলেন তা জানা যায় চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয় কাব্য' ও রঘুনন্দন গোস্বামীর 'গৌরাঙ্গচম্পূ' কাব্য থেকে। রঘুনন্দন গঙ্গাদাস সম্পর্কে লিখেছেন—

যং বেদেষু পরাশরস্তুতনয়ং ন্যায়েঽক্ষপাদং মুনিং
যোগে শ্রীল পতঞ্জলিং কণভুজং বৈশেষিকেদর্শনে।
মীমাংসায়াম্ জৈমিনিঞ্চ কপিলং সাংখ্যে তথা পাণিনিং
সাক্ষাৎ ব্যাকরণে বদন্তি ভরতং কাব্যেষু বিদ্বজ্জনাঃ ॥[২]

—পণ্ডিতগণ যাঁকে (গঙ্গাদাসকে) বেদে পরাশর-তনয় ব্যাস, ন্যায়শাস্ত্রে অক্ষপাদ গৌতম মুনি, যোগদর্শনে শ্রীপতঞ্জলি, বৈশেষিকদর্শনে কণাদ, মীমাংসায় জৈমিনি, সাংখ্যে কপিল, ব্যাকরণে সাক্ষাৎ পাণিনি এবং কাব্যে ভরত বলতেন।

জয়ানন্দের বিবরণ অনুযায়ী কোন কোন পণ্ডিত ধারণা করেন যে সুদর্শন পণ্ডিত ও বিষ্ণু পণ্ডিত নিমাইকে অ আ ক খ শিখিয়েছিলেন।[৩] কিন্তু এরূপ ধারণা নিছক অনুমান। জয়ানন্দের কাব্যে নিমাই-এর বিদ্যাশিক্ষার সুস্পষ্ট বিবরণ নেই,—জয়ানন্দের বিবরণ কতটা নির্ভরযোগ্য তাও চিন্তনীয়। অদ্বৈত প্রকাশের বিবরণ অনেকটা সুস্পষ্ট। এই বিবরণে নিমাই নবদ্বীপে তিন পণ্ডিতের কাছে পাঠ শেষ করে শান্তিপুরে গিয়েছিলেন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। সেই সময়ে নিমাই-এর সহচর গদাধর অদ্বৈতকে বলেছিলেন বাল্যবন্ধুর;অধীত বিদ্যা সম্পর্কে—

প্রথমে শ্রী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
দুই বর্ষে ব্যাকরণ কৈলা সমাপনে॥
দুই বর্ষে পড়িলা সাহিত্য অলংকার।
তবে গেলা শ্রীমান বিষ্ণুমিশ্রের গোচর॥
তাঁহা দুই বর্ষে স্মৃতি জ্যোতিষ পড়িলা।
সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা॥

১ চৈ. ম. নদীয়া—১৬।৫ ২ গৌরাঙ্গ চম্পূ—১১।৩৪ ৩ ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ৪৭

তাঁর কাছে ষড়দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে।
তবে গেলা বাসুদেব সার্বভৌমের পাশে ॥
তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়িলা দ্বিবৎসরে।
এবে তুয়া পাশে আইলা বেদ পড়িবারে ॥ [১]

লোচনদাস একটি সংবাদ দিয়েছেন :

পণ্ডিত সুদর্শন ঘরে একদিনে।
পরিহাস করে নিজ সতীর্থের সনে ॥
বঙ্গজের কথা কহে বড়ই রসাল।
অতি মনোহর হাসি হাসিতে মিশাল ॥[২]

সুদর্শন পণ্ডিতের ঘরে বসে সতীর্থের সঙ্গে বাঙাল ভাষায় রসিকতা করা অ আ ক খ পড়া শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। এই ঘটনা যথার্থ হলে সুদর্শন পণ্ডিতের কাছে পাঠকালে নিমাই এর বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্যই পরিপক্ক হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে। অদ্বৈত প্রকাশের মতে বিশ্বম্ভর পণ্ডিত এক বৎসর শান্তিপুরে অদ্বৈতের নিকট বেদ ও ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন।

ক্রমে গৌরের এক বর্ষ হইল অতিক্রম।
তাহে বেদ ভাগবত হইল পঠন ॥ [৩]

অদ্বৈতাচার্য অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র শ্রীগৌরাঙ্গের সর্বশাস্ত্রে পারংগমতা দেখে তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন—

এই নিমাঞি সর্বশাস্ত্রে অতি বিচক্ষণে।
বিদ্যাসাগর উপাধি মুঞি করিলা স্থাপনে ॥ [৪]

অদ্বৈত প্রকাশ অনুসারে নিমাই পণ্ডিত রচিত টীকার নাম বিদ্যাসাগর টীকা। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ববঙ্গে গমন করলে তথাকার অধিবাসীরা বলেছিল—

বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাই পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাঁহার রচিত ॥ [৫]

নবদ্বীপের পণ্ডিতেরাও বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন—

বড় বড় পণ্ডিতেরে তর্কে হারাইলা ॥
সবে কহে নিমাই পণ্ডিত শিরোমণি।

---

১ অ. প্র. ১১ অঃ ২ চৈ. ম. আদি খণ্ড ৩ অদ্বৈত প্রঃ ১১ অঃ
৪ তদেব ৫ তদেব

ঐছে বিদ্যাসাগর আর কাহা নাহি শুনি ॥
ক্রমে গৌরের বিদ্যাযশ পূর্ব উজলিল।[১]

অদ্বৈতপ্রকাশের মৌলিকতায় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। সে বিতর্কে না গিয়েও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহাপ্রভুর বিদ্যার্জনের এই বিবরণে অতিরঞ্জন বা প্রক্ষেপ আছে। বিদ্যাসাগর উপাধি আর কোন চরিতগ্রন্থে মহাপ্রভু সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় নি। কেবলমাত্র নরহরি চক্রবর্তী রচিত একটি পদে মহাপ্রভুকে গঙ্গাদাসশিষ্য বিদ্যাসাগর বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

'বিদ্যাসাগর উপাধির সম্ভাব্যতা

গঙ্গাদাস শিষ্য বিশ্বম্ভর।
সর্ববিদ্যা বিশারদ সে বিদ্যাসাগর ॥[২]

এখানে বিদ্যাসাগর অর্থে উপাধি না বুঝিয়ে সাগরতুল্য বিদ্যার অধিকারী বোঝানোও সম্ভব। নরহরি চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক হওয়ায় তাঁর কথার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম। শ্রীগৌরাঙ্গকে অদ্বৈতের ছাত্ররূপে উল্লেখ অন্য কোন চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায় না। নিমাই যদি অদ্বৈতের কাছে পাঠ নিয়েই থাকেন, তবে তিনি নবদ্বীপে না পড়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে বাস করতে গেলেন কেন? ঈশানের বিবরণ অনুসারে নবদ্বীপেও অদ্বৈতের চতুষ্পাঠী ছিল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কখনও বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন নি। পুরীতে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত বাসুদেব তাঁকে চিনতেন বলে মনে হয় না। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীক্ষেত্রে স্বর্ণকান্তি নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখে বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আচার্য! অয়ং পূর্বাশ্রমে গৌড়ীয় বা।"— হে আচার্য, ইনি পূর্বাশ্রমে কি বাঙ্গালী ছিলেন? উত্তরে গোপীনাথ মহাপ্রভুর পরিচয় প্রদান করে বললেন, "ভট্টাচার্য, পূর্বাশ্রমে নবদ্বীপবাসিনো নীলাম্বর চক্রবর্তিনো দৌহিত্রো জগন্নাথমিশ্র পুরন্দরস্য তনুজঃ।"—হে ভট্টাচার্য, ইনি পূর্বাশ্রমে নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র এবং জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের পুত্র। এই কথা শুনে সাদরে এবং সস্নেহে বললেন, "অহো নীলাম্বর চক্রবর্তিনো হি মত্তাতপাদানামভিমান্তঃ।"—অহো নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার পিতার সতীর্থ

শ্রীচৈতন্য বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন কি?

১ অঃ প্রঃ ১১অঃ
২ গৌরপদ তরঙ্গিনী—২৮ পদ

এবং পুরন্দর মিশ্র আমার পিতার অতিশয় স্নেহভাজন ছিলেন।'[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থেও অনুরূপ বিবরণ পাই। বাসুদেব পুরীতে তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে 'নমো নারায়ণায় বলি নমস্কার কৈল'। তারপরে গোপীনাথ আচার্যকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন —'গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্বাশ্রম?' তখন— গোপীনাথ আচার্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এবে ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয়েন দৌহিত্র॥[২]

সার্বভৌম নীলাম্বর চক্রবর্তী ও জগন্নাথ মিশ্রকে চিনতেন। কেন না, নীলাম্বর ছিলেন সার্বভৌমের পিতা নরহরি বিশারদের সহপাঠী এবং জগন্নাথ মিশ্র বা পুরন্দর মিশ্রও বিশারদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

সার্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য মানি॥[৩]

এমতাবস্থায় বিশ্বম্ভরকে চিনলে বাসুদেব নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন, ছাত্র হলে ত কথাই নেই। একদা ছাত্র বিশেষতঃ অসাধারণ প্রতিভাবান্ সুদর্শন ছাত্রকে কয়েক বৎসর পরে একেবারে চিনতে না পারার কথা নয়, ছাত্র হিসাবে অনুল্লেখ একেবারেই অসম্ভব। ছাত্রের প্রতি গুরুর আচরণও ভিন্ন প্রকার হওয়ার কথা। জয়ানন্দের বিবরণে মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের উপরে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের উপরে অত্যাচার চালাতে থাকায় রাজভয়ে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত নবদ্বীপ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন; সেই সময়ে বাসুদেবও সপরিবারে নবদ্বীপ ত্যাগ করে উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন।[৪] শ্রীচৈতন্যের সময় বাঙ্গালার সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে দেশের মানুষ অনেকটা শান্তিতে বসবাস করতে পেরেছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে জালালুদ্দিন ফতে শাহ্ ও পূর্ববর্তী হাবশী রাজাদের রাজত্বের সময়ে হিন্দু জনগণের উপর প্রবল অত্যাচার হয়েছিল। সুতরাং নিমাই-এর জন্মের পূর্বে অথবা শৈশবে বাসুদেব নবদ্বীপ ছেড়ে উৎকলে

১ চৈ. চন্দ্রোদয়—৬ অংক ২ চৈ. চ. মধ্য ৬ পরি ৩ তদেব
৪ চৈ. ম. নদীয়া—৪

চলে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও এবংবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১]

ঈশান নাগর কথিত অদ্বৈতের বেদ পঞ্চানন উপাধি অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বিশ্বম্ভর রচিত বিদ্যাসাগরী টীকা ব্যাকরণের অথবা অন্য কোন শাস্ত্রের, তার উল্লেখ নেই অদ্বৈত প্রকাশে।

অদ্বৈত প্রকাশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকৃত ভাগবতের টীকার উল্লেখ আছে। অদ্বৈততনয় অচ্যুতানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকৃত ভাগবতভাষ্যকে শ্রীধর স্বামীকৃত ভাষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলায় মহাপ্রভু শ্রীধর স্বামীর মর্যাদালোপের আশংকায় স্বকৃত টীকা গোপন করতে আদেশ দিয়েছিলেন—

একদিন মহাপ্রভু অচ্যুতের স্থানে।
ভাগবতের ভক্তিটীকা করিলা বাখানে॥
শ্রীঅচ্যুত কহে এই টীকা সর্বোত্তম।
ভাগবতে জ্ঞান — স্বামি ভাষ্য আদির আর নাহি প্রয়োজন॥
সর্বটীকার সার ইথে ব্যাখ্যাধিক্য হয়।
শুনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অচ্যুতেরে কয়॥
যাহে বহু সাধুর মহত্ত্ব হয় হানি।
তাহা সংগোপন কর মোর আজ্ঞা মানি॥[২]

শ্রীচৈতন্যকৃত ভাগবতটীকার উল্লেখ অন্য কোন চরিত গ্রন্থে না পাওয়ায় এ ব্যাপারের সত্যতায় স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের উদ্রেক করে। অবশ্য ভাগবতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অধিকার সম্পর্কে সংশয়ের হেতু নেই। শ্রীমদ্ ভাগবত তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি স্বয়ং ভাগবতের পুঁথির একটি অনুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য গদাধর পণ্ডিতের আবাসে মহাপ্রভুর হস্তলিখিত ভাগবতের পুঁথি দেখেছিলেন। প্রভুর চোখের জলে কালির আখর অনেক জায়গায় মুছে গিয়েছিল—

সে পুস্তক দেখিলাম প্রভুর হস্তাক্ষর।
অক্ষর সব মোছা দুঃখ পাইলাম বিস্তর॥[৩]

অম্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মন্দিরে ভাগবতের

১ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান ২ অ. প্র. ১৯ অঃ ৩ প্রে. বি. ৬ষ্ঠ বি

একটি হস্তলিখিত জীর্ণ তালপাতার পুঁথি আছে। সেবাইতরা বলেন, এই পুঁথি মহাপ্রভুর স্বহস্তলিখিত। ভাগবতের শ্লোক মহাপ্রভু প্রায়শঃই আবৃত্তি করতেন। ভাগবতের ব্যাখ্যাতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। একটি শ্লোকের (১।৭।১০) তিনি একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন।[১] মহাপ্রভু বলেছেন তাঁর ভক্তদের—

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ হয়॥[২]

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যানুসারে মহাপ্রভু ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ছুটি শ্লোকের আঠার রকম ব্যাখ্যা করেছিলেন—

পৃথক্ পৃথক্তান্নবধা চকার
ব্যাখ্যাং স পদ্যদ্বিতীয়স্ত শশ্বৎ।
অষ্টাদশার্থানুভয়ো নিশম্য
মহাবিমুগ্ধোঽভবদেষ বিপ্রঃ॥[৩]

—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নয় প্রকার অদ্বিতীয় ব্যাখ্যা তিনি তৎক্ষণাৎ করলেন। শ্লোক ছুটির অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা শুনে বিপ্র (বাসুদেব সার্বভৌম) মহাবিমুগ্ধ হয়ে গেলেন।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন, বাসুদেব সার্বভৌম ভাগবতের একটি শ্লোকের তেরো প্রকার অর্থ করার পর শ্রীচৈতন্যদেব আরও অধিক প্রকার ব্যাখ্যা করায় বাসুদেব তাঁকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলে মনে করেছিলেন।[৪] এই ঘটনাগুলি থেকে ভাগবতে শ্রীচৈতন্যর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি প্রমাণিত হয়।

স্মৃতিশাস্ত্রেও মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। মুরারি গুপ্ত জানিয়েছেন যে মহাপ্রভু 'লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি' অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করতেন।[৫] সহপাঠী হিসাবে মুরারির বিবরণ অবশ্যই অবিশ্বাস্য নয়। জয়ানন্দ ও চূড়ামণি দাস শ্রীগৌরাঙ্গের স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করেছেন। লোচনও বলেছেন যে শ্রীচৈতন্য স্মৃতি ও কাব্য পড়াতেন—

লৌকিক সৎক্রিয়াবিধি পড়ে শিষ্যগণ।
স্মৃতিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য আপনি পড়ায় প্রভু পুরুষরতন॥

---

১ চৈ. চ. মধ্য ২৫ পরি   ২ চৈ. চ. মধ্য ২৪ পরি   ৩ চৈ. চ. মহাকাব্য—১২।৮৯
৪ চৈ. ভা. অন্ত্য—৩ অঃ   ৫ মু ক.—১।১৫।১-২

বৃহস্পতি জিনি ব্যাকরণ জানে।
আপনি ঈশ্বর স্তুতি কি বলি বচনে॥[১]

স্মৃতিশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল বলেই বৈষ্ণবদিগের আচরণীয় নব স্মৃতিশাস্ত্র রচনায় তিনি সনাতন গোস্বামীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বারাণসীতে সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে প্রভু আদেশ করলেন—

বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥[২]

সনাতন তখন করজোড়ে বললেন—

মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার।
মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি পরচার॥
সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥[৩]

তখন মহাপ্রভু বৈষ্ণবীয় স্মৃতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে সনাতনের কাছে বিবৃত করলেন—

সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্তব্যাকর্তব্য স্মার্ত ব্যবহার॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।[৪]

মহাপ্রভুর দিগ্‌দর্শন অনুসরণ করে সনাতন প্রণয়ন করেন হরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণবীয় স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা না থাকলে নবস্মৃতি রচনায় দিগ্‌দর্শন সম্ভব নয়।

ন্যায়শাস্ত্রেও শ্রীচৈতন্যের অধিকার ছিল বলেই মনে হয়। জয়ানন্দের বিবরণে তিনি তর্কশাস্ত্রে পাঠ নিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর ছাত্রজীবনে

ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার

তাঁর ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তদনুসারে বিশ্বম্ভর তাঁর সহপাঠী পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধরের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র বিচার করে গদাধরকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। তিনি গদাধরকে ডেকে বলেছিলেন—

ন্যায় শাস্ত্র পঢ় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া।[৫]

---

১ চৈ. ম. আদিখণ্ড ২ চৈ চ. মধ্য ২৩ পরি ৩ চৈ. চ. মধ্য ২৪ পরি
৪ চৈ. চ. মধ্য ২৩ পরি ৫ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ

গদাধর ন্যায়ের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। তিনি প্রশ্ন করতে বললেন গৌরাঙ্গকে। তখন—

প্রভু বলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ॥
শাস্ত্র অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বলেন ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা॥
গদাধর্ বলে আত্যন্তিক দুঃখ নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ॥
নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতীপতি।
নাহি হেন তার্কিক যে করিবে স্থিতি॥[১]

অদ্বৈতপ্রকাশকার জানিয়েছেন যে পূর্ববঙ্গ পরিক্রমাকালে তত্রস্থ পণ্ডিতবর্গ মিলিত হয়ে বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কশাস্ত্র আলোচনা করতে এসে পরাভূত হয়েছিলেন।

শাস্ত্রে সুনিপুণ পণ্ডিতের শিরোমণি॥
তর্কশাস্ত্রের প্রশ্নে এক কৈলা উত্থাপন।
শুনিমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ করিলা খণ্ডন॥
সেই দ্বিজ পুনঃ পুনঃ করয়ে স্থাপন।
অবহেলে মহাপ্রভু করয়ে খণ্ডন॥
পূর্বপক্ষ উড়ি গেল স্থাপিতে নারিলা।
তবে পণ্ডিতের গণ পরাস্ত মানিলা॥[২]

অদ্বৈতপ্রকাশকার আরও একটি সংবাদ দিয়েছেন : শ্রীগৌরাঙ্গ ছাত্রাবস্থাতেই ন্যায়শাস্ত্রের একটি টীকা রচনা করেছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও রঘুনাথ

পূর্বে গোরা যবে শাস্ত্র কৈলা অধ্যয়ন।
তর্কশাস্ত্রের টীকা এক কৈল বিরচন॥[৩]

একদিন বিশ্বম্ভর স্বরচিত টীকার পুঁথিখানি নিয়ে গঙ্গাপার হচ্ছিলেন, সেই সময়ে নৌকাতে এক ব্রাহ্মণ বিশ্বম্ভরের পুঁথিখানি দেখতে চাইলেন। সেই পুঁথি দেখে ব্রাহ্মণ স্বরচিত ন্যায়ের টীকার ন্যূনতা এবং গৌরাঙ্গ-রচিত ন্যায়ের টীকার উৎকর্ষ বিচার করে শোকার্ত হওয়ায় করুণার অবতার গৌরচন্দ্র স্বরচিত টীকার পুঁথি গঙ্গাজলে সমর্পণ করেছিলেন।

১ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ ২ অ. প্র. ১৩ অঃ ৩ অ. প্র. ১৯ অঃ

দ্বিজ সেই টীকা দেখি করে হাহাকার।
কহে মোর পরিশ্রম হৈল ছারখার॥
ইহা দেখি মোর টীকার হৈব অনাদর।
শ্রীগৌরাঙ্গ কহে ভয় নাহি দ্বিজবর॥
সেইক্ষণে দয়ানিধির দয়া উপজিল।
নিজকৃত টীকা গঙ্গা মাঝে ডারি দিল॥[১]

কিম্বদন্তী এই যে, সহপাঠী রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়ের টীকায় অনাদর আশংকায় বিশ্বম্ভর স্বরচিত ন্যায়ের টীকা বিনষ্ট করেছিলেন। অদ্বৈতপ্রকাশের সম্পাদক সতীশ চন্দ্র মিত্র টীকায় (৩১পৃ:) লিখেছেন, "এ দ্বিজ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি। তিনি একসময়ে গৌরাঙ্গের সহপাঠী ছিলেন।" মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ অমিয় নিমাই চরিত নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের সহাধ্যায়ী রঘুনাথ শিরোমণির গৌরব রক্ষার্থে স্বয়ংকৃত ন্যায় শাস্ত্রের পুঁথি গঙ্গাজলে বিসর্জনের কাহিনী ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি উক্ত ঘটনা অবলম্বনে বলরাম দাসের একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। এই ঘটনাটিকে নিছক কাল্পনিক বোধ হয়, বলরাম দাসের নামাঙ্কিত কবিতাটিকেও অর্বাচীনকালের বোধ হয়। রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। নিমাই যেমন বাসুদেবের ছাত্র ছিলেন না, রঘুনাথও তেমনি নিমাই-এর সমাধ্যায়ী ছিলেন না। বাসুদেব নিমাই-এর পাঠ্যাবস্থার পূর্বেই নবদ্বীপ ত্যাগ করেছিলেন। অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, "শিরোমণি মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থ রচনাকালে মহাপ্রভু শৈশব অতিক্রম করেন নাই।"[২]

কিন্তু বৃন্দাবন ও জয়ানন্দের কথার সত্যতা মেনে নিলে বিশ্বম্ভরের ন্যায়শাস্ত্রে কিছুটা অধিকার স্বীকার করতেই হয়।

বেদান্তে পাণ্ডিত্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বেদান্তদর্শনে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই নীলাচলে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে বিতর্ককালে। এই বিতর্কের সবিস্তার বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিধৃত আছে। বাসুদেব মহাপ্রভুকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে প্রয়াসী হলে মহাপ্রভু তাঁকে বলেছিলেন—

১ অ. প্র. ১৯ অঃ ২ বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান—পৃঃ ৯৪-৯৫

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ, সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের অর্থ যেই হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে কয়॥

কবিকর্ণপূরও এই ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন,—

ইত্যস্য প্রতিপক্ষরূপং সপক্ষমেকং স তু সজ্জয়িত্বা।
অদ্বৈতবাদং বিনিরস্য ভক্তিসংস্থাপকং স্বীয়মতং জগাম॥[২]

—এইভাবে বাসুদেবের প্রতিপক্ষরূপে সপক্ষ যুক্তি সাজিয়ে অদ্বৈতবাদ নিরসন করে ভক্তিসংস্থাপক স্বীয়মতে আনয়ন করেছিলেন।

জয়ানন্দ বলেন,—

বেদান্ততত্ত্বার্থ জিজ্ঞাসিল সার্বভৌমে।
চতুর্মুখে ব্যাখ্যা করিল যথাক্রমে॥
সে অর্থ খণ্ডিয়া গোসাঞি খণ্ড খণ্ড করি।
সিদ্ধান্ত কল্লিল সার্বভৌম শক্তি ধরি॥
সেইসব সিদ্ধান্ত খণ্ডিল মহাপ্রভু।
কত সিদ্ধান্ত করিল সার্বভৌম মুহু মুহু॥
ছয় দর্শনে তুল্য বাখানে সার্বভৌমে।
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল যথাক্রমে॥[১]

মুরারি গুপ্তের কড়চাতে মহাপ্রভু কর্তৃক সার্বভৌমের নিকট বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে—

অথাপরাহ্নে দ্বিজবৃন্দসন্নিধৌ স সার্বভৌমস্য পুরো মহাপ্রভুঃ
উবাচ বেদান্ত নিগূঢ়মর্থং বচো মুরারেশ্চরণাম্বুজাশ্রয়ম্।
বেদান্ত সিদ্ধান্তমিদং বিদিত্বা গতং পুরা যত্তদলং স মত্বা
চৈতন্যপাদাব্জযুগে মহাত্মা স বিস্ময়োৎফুল্লমনাঃ পপাত॥[৩]

—অতঃপর অপরাহ্নে ব্রাহ্মণবর্গের নিকটে সার্বভৌমের সম্মুখে মহাপ্রভু

---

১ চৈ. চ মধ্য.—১২।২৪ ২ চৈ. ম. প্রকাশ—৬।৩-৬ ৩ মু. ক—১১।১২-১৩

শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল আশ্রয়কেই বেদান্তের গূঢ়ার্থ বলে ব্যাখ্যা করলেন। মহাত্মা সার্বভৌমও মহাপ্রভুর বক্তব্যকেই বেদান্তের সিদ্ধান্ত জেনে পূর্ববর্তীকালে গৃহীত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ভ্রান্ত বুঝে বিস্ময়ে আহ্লাদিতচিত্তে চৈতন্যের পাদাম্বুজ-যুগলে পতিত হলেন।

মহাবৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম মহাপ্রভুর মুখে বেদান্তব্যাখ্যা শুনে স্বীয় মত পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন—সকল জীবনীকারেরই এই একই বক্তব্য'অসত্য হতে পারে না। সার্বভৌম সহজে পরাজয় স্বীকার করেন নি। তিনি নানাভাবে পূর্বপক্ষ করে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং বেদান্তদর্শনে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকলে বাসুদেবের মত বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠকে স্বমতে আনয়ন সম্ভব নয়। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

শুনি ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার ॥[১]

সার্বভৌম বিজয়ী শ্রীচৈতন্যকে বলেছিলেন—

তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥[২]

অসাধারণ প্রতিভাবান অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম যে মহাপ্রভুর মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা প্রমাণিত হয় রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত সার্বভৌম রচিত চারিটি কৃষ্ণভক্তিমূলক শ্লোকে। তন্মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি :

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈবসাংখ্যসরণির্যোগে চ তীর্ণামতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিন্তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥[৩]

—কাণভুজ অর্থাৎ কণাদের মত জানি, আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় পরিচয় পেয়েছি, মীমাংসা শিখেছি, সাংখ্যদর্শনের পথ জেনেছি, যোগশাস্ত্রে মতি উত্তীর্ণ হয়েছে, বেদান্ত বিশেষভাবে অনুশীলন করেছি, কিন্তু নন্দনন্দনের স্ফুরিত মাধুর্যধারা বিশিষ্ট মুরলী সবলে আমার চিত্ত আকর্ষণ করছে।

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৬ পরি   ২ চৈ. চ মধ্য ৬ পরি   ৩ পদ্যাবলী—১০০ সং শ্লোক

অদ্বৈত আচার্য প্রথমে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁকে নিজস্ব দ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা স্বমতে আনয়ন করেছিলেন। অদ্বৈতকে তিনি বলেছিলেন যে দ্বৈতবাদী হয়েও তিনি অদ্বৈতবাদী —

ভো অদ্বৈত, স্মর কিমু বয়ং হস্ত নাদ্বৈত ভাজো।
ভেদস্তদস্মিংস্ত্বয়ি চ যদিমান্ রূপতোলিঙ্গতশ্চ।[১]

—হে অদ্বৈত! ভেবে দেখ, আমরাও কি অদ্বৈতবাদী নই, যেহেতু তোমাতে ও ঈশ্বরেতে রূপ ও লিঙ্গ (চিহ্নাদি) ভিন্ন কোন প্রভেদই নেই।

গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চায় দক্ষিণ-ভারতে কয়েকজন বৈদান্তিক পণ্ডিতের সঙ্গে মহাপ্রভুর বিতর্ক ও বৈদান্তিকদের পরাভব বর্ণিত হয়েছে। শিঙারির মঠে শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীদের পরাভূত করে প্রভু স্বমতে আনয়ন করেছিলেন।

শিঙারির মঠে থাকে শঙ্করের চেলা।
সেইখানে গিয়া প্রভু করিলেন খেলা॥
শঙ্করের শিষ্য যত একত্র হইয়া।
বিচার করিতে বসে তত্ত্ব বিচারিয়া॥
বিচারে সকল চেলা মানে পরাজয়।[২]

বেঙ্কট নগরে বৈদান্তিক দণ্ডীস্বামীর সঙ্গে বেদান্ত বিষয়ক বিতর্কে দণ্ডীস্বামী মহাপ্রভুর কাছে পরাভূত হয়েছিলেন।[৩] গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চায় গুর্জর নগরে অগস্ত্যকুণ্ডের ধারে অর্জুন নামে এক বৈদান্তিক পণ্ডিতের এবং গুর্জরীপ্রদেশে অচ্ছসর নামক জলাশয়ের ধারে অপর এক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতের পরাভব বর্ণিত হয়েছে।[৪] ব্রহ্মবাদী পণ্ডিতের পরাভব সম্পর্কে কড়চাকার লিখেছেন—

একজন ব্রহ্মবাদী পণ্ডিত আছিল।
তার সব তর্কবাদ প্রভু খণ্ডাইল॥[৫]

মহাপ্রভুর ওড়িয়া ভক্ত এবং পার্ষদ কানাই খুঁটিয়া মহাপ্রভুর বেদান্ত জ্ঞান এবং সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের উল্লেখ করে লিখেছেন,—

সে প্রাণ গৌরাঙ্গ সর্ব শাস্ত্রের বিবেগ।

* * *

১ চৈ. চন্দ্রোদয় নাটক—৫ম অংক ২ গো. ক. ৩ গো. ক.—পৃঃ ২৮
৪ গো. ক.—পৃঃ ৫০ ৫ তদেব —পৃঃ ৫২

সে প্রাণ গৌরাঙ্গ চাসে বেদান্তের ব্যাখ্যা।
সে প্রাণ গৌরাঙ্গ ঠারে সর্বজ্ঞান ঠুস ॥[১]

গোবিন্দ দাসের কড়চার প্রামাণিকতায় যদিও অনেকেই সন্দিগ্ধ তথাপি চরিতগ্রন্থগুলিতে প্রদত্ত বিবরণ মহাপ্রভুর বেদান্তে পারংগমতায় ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

অদ্বৈতপ্রকাশের মতে শ্রীগৌরাঙ্গ অদ্বৈত আচার্যের শান্তিপুরস্থ গৃহে বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী এই ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।[২] মুরারি গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের গুরুগৃহে বেদপাঠের এবং বেদ অধ্যাপনার উল্লেখ করেছেন।[৩] কিন্তু মহাপ্রভুর বেদজ্ঞানের উল্লেখ বা নিদর্শন চরিতগ্রন্থগুলির কোথাও নেই। মনে হয়, বেদের সার ভাগ ও অন্তভাগ উপনিষদ তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। কারণ সকল দর্শনের মূলীভূত তত্ত্বই জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ। কিন্তু অদ্বৈতগৃহে বেদপাঠের ব্যাপারটি গ্রহণযোগ্য নয়।

মহাপ্রভুর বেদজ্ঞান

দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিত ও দার্শনিকের সঙ্গে মহাপ্রভুর তর্কযুদ্ধ হয়েছিল। এখানে ছিল বহুতর ধর্মসম্প্রদায় এবং ছিলেন বিভিন্ন দর্শনে আস্থাশীল পণ্ডিতবর্গ। তাঁদের অনেকেই মহাপ্রভুর নিকট পরাভূত হয়ে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন॥ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কর্ণাটাধিপতির বার্তা নিয়ে কর্ণাটরাজামাত্য মল্লভট্ট, উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রের রাজসভায় আগমন করে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যবিজয় বার্তা বর্ণনা করেন। মল্লভট্ট বলছেন, "যথোত্তরমেব দক্ষিণস্যাং দিশি কিয়ন্তঃ কর্মনিষ্ঠাঃ কতিচিদেব জ্ঞাননিষ্ঠাঃ বিরলা এব সাত্বতাঃ প্রচুরতরাঃ পাশুপতাঃ প্রচুরতমাঃ পাষণ্ডিনঃ···।"[৪] উত্তর দেশের মতই দক্ষিণ দিকে কিছু সংখ্যক কর্মবাদী, কিছু সংখ্যক জ্ঞানবাদী, স্বল্প সংখ্যক সাত্বত (বিষ্ণুভক্ত), প্রচুরতর পাশুপত (শৈব), প্রচুরতম পাষণ্ডী অর্থাৎ বৌদ্ধ বাস করেন।

কিন্তু সকলেই স্ব স্ব মত পরিত্যাগ করে মহাপ্রভুর মতানুবর্তী হয়ে পড়েছিলেন—"সর্বগত এব স্ব স্ব মত প্রচ্যাবেন তৎপথপ্রবিষ্টা বভূবুঃ।"[৫] কৃষ্ণদাস কবিরাজও লিখেছেন-—

---

১ মহাভাবপ্রকাশ—৩য় বৃত্ত ২ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দশক্তি মা জাহ্নবী—পৃঃ ৪১৮
৩ ম ক —১।৮।১২ ৪ চৈ. চ. না. ৭ম অংক ৫ চৈ. চ. না. ৭ম অংক

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী কেহ কর্মী পাষণ্ডী॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে॥[১]

কবিরাজ গোস্বামী আরও লিখেছেন,—

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রোদ্‌গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্বমত দোষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥[২]

বারাণসীতেও বহু শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট পরাস্ত হয়েছিলেন।

লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥
সর্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার॥[৩]

এই বিবরণকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রতিভা কোন বিশেষ বিষয়ের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। লোকোত্তর চরিত্রের মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তির পরিমাপ সাধারণ মানদণ্ড দিয়ে করা চলে না।

সেকালে দক্ষিণ ভারতে প্রচুর বৌদ্ধ ছিলেন। মহাপ্রভু এঁদেরও তর্কে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তর্কপ্রধান বৌদ্ধ শাস্ত্র নব মতে।
তর্কেই খাণ্ডত প্রভু না পারে স্থাপিতে॥
বৌদ্ধাচার্য নব নব প্রশ্ন উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তিতর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধদের লজ্জা হয়॥[৪]

বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞান

১ চৈ. চ. মধ্য—৯ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি ৩ চৈ. চ. মধ্য ১৫ পরি
৪ তদেব ১৫ পরি

মহাপ্রভু কর্তৃক বৌদ্ধবিজয়ের বর্ণনা গোবিন্দদাস কর্মকারও দিয়েছেন। গোবিন্দের বিবরণ আরও স্পষ্ট।

ত্রিমন্দনগরে প্রভু প্রবেশ করয় ॥
বহু বৌদ্ধবাস করে ত্রিমন্দ নগরে।
আসিয়া মিলিল সবে গৌরাঙ্গ সুন্দরে ॥
বৌদ্ধগণ সহ প্রভু বিচার করিলা।
ত্রিমন্দের রাজা আসি মধ্যস্থ হইলা ॥
বৌদ্ধগণ বিচারেতে পরাস্ত মানিলা।
পণ্ডিত দর্শক সব হাসিতে লাগিলা ॥[১]

বৌদ্ধদের গুরু বা প্রধান রামগিরি রায় পরাজিত হয়ে মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করলেন—

বৌদ্ধগণের পতি রাম গিরি রায়।
প্রণমিয়া বলে পথ দেখাও আমায় ॥

* * *

পাষণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে।
কৃপা করি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে ॥[২]

এই বিবরণ যদি সত্য হয় তাহলে বৌদ্ধদর্শনেও মহাপ্রভুর অধিকার স্বীকার্য হয়ে পড়ে। অথচ তিনি কোন গুরুর কাছে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাঠ নিয়েছিলেন এমন সংবাদ কেউ দেন নি। তবে বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা শ্রীগৌরাঙ্গের পক্ষে অসম্ভব ছিল না, কারণ সেকালে নবদ্বীপেও বৌদ্ধরা বাস করতেন।

অধীত বিদ্যা ছাড়াও নৃত্যগীত অভিনয়ে শ্রীচৈতন্যের পারদর্শিতা ছিল। নবদ্বীপে ও নীলাচলে তিনি একাধিকবার কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীতে পারংগমতার পরিচয় মেলে কীর্তনগানের প্রবর্তনায়।

গোবিন্দ দাসের কড়চায় শ্রীচৈতন্য দক্ষিণীভাষা বিশেষতঃ তামিলভাষা আয়ত্ত করেছিলেন এবং দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণকালে তামিলভাষীদের সঙ্গে তামিল ভাষায় কথা বলতেন।

বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি

কখনও তামিল বুলি বলে গোরা রায়।
কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায় ॥[৩]

১ গোঃ কড়চা—পৃঃ ২৩ ২ গো. ক.—পৃঃ ৩ ৩ গো. ক.—পৃ ৩১

গোবিন্দ দাস কর্মকার অন্যত্র লিখেছেন—

একজন লোক আসি কাঁই মাই করি।
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি॥
তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমজিয়া।
কাঁই মাই করি তারে দিলেন বুঝিয়া॥[১]

দক্ষিণী ভাষায় ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে গোবিন্দদাস আরও বলেছেন—

এই দেশে তীর্থ পর্যটিয়া দীর্ঘকাল।
সকলের বুলি বুঝে শচীর দুলাল॥[২]

কড়চার মতে মহাপ্রভু দ্বারকায় গিয়ে গুজরাটী ভাষাতেও কথা বলতে পারতেন।

কিবা পাণ্ডা কিবা গৃহী সকলে মিলিয়া—
ধর্ম উপদেশ শুনে শ্রবণ পাতিয়া॥
যেই জন নাহি বুঝে তাহারে বুঝায়।
নানা বুলি বলি প্রভু তাহারে মাতায়॥
কখন বা মোর প্রভু কাঁই মাই বলে।
কাঁই মাই কত বলি বুঝায় সকলে॥[৩]

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা সে যুগে সংস্কৃত ভাষাতেই চলতো। কিন্তু অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় দেশীয় ভাষা ছাড়া আর গত্যন্তর কি? গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চায় বিশ্বস্ততায় সন্দেহের অবকাশ আছে ঠিকই, কিন্তু কাজ চলা গোছের দক্ষিণীভাষা আয়ত্ত করা মহাপ্রভুর মত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রে (শ্রীরঙ্গম্) বেঙ্কট ভট্টের গৃহে মহাপ্রভু চার মাস অবস্থান করেছিলেন। সুতরাং এই সময়ে অসংস্কৃতজ্ঞ লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য স্থানীয় লৌকিক ভাষা অল্পবিস্তর আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জীবনের অষ্টাদশ বৎসর যাপন করেছেন নীলাচলে। সুতরাং উড়িয়া ভাষায় তিনি স্বাভাবিকভাবেই অধিকার লাভ করেছিলেন। উড়িয়া ভাষার কবিতাও তিনি আস্বাদন করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন—

উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল।

---

১ গো. ক.—পৃঃ ৫১ ২ গো. ক.—পৃঃ ৬১ ৩ গো. ক.—পৃঃ ৭৫

তথাহিপদং

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ।
মন মাতিলাবে চক্য চন্দ্রকু চাঞ্চি॥ (ধ্রু)।[১]

শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক প্রতিভায় বোধহয় কিছুই অনায়ত্ত ছিল না। সুতরাং তাঁর ভক্ত ও জীবনীকারেরা মিথ্যাই তাঁর বিদ্যাবত্তার গুণকীর্তন করেন নি। বৃন্দাবন যথার্থই বলেছেন —

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা॥[২]

সেইজন্যই নবদ্বীপের তৎকালীন পণ্ডিতবর্গ বলতেন—

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই॥
পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার।
সবেই করেন দেখি সম্ভ্রম অপার॥[৩]

অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জন্যই নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ তাঁকে সমীহ করতেন।

যত বিদ্যাবন্ত বৈসে নদীয়া নগরে।
সকলেই সমীহা করেন বিশ্বম্ভরে॥[৪]

জীবনে প্রথম ষোল বৎসরের মধ্যে পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ হলে মাত্র এগারো বৎসর যাঁর অধ্যয়নকাল এবং ছাত্রাবস্থাসহ তেইশ বৎসর মাত্র যাঁর গার্হস্থ্য জীবন তিনি নৃত্যগীত-অভিনয় সহ ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার স্মৃতিশাস্ত্র এবং অন্ততঃপক্ষে বেদান্তদর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন তা বিস্ময়কর হলেও অসত্য বোধ হয় না। সম্ভবতঃ ন্যায়দর্শনেও তাঁর কিছু অধিকার ছিল। লোকোত্তর যাঁদের চরিত্র, প্রতিভা যাঁদের অনন্যসাধারণ—তাঁদের পক্ষে যা সম্ভব সাধারণের পক্ষে তা সম্ভব নয় ঠিকই। সুতরাং সাধারণের মানদণ্ডে তাঁদের বিচার করা চলে না। আধুনিককালে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাত্র ১২ বৎসর পাঁচ মাস কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ে বহুবিধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে অধ্যয়ন সমাপনান্তে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেছিলেন। পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অধীত বিদ্যা উল্লেখের অযোগ্য হলেও তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশামৃত অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই সমাদরের বিষয়। সুতরাং 'লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো বিজ্ঞাতুমর্হতি'।

১ চৈ. চ. অন্ত্য ১০ পরি ২ চৈ. ভা আদি ১০ অ: ৩ চৈ. ভা. আদি ১০ অ:
৪ ভক্তিরত্নাকর—১২ তরঙ্গ

ষষ্ঠ অধ্যায়

পিতৃবিয়োগ ও লক্ষ্মীপরিণয়

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করলে জগন্নাথ ও শচী শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন —"ততঃ পিতা তৎপরিশ্রুত্য বিহ্বলো মাতা চ সাধ্বী বিললাপ দুঃখিতা।"[১]

তদৈতদাশ্রুত্য পিতা প্রসূশ্চ সা
বিলাপমুচ্চৈরকরোন্মুমোহ চ।
ততঃ সমাশ্বাস্য হিতাভিলাষুকৌ
সদাশিষং তত্র সুতে প্রচক্রতুঃ॥[২]

—অনন্তর পিতা ও মাতা এই সংবাদ শুনে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তারপর কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে পুত্রের কল্যাণ কামনায় তাঁকে যথেষ্ট আশীর্বাদও করলেন।

বৃন্দাবন লিখেছেন—

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে শচী জগন্নাথের শোক

শচী জগন্নাথ দগ্ধ হইলা হৃদয়।
গোষ্ঠীসহ ক্রন্দন করয়ে ঊর্ধ্বরায়।
ভাইর বিরহে মূর্ছা গেলা গৌররায়॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথ-পুরী॥[৩]

জয়ানন্দ লিখেছেন যে শচীমাতা বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ শুনে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন—

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লয়্যা লোকমুখে।
গঙ্গাহ্রদে শচী সম্ভাইল পুত্রশোকে।
ধরিয়া তুলিল তারে গঙ্গাহ্রদ হইতে।[৪]

---

১ মু. ক.—১।৭।৭ ২ চৈ. চ. মহা—২।৯৫ ৩ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ
৪ চৈ. ম. নদীয়া—২০।১৭-১৮

বিশ্বরূপ-শোকে পিতামাতার সকাতর কারুণ্য লোচন মর্মস্পর্শী তাঁহার বর্ণনা করেছেন—

তবে লোক কাণাকাণি কার্য্য হৈল জানাজানি
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করণ।
তো কাণি মো কাণি কথা শুনি জগন্নাথ পিতা
আচম্বিতে হরিল চেতন॥
শচী দেবী ইহা শুনি মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি
অন্ধকার হৈল ত্রিজগত।
বিশ্বরূপ বলি ডাকে আয়রে পুত্র দেখি তোকে
কি লাগি হইলা বিরকত॥[১]

বালক নিমাই অগ্রজ বিশ্বরূপকে খুবই ভালবাসতেন। একমাত্র বিশ্বরূপের উপস্থিতিতেই তাঁর বাল্য দৌরাত্ম্য কিছুটা প্রশমিত হোত।

পিতামাতা কাহারেও না করয়ে ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজে দেখিলে নম্র হয়॥[২]

সুতরাং সেই অগ্রজের গৃহত্যাগে নিমাই যে কাতর হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? চূড়ামণি দাস লিখেছেন, অগ্রজের বিরহে 'ভাই বলি কাঁদে না বুঝএ আনে।"[৩] কিন্তু সেই বাল্যবয়সেই তাঁর কর্তব্যবোধ ছিল প্রখর। শোকে ভেঙ্গে পড়া জগন্নাথ-শচীকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। তিনি বললেন পিতা জগন্নাথকে—"ময়ৈব কার্য্যা ভবতশ্চ সেবা মাতুশ্চ নিত্যং সুখমাপ্নুহি ত্বম্।"[৪]—আমিই করবো তোমার ও মায়ের সেবা, তুমি আশ্বস্ত হও। কবি-কর্ণপূরের কাব্যে বিশ্বম্ভর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মাকে বললেন—

নিমাই কর্তৃক পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান

গতোঽগ্রজো মে ভবতীমুপেক্ষ্য য
তিতিক্ষ্যাসৌ পিতরঞ্চ শান্তিমান্।
ময়ৈব কার্য্যা জনকস্ত তেঽপি চ
ক্ষণাৎ সপর্য্যা সকলৈব নিত্যশঃ॥[৫]

কৃষ্ণদাসের সংক্ষিপ্ত উক্তি: তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন।[৬]

---

১ চৈ. ম.—আদিখণ্ড ২ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ ৩ গৌ. বি.—পৃঃ ৬৩
৪ মু. ক.—২।৭।৯ ৫ চৈ. চ. মহাকাব্য—২।৯৯ ৬ চৈ. চ. আদি ১৫ পরি

চূড়ামণি দাস লিখেছেন,—বাপ মাত্র শান্ত করাইল বিশ্বম্ভর।[১] বালক বিশ্বম্ভর শুধু বাপ মাকে শান্ত করলেন না, নিজেও শান্ত হয়ে গেলেন। করুণার্দ্রহৃদয় নিমাই পিতামাতার দুঃখে এবং ভ্রাতৃবিরহে কাতর হয়ে দুরন্তপনা অনেকটা পরিহার করলেন এবং মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া করতে লাগলেন।

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতামাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয় যেন জননী-জনকে॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পঢ়ে
তিলার্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাই নড়ে॥[২]

কিছুকাল পরে বিশ্বম্ভর তখনও ছাত্র, হঠাৎ একদিন জগন্নাথ মিশ্র জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন—

দৈবযোগেন তস্যাভূজ্জ্বরঃ প্রাণাপহারকঃ।
অতস্তং তাদৃশং দৃষ্ট্বা সহমাত্রা স্বয়ংহরিঃ॥
জগাম জাহ্নবতীরে নিজভক্তৈঃ সমাবৃতঃ।
শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরো দেবো হরিকীর্তনতৎপরৈঃ॥[৩]

—দৈবযোগে তাঁর প্রাণহারী জ্বর হয়েছিল, সুতরাং তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে হরি শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর দেব স্বয়ং মায়ের সঙ্গে ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হয়ে হরি সংকীর্তন করতে করতে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন।

কবিকর্ণপূর লিখেছেন—

জগন্নাথের মৃত্যু

ততঃ পিতা তস্য নিবৃত্তযৌবনো
জরাং স ভেজে জরিতোঽতিদুর্বলঃ।
তথাবিধং তং পরিলক্ষ্য স প্রভু-
র্নিনায় গঙ্গাতীরভূমিমাকুলঃ॥[৪]

—তারপর তাঁর পিতা যৌবন অতিক্রান্ত হলে জ্বরে অতি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে সেই প্রভু ব্যাকুল হয়ে তাঁকে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন।

---

১ গৌ. বি.—পৃঃ ৬২ ২ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ ৩ মু. ক.—২।৮।১৩-১৪
৪ চৈ. চ. মহা—২।১১৭

তখন বালক নিমাই শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতঃ, আমাকে কোথায় রেখে যাচ্ছেন? জগন্নাথ বললেন, তোমাকে নারায়ণের চরণ যুগলে সমর্পণ করলাম—"সমর্পণং তে রঘুনাথ পাদয়োঃ।"[১] বিশ্বম্ভর ও শচী বিলাপ করতে লাগলেন, জগন্নাথ গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করলেন। এই বিবরণ কবি-কর্ণপূর সম্পূর্ণই মুরারির কড়চা থেকে গ্রহণ করেছেন। বৃন্দাবন দাস শোক-দুঃখের কাহিনী বিশদভাবে বলতে চান নি, সংক্ষেপে উল্লেখমাত্র করেছেন—

হেনমতে কতদিন থাকি মিশ্র বর।
অন্তর্ধান হৈলা নিত্যশুদ্ধকলেবর॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।[২]

লোচন সবিস্তারে জগন্নাথের মৃত্যু ও শ্রীগৌরাঙ্গের ও শচীর বিলাপ করুণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। জগন্নাথকে মুমূর্ষু অবস্থায় গঙ্গাজলী দেখে বিশ্বম্ভর বিলাপ করতে লাগলেন—

আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি।
বাপ বলি ডাক আর নাহি দিব আমি॥
আজি হৈতে শূন্য হইল এ ঘর আমার।
আর না দেখিব দুই চরণ তোমার॥
আজি দশ দিগ্‌ শূন্য অন্ধকার মোরে।
না পড়াবে যত্ন করি ধরি নিজ করে॥[৩]

এদিকে শচীও করুণভাবে বিলাপ করছেন। পিতার মৃত্যু ও মাতার বিলাপে বিশ্বম্ভরের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে। লোচন বলেন—

মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ।
কান্দয়ে শচীর সুত অঝর নয়ন॥[৪]

জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে বিশ্বরূপের শোকেই জগন্নাথ ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন—

হেন কালে মূর্ছা গেলা মিশ্র পুরন্দর।
বিশ্বরূপের শোকে তার গাএ আইল জর॥

---

১ চৈ. চৈ. মহা.—২।১১৯ ২ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ ৩ চৈ. ম. আদিখণ্ড
৪ ঐ চৈ ম. আদিখণ্ড

মহাবায়ু কফ উর্দ্ধশ্বাস রক্ত স্রবে।
দেখিবারে গেলা তারে সকল বৈষ্ণবে ॥[১]

চূড়ামণি দাসও একই কথা বলেছেন—

অদ্বৈত সৎসঙ্গে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস।
এত শুনি মিশ্রবর হইল হতাস ॥
সেই শোকানলে গঙ্গাজলে মিশ্র রাএ।
নিত্য শরীরে কৃষ্ণলোক চলি জাএ ॥[২]

জয়ানন্দ জগন্নাথের মৃত্যু সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পরিবেষণ করেছেন। তাঁর মতে জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বৃষ্টি ও ভূমিকম্প হলে জগন্নাথ ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাস নিদাঘকালে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
সেই দিনে ভূমিকম্প বারিপূর্ণ ক্ষিতি ॥
মিশ্র পুরন্দর জরে হইলা অচৈতন্য।
মৃত্যুকালে প্রত্যাসন্ন দেখে সর্বশূন্য ॥
বিপ্রগণ মেলি লৈল অন্তর্জলে।[৩]

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর মতে বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে জগন্নাথের তিরোভাব হয় (১৪৯৬ খ্রীঃ)। নিমাই-এর বয়স তখন এগার বৎসর।[৪]

এখন শুধু পিতৃহীন বালক আর শোকাতুরা পতিপুত্রহারা শচী,—পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন।

পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেইপুত্রসেবা বই আর কর্ম নাই।[৫]

বিশ্বম্ভরও মায়ের চিত্তশান্তির নিমিত্ত মাকে প্রবোধ দিতে থাকেন।

প্রভুও মায়ের প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস উত্তর ॥
শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি ॥[৬]

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—৩৩।৪-৫ ২ গৌরাঙ্গবিজয়—পৃঃ ৯৮ ৩ চৈ. ম. নদীয়া—৩৩।১৯-২০
৪ বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ৫৩ ৫ চৈ. ভা. আদি ৭ অঃ ৬ চৈ. ভা. আদি ৭অঃ

জয়ানন্দ বলেন, অসুস্থ পুরন্দর মিশ্রকে অন্তর্জলী করার সময়ে গৌরাঙ্গ গুরুগৃহে বসে পুঁথি লিখছিলেন। পিতার অন্তিমকাল তাঁর গোচরে ছিল না। হরিদাস ঠাকুর দ্রুত গিয়ে সংবাদ দিলেন।

হরিদাস ঠাকুর বলেন কি পুথি লেখ।
তুমার বাপ অন্তর্জলে ঝট গিয়া দেখ॥
পুথি আছাড়িয়া গেলা গঙ্গা অন্তর্জলে।
করুণা করিয়া কান্দে পিতা করি কেলে॥[১]

অন্য কোন সূত্র থেকে এ তথ্য সমর্থিত হয় না। জগন্নাথের মৃত্যু যে আকস্মিকভাবে হয়েছিল তাও কেউ বলেন নি, জয়ানন্দও না। যাই হোক, কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভরের মুখ চেয়ে শচী শোক সম্বরণ করলেন।

গোরা চাঁদ দেখি শচী ছাড়ে এ নিশ্বাস।
পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস॥
'বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার।
তবে মনের সুখে পুত্র গোঙায় আমার॥[২]

নরহরি চক্রবর্তীর বিবরণে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখলেন নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। এই দুঃস্বপ্ন দেখে দারুণ দুশ্চিন্তায় জগন্নাথ জরাক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।[৩] বিশ্বরূপের গৃহত্যাগই যে জগন্নাথের মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তাতে সন্দেহ নেই।

পিতৃবিয়োগের পরে নিমাই অনেকটা শান্ত হয়েছেন। এর পরে মায়ের উপরে তাঁর অত্যাচারের একটি ঘটনারই বিবরণ বৃন্দাবন দিয়েছেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তারও সবিস্তার বিবরণ বৃন্দাবনের কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে।

বিদ্যার্জন শেষ হোল শ্রীগৌরাঙ্গের। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বৎসর।

ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন।
বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশ।[৪]

সঞ্জয় মুকুন্দের বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপে চতুষ্পাঠী খুলে গৌরচন্দ্র অধ্যাপনা শুরু করলেন।

১ চৈ ম. নদীয়া—৩৪।৩-৪ ২ লোচন—চৈ. ম. আদিখণ্ড
৩ ভক্তি রত্নাকর—১২।১২১০-১২ ৪ চৈ. ভা. আদি ৯অঃ

মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহা ভাগ্যবান।

নিমাই-এর অধ্যাপনা

যাহার আলয় বিদ্যাবিলাসের স্থান।
তাহার পুত্রের প্রভু আপনে পড়ায়।
তাহারাও তাঁর প্রতি ভক্ত সর্বথায়॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তায় ধরে॥
গোষ্ঠী করি তাহাই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ॥[১]

এই সময়েই ষোল বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ হয় বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে। গঙ্গার ঘাটে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের চাক্ষুষ পরিচয় হয়, মন জানাজানিও হয়েছিল।

দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইখানে॥
নিজলক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥
হেন মতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘর গেলা॥[২]

মুরারি গুপ্তও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন—

লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পরিচয়

আভাষ্য গচ্ছতাচার্যং হরিণা দদৃশে পথি
বল্লভাচার্যদুহিতা সখীজন সমাবৃতা॥
স্নানার্থং জাহ্নবীতোয়ে গচ্ছন্তী রুচিরাননা।
দৃষ্ট্বা তাং তাদৃশীং জ্ঞাত্বা মনসা জন্মকারণম্॥
তস্যাঃ জগাম নিলয়ং স্বয়মেব স্বজনৈঃ সহ।
শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরো দেবো বিদ্যারস কুতূহলী॥[৩]

—আচার্যকে সম্ভাষণ করে পথে যাবার সময় হরি (শ্রীগৌরাঙ্গ) সখীজন পরিবৃতা গঙ্গাজলে স্নানের নিমিত্ত গমনশীলা সুন্দরাননা বল্লভাচার্যের কন্যাকে দেখে ফেললেন। তাঁকে তদবস্থায় দেখে মনে মনে তাঁর জন্মকারণ জেনে বিদ্যারসকুতূহলী শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর দেব তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

---

১ চৈ. ভা. আদি ৯ অঃ ২ চৈ. ভা আদি ৯ অঃ ৩ মু. ক.—২।৯।৬-৮

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যেও গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরাঙ্গ ও লক্ষ্মীদেবীর পরস্পরের মন বিনিময়ের কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্মীদেবী তখন কৈশোরের সীমা অতিক্রম করে যৌবনের সীমানায় পদার্পণ করেছেন।

সা শৈশবাদেকপদেন বালা
সমাগতা যৌবন সীম্নি কিঞ্চিৎ।
পরিত্রটচ্চাপল জায়মান—
ত্রপা তমালোক্য ননন্দ শশ্বৎ॥[১]

—সেই কন্যা (লক্ষ্মী দেবী) শৈশব থেকে কিঞ্চিৎ যৌবনসীমায় একপদ স্থাপন করে চপলতা পরিহারপূর্বক লজ্জা প্রাপ্ত হয়ে তাঁকে (নিমাইকে) দেখে শাশ্বত আনন্দ লাভ করলেন।

গৌরচন্দ্রের বয়স তখন ষোল, লক্ষ্মীর বয়স গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরীর মতে বারো। নিমাই-এর এই বয়সে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক নয়, কারণ "প্রতিভাসম্পন্ন বালকদের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়।" বৃন্দাবন দাস, মুরারি, কবিকর্ণপূর ও লোচন নিমাই-এর একদিনের সাক্ষাৎকারেই অনুরাগ সঞ্চারের (love at first sight) বিবরণ দিয়েছেন কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত কাব্যে দুবার সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাওয়া যায়। বালক নিমাই যখন গঙ্গারঘাটে উপদ্রব করতেন সেইকালে তিনি স্নানার্থিনী নারীদেরও বিরক্ত করে আনন্দ উপভোগ করতেন। এই সময়ে একদিন গঙ্গাস্নানের পরে শিবপূজারতা লক্ষ্মীর সম্মুখে নিমাই উপস্থিত হয়ে লক্ষ্মীর নিকট থেকে পূজা গ্রহণ করেছিলেন।

একদিন বল্লভাচার্যের কন্যা নাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী প্রীতি পাইলা পাই প্রভুর দর্শন॥
সাহজিক প্রীতি দোঁহার হইল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয়॥
* * *

---

১ চৈ. চ. মহা: ৩।১০

প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্পচন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥[১]

তখনও বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের বেশ কিছুকাল পরে নিমাই-এর পনেরো যোল বয়সের সময়ে আর একবার লক্ষ্মীর সঙ্গে গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের বিবরণ পাই কবিরাজ গোস্বামীর মহাগ্রন্থে—

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥
পূর্বসিদ্ধভাব দোঁহার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইল॥[২]

এই বিবরণ যথার্থ হলে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে গঙ্গাতীরে গৌরাঙ্গের সঙ্গে লক্ষ্মীর দেখা সাক্ষাৎ অনেকবারই হয়েছিল এবং কিশোর-কিশোরীর বাল্যক্রীড়া অনুরাগে পরিণত হয়েছিল। জয়ানন্দের কাব্যে কালানুক্রমিক পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নি। তিনি গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে লক্ষ্মীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। তথাপি জয়ানন্দের বিবরণে লক্ষ্মীর মনে গৌরাঙ্গের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের ইঙ্গিত আছে। এখানে লক্ষ্মী শিবপূজা করে শিবের কাছে গৌরাঙ্গকে পতিরূপে লাভ করার বর প্রার্থনা করেছেন,—

একদিন গৌরচন্দ্র গেলা গঙ্গাতটে।
লক্ষ্মী শঙ্করপূজা করে করপুটে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ মাল্যচন্দন।
শঙ্খ ঘণ্টা দর্পণ চামর ব্যজন॥
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ স্তুতিভক্তি করি।
প্রদক্ষিণ হয়্যা বর মাগে ধ্যান করি॥
আমার মানস সিদ্ধ কর ত্রিলোচন।
নবদ্বীপচন্দ্র কর পাণিগ্রহণ॥[৩]

---

১ চৈ. চ. আদি ১৪ পরি   ২ চৈ. চ. আদি ১৫ পরি   ৩ চৈ. ম. নদীয়া—৪৫।১-৪

সেই নবদ্বীপচন্দ্র নিমাই স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি লক্ষ্মীকে বর দিলেন—

চলহ মন্দিরে লক্ষ্মী মনের সন্তোষে।
বিধি অনুকূল তোর বিভা এই মাসে ॥[১]

লোচন অবশ্য আরও একটু কবিত্ব করেছেন। তিনি শকুন্তলার মত লক্ষ্মীকে দিয়ে গলায় গজমতি হার ছিঁড়িয়ে মুক্তা কুড়াবার ছলে গৌরাঙ্গের রূপ মাধুরী পান করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু বল্লভাচার্য অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, কন্যার বিবাহে যৌতুকস্বরূপ কিছুই দিতে পারেন নি, সেইজন্য বল্লভ-নন্দিনীর কণ্ঠে গজমতি হার থাকাটা সম্ভব ছিল না।

যাই হোক্ লক্ষ্মী পরিণয়ের ব্যাপারে বনমালী আচার্য ঘটকরূপে দৌত্য কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হলেন। বনমালীকে ঘটকরূপে প্রেরণের ব্যাপারে বিশ্বম্ভরের হস্ত নেপথ্য থেকে অঙ্গুলিসংকেত করেছে বলে মনে হয়। মুরারি জানিয়েছেন যে বনমালী শচীদেবীর কাছে লক্ষ্মীর বিবাহের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু শচী তেমন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না, বললেন, পিতৃহীন বালক নিমাই, এখন লেখাপড়া করুক—'পিত্রাবিহীনঃ পঠতু'।[২] বনমালী ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রত্যাবর্তনের কালে পথে নিমাই-এর সাথে সাক্ষাৎ হোল,—বনমালীর কাছে শচীর উত্তর শুনে তিনি মাকে এসে বললেন, "কথং ন তস্য সম্প্রীতিঃ কৃতা মাতঃ প্রিয়োক্তিভিঃ ?"[৩] মা তুমি প্রিয়বচনের দ্বারা তাঁর (বনমালীর) প্রীতি উৎপাদন করলে না কেন? একথা শুনে শচী পুত্রের মনোগত অভিপ্রায় বুঝে বনমালীকে ডেকে বিবাহে সম্মতি দান করলেন। বৃন্দাবন এবং লোচন হুবহু একই বর্ণনা দিয়েছেন, এই বিবরণ কি বনমালীর দৌত্যকার্যের ব্যাপারে নিমাই-এর অনুপ্রেরণার ইঙ্গিত দেয় না? এ ক্ষেত্রে জয়ানন্দ নিতান্ত স্পষ্টভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক বনমালীকে দৌত্যে নিয়োগের উল্লেখ করেছেন—

ঘটক হইয়া তুমি করাহ সম্বন্ধ।
একথা কহিয়া চলিলা গৌরচন্দ্র ॥[৪]

শচীদেবী প্রথমে পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে অনিচ্ছুক হলেও পুত্রের মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বনমালীকে ডাকিয়ে এনে বল্লভ দুহিতার সঙ্গে বিবাহের

১ চৈ. ম. নদীয়া—৪৫।১৩ ২ মু. ক.—২।৯।১১ ৩ মু. ক.—২।৯।১৭
৪ চৈ. ম. নদীয়া—৪৫।১৭

সম্বন্ধ করতে বললেন। বল্লভ ত হাতে স্বর্গ পেলেন। এমন দুর্লভ পাত্রে কন্যা-দান তাঁর পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্য। কিন্তু বল্লভ নির্ধন; তিনি পণ বা যৌতুক দিতে অপারক। তখন বল্লভ বললেন,—

সবে এক বচন বলিতে লজ্জা নাই।
আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই॥
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া॥[১]

লোচন একই কথা বলিয়েছেন বল্লভের মুখ দিয়ে—

আমি ধনহীন কিছু দিবারে না পারি।
কন্যা মাত্র আছে মোর পরম সুন্দরী॥
ইহা জানি আজ্ঞা যদি করেন আপনে।
কন্যা দিব বিশ্বম্ভর জামাতা যতনে॥[২]

যেখানে বর কন্যার মনের মিলন হয়েছে সেখানে যৌতুকের বাধা নিতান্তই তুচ্ছ। শচীদেবী পণ বা যৌতুক ছাড়াই পুত্রের বিয়ে দিতে সম্মত হলেন। সুতরাং যথারীতি বিশ্বম্ভর ও লক্ষ্মীর শুভ পরিণয় হয়ে গেল। শচীর মন পূর্ণ হয়ে গেল মৃত স্বামী ও সন্ন্যাসীপুত্রের শোকে। বিশ্বম্ভর ও কাঁদলেন মায়ের সঙ্গে। যাই হোক, অবশেষে তাঁরা আশ্বস্ত হলেন।

পিতা বিবাহের উদ্যোগ করায় ষোল বৎসর বয়সে বিশ্বরূপ প্রব্রজ্যা নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন, সেই ষোল বৎসর বয়সেই বিশ্বম্ভর বিয়ে করলেন স্বনির্বাচিতা বধূকে বিনা যৌতুকে ঘটক নিয়োগ করে মাকে রাজি করিয়ে। সেকালে ষোল বৎসর বয়সে বিবাহটা অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু এই বয়সে বিবাহের জন্য এত ব্যগ্রতা এবং স্বকীয় প্রচেষ্টা কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর বৈ কি! লক্ষ্মী দেবী অবশ্যই সুন্দরী ছিলেন, জয়ানন্দ সে অপূর্ব রূপলাবণ্যের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। নরহরি লিখেছেন—লক্ষ্মীতনু জিনি কাঁচা সোনা।[৩]

লক্ষ্মীকে বিয়ে করে গৌরচন্দ্র বেশ সুখেই ছিলেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় দিন কাটছিল তাঁর।

লক্ষ্মীর গুণপনা

অধ্যয়ন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ ধাড়ায়॥[৪]

---

১ চৈ. ভা. আদি ৯অ: ২ চৈ ম আদি ৩ ৩ ভ র.—১২।১২৩৪
৪ চৈ. ভা আদি ৯ অ:

পতি ও শ্বশ্রূর সেবাতে লক্ষ্মী ছিলেন অকুণ্ঠ এবং আন্তরিক। তিনি স্বল্পকালেই শচীদেবী ও বিশ্বম্ভরের অন্তর জয় করেছিলেন। জয়ানন্দ লিখেছেন—

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী গৌরচন্দ্রের সেবা করি।
না গেলা বাপের বাড়ী নদিয়া নগরী॥
শাশুড়ীর সেবা হৈতে আন নাঞি মনে।
গৌরাঙ্গ চরণ ধ্যান করি রাত্রি দিনে॥[১]

বৃন্দাবন লক্ষ্মীর সেবা পরায়ণতার একটু ইঙ্গিত মাত্র দিয়েছেন—

লক্ষ্মী দেন অন্ন খান বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥
ভোজন অন্তরে করি তাম্বূল চর্বণ
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥[২]

এই সময়ে একদিন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী এলেন নবদ্বীপে। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ও হয়—

দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ঈশ্বরপুরীর আগমন — পঢ়াইয়া আইসেন আপনার ঘর॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে॥[৩]

গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীকে স্বগৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণের নিমিত্ত আমন্ত্রণ জানালেন।

ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥[৪]

নরহরিও ঈশ্বরপুরীর মিশ্রগৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণের উল্লেখ করেছেন—

নিজভৃত্য ঈশ্বর পুরীরে প্রণমিয়া।
এই ঘরে দিল ভিক্ষা যত্নেতে আনিয়া॥[৫]

বৃন্দাবন দাসের বিবরণ অনুযায়ী ঈশ্বর পুরী এই সময় গোপীনাথ আচার্যের গৃহে কয়েকমাস অবস্থান করেছিলেন। তিনি গঙ্গাধর পণ্ডিতকে স্বরচিত কৃষ্ণলীলামৃত নামক কৃষ্ণচরিতমূলক কাব্য শোনালেন। এখানেই শ্রীগৌরাঙ্গ

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—৫৫।১-২ ২ চৈ. ভা আদি ১০ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ৯ অঃ
৪ চৈ. ভা. আদি ৯ অঃ ৫ ভ র—১১।১৩৬৫

কৃষ্ণলীলামৃত কাব্য শুনে কাব্যে ব্যাকরণের দোষ দেখিয়ে ধাতুবিচার করেছিলেন। গৌরাঙ্গ তখন বিদ্যারসে নিমগ্ন। নবদ্বীপের পণ্ডিত ও নিজ সতীর্থদের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের পরাভূত করছেন। ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন কি তরুণ প্রতিভাবান্ উদ্ধত পণ্ডিত নিমাইকে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে?

নিমাই-এর উপরে ঈশ্বরপুরীর আগমনের কি ফল হয়েছিল বলা যায় না। বৃন্দাবন জানিয়েছেন যে এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ বায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বায়ুর প্রকোপে তাঁর উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশ্য বৃন্দাবন বলেছেন যে বায়ুরোগের ছলে নিমাই প্রেম-ভক্তির বিকার প্রকাশ করেছিলেন।

একদিন বায়ু দেহমান্দ্য করি ছল।
প্রকাশেন প্রেম-ভক্তি বিকার সকল ॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে ॥
গড়াগড়ি যায় হাসে ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥
হুঙ্কার গর্জন করে মালসাট পুরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে ॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্ছা হয় লোকে দেখি পায় ভয় ॥[১]

নিমাই এর বায়ুরোগ

বন্ধুবান্ধব অনুরাগিবর্গ দেখতে আসেন বিশ্বম্ভরকে আর প্রতিকারের নানাবিধ উপায় বলে যান।

শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সবে করে প্রতিকার ॥
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়ে।
গোষ্ঠীসহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥
বিষ্ণুতৈল নারায়ণতৈল দেন শিরে।
সবে করে প্রতিকার যার যেই স্ফুরে ॥[২]

যখন সুস্থ থাকেন তখন সুগন্ধি বিষ্ণুতৈল মাথায় দিয়ে বিশ্বম্ভর পণ্ডিত ছাত্রদের নিয়ে অধ্যাপনা করেন মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে—

---

১ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ

মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পঢ়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥
পরম সুগন্ধি পাকতৈল প্রভু শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেয় প্রভু ব্যাখ্যা করে॥[১]

জয়ানন্দ ও বিশ্বম্ভরের বায়ুরোগের সংবাদ দিয়েছেন। জয়ানন্দের মতে গৌরচন্দ্র তখন গঙ্গাদাস সুদর্শনের ছাত্র, নিতান্তই বালক,—বিশ্বরূপ তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি, জগন্নাথ মিশ্রও পরলোক গমন করেন নি। সুতরাং গৌরাঙ্গের বয়স তখন আট নয় বৎসরের বেশী হওয়ার কথা নয়। তবে তখনই নিমাই কীর্তনে নৃত্য করতে করতে বাহ্যজ্ঞান-হারা হয়ে পড়েন। সেই সময়ে গৌরচন্দ্রের বর্ণনা—

সিংহগর্জন করি মারে মারে মালসাট।
তুলিয়া আজানু বাহু উন্মত্ত নাট॥
ফিরে ফিরে অদ্বৈত ঘন ঘন ডাকে।
ক্ষণে রাজপথে নিঃশব্দ হয়্যা থাকে॥
হাথের মোহন পুঁথি দূরে পেলাইয়া।
বোল বোল ডাকেন গায় আছাড়িয়া॥[২]

বলা বাহুল্য, জয়ানন্দের বিবরণ থেকে গৌরচন্দ্রের বায়ু রোগ ভিন্ন অন্য কোন তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। বৃন্দাবনও এই বায়ু রোগকে ঐশ্বরিক আবেশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বহুজনে বহুপ্রকার ঠাণ্ডা তেল মাখাচ্ছেন বায়ুর প্রকোপ হ্রাস করার জন্য। বৃন্দাবন বলছেন—

কেহ বলে দানব দানব অধিষ্ঠান।
কেহ বলে হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥
কেহ বলে সদাই করেন বাক্যব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥
এইমত সর্বজনে করেন বিচার।
বিষ্ণুমায়া মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁর॥
বহুবিধ পাকা তৈল সবে দেন শিরে।
তৈলদ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খল খল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥[৩]

---

১ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ   ২ চৈ. ম. নদীয়া—২৬।৮-১০   ৩ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ

কিছুদিনের মধ্যে নিমাই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই সময়ে নিমাই-এর দৈনন্দিন জীবন-যাপনের তালিকা পাই চৈতন্য ভাগবতে। শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রগণবেষ্টিত হয়ে অধ্যাপনান্তে শিষ্যগণ সহ গঙ্গাস্নান করে আসেন। তারপর কৃষ্ণপূজন (শালগ্রাম শিলা?) সেরে মধ্যাহ্নভোজনে বসেন তিনি। লক্ষ্মী-পরিবেষিত অন্ন তৃপ্তিভরে ভোজন করে তাম্বূল চর্বন করতে করতে কিছুক্ষণ নিদ্রাসুখ উপভোগ করতেন, লক্ষ্মী এই সময় স্বামীর পদসেবা করতেন। তারপর তিনি পুস্তক হাতে নিয়ে নগর ভ্রমণে বেরুতেন, যার সঙ্গে

জনসংযোগ

দেখা হয় তাদের 'সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ'। এখন তিনি দারিদ্র্য পীড়িত মানুষদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সম্ভাষণ করতে থাকেন। তন্তুবায়ের বাড়ী গিয়ে হাসিমুখে কাপড়ের দাম করলেন, গোয়ালার ঘরে গিয়ে 'ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে'। গোপেরাও তাঁর সঙ্গে পরিহাসে যোগ দেয়—

প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
মামা বলি সবে করেন সম্ভাষ।।[১]

এরপর গন্ধবণিকের বাড়ী গিয়ে গন্ধদ্রব্য গায়ে মেখে চললেন। মালাকারদের বাড়ী থেকে মালা গলায় পরে তাম্বুলির বাড়ী থেকে সুগন্ধি তাম্বুল উপহার নিয়ে চর্বণ করতে করতে তিনি চললেন শঙ্খবণিকের গৃহে, গেলেন সর্বজ্ঞের বাড়ীতে, গেলেন খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ী।

এই মত নবদ্বীপে যত নাগরিয়া।
সবার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া।।[২]

কিন্তু বিশ্বম্ভরের চপলতা এখনও দূর হয় নি। সকলের ঘরেই তাঁর প্রাপ্য দ্রব্যাদি তিনি দাবী করেন। তাই শ্রীধর বলেছেন, তোমার বয়স বাড়লো, কিন্তু চঞ্চলতা কমলো না, বরং বেড়েই চলেছে—

শ্রীধর বলেন ওহে পণ্ডিত নিমাঞি।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই।।
বয়স বাড়িলে লোকে কত স্থির হয়ে।
তোমার চাপল্য আর দ্বিগুণ বাঢ়য়ে।।[৩]

এইভাবে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর সাধারণ মধ্যবিত্ত দরিদ্র মানুষের বাড়ী গিয়ে তাদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়েছিলেন প্রথম যৌবনেই। পরবর্তীকালে যিনি হয়েছিলেন হীন পতিতের ভগবান তিনিই পূর্বাশ্রমে দীনদরিদ্রের ঘরে ঘুরে হয়েছিলেন

১ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ ২ তদেব ৩ তদেব

তাদেরই এক সমব্যথী। যথা সাধ্য দুঃখীর দুঃখ দূর করতে তিনি প্রয়াসীও হয়েছিলেন।

প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস।
নবদ্বীপে হেন নাই যে না হয় বশ॥
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম কর্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু ঘরে॥
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর ব্যাভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কড়িপাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥[১]

এই সময়ে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন নবদ্বীপে। তিনি ভারতবর্ষের সর্বরাজ্য জয় করে পণ্ডিত অধ্যুষিত নবদ্বীপে এলেন বিদ্যার প্রতাপ জাহির করতে। ভয় পেলেন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ। শ্রীগৌরাঙ্গ এই সংবাদ শুনলেন। তিনি ছাত্র বেষ্টিত হয়ে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট, এমন সময় দিগ্বিজয়ী এলেন। বিশ্বম্ভরের নির্দেশমত দিগ্বিজয়ী মুখে মুখে রচনা করলেন গঙ্গাস্তোত্র। অসাধারণ মনীষার অধিকারী শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গাস্তোত্রে অলংকারের দোষ দেখালেন। পরাজিত দিগ্বিজয়ী নিমাইকে ভগবান্‌রূপে স্তব স্তুতি করলেন। কবিরাজ গোস্বামীর কাব্যে নিমাই পরাজিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দুঃখে সমব্যথী হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে নিজের দীনতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বললেন—

দিগ্বিজয়ীর পরাজয়

তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার।
তোমার সমান কবি কোথা নাহি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস॥
দোষগুণ বিচার এই অল্প করি মানি।
কবিত্ব করণে শক্তি তাহা সে বাখানি॥
শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥[২]

১ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ ২ চৈ. চ. আদি ১৬ পরি

ঔদ্ধত্য এবং নম্রতা —অহংকার এবং দুঃখীর প্রতি সমবেদনা—নিমাই-এর চরিত্রের এই দুটি আপাতবিরোধী বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রথম জীবনে প্রকটিত হয়েছিল। প্রথম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ঔদ্ধত্য বা অহংকার পরে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হওয়ায় তিনি প্রকৃতই দীন দরিদ্রের ভগবান হতে পেরেছিলেন।

বৃন্দাবন দাস বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু নরহরি চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে পণ্ডিতের নাম ছিল কেশব কাশ্মিরী।

দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায মধ্যে হয়।
কেশব কাশ্মিরী নাম দিয়ে পরিচয়॥[১]

নরহরি জানিয়েছেন যে কেশব ছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত এবং গোকুল ভট্টের শিষ্য। কেশব ভট্ট কাশ্মিরী ছিলেন অনন্য সাধারণ ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি ব্রহ্মোপনিষৎ, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির টীকা রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কীর্তি শ্রীনিবাসের কৌস্তুভটীকার প্রভা উপটীকা এবং নিম্বার্কের বেদান্ত পারিজাত। এতবড় একজন পণ্ডিতের পরাভব কাহিনীর মুরারি, কবিকর্ণপুর জয়ানন্দ ও লোচনের গ্রন্থে অনুল্লেখ এবং বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাসের কাব্যে পণ্ডিতের নামের অনুল্লেখ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এই ঘটনাকে কিম্বদন্তীমূলক বলে মনে করেছেন। ডঃ সুশীল দে মনে করেন যে, বিশ্বম্ভর ও কেশব কাশ্মিরীর সাক্ষাৎকার সম্ভব কিন্তু দিগ্বিজয়ীর পরাভবের বর্ণনায় বাড়াবাড়ি আছে।[২] মনে হয়, ঘটনাটা অসত্য নয়। কৃষ্ণদাস বা বৃন্দাবনের কাব্যে পরাভূত দিগ্বজয়ীর নাম অনুল্লেখের কারণ এই হতে পারে যে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের দুর্গতির কাহিনী শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্যের প্রকাশক হিসাবে বর্ণনা করলেও পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করে তাঁর অসম্মান করতে চান নি। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং যাঁকে পরাজিত করেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, সেই অসামান্য প্রতিভাবান পণ্ডিতের নাম উল্লেখ না করে সমীচীন কাজই করেছেন। মুরারি ও কবি কর্ণপূরের অনুল্লেখ উক্ত কারণেই হতে পারে। ঘটনায় অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু অসত্যতা প্রমাণের কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

---

১ ভ. র. ১২।১২৫৪

২ "The meeting with Chaitanya, as a fact, is not unlikely, but the account has been grotesquely exgagerated.'—The Vaisnava faith and movement—p. 73, f. n.

সপ্তম অধ্যায়

নদীয়া লীলা : গার্হস্থ্য জীবন ও রূপান্তর

এইভাবে পরম গৌরবে ও আনন্দে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে করতে বিশ্বম্ভর পূর্ববঙ্গ গমনের ইচ্ছা করলেন। বৃন্দাবন গৌরচন্দ্রের পূর্ববঙ্গ গমনের কোন উদ্দেশ্যের উল্লেখ করেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান্॥
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী। — পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ
কতদিন প্রবাস করিব মাতা আমি॥
লক্ষ্মী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌর সুন্দর।
মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর॥
তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া॥[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে বিশ্বম্ভরের বঙ্গদেশ গমন উক্ত অঞ্চলে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাহা যায় তাহা লওয়ায় নাম সংকীর্তন॥[২]

কিন্তু গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে হরিনাম প্রচার শ্রীগৌরাঙ্গ করেছিলেন, এরকম ধারণা তাঁর জীবন কাহিনী থেকে প্রতীত হয় না। তিনি সজ্ঞানে কখনও নাম প্রচারে বহির্গত হয়েছিলেন বলেও বোধ হয় না। কবিরাজ গোস্বামীর মতে পূর্ববঙ্গ থেকে এসে গৌরচন্দ্র দিগ্বিজয়ীর দর্প চূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু মুরারি, জয়ানন্দ ও লোচনের মতে গৌরচন্দ্র পূর্ববঙ্গ গিয়েছিলেন ধন উপার্জনের উদ্দেশ্যে।

ততো গৃহাশ্রমে স্থিত্বা ধনার্থং প্রযযৌ দিশি।
পূর্বস্যাং সজ্জনৈঃ সার্ধং দেশান্ কুর্বন্ সুনির্মলম্॥[৩]

---

১ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ   ২ চৈ চ আদি ১৬ পরি   ৩ মু. ক.—২।১১।৫

—তারপর গৃহাশ্রমে অবস্থান করে ধন অর্জনের নিমিত্ত সজ্জনগণের সঙ্গে দেশসমূহকে নির্মল করতঃ পূর্বদিকে গমন করেছিলেন।

জয়ানন্দের বক্তব্য :

হাসিয়া গৌরাঙ্গ সভারে কহিলা।
লক্ষ্মী-বিভা করি আমি সংসারে পড়িলা॥
ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব রমণী দাস দাসী।
রক্ষণ পোষণ করি উহা ভালবাসি॥
অর্থ উপার্জন বিনে সংসার না চলে।
বঙ্গদেশে জাই আমি অর্থের ছলে॥
অর্থ বিনা সংসার কভু নাঞি চলে।
অর্থবিত্তা অর্থরূপ সর্বলোক বলে।[১]

পূর্ববঙ্গ গমনের উদ্দেশ্য

লোচন যদিও বলেছেন যে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গৌরচন্দ্র পূর্ববঙ্গ গমন করেছিলেন, তথাপি তিনি মাকে বললেন যে ধন উপার্জনের জন্যই পূর্ববঙ্গে যাচ্ছেন—"মায়েরে কহিল যাব ধন উপার্জনে।"[২] শচীমাতাও বললেন—

ধন উপার্জনে পরদেশ যাবে তুমি।
তোমারে না দেখিয়া হেথা মরি যাব আমি॥[৩]

শুধু তাই নয়, বিশ্বম্ভর পণ্ডিত যখন ফিরে এলেন পূর্ববঙ্গ থেকে তখনও তাঁর সঙ্গে উপার্জিত ধন সম্পদ ছিল।

ঘরেতে আইলা প্রভু নানা ধন লঞা।
মাতৃস্থানে দিল ধন হরষিত হঞা॥[৪]

এই সময়ে পূর্ববঙ্গে হরিনাম প্রচার গৌরচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বৃন্দাবন যদিও গৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ গমনের কারণ সম্পর্কে কিছু বলেন নি, তথাপি তাঁর বিবরণে ধন উপার্জনের ইঙ্গিত আছে। পূর্ববঙ্গ থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার পেয়েছিলেন।

তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি।
যার যত শক্তি সবে ধন দিলা আনি॥

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—৪৯।১২ ২ চৈ. ম. আদিখণ্ড ৩ লোচনের চৈ. ম আদিখণ্ড
৪ লোচনের চৈ. ম. আদিখণ্ড

সুবর্ণ রজত জল-পাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যার যত ছিল ঘরে।
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥[১]

কবিরাজ গোস্বামী এক কথাতেই সেরেছেন—ঘরেতে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন জন।[২] জয়ানন্দের কাব্যে জগন্নাথ মিশ্রকে খুবই ধনী বলে প্রতীতি জন্মে। জয়ানন্দের মতে জগন্নাথের ধনসম্পদ দাসদাসী প্রচুর ছিল।

লেখিতে না পারি দাসদাসী যত
মিশ্রের মন্দিরে খাটে।[৩]

তবে এ বিবরণ কবি-কল্পনা বলেই মনে হয়। জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর পক্ষে এত বিত্তবান্ হওয়া কি প্রকারে সম্ভব? বরঞ্চ বৃন্দাবন দাস জগন্নাথের দারিদ্র্যের কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের পরে জগন্নাথ যখন নিমাই-এর বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করে দিলেন, তখন শচীর আগ্রহাতিশয্য দেখে জগন্নাথ বলেছিলেন—

সাক্ষাতেই এই কেন না দেখত আমাত
পড়িয়াও আমার কেন ঘরে নাহি ভাত॥[৪]

শিশু নিমাইকে দেখে জগন্নাথ শচী দরিদ্র হলেও আনন্দ সাগরে ভাসতেন—

দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত।[৫]

জগন্নাথের লোকান্তরের পরে একদিন মায়ের উপরে ক্রুদ্ধ নিমাই ঘরের জিনিষপত্র ভেঙ্গে ফেললেন। তখন শচী বলছেন পুত্রকে—

ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার।
অপচয় তোমার সে কি দায় আমার॥
পড়িবারে তুমি বুল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাই কালি কি খাইবা॥[৬]

---

১ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ ২ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি ৩ চৈ. ম. নদীয়া—৩।১৭
৪ ঐ ৬ অঃ ৫ ঐ ৪অঃ ৬ চৈ. ভা. আদি ৭ অঃ

এতএব দরিদ্র জগন্নাথ-শচীর সন্তান নিমাই যদি যৌবনারম্ভেই স্বেচ্ছায় বিয়ে করে সংসারে স্বাচ্ছল্য আনার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ববঙ্গে গিয়ে থাকেন, তবে তাতে অসম্ভাব্যতাও নেই, বিস্ময়েরও কিছু নেই। বৃন্দাবন দাসের মতে পূর্ববঙ্গ গিয়ে বিশ্বম্ভর বহু ছাত্র শিষ্য নিয়ে অধ্যাপনা করতে লাগলেন; এই অঞ্চলে নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। পূর্ববঙ্গবাসীরা গৌরচন্দ্রকে বলে—

মূর্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥

* * *

বিদ্যাদান

এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যাদান কর কিছু আমা সবাকারে॥
উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুন দ্বিজমণি॥[১]

সুতরাং নিমাই পণ্ডিতের বহুতর ছাত্রশিষ্য হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। বৃন্দাবন বলেছেন—

বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ঠাঞি॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥[২]

এইখানে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে সংসার বিরক্ত তপন মিশ্রের। তপন মিশ্রকে শ্রীগৌরাঙ্গ বারাণসী যেতে নির্দেশ দিলেন। পরে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তপন মিশ্রের মিলন হয়েছিল। তপন মিশ্র বিশ্বম্ভরের কাছে পথের সন্ধান চাইলেন। গৌরচন্দ্র তপন মিশ্রকে বললেন—

তপন মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥[৩]

১ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ

গৌরাঙ্গদেব তপন মিশ্রকে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ইত্যাদি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মহামন্ত্র জপ করতে বললেন, তারপর বললেন : বারাণসীতে তপন মিশ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে।

প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী ॥
তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য সাধন ॥[১]

বৃন্দাবন-প্রদত্ত বিবরণই কবিরাজ গোস্বামী সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।[২] দুই চরিতকারের বক্তব্যানুসারে তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্যের প্রথম শিষ্য।[৩] এই বিবরণ যথার্থ হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে শ্রীচৈতন্যের প্রথম যৌবনেই প্রথম বিবাহের পরেই ধর্মভাব স্ফুরিত হয়েছিল এবং তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের ও বৃন্দাবন গমনের পরিকল্পনা সন্ন্যাস গ্রহণের সাত আট বৎসর পূর্বেই করে রেখেছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনের পূর্বাপর ঘটনা থেকে এ ঘটনার কোন সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। বৃন্দাবনের পূর্ববর্তী বিবরণ ও এই বিবরণের মধ্যে অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। বিদ্যার্জন সমাপন করে নিমাই যখন অধ্যাপনা শুরু করলেন, তখন তাঁর সহপাঠি মুকুন্দ বলছেন—

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা ॥
এমত সুবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেক ইহার সঙ্গ না ছাড়িয়ে তবে ॥[৪]

মুকুন্দ বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ, কিন্তু কৃষ্ণভক্তির অভাব দেখে ক্ষুব্ধ। গঙ্গাতীরে বসে যখন বিশ্বম্ভর ছাত্রদের কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন, তখনও এতবড় প্রতিভাবান্ তরুণের কৃষ্ণভক্তিহীনতায় বৈষ্ণবগণ আক্ষেপ করতেন—

কেহ বলে হেন রূপ হেন বুদ্ধি যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার ॥[৫]

পণ্ডিতরা যদিও নিমাইএর ফাঁকি জিজ্ঞাসায় ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন, তথাপি তাঁরা বলতেন—

---

১ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ ২ চৈ. চ. আদি ১৬ পরি

৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১৯৮

৪ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ ৫ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ

মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই॥[১]

সকলেরই আকাঙ্ক্ষা নিমাইএর কৃষ্ণে রতি হোক্—

অন্যোন্যে সবেই সাধেন সবা প্রতি।
সবে বোল ইহান হউক কৃষ্ণে রতি॥
দণ্ডবত হই সবে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব ভাগবত মেলি আশীর্বাদ করে॥
হেন কর কৃষ্ণ জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হয় ছাড়ি অন্য মন॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণে দেহ আমা সবাকারে॥[২]

তাঁরা সকলে নিমাইকে কৃষ্ণভজনা করতে পরামর্শ দিলেন।

কেহ বলে হের দেখ নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি লাভ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত।
পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥[৩]

গৌরচন্দ্র এই কৃষ্ণভক্তদের উপহাস করে বলেন—

কতদিন পড়াইয়া মোর চিত্তে আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল বৈষ্ণবের কাছে॥[৪]

এহেন বিদ্যাগর্বিত ভক্তিহীন ব্যক্তি বিবাহ করে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করতে গিয়েই কৃষ্ণভক্ত হয়ে কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দিলেন ও কাশীতে তপন মিশ্রের সঙ্গে সাত আট বৎসর পরের সাক্ষাৎকারের আভাস দিলেন এমন ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। গৌরচন্দ্র হয়ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভক্ত তপন মিশ্রকে কাশীতে বাস করতে পরামর্শ দিয়ে থাকতে পারেন, কিম্বা কাশীতে কোন ধর্মপ্রাণ সাধু সন্ন্যাসীর কাছে যেতে উপদেশ দিতে পারেন।

নিমাইএর পূর্ববঙ্গ গমনের আর একটি হেতু কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের চৈতন্যোদয়াবলীতে কথিত হয়েছে যে, জগন্নাথ মিশ্র

১ চৈ. ভা আদি ১০ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ ৩ চৈ, ভা আদি ১০ অঃ
৪ ঐ

পিতামাতার অসন্তোষজনিত পাপে অষ্টকন্যার মৃত্যু আশংকা করে বিশ্বরূপের জন্মের পর শ্রীহট্টে শচী সহ পিতৃমাতৃসন্দর্শনে যান এবং কায়মনোবাক্যে পত্নীসহ পিতা উপেন্দ্র মিশ্র ও মাতা শোভাদেবীর সেবা করতে থাকেন। এই সময়ে নিমাই শচীগর্ভে আবির্ভূত হলে শোভা দেবী স্বপ্নে শচীগর্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে জগন্নাথ ও শচীকে নবদ্বীপে পাঠালেন। যাত্রাকালে শোভাদেবী শচীকে বলেছিলেন, তোমার গর্ভ থেকে যে পুত্রসন্তান জন্মাবে তাকে আমি দেখবো, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। শচী সম্মত হয়েছিলেন। লক্ষ্মী-পরিণয়ের পর শচীর আদেশে গৌরচন্দ্র শ্রীহট্টে গমন করেছিলেন—"বঙ্গদেশে সমায়াতো মাতুরাজ্ঞাং বিধায় সঃ।"[১]

এই কাহিনী কতটা বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। তবে চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্যে স্বেচ্ছায় পিতৃভূমি শ্রীহট্টদর্শন মানসে গৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ গমনের উল্লেখ আছে—

দেখিবাও পিতৃভূমি জাগএ অন্তর।
অবশ্য দেখিব গিয়া শ্রীহট্টনগর ॥[২]

শচী মা এখানে নিজে উদ্যোগী হয়ে পুত্রকে পাঠান নি, বরং জঙ্গল-নদীনালা-সমাকীর্ণ পূর্ববঙ্গ গমনে প্রথমে বাধাই দিয়েছিলেন। গৌরচন্দ্র মায়ের অনুমতি আদায় করলেন এবং তিন চার জন ছাত্র নিয়ে পিতৃভূমি দর্শনে চললেন।

তিন চারিজন লইব পড়ুয়াত সঙ্গে।
নানা শাস্ত্র বিচারে সে করিবেন রঙ্গে ॥[৩]

পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করে শ্রীগৌরাঙ্গ শেষে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীহট্টে—

স্থানে স্থানে রহে গৌর ক্রমে ক্রমে চলে।
নদ-নদী পার হৈল নিজ বাহুবলে ॥
ক্রমে সে চলিয়া পায়ে শ্রীহট্টনগরে।
জিজ্ঞাসি রহয়ে গিয়া নিজ বন্ধু ঘরে ॥[৪]

এখানে গৌর ভাগবত ব্যাখ্যা করে সকল বৈদান্তিক মৈমাংসিক তার্কিকদের

---

১ চৈতন্যোদয়াবলী—৪।১৩ ২ গৌ. বি.—পৃঃ ২৮ ৩ গৌ. বি.—পৃঃ ৯৯
৪ ঐ —পৃঃ ৯৯

অভিভূত করেছিলেন এবং একমাস অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করবেন শুনে শ্রীহট্টবাসীরা প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছিল।

এত শুনি সর্বলোক উল্লাস অন্তরে।
বাস পরিচ্ছদ ধন জাএ আনিবারে॥

*　　*　　*

রাজযোগ্য বস্ত্র পরিচ্ছদ বহুমূল্য।
নানাবিধ রত্ন ধন প্রভুবর তুল্য॥[১]

এই দুটি বিবরণ পড়ে গৌরচন্দ্রের শ্রীহট্টগমনের ঘটনা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, "দেশের ভূসম্পত্তি যাহা ছিল, তাহার শেষ ব্যবস্থা করিতেই তিনি বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন।[২] যদিও এরকম সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবু এ নিছক অনুমানমাত্র। আর একজনের মতে "পৈত্রিক বাসস্থান সন্দর্শনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।[৩] বঙ্গদেশে বিশ্বম্ভর যে শিষ্যবর্গ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার উল্লেখ বৃন্দাবনের কাব্যেও পাই—

তবে প্রভু কত আপ্তশিষ্যবর্গ লৈয়া।
চলিলেন বঙ্গদেশ হরষিত হৈয়া॥[৪]

বৃন্দাবন বলেছেন যে পূর্ববঙ্গে দলে দলে মানুষ বিশ্বম্ভরের ছাত্রত্ব স্বীকার করে ধন্য হয়েছিল। তারা বলে—

অর্থবৃত্তি লই সর্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে॥
হেন নিধি অনায়াসে আপন ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা সবার গোচরে॥
মূর্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥[৫]

পূর্ববঙ্গবাসীরা বলেছিল, তোমার টিপ্পনী আমরা পড়ি, এখন তোমাকে

---

১ গৌ. বি.—পৃঃ ১০২　　২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড পৃঃ ১৪

৩ বঙ্গদর্শন—৫ম বর্ষ, নবম সংখ্যা ১২৮৩, শ্রীকৃষ্ণদাস রচিত চৈতন্য প্রবন্ধ

৪ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ　　৫ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ

গুরুরূপে পেয়ে আমরা ধন্য। বৃন্দাবন বলেন, সহস্র সহস্র শিষ্য বিশ্বম্ভরের কাছে পাঠ নিতে এসেছিল।

শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি পণ্ডিতস্থানে পড়িবাঙ গিয়া ॥[১]

গৌরাঙ্গদেব পূর্ববঙ্গে কতদিন ছিলেন তা বলা কঠিন। চূড়ামণি দাস জানিয়েছেন যে তিনি শ্রীহট্টে একমাস ছিলেন। বৃন্দাবনের রচনায় পাই, তিনি দুইমাস পূর্ববঙ্গে বিদ্যমান করেছিলেন—"দুই মাসে সবেই হইল বিদ্যাবান"।[২] মুরারির বিবরণে তিনি কয়েকমাস পূর্ববঙ্গে অবস্থান করে বিদ্যাদান করেছিলেন—

দয়ালুরনয়ৎ স্বামী মাসান্ কতিপয়ান্ বিভুঃ।
পাঠয়ন্ ব্রাহ্মণান্ সর্বান্ বিদ্যারসকুতূহলী ॥[৩]

মুরারির বিবরণ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিলাসে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিবরণটি উদ্ধৃত করছি :-

নবদ্বীপ হৈতে প্রভু আসি বঙ্গদেশে।
পদ্মার তীরেতে রহে মনের হরিষে ॥

* * *

কিছুদিন থাকি প্রভু ভাবিলা মনেতে।
যাইতে হইল মোর শ্রীহট্ট দেশেতে ॥
পিতৃজন্মস্থান পিতামহেরে দেখিয়া।
পদ্মার তীরেতে ঝাট আসিব চলিয়া ॥
এতচিন্তি মহাপ্রভু শ্রীহট্টে চলিলা।
পদ্মাতীরে ফরিদপুরে উপস্থিত হৈলা ॥
তথা হৈতে বিক্রমপুরের নূরপুরে গমন।
সুবর্ণগ্রামেতে পরে দিলা দরশন ॥
তাহা হৈতে আইলা দেশ এগার সিন্দুর।
ব্রহ্মপুত্র তীরে পুর অতি মনোহর ॥

---

১ চৈ. ভা আদি ১২ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ ৩ মু. ক.—১।১১।১৬

সে দেশে বেতাল গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ হয়।
কৃপা করি সে স্থানে আইলা দয়াময় ॥
তাহার নিকটে আছে ভিটাদিয়া গ্রাম।
নানা দেশে সুপ্রসিদ্ধ কুলীনের স্থান ॥
সেইস্থানে আছেন লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ী।
পরম বৈষ্ণব সর্বগুণে সর্বোপরি ॥
তাঁর ঘরে কৈলা প্রভু ভিক্ষা নির্বাহণে।
দুই চারি দিবস রহে তাঁর ভক্তিগুণে।[1]

প্রেমবিলাসের মতে পিতামহ পিতামহীকে দর্শন করে তিনি পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে বিদ্যা বিতরণ করেছিলেন—

পিতামহী পিতামহে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
কৃপা করিয়া পদ্মাবতী তীরে চলি যায় ॥
তথা থাকি প্রভু করে বিদ্যার বিলাস ॥[2]

এই বিবরণের খাঁটিত্বে সন্দেহ জাগে। প্রেমবিলাস লিখিত হয়েছে ১৫২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে—মহাপ্রভুর তিরোধানের ৬৭ বৎসর পরে। সুতরাং অন্য প্রমাণাভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গের বিভিন্নস্থান ভ্রমণের খুঁটিনাটি বর্ণনায় সংশয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া নিত্যানন্দ দাস বলেছেন ভিটাদিয়া গ্রামের পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর গৃহে বিশ্বম্ভর ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কোন বৈষ্ণবের ঘরে চার দিন অবস্থান হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু গৃহস্থ গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ সন্ন্যাসীর রীতি। শ্রীগৌরাঙ্গ তখন সত্যোবিবাহিত। সন্ন্যাসীর আচরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য শ্রীহট্ট গিয়ে ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি কয়েকমাস পূর্ববঙ্গে কাটিয়ে ধন অর্জন করে গৃহে ফিরেছিলেন। পূর্ববঙ্গে গিয়ে তিনি কিভাবে ধন অর্জন করেন তা কোন চরিতকারই বলেন নি। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে (অবশ্যই এক বৎসরের কম সময়) দুই মাস বা তদপেক্ষা কিছু বেশীকাল বিদ্যাদান করে তিনি কতখানি সফলতা লাভ করেছিলেন, কিভাবে ধন অর্জন করেছিলেন, তা তর্কের বিষয়। শ্রীহট্টে তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল

---

১ প্রে বি ২৪ বি ২ প্র বি ২৪ বি

কিনা তাও জানা যায় না। সে সময়েও যদি বিশ্বম্ভরের পিতামহ-পিতামহী জীবিত থাকেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার তাঁর ছিল না। সেকালে, এমনকি, প্রাগাধুনিক কালেও ধনী জমিদার ব্যক্তিরা প্রতিভাবান্ পণ্ডিতদের পোষণ করতেন। নিমাইপণ্ডিতের মত খ্যাতনামা তরুণ অধ্যাপক নানাস্থানে ভ্রমণ কালে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তির কাছ থেকে মূল্যবান দ্রব্যাদি উপহাররূপে পেয়েছিলেন—এমত ঘটনা সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে না।

এই সময়ে নবদ্বীপে শচীদেবীর গৃহে একটি বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে গেল,—একদিন নিদ্রিত অবস্থায় সর্পদংশনে গৌরাঙ্গপ্রিয়া লক্ষ্মী মারা গেলেন—"এবং স্থিতা গৃহে কালে দৈবাদাগত্য কুণ্ডলী অদশৎ পাদমূলে…।"[১]

কবিকর্ণপূর লিখেছেন,—

লক্ষ্মীর মৃত্যু

দৈবাদথ মন্দিরমধ্যমাগত
শ্চক্ষুঃশ্রবাঃ ক্রূরতরঃ সুপামরঃ।
বধ্বাঃ পদং শারদপদ্ম সৌরভং
ভেজে কঠোরৈর্দশনৈঃ কঠোরধীঃ॥[২]

—অনন্তর দৈবক্রমে গৃহমধ্যে আগত নিষ্ঠুর পামর কঠোর প্রকৃতির সর্প বধূ (লক্ষ্মী)র শারদ পদ্মের মত পদে কঠোর দন্তের দ্বারা দংশন করলো।

লোচন যদিও বলেছেন যে গৌরাঙ্গের বিরহই সর্পের আকারে দংশন করেছিল, তথাপি তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন—দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরণে।[৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও লোচনের মতই বলেছেন—

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥[৪]

জয়ানন্দ কিন্তু স্পষ্টভাবেই লিখেছেন যে নিশাকালে নিদ্রিত অবস্থায় লক্ষ্মীকে সাপে কামড়েছিল।

আর একদিনে লক্ষ্মী পালঙ্ক উপরে।
শচী সঙ্গে নিদ্রা-লক্ষ্মী বিলাস মন্দিরে॥
রাত্রি অবশেষে কাল সর্পরূপ ধরি।
দংশিল দক্ষিণ পদ কনিষ্ঠ অঙ্গুলি॥[৫]

---

১ বৃ. ক.—১।১১।২১ ২ চৈ. চ. মহাকাব্য—৩।১০১ ৩ চৈ. ম. আদিখণ্ড
৪ চৈ. চ. আদি ১৬ পরি ৫ চৈ. ম. নদীয়া—৫৮।১-২

বৃন্দাবন দাস এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র লক্ষ্মীর মৃত্যুর কারণটিকে অস্পষ্ট রেখে বলেছেন যে পতিবিরহেই লক্ষ্মী দেহত্যাগ করেছিলেন। যাই হোক, গৌরচন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুসংবাদ শুনলেন। এই দুঃসংবাদ শ্রবণে নিমাইএর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন চরিতকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবন লিখেছেন--

পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা প্রভু হেট মাথা করি॥
প্রিয়ার বিরহদুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্ণী হই রহিলেন সর্ববেদসার॥[১]

বৃন্দাবন স্বল্প কয়েকটি কথায় নিমাই-এর পত্নী-বিয়োগ জনিত তীব্র বেদনা প্রকাশ করেছেন। প্রিয়তমা বিযোগ দুঃখের গভীরতা মুরারিও ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন—

ইতি নিশম্য বচো মধুসূদনঃ সমবদৎ করুণার্দ্রদৃশাম্বিকাম্।
আত্মগোপনবরৈর্বচনৈস্তদ্ গোপয়ন্ হি সকলং জগদীশঃ[২]

—এই (লক্ষ্মীর মৃত্যু) শুনে মধুসূদন (গৌরাঙ্গ) করুণায় আর্দ্রদৃষ্টিতে জননীকে নিজ মনোভাব গোপন করে আত্মদুঃখ গোপনসূচক বাক্যের দ্বারা জননীকে বললেন।

গহন গভীর প্রভু কিছু নাহি ভাষে।
ক্ষণেক রহিয়া কহে এ বাগ্ বিলাসে॥[৩]

লোচন দাস বললেন—

এ বোল শুনিঞা প্রভু বিরস অন্তর।
ছল ছল করে আঁখি করুণায় জল॥[৪]

এই কটি বিবরণ থেকে শ্রীগৌরাঙ্গের শোকের গভীরতা এবং তীব্রতা সহজেই অনুমেয়। তবে তিনি মাতৃভক্ত সন্তান, মায়ের গভীর শোকের কথা স্মরণ করেই আত্মশোক গোপন করে মাকে সান্ত্বনা দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। জয়ানন্দ ও কবি কর্ণপুর অবশ্য উল্টট সংবাদ দিয়েছেন। কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে

১ চৈ ভা আদি ১২ অঃ ২ মু. ক.—১।১।১৩ ৩ গৌ. বি —পৃঃ ১০৪
৪ চৈ ম. আদিখণ্ড

গৃহপ্রত্যাগত নিমাই লক্ষ্মী-বিয়োগ শুনে হাসতে হাসতে মাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়েছেন, আর জয়ানন্দের কাব্যে তিনি প্রেমানন্দে নৃত্য করেছেন।

লক্ষ্মীর বিয়োগ কথা লোকমুখে শুনি।
প্রেমানন্দে কীর্তনে নাচে দ্বিজমণি ॥[১]

এই উদ্ভট বিবরণ যে গৌরচন্দ্রের অতিমানবিকতা প্রতিপাদনের প্রয়াস তাতে সন্দেহ নেই। স্বনির্বাচিতা প্রিয়তমা পত্নীর আকস্মিক বিয়োগ-বেদনাকে বক্ষে লালন করেই বিশ্বম্ভরকে অন্ততঃ মায়ের প্রীতির নিমিত্তও স্বাভাবিক জীবন নির্বাহ করতে হয়েছিল। এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন পূর্ববৎ যথানিয়মে চলতে থাকে। প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনা সেরে তিনি জননীকে প্রণাম করে মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনা করেন, ছাত্রদের সঙ্গে-কৌতুক পরিহাসও করতে থাকেন; বিশেষতঃ শ্রীহট্টিয়াদের তদ্দেশীয় ভাষা বলে রঙ্গরস করতে থাকেন, মাথায় বিষ্ণু তেল দেন, গঙ্গা স্নান করেন, পুনরায় সন্ধ্যাকালে অধ্যাপনা করেন। এই ভাবেই চলে দিন। হয়ত বা লক্ষ্মীর শোক চাপা দিতেই তিনি জীবনযাত্রায় বাহ্যতঃ স্বাভাবিকতা রক্ষা করে চলতেন। শচী দেবী হয়ত পুত্রের মনের ব্যথা বুঝেছিলেন। তাই তিনি পুত্রের পুনর্বিবাহের জন্য উদ্যোগী হলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া পরিণয় — বধূশূন্য গৃহ দেখি পায়ে বড় চিন্তা।
বিশ্বম্ভরে বিভা দিব করে মনঃ কথা ॥[২]

গঙ্গাস্নানকালে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে শচী দেবী তাঁকে পুত্রবধূরূপে মনোনীত করলেন—

শচী দেবী তানে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
এই কন্যা পুত্রযোগ্য বুঝিলেন মনে ॥[৩]

বিষ্ণুপ্রিয়াও শচীকে চিনলেন। তিনি গঙ্গাস্নানান্তে শচীকে প্রণাম করতেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে নির্বাচিত করে কাশীনাথ মিশ্রকে ঘটকালিতে নিযুক্ত করলেন—

ততঃ শচী চিন্তয়িত্বা বিবাহার্থং সুতস্য সা।
কাশীনাথং দ্বিজশ্রেষ্ঠং প্রাহ গচ্ছস্ব সাম্প্রতম্ ॥

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—৮২।১ ২ লোচন—চৈ. ম. আদিখণ্ড ৩ চৈ. ভা. আদি ১৩ অঃ

শ্রীমৎসনাতনং বিপ্রং পণ্ডিতং ধর্মিণাং বরম্।
বদস্ব মম পুত্রায় সুতাং দাতুং যথা বিধি ॥[১]

—তারপর শচী পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত চিন্তা করে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাশীনাথকে বললেন, এখন ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সনাতন পণ্ডিতের কাছে যাও, আমার পুত্রকে যথাবিধি কন্যা দান করতে বল।

দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে বাপ শুন এক বাণী ॥
রাজ পণ্ডিতেরে কহ ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে করুন কন্যাদান ॥[২]

সুতরাং সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিশ্বম্ভর মিশ্রের বিবাহ হয়ে গেল জাঁকজমক সহকারে। বুদ্ধিমন্তখান বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন।

বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব ভাই।
বামনিঞা সজ্জ এ বিবাহে কিছু নাঞি ॥
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন ॥[৩]

নিমাই-এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল স্বনির্বাচিত কন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর (আঃ ১৫০৭ খ্রীঃ) জননী নিজেরই আগ্রহাতিশয্যে। দ্বিতীয় বিবাহ হয় প্রায় বৎসরাধিককাল পরে শচীদেবীর নির্বাচিত কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। মায়ের দিকে চেয়ে এ বিবাহকে বিশ্বম্ভর মেনে নিলেন। দ্বিতীয় বিবাহে বিশ্বম্ভরের আগ্রহ কতটা ছিল জীবনীকাররা বলেন নি। মুরারি গুপ্তের রচনা থেকে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে মাত্র। মুরারির কড়চায় বিবাহের দিন এক গণক এসে সনাতনকে জানালেন—

ময়া অভ্যেত্য পথি মুদা শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরঃ প্রভুঃ ॥
দৃষ্টঃ পৃষ্টশ্চ ভগবন্নধিবাসস্তবানঘ।
বিবাহস্তাদ্য কিং তত্র বিলম্বস্তাত দৃশ্যতে ॥
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ মাং দেবো রাজৎশ্বেরমুখাম্বুজঃ।
কৃতঃ কস্য বিবাহস্তে বিদিতস্তবদদ্য মে ॥[৪]

---

১ মু. ক.—১।১৩।২-৩ ২ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ১০ অঃ
৪ মু. ক—১।১৩।১৮-২০

—আমি পথে যেতে যেতে সানন্দে বিশ্বম্ভর প্রভুকে দেখলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, হে ভগবন্, মহাভাগ, আজ তোমার বিবাহের অধিবাস, সে বিষয়ে বিলম্ব দেখছি কেন? এই কথা শুনে হাস্যোৎফুল্ল মুখপদ্মবিশিষ্ট দেব বললেন, কোথায় কার বিবাহ, তুমি শুনেছ আমাকে তা বল।

গণকের কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়ে পড়লেন কন্যার পিতা সনাতন মিশ্র। তাঁর মনে উদ্বেগ দেখা দিল। মুরারি লিখেছেন,—

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য গণকস্য দুঃখিতঃ।
শ্রীমৎসনাতনো ধৈর্য্যমবলম্ব্যাব্রবীদ্বচঃ ॥
কৃতং ময়ৈতৎ সকলং দ্রব্যালংকারাণি-চ।
তথাপি তস্য ন তত্রাদরোভূদ্দৈবদোষতঃ ॥[১]

—গণকের এই বাক্য শুনে সনাতন সুদুঃখিত হয়েও ধৈর্য অবলম্বন করে বললেন, আমি সকল দ্রব্য ও অলংকার সংগ্রহ করেছি, তবুও দুর্ভাগ্যবশে তাঁর এ বিষয়ে সমাদর হোল না!

মুরারি লিখিত এই বিবরণ পড়ে মনে হয় না যে বিশ্বম্ভর দ্বিতীয় বিবাহে বেশী আগ্রহী ছিলেন। মনে হতে পারে যে বিশ্বম্ভর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক করেছিলেন গণকের সঙ্গে। কিন্তু বিবাহপূর্ব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অধিবাস, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে বিলম্ব বা অনুৎসাহের কারণ কি? গণক কি এতই নির্বোধ ছিলেন যে বিশ্বম্ভরের রসিকতা বুঝতে পারলেন না, উদ্বিগ্ন হয়ে খবর দিলেন সনাতনকে? আর সনাতনই বা এত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন কেন?

তারপরে অবশ্য বিশ্বম্ভর করুণা পরবশ সনাতনের দুঃখের কথা ভেবে বিবাহে মনঃস্থির করলেন।

ততশ্চ ভগবান কৃষ্ণঃ করুণাপরমানসঃ।
তয়োর্দুঃখমনুস্মৃত্য প্রাপয্য নিজ ব্রাহ্মণান্ ॥
বাণ্যা মধুরয়া বিপ্রমুখেন প্রাকৃতো যথা।
অনুনীয় তয়োঃ কন্যামুদ্বাহার্থং মনো দধে ॥[২]

—তারপর ভগবান্ কৃষ্ণ (বিশ্বম্ভর) তাঁদের (সনাতন ও তৎপত্নীর) দুঃখ

---

১ মু. ক.—১।১৩।২২-২৩ ২ মু. ক.—১।১৪।২

অনুভব করে নিজ ব্রাহ্মণদের প্রেরণ করে বিপ্রমুখে প্রাকৃত ভাষার মত মধু ভাষায় অনুনয় করে তাঁদের কন্যাকে বিবাহ করতে মনঃস্থির করলেন।

স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে, বিবাহের দিন ও বিশ্বম্ভর মনঃস্থির করতে পারেন নি পরে সনাতন দম্পতির কষ্টের কথা ভেবেই তিনি রাজি হলেন বিয়ে করতে

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার পর বেশী দিন আর শ্রীগৌরাঙ্গ গার্হস্থ্য জীব যাপন করেন নি। লক্ষ্মীদেবীর প্রতি তাঁর যে সানুরাগ প্রণয়পূর্ণ ব্যবহারে উল্লেখ জীবনীকারগণ করেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর আচরণের অনুরূপ কো বিবরণ দেন নি। বৃন্দাবন বলেছেন যে, বিবাহের পর গৌরচন্দ্র অধ্যয় অধ্যাপনাতেই নিবিষ্ট ছিলেন—

প্রভু যে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে।[১]

মুরারি ও গৌরচন্দ্রের অভিনিবিষ্ট অধ্যাপনার উল্লেখ করেছেন—

অধ্যাপনা বিদ্যাবিলাসেন বিলোল বাহুগর্জ্জন্ পথি শিষ্যসমাকুলো হরিঃ।
আগত্য গেহে নিজমাতুরস্তিকে তস্যাঃ সুখং নিত্যমধাৎ প্রিয়াসমম্॥[২]

—লম্বিতবাহু হরি (গৌরাঙ্গদেব) পথে শিষ্যসমাবৃত হয়ে বিদ্যাবিলাসহেতু গমনের পরে গৃহে এসে প্রিয়ার মত মায়েরও নিত্য আনন্দ বর্ধন করতেন।

দ্বিতীয় বিবাহের কিছুকাল পরেই বিশ্বম্ভর গয়াযাত্রা করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহের কতকাল পরে তিনি গয়া যাত্রা করেছিলেন তা বলা সম্ভব নয়, তবে দ্বিতীয় বিবাহ ও গয়াযাত্রার মধ্যে ব্যবধান এক বৎসরের অধিক বোধ হয় না। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরের বিবাহ হয় ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং গয়া গমন ঘটে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে।[৩] গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীর মতে "১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে প্রভু গয়া গিয়াছিলেন ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারীতে নবদ্বীপ ফিরিলেন।"[৪]

জীবনীকাররা জানিয়েছেন যে বিশ্বম্ভরের গয়া গমনের উদ্দেশ্য ছিল পিতৃপিণ্ডদান—

গয়াযাত্রা ততঃ স লোকাননু শিক্ষয়ন্ মনশ্চকার কর্তুং পিতৃকার্যমচ্যুতঃ।
শ্রাদ্ধং স কৃত্বা বিধিবদ্বিধানবিদ্ গয়াং প্রতস্থে ক্ষিতিদেবতান্বিতঃ॥[৫]

---

১ চৈ. ভা. আদি ২ মু. ক.—১।১৪।৫
৩ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম—পৃঃ ১৮
৪ চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ৯৯ ৫ মু. ক.—১।১৪।৬

—তারপর বিষ্ণু (গৌরাঙ্গ) লোকশিক্ষা দিতে পিতৃকার্য করতে মনস্থ করলেন। শাস্ত্রবিদ্ তিনি যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করে ব্রাহ্মণগণ সহ গয়া প্রস্থান করলেন।

লোচনদাস লিখেছেন—

এই মতে লোকশিক্ষা করে বিশ্বম্ভর।
গয়া করিবারে যাব করিলা অন্তর॥
পিতৃপিণ্ডদান দিব গয়া শিরোপরি।
গয়াধর আদি বিষ্ণুপদে নমস্করি॥
এত বলি শুভযাত্রা করিলা ঠাকুর।
সংহতি চলিলা বিপ্রগণ মহাকুল॥[১]

কিন্তু বৃন্দাবন দাস গয়া গমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। শ্রীচৈতন্যের গয়া গমন সম্পর্কে বৃন্দাবন লিখেছেন,—

ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান।
গয়াভূমি দেখিতে ইচ্ছা হইল তাহান॥
শাস্ত্রবিধিমত শ্রাদ্ধকর্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লঞা॥
জননীর আজ্ঞা লই মহাহর্ষ মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া দরশনে॥[২]

শ্রীগৌরাঙ্গের গয়া গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য পিতৃপিণ্ডদান হলেও অকালে সর্পাঘাতে মৃতা প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীর সদ্‌গতির কথা নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিল। পিতৃবিয়োগের তেরো বৎসর পরে সুন্দরী যুবতী এবং গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করার অল্পকাল পরেই গয়াযাত্রা প্রিয়তমা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে পিণ্ড দানের আকাঙ্ক্ষাজাত বলেই মনে হয়। নচেৎ অধ্যয়ন শেষ করে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের পূর্বে গয়ায় পিতৃপিণ্ডদানের কথাই আগে মনে আসা স্বাভাবিক।

কবিকর্ণপূরের মতে গয়া যাত্রায় বিশ্বম্ভরের সঙ্গী ছিলেন জননী শচীর ভগ্নীপতি আচার্য চন্দ্রশেখর—স জননীভগিনীপতিনা গয়াং স সমুপেতুং।[৩] কিন্তু জয়ানন্দের মতে সঙ্গী ছিলেন জগদানন্দ, গোবিন্দ ও চন্দ্রশেখর আচার্য—

১ চৈ. ম. আদিখণ্ড ২ চৈ. ভা. ১৫ অঃ ৩ মু. ক—১।৪৪।৫

জগদানন্দ গোবিন্দ আচার্যরত্ন সঙ্গে।
গয়াযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ খণ্ডে ॥[১]

পথে সঙ্গীদের সঙ্গে পরিহাস করতে করতে শ্রীগৌরাঙ্গ চলেছেন গয়া—
গচ্ছন্ পথি প্রাকৃত চেষ্টয়া হসন্ নর্মোক্তিভিঃ কৌতুকমাবহন সতাম্।[২]

ধর্মকথা বাক্যে বাক্য পরিহাস রসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতক দিবসে ॥[৩]

মন্দার অতিক্রম করে পথিমধ্যে গৌরচন্দ্র জ্বরে আক্রান্ত হলেন—

এই মত কথো পথ আসিতে আসিতে।
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে ॥[৪]

মনুষ্য শিক্ষামনুদর্শয়ন্ প্রভুজ্বরেণ সম্প্রতন্তুর্বভুব ॥[৫]

কবিকর্ণপুর বলেন যে চীর নামক নদে স্নানতর্পণ ও পূজা করার কালে গৌরাঙ্গদেব জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন—

পথি স চীরনদে প্রভুরাতনোৎ
প্লবন তর্পণ পূজনমুৎসুকঃ।
জ্বরিতমস্ত বপুঃ সম ভূত্ততো
ন চরিতং চরিতং ভবতি প্রভোঃ ॥[৬]

শেষ পর্যন্ত বিপ্র পাদোদক পান করে গৌরচন্দ্র রোগমুক্ত হলেন। মুরারি ও বৃন্দাবনের বিবরণে গৌরচন্দ্র অতঃপর হাজির হলেন পুনঃপুন; তীর্থে ও তৎপরে গয়া। কবিকর্ণপুর বলেন যে জ্বরমুক্তির পর শ্রীগৌরাঙ্গ রাজগিরি গমন করেন ও পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। রাজগৃহ গমন ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের উল্লেখ মুরারিও করেছেন। কিন্তু জয়ানন্দের বিবরণ আরও বিশদ। জয়ানন্দ বলেছেন, গৌরচন্দ্র অনেক সঙ্গীসহ ইন্দ্রাণী নৈহাটি গ্রাম বামে রেখে অজয় পার হয়ে চাকটা খালবনা ডাহিনে রেখে হাজির হলেন তিলপুর গ্রামে। অতঃপর একতালা, গৌড় মাল্লাপাড়া অতিক্রম করে তিনি এলেন কানাঞির নাটশালায়। তারপর দুর্গম অরণ্যসংকুল পথ পরিত্যাগ করে মগধে প্রবেশ করে রাজগীর এলেন। কানাঞির নাটশালা, কালগ্রাম বারাড়ী, বাঘলপুর, মুগেরের গড় ও পরে গয়া এই স্থানের ক্রম চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গ বিজয় কাব্যে

১ চৈ ম. নদীয়া—৩৪।২৯ ২ মু. ক.—১।১৩।৭ ৩ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ
৪ চৈ. ভা. আদি ১২অঃ ৫ ঐ —২।১৪।০ ৬ চৈ. চ মহাকাব্য—৪।৫০

শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াযাত্রার পথের বর্ণনায়। বৃন্দাবন বলেন, গয়াতে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে পিতৃশ্রাদ্ধ করে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করতে এলেন গৌরাঙ্গ প্রভু। বিপ্রগণের মুখে তিনি শুনলেন বিষ্ণুপদের মহিমা। হঠাৎ প্রেমানন্দে তাঁর দুই চক্ষু ছাপিয়ে কপোল বেয়ে নামলো অশ্রুর বন্যা।

চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে।
প্রেমভক্তির উদয় — আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ সুখে ॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।
লোম হর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে ॥[১]

পাণ্ডিত্যাভিমানী তীক্ষ্ণধী বিশ্বম্ভরের প্রথম প্রেম ভক্তির উদয় হোল।

সর্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ ॥[২]

এ এক অলৌকিক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। উদ্ধত নিমাই পণ্ডিতের চোখ দিয়ে অবিশ্রাম ধারা ঝরছে।

অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে ॥[৩]

সেই সময় ঈশ্বরপুরী এসে উপস্থিত হলেন বিষ্ণুপদমন্দিরে—উভয়ের ঘটলো সাক্ষাৎকার। দুজনেই ভাসতে লাগলেন প্রেমাশ্রুতে।

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে ॥
ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ — ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন প্রভু করিয়া আদর ॥
ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহাহর্ষ হঞা ॥
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেমজলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ কুতূহলে ॥[৪]

তখনি গৌরচন্দ্র বললেন—

কৃষ্ণপাদ পদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুহি চাহি দান ॥[৫]

১-৫ চৈ. ভা আদি ১৩অঃ

তারপর ঈশ্বরপুরীর অনুমতি নিয়ে গৌরচন্দ্র তীর্থ শ্রাদ্ধ, ফল্গুতীর্থে বালুকার পিণ্ডদান, প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধ, রাম গয়া যুধিষ্ঠির গয়া প্রভৃতিতে পিণ্ডদান ইত্যাদি গয়া কৃত্য সমাপন করলেন। গয়াকৃত্য সমাপনের পরে নিজের আস্তানায় এসে গৌরাঙ্গদেব রন্ধন করলেন। এমন সময় দর্শন দিলেন ঈশ্বরপুরী। গৌরচন্দ্র নিজের অন্ন পুরীকে ভোজন করিয়ে পুনর্বার পাক করলেন নিজের জন্য। আর একদিন নিভৃতে ঈশ্বরপুরী তাঁকে দশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করলেন।

আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥

* * *

তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥[১]

মুরারির বিবরণে ও বৃন্দাবনের বিবরণে কিঞ্চিৎ অনৈক্য লক্ষিত হয়। মুরারির বিবরণে রাজগৃহ থেকে ব্রহ্মকুণ্ডে পিতৃতর্পণ করার পর বিষ্ণুপদদর্শনেচ্ছায় যখন গৌরচন্দ্র যাচ্ছিলেন সেই সময়ে সাক্ষাৎ হয় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে। সেইকালে ঈশ্বরপুরীর প্রভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করায় পুরী তাঁকে দশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করলেন।

তস্মিন্ শুভং ন্যাসিবরং দদর্শ স ঈশ্বরাখ্যং হরিপাদভক্তম্।
পুরীং পরেশঃ পরমাত্মভক্ত্যা তুষ্টং ননামৈনমথাব্রবীচ্চ॥
দিষ্ট্যাদ্য দৃষ্টং ভগবন্ পদাম্বুজং তব প্রভো ব্রূহি যথা ভবাম্বুধিম্।
নিস্তীর্য্য কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সরোরুহামৃতং পশ্যামি তন্মে করুণানিধে স্বয়ম্॥[২]

—সেইকালে তিনি দেখলেন হরির চরণে ভক্তিমান্ ঈশ্বরপুরী নামক সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠকে। পরম ভক্তি দ্বারা তুষ্ট তাঁকে পরেশ (গৌরাঙ্গ) প্রণাম করলেন এবং বললেন, হে ভগবন্, হে প্রভো, ভাগ্যবশে আপনার চরণকমল দর্শন হোল, বলুন যাতে ভবসাগর পার হয়ে শ্রীকৃষ্ণের অমৃততুল্য চরণপদ্ম দেখতে পাই, হে করুণানিধি, তার উপায় করুন।

স ইত্থমাকর্ণ্য হরের্বচোঽমৃতং মুদা দদৌ মন্ত্রবরং মতিজ্ঞঃ।
দশাক্ষরং প্রাপ্য স গৌরচন্দ্রমা তুষ্টাব তং ভক্তিবিভাবিতঃ স্বয়ম্॥[৩]

---

১ চৈ. ভা. আদি, ১২ অঃ ২ মু. ক.—১।১৫।১৬-১৭ ৩ মু. ক.—১।১৫।১৮

—সেই মতিমান হরির (শ্রীগৌরাঙ্গের) অমৃততুল্য এই বাক্য শুনে সানন্দে মন্ত্র দান করলেন। গৌরচন্দ্রও দশাক্ষর মন্ত্রলাভ করে ভক্তিভরে তাঁর স্তব করলেন।

লোচনও বলেছেন, বিষ্ণুপদদর্শন করতে যাবার আগেই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎকার এবং পুরীর নিকট থেকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ হয়েছিল।

বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা ত্বরায়।
যাইতে দেখিল পথে এক স্থাসিবর॥
মহাভাগবত নাম পুরী যে ঈশ্বর।
প্রণাম করিয়া তারে বৈল বিশ্বম্ভর॥

* * *

কেমনে তরিব আমি সংসার সাগরে।
কৃষ্ণপাদাম্বুজ ভক্তি দেহ ত আমারে॥
কৃষ্ণদীক্ষা দিয়ু দেহ অকারণ দেখি।
পুরাণে এ সব বাক্য সাধুমুখে সাক্ষী॥
ঐছন শুনিঞা বাণী পুরী যে ঈশ্বর।
নিভৃতে কহিল তারে মহামন্ত্রবর॥
গোপীনাথ মহামন্ত্র পাঞা বিশ্বম্ভর।
পুলকিত সব অঙ্গ হরিষ অন্তর॥[১]

লোচন অবশ্যই মুরারিকে অনুসরণ করেছেন। লোচন বলেন, গোপীনাথ মন্ত্রে দীক্ষালাভের পরেই শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে প্রেমভক্তির প্রকাশ দেখা গেল এবং তিনি রাধা রাধা বলে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। অন্য কোন গ্রন্থে গয়া থেকেই মহাপ্রভুর মুখে রাধা রাধা বোল উচ্চারিত হতে শোনা যায় না। লোচন বলেন দীক্ষার পর গৌরচন্দ্র বিষ্ণুপদ দর্শন করে প্রেম ভক্তি প্রকাশ করেন, তাঁর দেহে সাত্বিকভাবের প্রকাশ ঘটে।

ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
প্রকাশ করয়ে গোরা প্রেম অধিকারী॥
কম্প পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ।
নয়নে গলয়ে ধারা ক্ষণে হয় স্তম্ভ॥[২]

১ চৈ. ম. আদিখণ্ড　　২ চৈ. ম. আদিখণ্ড

বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শন করে বিশ্বম্ভর পিণ্ডদান করলেন। মুরারির বিবরণেও দীক্ষার পর বিশ্বম্ভর পিতৃপিণ্ডদান করেছিলেন।

গুরৌ স ভক্তিং পবিদর্শয়ন্ স্বয়ং ফল্গুষুচক্রে পিতৃদেবার্চনম্।
প্রেতাদিশৃঙ্গে পিতৃপিণ্ডদানং ব্রহ্মাঙ্গুলিরেণুযুতেষু কৃত্বা॥
দেবান্ সমভ্যর্চ্য দদৌ দ্বিজাতয়ে পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যথেষ্টদক্ষিণম্।[১]

—গুরুকে ভক্তি প্রদর্শন করে তিনি স্বয়ং ফল্গুনদীতে পিতৃকুল এবং দেবকুলের অর্চনা করে ব্রহ্মাদি দেবগণের পদাঙ্গুলিরেণুযুক্ত প্রেতশৃঙ্গে পিতৃপিণ্ডদান করে দেবগণকে অর্চনা করে পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করে ব্রাহ্মণগণকে যথেষ্ট দক্ষিণা দান করেছিলেন।

লোচন মুরারিকেই অনুসরণ করেছেন। এই সময়েই বিষ্ণুপদ দর্শন করে শ্রীগৌরাঙ্গ ভাববিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

স বিষ্ণুপদ্যাং হরিপাদচিহ্নং দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো মনসাব্রবীচ্চ।
কথং হরেঃ পাদপয়োজলক্ষ্মপ্রেমোদয়ো মে ন বভূব দৃষ্ট্বা॥
তস্মিন্ ক্ষণে তস্য বভূব দৈবাৎ সুশীততোয়ৈরভিষেচনং মুহুঃ।
কম্পোর্ধ্বরোমা ভগবান্ বভূব প্রেমাম্বুধারাশতধৌতবক্ষাঃ॥[২]

—তিনি বিষ্ণুপদী শৃঙ্গে হরিপাদচিহ্ন দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মনে মনে বলেছিলেন, হরির পাদপদ্মচিহ্ন দেখে কেন আমার প্রেমোদয় হোল না? সেইক্ষণে দৈবাৎ মুহুর্মুহু তাঁর শীতল জলে অভিষেক ঘটলো, কম্প রোমাঞ্চ ও প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হোল।

কবিকর্ণপূরও বলেছেন যে গয়ায় প্রবেশ করে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ঈশ্বরপুরীকে বিশ্বম্ভর বলেছিলেন, আমাকে সেই উপদেশ দাও যাতে হরিভক্তিগুণ প্রভাবে আমি ভবসমুদ্র পার হতে পারি—

বদ যথা হরিভক্তিগুণাদ্ভবেৎ
প্রভবতো ভবতোঽম্বুধি শোষণম্॥[৩]

এই কথা শুনে পুরী মহারাজ তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করলেন। তারপর গৌরচন্দ্র পুলকিত দেহে সজল নেত্রে গুরুকে প্রণাম করে ফল্গুতে স্নান তর্পণ সেরে প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করলেন। তৎপরে তিনি দক্ষিণ ও উত্তর মানস সরোবরে এবং গয়াশিরে পিণ্ড দিয়ে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করে সঙ্গীদের সঙ্গে

১ মু. ক.—১।১৬।১-২ ২ মু ক ১।১৬।৬ ৭ ৩ চৈ. চ. মহা—৪।৫৮

প্রস্থান করলেন। তারপর হরির পদাঙ্ক দর্শন করেও আমার হৃদয় কোমল হোল না কেন, এই কথা ভাবতে ভাবতেই তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো এবং শরীর আকুল হোল।

কথমভূন্ন হরেঃ পদপদ্ধতিং
সমবলোকয়তো মৃদুতৈব ন।
ইতি বিচিন্তয়তোঽস্য দৃশোর্ঝরো
বিপুলবঃ পুলকশ্চ তদাভবৎ ॥[১]

এই বিবরণগুলি থেকে প্রতীত হয় যে গয়াযাত্রাকালে বা তার কিছু পূর্বেই পাণ্ডিত্যাভিমানী উদ্ধত যুবক নিমাই-এর চিত্তে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই কৃষ্ণমন্ত্রলাভের জন্য তাঁর ব্যাকুলতাই এই তথ্য প্রমাণিত করে। মুরারি লোচন ও কবিকর্ণপূরের বিবরণই যথার্থ মনে হয়। গয়াতে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা ও তৎপরে বিষ্ণুপদচিহ্ন দেখে নিমাই-এর ভাবান্তর হয় এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে অশ্রুমোচন করতে থাকেন। কোন কোন চরিতকার যে পূর্ববঙ্গে নিমাই পণ্ডিত কর্তৃক হরিনাম প্রচারের বিবরণ দিয়েছেন এবং বৃন্দাবনের কাব্যে নিমাইকর্তৃক তপন মিশ্রকে যে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি মন্ত্র জপের নির্দেশ তা কল্পিত বলেই মনে হয়। গয়াতে নিমাই পণ্ডিতের এই আকস্মিক পরিবর্তনের হেতু খুব সুস্পষ্ট নয়। জীবনীকাররা কোন সূত্র স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন নি। আমাদের অনুমান, প্রিয়তমা লক্ষ্মীর বিয়োগ বেদনা নীরবে বহন করতে করতে বিশ্বম্ভরের অন্তর বৈরাগ্যময় ও ঈশ্বরমুখী হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ অপঘাতে মৃতা লক্ষ্মীর আত্মাকে মুক্তি দেওয়া ছিল তাঁর গয়ায় পিণ্ড দিতে যাওয়ার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা। সাধারণতঃ অপঘাতে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মুক্তির জন্যই গয়ায় প্রেতশিলায় পিণ্ড দেওয়ার রীতি। নিমাই বিষ্ণুপদেও পিণ্ড দিয়েছেন, প্রেতশিলাতেও পিণ্ডদান করেছেন। চরিতকাররা না বললেও প্রেত শিলায় নিমাই যে লক্ষ্মীকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। চূড়ামণি দাস লিখেছেন—

জাতি জ্ঞাতি বিজাতিরে জত পড়ে মনে।
সর্বতীর্থে পিণ্ড দিল শচীর নন্দনে ॥[২]

---

১ চৈ. চ. মহা—৪।৩৫ ২ গৌ. বি—পৃঃ ১০৭

জাতি বিজাতি জাতিদের যিনি পিণ্ডদানে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি যে প্রাণসমা অকালমৃতা পত্নীর মুক্তির চিন্তা করবেন না, তা বিশ্বাস্য নয়। জয়ানন্দের কাব্যে সন্ন্যাসের পূর্বে গৌরচন্দ্র যাঁদের তর্পণ করেছিলেন তাঁদের তালিকায় লক্ষ্মীর নামও ছিল।

যাই হোক, ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে এবং গদাধরের পদাঙ্ক দর্শনে ও স্পর্শনে হঠাৎ যে প্রবল প্রেমোদয় হোল শ্রীগৌরাঙ্গের মনে তাতে তাঁর দেহে মহাসাধকের স্বেদ অশ্রু রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবেরও প্রকাশ ঘটতে থাকে। বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন যে কিছুদিন গৌরচন্দ্র গয়ায় অবস্থান করেছিলেন—কথোদিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি।[১] এই ইষ্টমন্ত্র জপ ও ধ্যান করতে করতে তাঁর প্রেমভক্তি গাঢ়তর হয়ে উঠলো, কৃষ্ণলাভের ব্যাকুলতাও বাড়তে লাগলো। বৃন্দাবন বলেছেন—

ধ্যানানন্দে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইলো ঈশ্বর মোর কোন দিগে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেম-ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রী-অঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
আর্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃ স্বরে॥
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহোরে॥[২]

গৌরচন্দ্রের এই আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেই বৃন্দাবন বলেছেন—

যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥[৩]

সংসারে বৈরাগ্য এলো শ্রীগৌরাঙ্গের। তিনি আর গৃহে ফিরবেন না। কৃষ্ণলীলাস্থল মথুরা বৃন্দাবন তাঁকে আকর্ষণ করছে। সুতরাং তিনি মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রার সংকল্প করলেন—ত্যক্ত্বা গয়াং সত্বমিয়েষ রম্যাং মধোর্বনং সাধু নিষেবিতাং

১ চৈ. ভা আদি ১৫ অঃ ২ চৈ ভা আদি ১৫ অঃ চৈ. ভা.আদি ১৫ অঃ

তাম্।[১]—গয়া-ত্যাগ করে সাধু নিষেবিত মনোরম নিধুবন গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

প্রভু বলে তোমা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥[২]

মুরারি, বৃন্দাবন ও লোচনের কথামত গৌরচন্দ্র যখন মথুরা বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ করছিলেন সেই সময়ে মেঘমন্দ্ররবে আকাশবাণী হোল, ঘরে ফিরে যাও—চল স্বমন্দিরম্।[৩] কিন্তু প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন করেছেন জয়ানন্দ। তাঁর মতে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সঙ্গীদের বললেন—

মথুরা জাইব আমি না জাইব দেশে।
আমার মা এরে সতে কহিয় বিশেষে॥[৪]

তখন সঙ্গীদের প্রতিক্রিয়া :

গৃহে প্রত্যাবর্তন

ইহা শুনি কান্দে মুরারি গুপ্ত শ্রীনিবাস।
গদাধর পণ্ডিত কান্দে ছাড়িআ নিঃশ্বাস॥
গোপীনাথ পণ্ডিত আচার্য বিদ্যানিধি।
জগদানন্দ মুকুন্দ কান্দএ নিরবধি॥
* * *
সভার ক্রন্দন শুনি না গেলা মথুরা।
দেশের চলিলা করি রাত্রিদিন ত্বরা॥[৫]

এই বিবরণ অনুসারে মুরারি গুপ্ত, শ্রীনিবাস গোপীনাথ পণ্ডিত, আচার্য বিদ্যানিধি, জগদানন্দ ও মুকুন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী ছিলেন গয়া যাত্রায়। সঙ্গীদের অনুরোধেই নবদ্বীপে ফিরে এলেন নিমাই পণ্ডিত, -কিন্তু সে মানুষ নয়,—একেবারে অন্য মানুষ।

পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাই পণ্ডিত হৈল পরম বৈষ্ণব॥
* * *

১ মু. ক.—১।১৩।৮ ২ চৈ ভা. আদি ১২অঃ ৩ মু. ক.—১।১৩।৯
৪ চৈ. ম. নদীয়া—৬৭।১৩-১৫, ১৭

পরম বিরক্তরূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥[১]

গয়া প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গের দৈনন্দিন জীবন যাপন সম্পর্কে মুরারি লিখেছেন—

গৃহে বসন্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যং রুদত্যলং রৌতি মুহুর্মুহুঃ স্বনৈঃ।
সবেপথুর্গদ্‌গদয়া গিরা লপত্যলং হরে কৃষ্ণ হরে মুদা কচিৎ॥
শ্রীবাসবিপ্রাদিগণৈঃ কচিন্নবং গায়ত্যলং নৃত্যতি ভাবপূর্ণঃ।
নানাবতারানুকৃতিং বিতন্বন্ রেমে নৃলোকাননুশিক্ষয়ংশ্চ ॥[২]

—গৃহে বাসকালে প্রেমের আবেগে লুপ্তধৈর্য গৌরাঙ্গ কম্পনের সঙ্গে মুহুর্মুহু গদ্‌গদ ভাষায় সশব্দে বিলাপ করছেন, কখনও বা সানন্দে হরে কৃষ্ণ হরে বলছেন, শ্রীবাসাদি বিপ্রগণের সঙ্গে কখনও নব নব গান করছেন, নৃত্য করছেন কখনও নানাবিধ অবতারের অনুকরণে লোকশিক্ষা দিয়ে আনন্দ করতে থাকেন।

কবিকর্ণপূর বলেছেন যে গৌরচন্দ্র গয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন পৌষ-মাসের শেষে এবং মাঘমাসের প্রথম দিন থেকে হরিসংকীর্তনের দ্বারা ভাবাবেশ প্রকাশ করতে থাকেন।

গয়ায়া ইত্যেবং স্বগৃহমগমত্তুরিকরুণ
প্রভুঃ পৌষস্যান্তে সকলতনুভৃত্তাপশমনঃ।
ততো মাঘস্যাদৌ নিরবধি নিজৈঃ কীর্তন রসৈঃ
প্রকাশং চাবেশং ভুবি বিকিরতি স্মানুদিবসম্ ॥

ইতি ক্ষণোৎক্ষিপ্ত সমস্ত চেষ্টিতঃ

অভাবিত পরিবর্তন

প্রতিক্ষণং গায়তি নির্ভরং মুহুঃ।
পদে পদে রোদিতি রোমহর্ষণৈ
বিমুক্তকণ্ঠং করুণাপয়োনিধিঃ ॥[৩]

—প্রভূত করুণাময় সকল জীবের তাপনাশন প্রভু এইভাবে পৌষের অন্তে গয়া থেকে স্বগৃহে আগমন করলেন। তারপর মাঘের প্রথমে নিরবধি নিজকীর্তন (কৃষ্ণনাম কীর্তন) রসের দ্বারা প্রকাশ ও আবেশ পৃথিবীতে বিকীর্ণ করতে লাগলেন।

---

১ চৈ. ভা মধ্য ১অঃ ২ মু. ক —১।৬।২-৩৩ ৩ চৈ. চ. মহা—৪।৭৬-৭৭

এইভাবে ক্ষণে সমস্ত চেষ্টা আক্ষিপ্ত হয়, প্রতিক্ষণে মুহুর্মুহু পূর্ণ আবেগে গান করেন, পদে পদে করুণাসাগর রোমাঞ্চের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে থাকেন।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের পৌষসংক্রান্তিতে (জানুয়ারীর মধ্যভাগ) নিমাই গৃহে ফিরে মায়ের চরণ বন্দনা করেছিলেন এবং ১লা মাঘ থেকে তাঁর প্রেমভক্তির অভিপ্রকাশ ঘটেছিল। চারমাস পূর্বে ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে তিনি গয়াযাত্রা করেছিলেন। যদিও জয়ানন্দ জগন্নাথের লোকান্তরের পরই নিমাইকে গয়ায় প্রেরণ করেছেন, তথাপি মুরারি ও অন্যান্য জীবনীকারের বক্তব্য থেকে তা সমর্থিত হয় না। অথচ জয়ানন্দের বিবরণে নিমাই কৃষ্ণ-ভাবাবেশ গয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন। শচীদেবী প্রিয়পুত্রের অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখে বললেন, তুমি গয়া থেকে প্রেমধন নিয়ে এলে, আমার জন্য কি আনলে? আমাকে প্রেমধন দাও—

> প্রেমাখ্যং কিং ধনং লব্ধং গয়ায়াং দেবদুর্লভম্॥
> তস্মাং প্রযচ্ছ তাতাশু যদ্যস্তি করুণা ময়ি।
> যথাকৃষ্ণরসাম্ভোধৌ বিহরামি নিরন্তরম্॥[১]
> দেবানামবিদিতমেতদত্যলভ্যং
> প্রেমেদং যদবগতং ত্বয়া গয়ায়াম্।
> দীনায়ৈ তাদহ হ মে প্রযচ্ছ তাত
> স্নেহস্তে যদি ময়ি তিষ্ঠতি ক্ষণঞ্চ॥[২]

নিমাই অবশ্য মাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বৈষ্ণবদের কৃপায় তুমি প্রেমধন পাবে—

> বৈষ্ণব প্রসাদে প্রেম পাইবে যে তুমি।
> নিশ্চয় জানিহ কথা কহিলাম আমি॥[৩]

বৃন্দাবনের রচনা থেকেও নিমাই-এর অসম্ভাবিত পরিবর্তনের ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বৃন্দাবন জানিয়েছেন যে শ্রীবাসের গৃহে বৈষ্ণবগণ প্রভাতে কৃষ্ণপূজার জন্য কুন্দকুসুম চয়ন করেন। গদাধর, গোপীনাথ, রামাঞি, শ্রীবাস ইত্যাদি ফুল তুলছিলেন, এমন সময় শ্রীমান্ পণ্ডিত এলেন হাসতে হাসতে।

---

১ মু. ক.—২।১।১২-১৫ ২ চৈ. চ মহা.—৫।৫ ৩ চৈ ভা. মধ্য ১ অঃ

বৈষ্ণবরা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রাতঃকালে এই হাসির কারণ কি? শ্রীবাস্ পণ্ডিত উত্তরে বললেন,

পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাই পণ্ডিত হৈল পরম বৈষ্ণব ॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে ॥
পরম বিরক্তরূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ ॥
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণকথা।[১]

শ্রীবাস্ জানালেন যে নিমাই আগামীকাল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে বৈষ্ণবদের সাথে মিলিত হবেন—শুক্লাম্বর ঘরে কালি মিলিবা সকালে।[২] এই কথা শুনে বৈষ্ণবগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হরিধ্বনি করলেন। শ্রীবাস বললেন—গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার[৩] অর্থাৎ বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক। শ্রীবাসের গৃহে বৈষ্ণব সমাবেশ কীর্তনানুষ্ঠানের ফলে পাষণ্ডীদের অত্যাচারের ভয়ে শ্রীবাস কুণ্ঠিত ছিলেন বলেই বোধ হয় শ্রীবাসের এই উক্তি। যথাসময়ে বিশ্বম্ভর এলেন শুক্লাম্বরের বাড়ী—বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এইখানেই তিনি বিভোর হয়ে গেলেন হরিগুণগানে,—সাত্ত্বিক ভাবসমূহ বিকশিত হোল তাঁর দেহে,—কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তিনি ধূলায় লুটাতে লাগলেন। বৈষ্ণব সমাজ হতবাক্—অদ্ভুত আশ্চর্যজনক এই পরিবর্তন।

শুনিয়া অপূর্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহ বলে ঈশ্বর হইলা বিদিত ॥
কেহ বলে নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে ॥

* * *

কেহ বলে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ প্রকাশ গয়াতে ॥[৩]

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ১ অঃ

গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন গৌরচন্দ্র। গঙ্গাদাস বললেন, তোমার ছাত্ররা তুমি গয়াযাত্রা করা অবধি পুঁথি খোলে নি, কাল থেকে অধ্যাপনা সুরু কর।

কালি হৈতে পঢ়াইবা আজি চল বাস ॥
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিকে পঢ়ুয়া বেষ্টিত শশধর ॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে ॥[১]

কিছুকাল বিশ্বম্ভর অধ্যাপনাও করেছিলেন, কিন্তু অধ্যাপনা করতে গিয়ে কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কিছু মুখে আসে না।

কৃষ্ণ বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পঢ়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে ॥
অধ্যাপনা ত্যাগ — অনুরোধে প্রভু বসিলেন পঢ়াইতে।
পঢ়ুয়া সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥
হরি বলি পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিয়া আনন্দ হৈলা শ্রীশচী নন্দন ॥

• • •

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম ॥
প্রভু বলে সর্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি না বলয়ে আন ॥[২]

কিন্তু গৌরচন্দ্রের এই কৃষ্ণকথামূলক অভিনব পাঠন পদ্ধতি ছাত্রদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। গুরু ও ছাত্রের কথোপকথনে সরল সত্য ব্যক্ত হয়ে ওঠে।

আজি আমি কোন্ মত সূত্র বাখানিল।
পঢ়ুয়া সকলে বলে কিছু না বুঝিল ॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ॥

১-২ চৈ. ভা. মধ্য. ১ অঃ

হাসি বলে বিশ্বম্ভর শুন সব ভাই।
পুঁথি বন্ধ আজি চল গঙ্গা স্নানে যাই ।।[১]

এইভাবে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যানে ছাত্রসমাজের বিস্তার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না পুঁথিগত বিদ্যা ব্যর্থ হয়। ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া বৃন্দাবনের ভাষায়—

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহ বলে হেন বুঝি বায়ুর কারণ ।।
শিষ্যবর্গ বলে এবে কেমত বাখান।
প্রভু বলে যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ।।[২]

সুতরাং নিমাই-এর ছাত্রগণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে গিয়ে নালিশ করে। গঙ্গাদাস মৃদু ভৎর্সনার সঙ্গে প্রিয়তম ছাত্র নিমাই পণ্ডিতকে বলেন—

মাতামহ যার চক্রবর্তী নীলাম্বর।
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ।।
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম যোগ্য বিখ্যাত টীকায় ।।
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয় ।।

* * *

ভাল মতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পঢ়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও ।।[৩]

গুরুর তিরস্কারে ক্ষণিকের জন্য বিশ্বম্ভরের পূর্ব অহমিকা জেগে ওঠে। তিনি বললেন—

আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন জন ।।[৪]

ছাত্র নিয়ে অধ্যাপনায় বসেন নিমাই পণ্ডিত, চলে তাঁর পাণ্ডিত্যের আস্ফালন।

যোগপট্টছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন ।।

১-৪ চৈ. ভা. মধ্য. ১অঃ

প্রভু বলে সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার॥
শব্দ জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥
যে আমি খণ্ডন করি যে করি স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক কোন জন॥[১]

বোঝা যায়, গৌরাঙ্গদেব ছাত্রদের ব্যাকরণ শাস্ত্রই পড়াতেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে তিনি আর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে পারলেন না। কৃষ্ণ কথা বিনা আর কিছু তাঁর জিহ্বা উচ্চারণে অসমর্থ হওয়ায় গৌরচন্দ্র অধ্যাপনা ছেড়ে দিলেন।

গঙ্গাদাসের কাছ থেকে ফিরে এসে গৌরচন্দ্র তাঁর বিদ্যার প্রকাশ আর ঘটাতে পারলেন কই? রত্নগর্ভ আচার্যের দ্বারে এসে পৌঁছে তিনি দেখেন ভাগবত পাঠ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির আবেশে বিহ্বল হয়ে পড়লেন তিনি—তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন প্রাতে তিনি পুনরায় অধ্যাপনায় বসলেন। কিন্তু—

প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন।
শব্দমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান।[২]

এইভাবে অধ্যাপনা আর কতদিন চালানো যায়! কৃষ্ণ কথা ভিন্ন আর কিছুই পড়ানো নিমাই পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব হোল না। তাই তিনি ছাত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তাদের অন্যত্র পড়তে অনুমতি দিয়ে। তিনি তাদের বললেন—

তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার স্থানে পড় আমি দিলাঙ নির্ভয়॥
কৃষ্ণ বিনে আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার॥

১-২ চৈ. ভা. মধ্য ১ অঃ

এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া।
দিলেন পুস্তকে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥[১]

বৃন্দাবন আরও জানালেন যে এই সময়ে গৌরাঙ্গদেব ছাত্রদেরও কৃষ্ণ নাম গানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাদের বললেন—

পড়িলাঙ শুনিলাঙ যতদিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥[২]

শিষ্যগণও অনুপ্রেরণা পেয়ে কীর্তনে অংশ গ্রহণ করতে থাকে—

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥[৩]

ক্ষুরধার মেধাসম্পন্ন নিমাই পণ্ডিতকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে বৈষ্ণবগণ অকূলে কূল পেলেন। সব থেকে খুশী হলেন অদ্বৈত আচার্য। তিনি পাষণ্ডীদের অত্যাচার থেকে বৈষ্ণবদের রক্ষার মানসে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের জন্য তপস্যা করছিলেন। তিনি এখন অনুভব করলেন, তাঁর সাধনার ফল করতলগত, ভগবান কৃষ্ণ নিমাইরূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নিমাই-এর চরিত্রের গুরুতর পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে। গঙ্গাস্নানে যাবার কালে বৈষ্ণবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি নমস্কার করেন। বৈষ্ণবগণ আশীর্বাদ করেন—

তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে বাপ সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥[৪]

গৌরচন্দ্র ভক্তবৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ মস্তকে গ্রহণ করেন, সাজি ধুতি বহন করে বৈষ্ণবের সেবা করেন। বৈষ্ণবগণও আশীর্বাদ করে অন্তরের কামনা ব্যক্ত করেন—

বলহ বলহ কৃষ্ণ হও কৃষ্ণদাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বৈ আর নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা হৈতে দুঃখ আমা সবাকার॥

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ১অঃ ৪ চৈ. ভা. আদি ১অঃ

যে অধম লোক সব কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণ রসে॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজ কর পাষণ্ডী সংহার॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাহি নাচি হইয়া বিহ্বল॥[১]

গৌরচন্দ্রের পরিবর্তন দিন দিন গুরুতর আকার ধারণ করে। তাঁর মধ্যে যেন উন্মত্ততার প্রকাশ দেখা যায়। কখনও তিনি বৈষ্ণবদ্বেষীদের সংহার করার জন্য হুঙ্কার ছাড়েন, নিজেকে বলেন দানবদলন কৃষ্ণ, কখনও বা তিনি ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন—মূর্ছা যান।

পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
সংহারিব সব বলি করয়ে হুঙ্কার।
মুঞি মুঞি সেই বলে বার বার॥
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মূর্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥

বায়ুরোগ না কৃষ্ণপ্রেম ?

* * *

আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডো পাষণ্ডীর মাথা॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট্ মারে।
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে॥[২]

কখনও তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে মারতে যান। বৃন্দাবনের এই কথাটি লক্ষণীয়। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর স্থান গ্রহণ করতে পারেন নি বলেই মনে হয়। যাই হোক, শচীমাতা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি পুত্রের এ হেন অবস্থা দেখে লোককে ডেকে দেখাচ্ছেন। ভক্তগণ বলেন, কৃষ্ণের বিকার। অন্তে বলছে, বায়ু রোগ, বেঁধে রাখ। নানা জনে নানা প্রকারে প্রতিবিধান করতে বলে।

১ চৈ. ভা. আদি ১ অঃ ২ চৈ. ভা. মধ্য ১৷ অঃ

পূর্বকার বায়ু আসি জন্মিল অন্তরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে ॥
খাইবারে দেহ ভাব নারিকেল জল।
যাবৎ উন্মাদ বায়ু নাহি করে বল ॥
কেহ বলে ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবামৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে ॥
পাক তৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবৎ প্রকাশ নাহি হইয়াছে জ্ঞান ॥[১]

অনন্তোপায় হয়ে শচীমাতা বৈষ্ণবভক্তদের সংবাদ দিলেন। শ্রীবাস দেখে বললেন—মহা ভক্তিযোগ, বায়ু বলে কোন জনে।[২] শ্রীবাস শচীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—বায়ু নহে কৃষ্ণ ভক্তি বলিল তোমারে।[৩] অদ্বৈতের উপলব্ধি: ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি পরীক্ষা করার জন্য শান্তিপুরে নিজালয়ে গমন করলেন; যদি প্রয়োজন হয় তবে ঈশ্বর নিজেই অদ্বৈতকে টেনে আনবেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে কীর্তনে মেতে উঠেছেন—

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতিদিনে দিনে।
সংকীর্তন করে সব বৈষ্ণবের সনে ॥[৪]

কীর্তনকালে নিমাই-এর দেহে সাত্ত্বিক ভাবসমূহের প্রকাশ ঘটে, কখনও প্রবল কম্প হয় দেহে, কখনও অশ্রুতে বুক ভাসে, কখনও অট্টহাসি হাসেন, কখনও বা মূর্ছিত হয়ে পড়েন, আবার মূর্ছাবসানে কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করতে থাকেন।

বাহ্য হইলেও প্রভু সবার গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি ॥
কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন।
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন ॥[৫]

নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেও কৃষ্ণৈষণা ছাড়া আর কিছুই স্ফুরিত হয় না—

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ মাত্র প্রভু বলে।
আর কোন কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে ॥[৬]

১-৬ চৈ. ভা. মধ্য. ১ অঃ

একদিন গদাধরকে তিনি কৃষ্ণ কোথা আছেন প্রশ্ন করায় গদাধর বলেন, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে। এ কথা শুনে গৌরাঙ্গ প্রভু নখ দিয়ে বুক চিরতে লাগলেন। এ এক অদ্ভুত আবেশ। ভক্তগণ উল্লসিত, শচীমাতা সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যার সময় ভক্তগণ সমবেত হন শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহে, তারপর সারারাত্রি চলে কীর্তন। প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়—তাদের নৈশ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে তুমুল চীৎকারে। কেউ বলছে, শ্রীবাসই পাণ্ডা, ওর ঘরটা জলে ফেলে দাও, ওকে বাঁধ। নগরে জনরব ওঠে : রাজনৌকা আসে বৈষ্ণব ধরিবারে।[১] বিশ্বম্ভরও শ্রীবাসকে আশ্বাস দেন—সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।[২] তিনি আরও বলেন,

হরিসংকীর্তন ও কৃষ্ণের আবেশ

মুঞি গিয়া সর্ব আগে নৌকায় চড়িমু।
এই মত গিয়া রাজ গোচর হইমু॥[৩]

নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। তাঁরা রাজভয়, প্রতিবেশীদের রোষ উপেক্ষা করে একে একে এসে মিলিত হন গৌরচন্দ্রের গৃহাঙ্গনে—হরিনাম মহামন্ত্রের পতাকাতলে।

মিলিলেন গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঞি॥
শ্রীবাস মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর।
শ্রীধর পণ্ডিত নবদ্বীপে যার ঘর॥
শ্রীমান্ সঞ্জয় সে পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শুক্লাম্বর নীলাম্বর আদি মহাশয়॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর মহেশ পণ্ডিত।
হরিদাস নন্দন আচার্য সুচরিত॥
রুদ্র পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ অনুচর॥[৪]

এই সব খ্যাতিমান বৈষ্ণব সাধু সন্ত এসে জমায়েত হলেন গৌরচন্দ্রের চতুর্দিকে। এই সময়ে বীরভূমের একচাকা গ্রামের অধিবাসী হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর নন্দন পরিব্রাজক অবধূত নিত্যানন্দ এসে মিলিত হলেন গৌর-

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ১ অঃ   ৪ লোচন—চৈ. ম. মধ্যখণ্ড

চন্দ্রের সঙ্গে। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ ঘটেছে জেনে তিনি বৃন্দাবন মথুরা থেকে চলে এলেন নবদ্বীপে। নিত্যানন্দ প্রথমে নন্দন আচার্যের গৃহে অবস্থান করছিলেন। গৌরাঙ্গ স্বয়ং স্বগণে নন্দন আচার্যের গৃহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায় শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজা মহোৎসবে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করলেন। কীর্তন মহোৎসবে মেতে উঠলেন সকলে। অদ্বৈতও শান্তিপুর থেকে পত্নী সীতাদেবী ও পুত্র অচ্যুতানন্দ সহ যোগ দিলেন। নিত্যানন্দকে দেখে শচীদেবীর অন্তরে বাৎসল্যভাব জেগে ওঠে। নিত্যানন্দ নিমাই-এর বাড়ী যান। শচীমাতা গৌর নিতাই দুজনকে সমাদরে ভোজন করান। আরও এসে মিলিত হলেন যবন হরিদাস ও স্বরূপ দামোদর। এই সংকীর্তন মহামণ্ডলে এসে মিলিত হলেন গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীধর, সদাশিব, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, শুক্লাম্বর, রাম গরুড়াই, গোপীনাথ, জগদীশ, ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম প্রভৃতি। বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন বিশ্বম্ভর—তিনি বৈষ্ণব ভক্তদের বললেন যে সেইদিন হতেই প্রতিরাত্রে সংকীর্তন করবেন।

আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল।
নিশায় করিব সঙ্গে কীর্তন মঙ্গল॥
সঙ্কীর্তন করিয়া সকল গণসনে।
ভক্তিস্বরূপিণী-গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরমার্থে তোমরা সবার ধনপ্রাণ॥[১]

কোনদিন শ্রীবাসের গৃহে কোন দিন চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে ভক্তগণসহ রাত্রে চলে কীর্তন নর্তন।

শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন।
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন॥[২]

কোনদিন বা হরিনাম সহ নৃত্যগীতের আসর বসে স্বগৃহে—

কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সবেই গায়েন নাচেন শ্রীশচীনন্দন॥[৩]

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ৭ অঃ

হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীর দিনে প্রভাতকাল থেকেই শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন ও নৃত্য চলে।

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিল প্রভু জগতের প্রাণ ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্তনধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥
উষঃকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যূথে যূথে হইল যত গায়ন সুন্দর ॥[১]

গৌরচন্দ্রের দেহে কৃষ্ণপ্রেমের নানাবিধ বিকার প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর আজ্ঞায় কীর্তন চলে রুদ্ধদ্বার গৃহে, ভক্তগণ ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না। শ্রীবাস অঙ্গনের বহির্ভাগে লোক জমায়েত হয়, তারা ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে নানাপ্রকার মন্তব্য করতে থাকে।

কেহো বোলে অরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥
কেহো বোলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥
কেহো বোলে হেন বুঝি পূর্বের সংস্কার।
কেহো বোলে সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই ॥
কেহো বোলে পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ ॥[২]

নিমাই-এর এই নৃত্যগীতসহ সঙ্কীর্তনকে সমকালীন নবদ্বীপের কোন ব্যক্তি বায়ুরোগ বলে মনে করেছিলেন। জয়ানন্দ গয়া থেকে প্রত্যাগমনের পরে যদিও বায়ুরোগের কথা বলেন নি, তথাপি গৌরাঙ্গের প্রেমনৃত্যের যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে বায়ুরোগের লক্ষণ প্রকটিত। জয়ানন্দ প্রেমনৃত্যের বিবরণে লিখেছেন—

১-২ চৈ. ভা. মধ্য ৭অঃ

মহানৃত্য দেখি সভা এ লাগে ভয় ॥
হাড় মাস চূর্ণ হএ আছাড়ের ঘাএ।
দন্ত কড়মড় শব্দে শুনি ত্রাস পাএ ॥[১]

কোন আধুনিক পণ্ডিতও গৌরচন্দ্রের প্রেমোন্মাদনাকে বায়ুরোগ সম্পৃক্ত বলে ধারণা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বায়ু রোগ একটা মানসিক ব্যাধি। বায়ু ব্যাধি যদি কৃষ্ণ বিরহের কারণ না হয়, কৃষ্ণবিরহও ত বায়ুব্যাধির কারণ হতে পারে। বায়ু বা ব্যাধি ছিল না, ইহা বলা সত্যের অপলাপ।"[২] শ্রীগৌরাঙ্গের এই উন্মত্তভাব বায়ু রোগ না কৃষ্ণপ্রেমের বিকার তা পাথিব মানুষের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি দিয়ে অতিলৌকিক মানবের চরিত্রের বিচার হয়ত সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও অনুরূপ প্রেমোন্মাদনা দেখা যেত।[৩] পেনেটির মহোৎসবে (১৮।৬।১৮৮৩) শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধোন্মাদ অবস্থায় নৃত্যকীর্তন করেছিলেন।[৪]

এইভাবে ভক্তগণসহ হরিনামসংকীর্তনানন্দে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হয়ে গেল—বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্তন কৈল এক সংবৎসর ॥
কপাট দিয়া কীর্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥
কীর্তন শুনি বাহিরে তারা জলি পুড়ি মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥[৫]

চাপাল গোপাল নামে এক দুর্মুখ দুষ্ট ব্রাহ্মণ একদিন রাত্রে ভবানী পূজার সামগ্রী শ্রীবাসের দ্বারে স্থাপন করে যায়। তারা কলার পাতে ওড়ফুল, হরিদ্রা, সিঁদুর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল ও মদ্যভাণ্ড রেখে যায়। এই সময়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরাঙ্গের সাড়ম্বরে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অভিষেকের সবিস্তার বিবরণ আছে চৈতন্য ভাগবতে।[৬]

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—৪০।১৪-১৫
২ চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী—পৃঃ ১১৭
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম—পৃঃ ৪ ৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৪র্থ—পৃঃ ২৩
৫ চৈ. চ. আদি ১৭ পরি ৬ চৈ. ভা. মধ্য ৯ অঃ

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী এক বৎসর কালের মধ্যে দুটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় চৈতন্য জীবনীকাব্যে—একটি জগাই মাধাই উদ্ধার, আর একটি কাজিদলন। এই সময়েই নিমাই বিষ্ণুর অবতার রূপে ভক্তমহলে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি নিজে কৃষ্ণপ্রেমরসে নিমগ্ন—কীর্তনানন্দে আত্মহারা। কিন্তু জীবের দুঃখে তিনি কাতর। ভক্তিহীন নবদ্বীপে ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম প্রচার করার জন্য তিনি আদেশ দিলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ; বললেন,—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বোল কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
ইহা বহি আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥[১]

হরিনাম প্রচার

সুতরাং হরিদাস ও নিত্যানন্দ দ্বারে দ্বারে ঘুরে কৃষ্ণনাম বিতরণ করে চলেন।

আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণের ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই একমন ॥
এই মত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে ॥[২]

গৃহস্থ ভিক্ষা দিতে এলে দুইজনে কৃষ্ণনাম গ্রহণ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন—

নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে এই ভিক্ষা॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥[৩]

কেউ বা সাগ্রহে সানন্দে দুই ভক্তের কথা শ্রবণ করেন, কেউ বা অসন্তুষ্ট হয়ে গালাগালি করেন।

এইভাবে ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম বিতরণকালে একদিন নিত্যানন্দ জগাই মাধাই নামক দুই মত্তপ ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলেন। জগাই মাধাই ছিল ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু অনাচারী মত্তপ দুর্বৃত্ত পাপী—নগরের কোটাল।

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ১৩ অঃ

সেই দুজনের কথা কহিতে অপার।
জগাই-মাধাই উদ্ধার
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহদাহে সর্বক্ষণ।
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্যমাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥[১]

নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আসতে দেখে এই দুই মাতাল চকার বকার শব্দ উচ্চারণ করে গালাগালি করতে থাকে। লোকের মুখে নিত্যানন্দ শোনেন—

এই দুই দেখিয়া নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায়॥
হেন পাপ নাহি যাহা না করে দুইজন।
ডাকা চুরি মদ্যমাংস করয়ে ভোজন॥[২]

নিত্যানন্দ স্থির করলেন এই দুই দুর্বৃত্তকে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে হবে। অন্য লোকে তাঁদের নিষেধ করলেন দুর্বৃত্তদের কাছে যেতে, কারণ—"গোবধে ব্রহ্মবধে যাহার অন্ত নাই॥[৩] কিন্তু কারো নিষেধ না শুনেই হরিদাস ও নিত্যানন্দ গেলেন জগন্নাথ ও মাধবের কাছে, দুই মাতালের কাছে শোনালেন কৃষ্ণনাম—

বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণধন প্রাণ॥[৪]

মত্ত দুর্বৃত্তদ্বয় তখন মহাক্রোধে দুই বৈষ্ণব ভক্তের পিছনে পিছনে ধাবমান হয়েছে—নিত্যানন্দ ও হরিদাস পালাচ্ছেন ভয়ে।

ধর ধর ধর বলি ধরিবারে যায়॥
আথে ব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।
রহ রহ বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ গর্জ করে।
মহাভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥[৫]

পাষণ্ডী সব উপহাস করে,—আগে দৌড়াচ্ছেন নিত্যানন্দ ও হরিদাস,—

১-৫ চৈ. ভা. মধ্য

পিছনে দৌড়াচ্ছে জগাই-মাধাই। কিন্তু দস্যুদ্বয় স্থূলদেহ নিয়ে দৌড়াতে পারে না, পিছিয়ে পড়ে। হরিদাস বলেন নিত্যানন্দকে—"চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি প্রাণ সে হারাই।" নিত্যানন্দ বললেন, দোষ ত প্রভু বিশ্বম্ভরের, মহারাজার মত তিনিই ত আদেশ দিয়েছেন ঘরে ঘরে হরিনাম দিতে ; তাঁর আদেশেই ত ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ; লোকে বলে চোর ভণ্ড, তাঁর আদেশ পালন করলেও এই ফল, না করলেও সর্বনাশ।

ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে॥
কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তান।
চোর ঢঙ্গ বই লোকে নাহি বলে আন॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥[১]

সেদিন আর মাতাল জগাই-মাধাই এদের ধরতে পারলো না। এঁরা তখন পৌঁছে গেছেন প্রভু বিশ্বম্ভরের বাড়ীতে। সব শুনে বিশ্বম্ভর বললেন—খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর এথা।[২] কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুকে বললেন, এই দুই দুবৃত্তকে যদি হরিনাম নেওয়াতে পারো, তবেই ত তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক।

এই দুই উদ্ধার যদি দিয়া ভক্তিদান।
তবে জানি পাতকি-পাবন হেন নাম॥
আমাকে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দোঁহার উদ্ধারের সীমা॥[৩]

বিশ্বম্ভর আশ্বাস দিলেন, তোমার দর্শন যখন ওরা পেয়েছে, তখন ওদের উদ্ধার ত হয়ে গেছে। ভক্তগণসঙ্গে গৌরাঙ্গের চলে পরামর্শ। অদ্বৈত বললেন, নিত্যানন্দই ওদের উদ্ধার করবেন। দুর্বৃত্তদ্বয় সকল স্থানেই ঘুরে বেড়ায়, একা একা কেউ রাত্রে গঙ্গাস্নানে যেতে পারে না। রাত্রিতে এই দুই দস্যু নিমাই-এর বাড়ীর আশে পাশে ঘোরে, মদের ঝোঁকে কীর্তনের বাজনার সঙ্গে নাচতে থাকে। প্রভুকে দেখে তারা বলে নিমাঞি পণ্ডিত সুন্দর মঙ্গল-

---

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ১৩ অঃ

চণ্ডীর গীত করছে, গায়েনগুলিও ভাল—তাদের দেখাও, তারা যা চাইবে তাই এনে দোব। প্রভু ও দুর্জনের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকেন। অবশেষে এলো উদ্ধারের লগ্ন। একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করে ফিরছেন, এমন সময় জগাই-মাধাই কে রে বে করে ধাওয়া করলো। নিত্যানন্দ বললেন, আমার নাম অবধূত। অবধূত নাম শুনেই মাধাই ক্রুদ্ধ হয়ে 'মারিল প্রভুর শিরে মুকুটী তুলিয়া।' নিত্যানন্দের মাথা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ে। রক্ত দেখে জগাইএর দয়া হোল,—মাধাই আবার মারতে গেলে জগাই তার হাত ধরলো, নিষেধ করলো—

কেন হেন করিলে নির্দয় তুমি দঢ়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥
এড় এড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥[১]

নিমাইকে লোকে খবর দিয়েছে। তিনি দলবল নিয়ে চলে এসেছেন অকুস্থলে। তখন কৃষ্ণের আবেশ হয়েছে গৌরচন্দ্রের, নিত্যানন্দের রক্ত দেখে ক্রোধে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে "চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘন ঘনে।"[২] জগাই মাধাই দেখলো, প্রভুর হাতে সুদর্শন চক্র এসে হাজির হয়েছে। নিত্যানন্দ তখন করুণা পরবশ হয়ে জগাই মাধাই-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন প্রভুর কাছে।

মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥[৩]

জগাই রক্ষা করেছে শুনে প্রভু খুসী হলেন। তিনি জগাইকে প্রেমভক্তি প্রদান করলেন।

জগাইয়ে বোলে কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুক্তি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি লাভ॥[৪]

১-৪ চৈ. ভা. মধ্য ১৩ অঃ

জগাই মহাপ্রভুর কৃপালাভ করে ধন্য হোল, সে দেখলো নিমাই-এর দেহে চতুর্ভুজ বিষ্ণু। প্রভু জগাই-এর বক্ষে পদ স্থাপন করলেন। জগাই প্রভুর পায়ে ধরে চোখের জলে ভাসে। জগাই-এর পরিবর্তন দেখে মাধাইও প্রভুর পায়ে পড়লো, কিন্তু প্রভু মাধাইকে কৃপা করবেন না, কারণ মাধাই নিত্যানন্দের রক্তপাত ঘটিয়েছে। কিন্তু মাধাই-এর ব্যাকুলতা দেখে তিনি মাধাইকে নির্দেশ দিলেন নিত্যানন্দের পায়ে পড়তে। নিতাই মাধাই-এর বিনয় বচনে তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করলেন। গৌরচন্দ্রও কৃপা করলেন মাধাইকে—তার সব অপরাধ মার্জনা করলেন।

বিশ্বম্ভর বোলে যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ হউক সফল ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হইল সর্ববন্ধন মোচন ॥[১]

প্রভু জগাই মাধাইকে বললেন "তোরা আর না করিস পাপ।" দুজনে স্বীকৃত হোল সানন্দে। প্রভু তাদের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, বললেন,—

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস সব দায় মোর ॥[২]

এমনিভাবে পাপীর পাপের দায়িত্ব গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নয়। অতঃপর বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে জগাই মাধাইকে স্বগৃহে নিয়ে এসে দ্বার রুদ্ধ করে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্তনানন্দে মেতে উঠলেন। প্রভু বিশ্বম্ভরের ইচ্ছানুসারে বৈষ্ণব সমাজ জগাই মাধাইকে ক্ষমা করে তাদের আশীর্বাদ করলেন। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিত্ব লাভের মত জগাই মাধাই পরিণত হোল ভক্ত বৈষ্ণবে। তারা প্রভাতে গঙ্গাস্নান করে নিরালায় হরিনাম করে জীবন অতিবাহিত করেছিল।

জগাই মাধাই দুই চৈতন্যকৃপায়।
পরম ধার্মিকরূপে বৈসে নদীয়ায় ॥
উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণ নাম লয় প্রতিদিনে ॥

১-২ চৈ. ভা. মধ্য ১৪ অঃ

আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন ॥[১]

সব থেকে গুরুতর পরিবর্তন হোল মাধাই-এর। সে গঙ্গাতীরে ব্রহ্মচারী হয়ে বসবাস করতো এবং স্বহস্তে কোদাল নিয়ে গঙ্গার ঘাট তৈরী করতো। সেই ঘাট মাধাইর ঘাট নামে প্রসিদ্ধ।

পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে ॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্যকৃপায়।
মাধাইর ঘাট বলি সর্বলোকে গায় ॥[২]

নবদ্বীপে মাধাইর ঘাট আজও বর্তমান। জগাই মাধাইএর কল্পনাতীত পরিবর্তন সাধনের ফলে শ্রীগৌরাঙ্গের বৈষ্ণব-নেতৃত্ব যেমন প্রতিষ্ঠিত হোল, তেমনি বৈষ্ণবদের শক্তিও বর্ধিত হোল। জনসাধারণের মধ্যেও তাঁর প্রভাব বর্ধিত হোল তিনি অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ বা ঈশ্বরের অবতার অথবা স্বয়ং ঈশ্বররূপে পরিগণিত হলেন। লোকে বলতে লাগলো—

প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥[৩]

নিমাইএর অলোকসামান্য শক্তির বহিঃপ্রকাশ জগাই-মাধাই উদ্ধারের ঘটনা থেকেই সুরু হোল। পাপী তাপী উদ্ধারের জন্যই যে তাঁর আবির্ভাব এই ভাবটিও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা পায় এই ঘটনার পর থেকেই।

জগাই মাধাই উদ্ধারের কাহিনী মুরারির কড়চায়, কবি কর্ণপূরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র, বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হয় নি। সেইজন্য কেউ কেউ মনে করেন যে ঘটনাটি কল্পিত এবং মুরারির কড়চায় প্রক্ষিপ্ত।[৪] মুরারির কড়চা (২।১৩) ও অন্যান্য প্রায় সকল চরিতগ্রন্থেই এক কুষ্ঠরোগীর উদ্ধারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কুষ্ঠরোগী উদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীবাস বিশ্বম্ভর প্রভুকে অনুরোধ করেছিলেন

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ১৫ অঃ

৪ ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—অমূল্য সেন পৃঃ ৭৪

তুমি জগন্নাথ মাধব প্রভৃতি পাপীদের উদ্ধার কর। এই অনুরোধে প্রভু বলেছিলেন তথাস্তু।

পাপপূর্ণান্ জগন্নাথ-মাধবাদীন্ সমুদ্ধর।
ও মিত্যাহ স ভগবান্ সর্বপাতকমূলহৃৎ ॥[১]

মুরারি কড়চা বা রোজনামচার আকারে চৈতন্য জীবনী লিখেছিলেন। সুতরাং সেখানে অনেক বিবরণই সংক্ষিপ্ত। কবিকর্ণপুর যদিও মহাকাব্যে জগাই-মধোই উদ্ধার কাহিনীর উল্লেখ করেন নি, তথাপি নাটকে তিনি মুরারি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশদ। তিনি লিখেছেন—"……জগন্নাথ-মাধবাভিধানয়োর-নয়োরহরহরতীব বর্ধমানমানসমলয়োঃ সানুগ্রগ্রহমাত্মনৈবাহূয় পুরতঃ সমানীতয়োঃ কিল্বিষবিষলোভবদ্ভ্যাং ভবদ্ভ্যাং যদ্‌যদেনো ব্যরচি তদখিলমেব মেহধ্বানপূর্বকং দদতমিতি গদিতয়োঃ কথং কথমপি বিস্ময় চমৎকারকারণেন ক্ষণং স্থগিতয়োরনন্তরং দদাবেতি নিগদতোঃ করতো জলং গৃহীত্বা সদ্য এব দেদীপ্যমানী ক্রিয়মানয়ো রুদিত্বরত্বরমান বিপুল পুলক কঞ্চুকয়োরানন্দ নন্দ দীক্ষণ সলিলয়োঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি গদ্‌গদগদনরুদ্ধকণ্ঠয়োশ্চির সময়—সময়মানমনো নির্মলতয়া চির সমুপসন্ন-ভক্তিযোগ-যোগতো গতোদ্দামকামাদি দোষয়োঃ পরমভাগবতানাং পদবীমারূঢ়য়োস্তাদৃশেনানন্দবিকারেণ পশ্যতঃ..।"[২]

—জগন্নাথ ও মাধব নামধারী নিন্দিত ব্রাহ্মণ সহোদরদ্বয়কে যিনি অনুগ্রহ-পূর্বক স্বয়ং আহ্বান করিয়া সম্মুখে আনিয়া কহিলেন—"দেখ, তোমরা পাপ-বিষ-লোভে যে যে পাপকার্য করিয়াছ তৎসমস্ত নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে প্রদান কর।" এই কথা বলামাত্র তাহারা একপ্রকার বিস্ময়চকিত ও ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর 'প্রদান করি' বলামাত্র যিনি তাহাদের হস্ত হইতে জল গ্রহণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শরীর নিষ্পাপ ও দেদীপ্যমান করিলেন এবং তৎফলে বিপুল পুলকে তাহাদের অঙ্গে রোমহর্ষ হইল, নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রু পূর্ণ হইল, প্রেমরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে গদ্‌গদ্ স্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই বাণী নির্গত হইতে লাগিল, সুদীর্ঘ পাপাসক্তির পরে তাহাদিগের চিত্ত নির্মল হওয়ায় শুদ্ধ ভক্তি-যোগের আবির্ভাবে উদ্দাম কামাদি দোষ শূন্য হইল…।"[৩]

---

১ মু. ক.—২।১৩।১৭ ২ চৈ. চ. নাটক—১ম অংক

৩ অনুবাদ—অমূল্যক বিদ্যালংকার

জয়ানন্দ জগাই-মাধাই উদ্ধারের বিবরণ বিস্তৃতভাবেই দিয়েছেন। জগাই-মাধাই-এর চরিত্র ও অপকর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদৈত্য জগাই-মাধাই।
ভূতালিয়া সিধলিয়া চোর দস্যু দুই ভাই॥
মন সরিয়া বৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে॥
দস্যুগণ সঙ্গে থাকে বনে তেপান্তরে।
নিন্দ না জাএ কেহো জগাই-মাধাইর ডরে॥
অন্ন যোনি বিচার নাহিথ দুই ভাই।
স্নান সন্ধ্যা বিবর্জিত জগাই-মাধাই॥
গোবধ ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ জত।
বলে ছলে গুরুপত্নী হরে কত শত॥
গোমাংস শূকর মাংস করে সুরাপান।
ধর্মকথা না শুনে না করে গঙ্গাস্নানে॥
শিশু সব আছাড়িয়া মারে শিলাপটে।
কত শত গর্ভবতীর গর্ভ কাটে॥[১]

মাধাই যখন নিত্যানন্দকে আহত করলো, দূতমুখে শুনে গৌরচন্দ্র তখন—

জগাই বলে মাধাই কেন মারিলে সন্ন্যাসী।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়্যা ভয় নাঞি বাসি॥
জগাইরে বন্দী কৈল মাধাই পালাইল।
আর জত দস্যুগণ কান্দিতে লাগিল॥
নিত্যানন্দ বলে মোরে মারিল মাধাই।
আজিকার দুঃখে মোরে রাখিল জগাই॥
হাসিয়া আসিয়া বলে শ্রী নিত্যানন্দ।
দুই ভাইরে প্রেমভক্তি দেহ গৌরচন্দ্র॥

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—৭০।২-৯

জগাই বলে অপরাধ ক্ষেম গৌরচন্দ্র।
না জানিঞা মাধাই মারিল নিত্যানন্দ ॥
পতিত তারিতে দু ভাই আল্যা ক্ষিতিতলে।
জগাই-মাধাই তারিলে সংসার ভাল বলে ॥
পতিতপাবন তুমার নামখানি জাগে।
পতিত জগাই মাধাই প্রেমভক্তি মাগে ॥[1]

জয়ানন্দ বলেন, কৃপালাভ করার পরে জগাই-মাধাই গৌর নিতাই-এর কাছে কর্ম প্রার্থনা করে। গৌরচন্দ্র তুলসীপত্র গঙ্গাজল দিয়ে জগাই-মাধাইকে পাপ উৎসর্গ করতে বলেন, আর সেই জল নিজের মাথায় ছিটিয়ে দেওয়ায় গৌরচন্দ্রের মুখ ক্ষণেকের জন্য কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। পরে অবশ্য তাঁর স্বর্ণতুল্য গাত্রবর্ণ ফিরে এসেছিল।

জগাই-মাধাই পাপ উৎসর্গিল হাথে।
প্রভু ও অঞ্জলি গঙ্গাজল দিল মাথে ॥
কৃষ্ণবর্ণ মুখ হইল দেখ্যা লোকে ত্রাস।
নিমেষেকে হেমচন্দ মুখের প্রকাশ ॥
জগাইরে প্রেমভক্তি দিল গৌরচন্দ্র।
মাধাইরে হরিনাম দিল নিত্যানন্দ ॥[2]

প্রভুর আজ্ঞায় মাধাই গঙ্গায় ঘাট বাঁধলো, সেই ঘাটের নাম হোল পাপ-হরণ ঘাট।

লোচন দাসের বিবরণে জগাই-মাধাইএর দৌরাত্ম্য শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তদের নিয়ে পথকীর্তনে বহির্গত হলেন। মদে মত্ত জগাই-মাধাই উচ্চরবে হরি সংকীর্তন সহ্য করতে না পেরে প্রথমে দূত মুখে হরি-সংকীর্তন নিষেধ করলো, পরে দুই ভাই স্বয়ং ছুটলো ভক্ত মারতে। এই কীর্তনদলের মধ্যেই নিত্যানন্দকে আঘাত করলো মাধাই, আর নিতাই দিলেন তাদের হরিনাম।

দীন দয়ার্দ্রচিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দুহা পানে চায় ॥

---

১ চৈ. ম. নদীয়া—৬০।২১-২৮ ২ জয়ে ৭৩২-৫

সে করুণ আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
ক্রোধভরে দুই ভাই সম্মুখে দাঁড়াল ॥
জগাইর মন অমনি দরবিয়া গেল।
স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়ায়ে রহিল ॥
ক্রোধেতে মাধাই ধায় হাতে লঞা দণ্ড।
সম্মুখে পাইল ভগ্নকুণ্ড একখণ্ড ॥
কলসীর কানা সে ফেলিয়া মারে রোষে।
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥
নির্ভরে বাজিল কানা রক্ত পড়ে ধারে।
দেখি সর্ব নিজ জন হাহাকার করে ॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
গৌর বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে ॥
মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি ॥
মেরেছিস তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥[১]

লোচন অতঃপর বিশ্বম্ভর প্রভুর ক্রোধ, সুদর্শনকে আহ্বান, মানবরূপে করজোড়ে সুদর্শনের আগমন, নিত্যানন্দের প্রবোধে বিশ্বম্ভরের ক্রোধের প্রেমাশ্রুতে পরিণতি, জগাই মাধাইকে শাস্তি না দিয়েই বিশ্বম্ভরের স্বগৃহে আগমন, অনুতপ্ত জগাই-মাধাই এর নিমাই-এর গৃহে এসে চরণ ধরে কৃপা প্রার্থনা এবং গৌরাঙ্গ প্রভু কর্তৃক জগাই মাধাই-এর হাত থেকে তুলসী গ্রহণের মাধ্যমে পাপগ্রহণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, কবিকল্পনা হিসাবে লোচনের বিবরণ মনোজ্ঞ হলেও, বৃন্দাবনের বর্ণনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবতা সম্মত এবং গ্রহণযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ "তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই" বলে একটি বাক্যেই কর্তব্য শেষ করেছেন। মহাপ্রভুর উড়িয়া ভক্ত কানাই খুঁটিয়াও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন—

আর্তত্রাণ প্রভু ভক্তজনের প্রাণ।
জগাই মাধাই জীবনের কারণ ॥[২]

---

১ চৈ. ম. মধ্যখণ্ড ২ মহাভাব প্রকাশ

নরহরি চক্রবর্তীও জগাই মাধাই উদ্ধার কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন।[১] শ্যামদাসের রচিত একটি পদে জগাই মাধাই উদ্ধারের যে আলেখ্য আছে, তাতে গৌর নিতাই হরিদাস প্রমুখ বৈষ্ণব নেতৃবৃন্দের কীর্তন কালে জগাই মাধাইএর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং নিতাই আহত হয়ে জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন।

সংকীর্তন ছলে গৌর নিতাই নগরে বাহির হৈল।
জগাই মাধাই যথা বসিয়াছে তথা উপনীত ভেল ॥
খোল করতাল বিষম জঞ্জাল ভাবিল সে দোন ভাই।
মারিবার তরে সুধাভাণ্ড করে চলিল পশ্চাৎ যাই ॥
প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস আর দাঁড়াইল হস্ত মেলি।
সুধাভাণ্ড কান্ধা হাতেতে আছিল, মাধাই মারিল ফেলি ॥
নিতাই ললাটে সে কান্ধা লাগিল, ছুটিল শোনিত নদী।
তবু অবধূত কহে ভাই আয়, তরিবি এ ভব যদি ॥
আয় দেই কোল, বোল হরি বোল, আয়রে মাধাই ভাই।
শ্যামদাস কহে এমন দয়াল, কোনকালে দেখি নাই ॥[২]

এ বহুব্যাপ্ত বহুপ্রসিদ্ধ ঘটনাটিকে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর থেকেই গৌরচন্দ্রর পাপীর ত্রাতা ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

প্রাক্‌-সন্ন্যাস জীবনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আর একটি বিরাট কীর্তি কাজি-দলন। জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর ভক্তসঙ্গে নৃত্য সহ কীর্তন গান চলে রুদ্ধদ্বার গৃহে প্রতি রাত্রে। পাষণ্ডীরা ভয় দেখায় রাজা আসবে ধরে নিয়ে যেতে। কিন্তু গৌরচন্দ্র নির্ভীক—রাজার শাস্তির ভয় তাঁর নেই। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কাজিশাসন

প্রভু বোলে অস্ত অস্ত এসব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে করোঁ রাজ-দরশন ॥[৩]

দিবারাত্র কৃষ্ণনামগান ও নৃত্য ত চলতেই থাকে। তাছাড়া এই সময়ে একদিন দলবল নিয়ে গৌরাঙ্গদেব চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণলীলা অভিনয়

১ ভ. র. ১২ তরঙ্গ ২ গৌরপদ তরঙ্গিণী—১৮ নং পদ ৩ চৈ. ভা. মধ্য ১৮অঃ

করলেন। নারীর বসন অলংকার ইত্যাদি সংগ্রহ করা হোল। গদাধর রাধা সাজলেন, ব্রহ্মানন্দ হলেন তাঁর সখী বুড়ী, নিত্যানন্দ হলেন বড়াই বুড়ী, হরিদাস সাজলেন কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ, শ্রীমান্ পণ্ডিত দিয়ড়িয়া হাড়ি, গৌরচন্দ্র স্বয়ং রুক্মিণী বা লক্ষ্মীর বেশে অভিনয় করলেন।[১] এ অভিনয় হয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক। এই প্রথম অভিনয়ের সংবাদ পাচ্ছি বাঙ্গালা দেশে। নৃত্যগীত সহ আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় সবই ছিল এই অনুষ্ঠানে। এই বোধ হয় প্রথম যাত্রাগানের অনুষ্ঠান।

শ্রীবাসের গৃহাঙ্গনে রুদ্ধদ্বার গৃহে কীর্তন জমজমাট হয়ে ওঠে। নগরের লোক অদ্ভুত নৃত্যগীত দেখার জন্য উৎসুক। লোকে নানা উপহারসহ প্রণাম জানায় নিমাই পণ্ডিতকে। প্রভু সকলকে জপ করতে উপদেশ দিলেন মহামন্ত্র :

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥[২]

তিনি আরও উপদেশ দিলেন প্রতি ঘরে ঘরে আত্মীয় স্বজন পাঁচ দশ জন একত্রে মিলে দুয়ারে বসে হাততালি দিয়ে হরিনাম কীর্তন করতে—

দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্তন কহিল এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥[৩]

অনেকের ঘরেই দুর্গোৎসবের সময়ে বাজাবার জন্য মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ প্রভৃতি আছে। এইসব বাদ্য সহযোগে অনেকেই নিজ নিজ গৃহে কীর্তন করতে থাকে। একদিন কাজি এই পথে যাবার সময় হরিনাম কীর্তন কোলাহল শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে খোল ভেঙে মারধোর করে সকলকে বিতাড়িত করলে এবং হরিনাম কীর্তন নিষিদ্ধ করে দিলে।

১ চৈ. ভা. মধ্য ১৮ অঃ ২-৩ চৈ. ভা. মধ্য ২৩ অঃ

কাজি বোলে ধর ধর আজি করোঁ কার্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য॥
আথে ব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বোলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া॥
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাও আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলেই লইব জাতি॥[১]

এখন কাজি দলবল নিয়ে পথে পথে কীর্তনের খোঁজ করে ফেরে। সুতরাং নগরের লোকজন লুকিয়ে থাকে ঘরে। কীর্তনের বাধা শুনে বিশ্বম্ভর পূর্বের মতই দর্পিত উদ্ধত হয়ে উঠলেন। তিনি ক্রোধে রুদ্রমূর্তি হয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন—ঘোষণা করলেন নবদ্বীপের পথে পথে তিনি কীর্তন করবেন॥

কীর্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্রমূর্তিধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি হরি বোলে নাগরিয়াগণ॥
প্রভু বোলে নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সর্ব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম করে কোন জন॥
দেখ আজি কাজির পোড়াও ঘরদ্বার।
কোন কর্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥
প্রেমভক্তিবৃষ্টি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীর গণের হইব আজি কাল॥[২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে প্রভু নবদ্বীপবাসীদের ঘরে ঘরে কীর্তন করতে

১-২ চৈ. ভা মধ্য ২৩ অঃ

আদেশ দিলেন। ঘরে ঘরে কীর্তনের ধ্বনি শুনে যবনগণ ক্রুদ্ধ হয়ে কাজির কাছে নালিশ জানায়। কাজি এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হয়ে সন্ধ্যাকালে এক বাড়ীতে প্রবেশ করে মৃদঙ্গ ভেঙ্গে কীর্তন নিষেধ করে দিলেন।

ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজি এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকাল কেহ নাহি কৈলে হিন্দুয়ানী।
এবে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি।
কেহ কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥[১]

প্রভু নবদ্বীপবাসীদের আশ্বাস দিয়ে নগর কীর্তনের সংকল্প ঘোষণা করলেন—

নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে সবে কর নগর মণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ কোন্ কাজি আসি মোরে মানা করে॥[২]

বৃন্দাবন বলেন, গৌরচন্দ্র সকলকে নগরকীর্তনের সময় হাতে দীপ নিয়ে আসতে আদেশ করেছেন, সুতরাং সকলেই তৈলভাণ্ড ও দেউটি (মশাল) নিয়ে হাজির হয়েছেন। সুতরাং মশালের আলোয় আলোকময় হয়ে উঠলো নবদ্বীপ— হইল দেউটিময় নবদ্বীপ পুর।[৩] সুপরিকল্পিত পন্থায় নগর কীর্তনের আয়োজন। জনসমষ্টিকে কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হোল যুদ্ধকালে সৈন্যবিন্যাসের মত। এক একজন বৈষ্ণব প্রধান সেনাপতির ভূমিকা নিয়ে এক একটি সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করবেন। প্রথম সম্প্রদায়ের নেতা হবেন অদ্বৈত আচার্য, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নেতা যবন হরিদাস, তারপরে থাকবেন শ্রীবাস পণ্ডিতের সম্প্রদায়। গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য, গোবিন্দ, মুকুল, শ্রীধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ কীর্তনে যোগ দিলেন। সন্ধ্যা হতেই বহুলোকের সমাবেশ হোল বিশ্বম্ভরের দ্বারে, বৃন্দাবনের ভাষায় "কোটি কোটি লোক আসি আছয়ে দুয়ারে।" সকলেই হরিধ্বনি করে মশাল জ্বালে।

১-২ চৈ. চ. আদি ১৭ পরি ৩ চৈ. ভা মধ্য ২৩ অঃ

লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে হরিবোলে ॥[১]

বৈষ্ণবগণ কণ্ঠমাল্য, ফাগু ও চন্দনে দেহ ভূষিত করে গৌরাঙ্গের চতুর্দিকে ঘিরে কীর্তন করছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চন্দন-চর্চিত ললাটে ফাগুর বিন্দু, বক্ষে আজানুলম্বিত পুষ্পমালা—পরিধানে সূক্ষ্ম শুভ্র বসন—মস্তকে ফুলমালাবেষ্টিত, তাঁর সুবর্ণবর্ণ, সুদীর্ঘ কলেবর, উন্নত নাসিকা, সিংহগ্রীব—দুই বাহু তুলে হরি হরি বলতে বলতে কীর্তনে নৃত্য করতে করতে চলেছেন। অদ্বৈত আচার্য, হরিদাস, শ্রীবাস প্রমুখ এক এক জন ভক্তের নেতৃত্বে এক এক দল চলেছে পথ দিযে ভাগীরথীর তীর ধরে। সব-পশ্চাতে চলেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এ এক অদ্ভুত অভূতপূর্ব দৃশ্য। বৃন্দাবন এই দৃশ্যের বর্ণনায় লিখেছেন—

চতুর্দিগে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দিগে হরি বোলে ॥

*　　　*　　　*

নগরে উঠিল মহাকৃষ্ণ কোলাহল।
হরি বলি ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকলে ॥
হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।
হরি বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান ॥
ঠাঞি ঠাঞি এই মত মিলি দশ পাঁচে।
কেহো গায় কেহো বায় কেহো মাঝে নাচে ॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব নবদ্বীপে যায় ॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥
কেহো কেহো নাচয়ে হইয়া একমেলি।
দশে পাঁচে নাচে কেহো দিয়া করতালি ॥[২]

জনসংখ্যার হিসাবে অতিশয়োক্তি আছে ঠিকই। কিন্তু এই বিপুল জনসমাবেশের শক্তিকে অস্বীকার করবে কে? জনগণ কেবল হরিনাম সংকীর্তনে

১-২ চৈ. ভা. মধ্য ২৩ অঃ

বস্তু নয়, তারা অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার জন্যও আস্ফালন করতে করতে চলে।

কেহো বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগি পাও এখনে ছিণ্ডিয়া ফেলো মাথা॥
রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥[১]

গঙ্গার তীরে তীরে বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাট পেরিয়ে এই বিপুল জনসঙ্ঘ এল সিমুলিয়া ঘাটে। সিমুলিয়াতে ছিল কাজির আবাস। গঙ্গার ঘাট থেকে জনসমষ্টি চললো কাজির বাড়ীর দিকে। বিপুল কলরোল শুনে কাজি লোক পাঠালো তত্ত্ব অবগত হতে।

কাজি বোলে জান ভাই কি গীত বাজন।
কিবা কারো বিভা কিবা ভূতের কীর্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি আয় তবে চলিব আপনি॥[২]

দূত দেখে এসে সত্রাসে সংবাদ দেয়:

কি কর চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই আচার্য।
সাজিয়া আইসে আজি কি বা করে কার্য॥
লাখ লাখ মহাতাপ দেউটি সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বোলে॥[৩]

রাত্রিকালে জ্বলন্ত মশাল হাতে উদ্ধত বিপুল জনসমষ্টিকে নাচ গান করতে করতে মার মার করতে করতে ছুটে আসতে দেখে দূতের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। লোকসংখ্যা নির্ণয় সম্ভব ছিল না, তাই লক্ষ কোটি লোক বলাও অসঙ্গত নয়। কাজির সঙ্গে কিছু প্রহরী ও অনুচর পরিজন ছাড়া সৈন্যবাহিনী নিশ্চয়ই ছিল না। উন্মত্ত বিশাল জনসংঘট্ট দেখে কাজির ভীত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং কাজি লোকজন সহ ভয়ে পলায়ন করলো।

শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ সহ ধায়।
সর্পভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ২৩ অঃ

পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভরগণে।
ভয়ে পলাইতে কেহো দিগ্ নাহি জানে ॥[১]

প্রভু বিশ্বম্ভর কাজির দ্বারে এসে রুদ্রমূর্তিতে হুংকার ছাড়লেন,—কাজিকে ধরে এনে মাথা কাটো।

ক্রোধে বোলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা ॥
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কাল যবন ॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ প্রভু বোলে বার বার ॥[২]

নেতার অলঙ্ঘনীয় আদেশ মুহূর্তমধ্যে অনুচরবর্গের অন্তরে ক্রোধবহ্নি সঞ্চার করে দিল। তারাও কাজির ঘর দুয়ার ভাঙতে বাগানের ফুলগাছ ছিঁড়তে লেগে গেল।

কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহো ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার ॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহো ফেলে।
কেহো কদলির বন ভাঙ্গি হরি বোলে ॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া ॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরি বলি নাচে সব শ্রুতিমূলে গিয়া ॥[৩]

একদিকে বাইরের ঘরের জানালা কপাট ভাঙা চলে, আর ওদিকে নেতা আদেশ দেন বাড়ীতে আগুন লাগাও।

ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥
পুড়িয়া মরুক সর্বগণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেঢ়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে ॥

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ২৩ অঃ

দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখোঁ মোরে কোন্ জনে করে অব্যাহতি ॥[১]

ভক্তগণ প্রভুর রুদ্রমূর্তিতে সন্ত্রস্ত হয়ে স্তুতিনতি করে প্রভুকে শান্ত করলেন। অত্যাচারী-কাজিকে শাসন করে মহানন্দে কীর্তন করতে করতে চললো জনসংঘ।

কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্বনগরিয়া।
মহানন্দে হরি বলি যায়েন নাচিয়া ॥[২]

কীর্তন করতে করতে গৌরাঙ্গ প্রভু শাখারি পাড়া গেলেন, সেখান থেকে তাঁতিপাড়া—তারপরে গেলেন দীন দরিদ্র শ্রীধরের গৃহে। শ্রীধরের আঙিনায় কীর্তন করতে করতে তাঁর ভাঙ্গা লোহার বাটিতে জলপান করে দরিদ্রের মর্যাদাকে তুঙ্গে স্থাপন করলেন।

সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি তাহা চোরেও না হরে ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে ॥
প্রেমভক্তি বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।
লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ ॥
জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনায়।[৩]

শ্রীধরের লৌহপাত্রে জলপান

গৌরচন্দ্র যেমন প্রচণ্ড ক্রোধে অত্যাচারী শাসকের প্রতীক কাজিকে শাসন করলেন, তেমনি তিনিই পরম প্রেমে ও করুণায় দীনদুঃখী শ্রীধরের ভাঙ্গা লোহার বাটিতে জলপান করে দরিদ্র ভক্তের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করলেন। মহামানবের অলৌকিক কার্যাবলী সবই অসাধারণ। কিছু পূর্বের রুদ্ররূপী গৌরাঙ্গ ও কিছু পরের পরম কারুণিক ভক্তবৎসল গৌরাঙ্গ কত তফাৎ!

কবিরাজ গোস্বামী যদিও কাজি-শাসন ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বৃন্দাবনের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন, তথাপি তাঁর প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণে বৃন্দাবনের বিবরণ থেকে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন, হরিনামকীর্তন সম্প্রদায়ের পুরোভাগে ছিলেন যবন হরিদাস, মধ্যে অদ্বৈত আচার্য ও শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু। কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণে জনসমুদ্রের রুদ্র কল্লোল শুনে কাজি ঘরে লুকিয়েছিলেন,

১-৩ চৈ. ভা. ২৩ অঃ

গৌরাঙ্গদেব ভব্য লোক দিয়ে তাঁকে ডাকিয়ে আনলেন এবং উভয়ের মধ্যে গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়তার প্রসঙ্গ আলোচিত হোল ; পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝা-পড়াও হয়ে গেল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ

তবে মহাপ্রভু দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজিরে বোলাইলা॥
দূর হৈতে আসে কাজি মাথা নোঙাইয়া।
কাজিরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলেন, আমি আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম কিমত॥
কাজি কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হৈঞা।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইঞা॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে আসি মিলিলাঙ।
গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥[১]

অতঃপর গৌরচন্দ্র গোমাংস ভক্ষণ সম্পর্কে কাজির সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। কাজি এই বিতর্কে পরাজিত হন। কাজি আরও বলেন যে কীর্তন নিষেধ করার ফলে নরসিংহ রাত্রিকালে তাঁকে আক্রমণ করেন এবং কীর্তন নিষেধ করলে সবংশে যবন ধ্বংস করার ভয় দেখান। কাজি আরও সংবাদ দিলেন যে কীর্তন নিষেধ করার ফলে দাড়িতে আগুন লেগে এক পেয়াদার মুখে দগ্ধক্ষত হয়েছে। কীর্তন নিষেধ করার কারণ সম্পর্কে কাজি বললেন, একদল যবন ও একদল পাষণ্ডী হিন্দু এসে নিমাই-এর নেতৃত্বে হরিনাম সংকীর্তনের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। কাজির মুখে রামকৃষ্ণ ও হরির নাম উচ্চারণ শুনে কাজিকে ভাগ্যবান বলে প্রশংসা করলেন বিশ্বম্ভর। কাজি বিগলিত হয়ে প্রভুর চরণ ধরে বললেন,—

তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥[২]

১-২ চৈ. চ. আদি ৭ পরি

প্রভু অনুরোধ করলেন, নদীয়ায় কীর্তন যেন নিষিদ্ধ না হয়। কাজিও আশ্বাস দিলেন, তাঁর বংশধররা কেউ কখনও কীর্তন নিষেধ করবে না।

কাজি কহে মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে॥[১]

কাজিকে বশীভূত করে প্রভু কীর্তন করতে করতে সদলে চললেন, কাজিও চললেন কীর্তনের সঙ্গে। গৌরহরি কাজিকে বিদায় দিয়ে ফিরে গেলেন স্বগৃহে।

কাজি-শাসনের পরিণাম সম্পর্কে বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাস দু'রকম বিবরণ দিয়েছেন, অথচ কাজির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাওয়ার বিবরণ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন। যদিও বৃন্দাবনের বিবরণে আতিশয্য অবশ্যই আছে (বিশেষতঃ জনসংখ্যার ব্যাপারে) তথাপি তাঁর বিবরণই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কারণ বৃন্দাবন প্রত্যক্ষদর্শী নিত্যানন্দ ও মাতা নারায়ণীর মুখ থেকে শুনেছেন। কবিরাজ গোস্বামী একটি বিশেষ তত্ত্বের আলোকে শ্রীচৈতন্যের জীবন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা প্রভাবিত। রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে শ্রীচৈতন্যের মধুর রসাশ্রিত রূপ তাঁদের উপাস্য। কিন্তু বৃন্দাবনেব কাব্যে শ্রীচৈতন্যের রুদ্র ও কোমল উভয় রূপই প্রকটিত। মনে হয় বৃন্দাবন চৈতন্য-চরিত্রের যথার্থ বিশিষ্টতার রূপকাব। বৃন্দাবন চক্রধারী মহাবীর কৃষ্ণকে দেখেছেন চৈতন্যচরিত্রে, রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে নয়। আত্মগোপনকারী কাজির সঙ্গে গোমাংস ভোজনের অযৌক্তিকতা সম্পর্কে বিচার—কাজিকে রামকৃষ্ণহরি বলিয়ে চৈতন্যচরণে ভক্তিনত করা—এমন কি কাজিকে হরিনামের মিছিলে সামিল করার ঘটনা সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য সাময়িকভাবে বিশাল জনতার আক্রোশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাজির আত্মগোপন যেমন সম্ভব, তেমনি উত্তেজনা প্রশমনের পরে গ্রাম্য সম্পর্কে নিমাই-এর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে সন্ধির চেষ্টাও স্বাভাবিক। কারণ নিমাই-এর বিপুল জনপ্রিয়তা, জনসমর্থন ও দক্ষ নেতৃত্ব অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে অন্যান্য জীবনীকাররা স্পষ্টভাবে কাজি-শাসন

১ চৈ. চ. আদি ৭ পরি

সম্পর্কে উল্লেখ করেন নি। সেইজন্য কোন কোন পণ্ডিত এই ঘটনার সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। একজন লিখেছেন, "কাহিনীটি যে সম্পূর্ণ বৃন্দাবনের কল্পনা-প্রসূত তাহা বুঝা যায় ইহা হইতে যে কাহিনীর বহু চমৎকারিত্ব সত্বেও কর্ণপূর ইহার উল্লেখমাত্রও করেন নাই এবং মুরারি শুধু বলিয়াছেন, নিমাই নগরে হরিসংকীর্তন করিয়া ম্লেচ্ছদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন... ।"[১]

আর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত লিখেছেন, "আমার মনে হয় যে, কোন কোন মুসলমান নগর সংকীর্তনে বাধা দেওয়ায় বিশ্বম্ভর নগর সংকীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন, সংকীর্তন বিরোধিগণের বাড়ীর পাশ দিয়া সজোরে কীর্তন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার দলের কোন কোন লোক বিরোধী মুসলমানদের গাছপালা নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা সত্বেও কীর্তনের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বিরোধীদলের প্রধান ব্যক্তি ভক্তিধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২]

কিন্তু কাজি প্রসঙ্গ মিথ্যা কাল্পনিক বোধ হয় না। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল-কাব্যে কাজি-দলন কাহিনীর উল্লেখ করেছেন।

কাজি কাহিনীর সত্যতা বিচার

> সিমলিআ গ্রামে কাজির ঘর ভাঙ্গি।
> সাত প্রহরিয়া ভাবে হইলা কত রঙ্গী ॥
> ঘরে ঘরে নবদ্বীপে হরি-সঙ্কীর্তন।
> সিমলিয়া ছাড়িয়া পলাইল যবন ॥[৩]

বৃন্দাবনের বিবরণে যদিও মুরারি কাজির গৃহে অভিযানের দলে উপস্থিত ছিলেন তবু তাঁর গ্রন্থে স্পষ্টভাবে কাজি-দলন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নি। তিনি কেবল হরি-সংকীর্তন করে ম্লেচ্ছ উদ্ধারের উল্লেখ করেছেন—

> হরিসঙ্কীর্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ ॥
> ম্লেচ্ছাদীনুদ্ধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ ॥[৪]

জয়ানন্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বৃন্দাবনের অনুরূপ। মুরারির ম্লেচ্ছ উদ্ধার কাজি-উদ্ধার হতে পারে না তা নয়। মুরারির কাব্যে শ্রীচৈতন্যের রাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনুর বিবরণ পাওয়া যায়। মনে হয়, মুরারি, কবিকর্ণপূর প্রমুখ

১ ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—অমূল্য সেন
২ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—পৃঃ ২১৪
৩ চৈ. ম. উত্তর—৪৪/৪৫ ৪ মু. ক.—২।১৭।১১

জীবনীকারেরা মধুর ভাবের ভাবুক হওয়াতেই গৌরহরির বাস্তব কঠোরমূর্তির বিবরণ অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে চৈতন্যজীবনের অনেক ঘটনাই বাদ দিয়েছেন, কিন্তু শ্রীবাস কথিত শ্রীগৌরাঙ্গকর্তৃক আদি রসাত্মক রাধা-কৃষ্ণ লীলারস আস্বাদনের বর্ণনায় তিনি দুটি সর্গ ব্যয় করেছেন (৯ম ও ১০ম সর্গ)। বৃন্দাবন যে ভাবে কাজির অন্যায় অত্যাচারের মহাপ্রভু কর্তৃক প্রতিবাদের বিবরণ দিয়েছেন, তা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মত স্পষ্ট। এ বিবরণ অলীক হতে পারে না। পরবর্তীকালে নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকরে (১২ তরঙ্গ) কাজিদলনের বিবরণ দিয়েছেন। এ ছাড়াও কাদি নামক এক যবনের (কোন রাজকর্মচারী ?) সংকীর্তন বিরোধিতার বিরুদ্ধে গৌরচন্দ্রের সক্রিয় প্রতিবাদের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন।

কাদি দুষ্ট কীর্তন সহিতে নারে কভু।
করিল কীর্তন বাদ শুনিলেন প্রভু॥
শুনি মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া গৌরহরি।
আপনার তত্ত্ব প্রকাশয়ে দর্প করি॥
ঘন ঘন হুঙ্কার করয়ে মহারঙ্গে।
নগর কীর্তনে প্রভু সাজে গণসঙ্গে॥
হইল সর্বত্র ধ্বনি—শচীর নন্দন।
নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।[১]

এই ঘটনার সত্যতা বিচারের কোন অবকাশ নেই। অন্য কোন চরিতগ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করার মত দৃঢ় অনমনীয় মনোভাবটি তাঁর চরিত্রে আকস্মিক নয়,—পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাঙ্গালাদেশে তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শ্রীগৌরাঙ্গের নেতৃত্বে এই গণআন্দোলন অহিংস সত্যাগ্রহের প্রথম নিদর্শন। নিরস্ত্র গণশক্তির কাছে শাসককে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল, ভক্তগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গের হরিনাম সংকীর্তনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল।

---

১ ভ. র.—১২ তরঙ্গ

অষ্টম অধ্যায়

নিমাই সন্ন্যাস

বাধাহীন হয়েছে হরিনাম সংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে কীর্তনানন্দে মেতে থাকেন গৌরচন্দ্র। কখনও কৃষ্ণনাম শ্রবণেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন।

হেন সে হইলা প্রভু হরিসংকীর্তনে।
কৃষ্ণনাম শ্রুতিমাত্র পড়ে যেতে স্থানে॥
কি নগরে কি চত্বরে কি জলে বা বনে।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥
আপ্তগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বম্ভর॥
কেহো মাত্র কোনরূপে যদি বোলে হরি।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥
মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে॥[১]

পূর্ববৎ শ্রীবাসের গৃহে অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সহ সংকীর্তন চলতে থাকে। বৃন্দাবন বলেছেন, কখনও কৃষ্ণের আবেশ হয় তাঁর মধ্যে, কখনও বা গোপীনাম জপ করতে থাকেন।

ক্ষণে বোলে মুঞি সেই মদন গোপাল।
গোপীভাব ক্ষণে বোলে মুঞি কৃষ্ণদাস সর্বকাল॥
গোপী গোপী গোপী মাত্র কোন দিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জলে মহাকোপে॥[২]

বৃন্দাবনের এই বিবরণ অনুসারে গোপীভাবের আবেশ গৌরচন্দ্রের প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনেই কখন সখন দেখা গেছে। মানিনী গোপীর মত তিনি কখনও কৃষ্ণনাম শ্রবণে কপট কোপ প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী রাধাভাব ভাবুকতায়

১-২ চৈ. ভা. মধ্য ২৩ অঃ

এই প্রথম আভাস। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সকল সময়েই যে ভাবতন্ময় হয়ে থাকতেন তা নয়, মাঝে মাঝে সাংসারিক কাজকর্মেরও ইঙ্গিত পাই বৃন্দাবনের বক্তব্যে।

বাহ্যচেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ কারণে ॥[১]

আবার কখনও গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে কৌতুক রসে মত্ত হন। এইভাবেই দিনগুলি কাটছিল। একদিন গৌরাঙ্গদেব সভার মাঝে নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করে হেঁয়ালি ভাষায় সন্ন্যাস গ্রহণের ইঙ্গিত দিলেন—

করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ্ বাঢ়িল দেহেতে।[২]

এই ধাঁধা বলে গৌরাঙ্গ হাসতে লাগলেন। নিত্যানন্দ এর অর্থ বুঝলেন, তবে তিনি বিষণ্ণ হলেন গৌরহরি সংসার ত্যাগ করবেন ভেবে। তারপর তিনি নিভৃতে নিত্যানন্দকে সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পর্কে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন—

ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে।
তরণ নহিল আইলাঙ সংহারিতে ॥
সন্ন্যাসের প্রস্তাব
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধনাশ।
এক গুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি পাশ ॥

* * *

দেখ কালি শিখাসূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥
সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার ॥
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলো দেখি কে মোহোরে মারে ॥[৩]

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ২৪ অঃ

তারপর তিনি মুকুন্দকে বললেন—

গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ্ সুনিশ্চিত।
শিখাসূত্রে ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভীত ॥[১]

গদাধরকে প্রভু বললেন—

না যাইব গদাধর আমি গৃহবাসে।
যে-তে দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥
শিখাসূত্র সর্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুণ্ডাইয়া যে-তে দিগে চলি যাব ॥[২]

ভক্তরা শোকে কাতর হলেন। শচীমায়ের কথাটা তাঁরা চিন্তা করলেন বিশেষভাবে। মুকুন্দ অনুনয় করলেন, আরও কিছুকাল অন্ততঃ থাক। গদাধর তর্ক তুললেন: ঘরে থেকে ঈশ্বর ভজন কি হয় না? এভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ বেদ-বিরোধী, সন্ন্যাস নিলে কি এমন হয়? ভক্তগণকে প্রবোধ দিলেন গৌরহরি, বললেন, আমি সব সময়ই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবো—

তোমরা বা ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া ॥
সর্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে ॥[৩]

ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিয়ে গৌরচন্দ্র স্বগৃহে গেলেন। লোকমুখে নিমাই-এর গৃহত্যাগের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। শচীদেবীও শুনলেন সেই মর্মবিদারী সংবাদ। তিনি অনুরোধ করলেন প্রিয় পুত্রকে ভক্তগণ সঙ্গে স্বগৃহে কীর্তন করে কালযাপন করতে। শেষে শচী মোক্ষম যুক্তি বিস্তার করলেন—

মাতৃসান্ত্বনা

ধর্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন ধর্ম বা বিচার ॥
তুমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা ॥[৪]

পতির মৃত্যু ও বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের দুঃখ উল্লেখ করে শচী নিমাইকে অনুরোধ করেন মাকে ছেড়ে না যেতে। তিনি আহার ত্যাগ করলেন, দেহ

১-৪ চৈ. ভা. মধ্য ২৫ অঃ

হোল অস্থিচর্মসার। তখন বিশ্বম্ভর মাকে প্রবোধ দিলেন, বললেন, জন্মে জন্মে তুমি আমার মা, তোমাকে আমি কখনও ত্যাগ করতে পারি না।

এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্মে ॥[১]

সন্ন্যাসের সংকল্প ভক্তজনের কাছে ব্যক্ত করলেও প্রভু নিরবধি কীর্তনরঙ্গেই ভাসতে লাগলেন। সন্ন্যাসের পূর্বদিন তিনি নিত্যানন্দকে বললেন তাঁর সন্ন্যাসের বিষয় আর বললেন পাঁচজন ব্যক্তির কাছে সংবাদটি প্রকাশ করতে :

শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
একথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চজন ঠাঞি ॥
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥
ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম ॥
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পঞ্চজনারে কথা কহিবা বিদিত ॥
আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য অপর মুকুন্দ ॥[২]

গৃহত্যাগের পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাদর্শন করে গৃহে ফিরে এসে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে কৌতুক করলেন ; সকলকে উপদেশ দিলেন কৃষ্ণভজনা করতে :

বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন ॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইব আর ॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে ॥[৩]

সন্ধ্যাকালে শ্রীধর এনে দিলেন লাউ, এক ভক্ত এনে দিলেন দুধ, প্রভু মাকে বললেন লাউ-দুধ রান্না করতে। ভোজনান্তে তিনি শয়ন করলেন।

১-৩ চৈ. ভা. মধ্য ২৪ অঃ

শচী জানেন, নিমাই আজ রাত্রে গৃহত্যাগ করবেন, তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। সকলে নিদ্রিত, রাত্রি আর চার দণ্ড অবশিষ্ট, শচী বসে আছেন দ্বারে। বিরক্ত পুত্র মাকে প্রবোধ দিয়ে মায়ের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে জননীর পদধূলি মাথায় দিয়ে গৃহত্যাগ করলেন।

আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর॥
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পঢ়িলাঙ্ শুনিলাঙ্ তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্ধেকো না লইলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলা ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শুধিবার॥

* * *

বুকে হাথ দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥[১]

প্রাণের নিমাই মাতৃপদধূলি নিয়ে চলে গেলেন মায়ের স্নেহাঞ্চল ছেড়ে, কিন্তু পৃথিবীস্বরূপা শচী জড়ের মতন বসে রইলেন।

প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড়প্রায় হইলেন নাহি স্ফুরে কথা॥[২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজও শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গোপীনাম জপের উল্লেখ করেছেন—

একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
গোপী গোপী নাম লয় বিষণ্ণ হঞা॥[৩]

শ্রীগৌরাঙ্গের গার্হস্থ্যজীবনের শেষ দিনটি সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কিছুই বলেন নি। গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে নিন্দুক, দুর্জন,

---

১ চৈ. ভা. মধ্য ২৪ অঃ ২ চৈ. ভা. মধ্য. ২৪ অঃ ৩ চৈ. চ. আদি ১৭ পরি

পাপী-তাপী ব্যক্তি সন্ন্যাসী গৌরহরিকে প্রণাম করে পাপমুক্ত হয়ে উদ্ধার হয়ে যাবে।

মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য এতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাই এ যুক্তি সার॥[১]

জয়ানন্দের কাব্যে একদিন রাত্রিশেষে শ্রীবাসকে গৌরচন্দ্র জানালেন তাঁর সংসার ত্যাগের বাসনা :—

আর দিন গৌরাঙ্গ বড় নিশি অবশেষে।
শ্রীনিবাস পণ্ডিতেরে কহিল বিশেষে॥
আজি হৈতে ছাড়িল সংসার অভিলাষ।
নবদ্বীপ সম্প্রতি ছাড়িব শ্রীবাস॥
অধ্যয়ন করিল করাল্য অধ্যাপনা।
আর গৃহ সুখে মোর নাইক বাসনা॥
স্রক্ চন্দন বনিতা উপভোগ জত।
অনিত্য সংসার স্বপ্ন হেন মোর মত॥
বিষয়ভুজঙ্গ বিষ সর্বক্ষণ দেহে।
বিনি কৃষ্ণ না ভজিলে নিবারণ দেহে॥[২]

এই সময়েই তিনি নীলাচলে জগন্নাথের কাছে বাস করার বাসনা প্রকাশ করলেন এবং শচীমাতার কাছেও বিদায় প্রার্থনা করলেন।

গৌরচন্দ্র বলে মা তুমার গর্ভে জন্ম।
কৃষ্ণ না ভজিঞা করিলা কোন কর্ম॥
না কর বিরোধ মা দেহ ত মেলানি।
ধ্রুবেরে বৈষ্ণব কৈল ধ্রুবের জননী॥[৩]

১ চৈ. চ. আদি ১৭ পরি ২ চৈ. ম. বৈরাগ্য—৪।১-৫ ৩ চৈ. ম. বৈরাগ্য—৪।২০-২১

শচীঠাকুরাণী এই মর্মন্তুদ বাক্য শুনে রোদন করতে থাকলে শ্রীগৌরাঙ্গ পুরাণ-কথিত ধ্রুব উপাখ্যান সবিস্তারে জননীকে শোনালেন। শচীমাতার মন কিছুটা প্রবোধ মানলেও পুত্রকে নিজের দুঃখের কথা, বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের কথা বলে নবদ্বীপে থেকে সংকীর্তন করে ধর্মপালন করতে অনুরোধ করলেন। এই সময়ের পর থেকে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি স্নান, বেশভূষা, শয্যা, জপ, পূজা, দেবার্চনা, পরিকরদের সঙ্গে রহস্যালাপ—সবই ত্যাগ করলেন। একদিন পরিকরগণের কাছে জড়ভরতের উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তিনি প্রবল বৈরাগ্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নগর-সংকীর্তন করে ঘরে ঘরে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করতে থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন স্বামীকে নূতন গামছা উপহার দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে নিবেদন জানালেন :

জথা তথা জায় তুমি সঙ্গে জাইব আমি
না ছাড়িবা দ্বিজরাজ।
করিব তুমার সেবা সেই সে আমার শোভা
গৃহ পরিজনে পড়ু বাজ ॥[১]

বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ

শ্রীগৌরাঙ্গ সান্ত্বনা দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে, দিতে চাইলেন নিজের যজ্ঞসূত্র আর উপদেশ দিলেন, প্রত্যহ হরে কৃষ্ণ হরে রাম বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র জপ করে একটি তণ্ডুল রাখবে, দুই প্রহরে যতগুলি চাল হবে সেইগুলি একত্র করে রন্ধন করে কৃষ্ণের ভোগ দিয়ে ভোজন করবে। আর—

সঙ্কীর্তন করাইহ বৈষ্ণবে অন্ন দিহ
এই সত্য পালিহ আমার ॥[২]

গৌরচন্দ্র আরও বললেন,—স্ত্রীসঙ্গ সন্ন্যাসে না হএ।[৩] স্বামীর আদেশ বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা পেতে নিলেন।

একথা শুনিয়া সতী বিষ্ণুপ্রিয়া মৌনব্রতী
যজ্ঞসূত্র লইল হাথ পাতিয়া ॥[৪]

বিষ্ণুপ্রিয়া তথাপি বারো মাসের দুঃখ কাহিনী শোনালেন। পুনর্বার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং জানালেন—

আমার বচন সতী কর অবধান।
তুমার শাশুড়ী যেন দুঃখ নাঞি পান ॥[৫]

---

১ চৈ. ম. বৈরাগ্য—১২।৯ ২ চৈ. ম. বৈরাগ্য—২২।১৭ ৩ চৈ. ম. বৈরাগ্য—২২।২০
৪ চৈ. ম. বৈরাগ্য—২২।২১ ৫ চৈ. ম. বৈরাগ্য—২৫।১৩

জয়ানন্দের বিবরণ অনেকটাই গালগল্প মনে হয়। তিনি লোকরঞ্জনের জন্য মঙ্গলগান রচনা করেছেন। তাই তাঁর অনেক বর্ণনাই তথ্যভিত্তিক নয়। তবে বিষ্ণুপ্রিয়াকে হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বত্রিশ অক্ষর নাম জপের সঙ্গে তণ্ডুল গণনা করে সেই তণ্ডুলে অন্নপাক করে দেবতাকে নিবেদন করে ভোজন করার ও মাতার পরিচর্যা করার আদেশ দানের উল্লেখ বহু গ্রন্থেই পাওয়া যায়। জয়ানন্দের কাব্যানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ মুকুন্দ, গোবিন্দানন্দ ও নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে কাটোয়া গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও বৃন্দাবন বা কৃষ্ণদাসের বিবরণের সঙ্গে জয়ানন্দের বিবরণের মিল দেখা যাচ্ছে না।

লোচনের বিবরণও ভিন্ন প্রকার। তাঁর কাব্যে গৌরহরি একদিন শ্রীবাসের গৃহে ভক্তগণসমক্ষে সন্ন্যাসের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বললেন—

ধন জন যৌবন সকল অকারণ।
না ভজিনু সত্যবস্তু কৃষ্ণের চরণ॥
নিরন্তর দগধে সংসারে মোর হিয়া।
না করিলুঁ কৃষ্ণকর্ম হেন দেহ পাঞা॥
সংসার-দুর্লভ এই মনুষ্য শরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হয় ধীর॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে এই মিছা সব দেহ।
পতিসুত পিতামাতা মিছা সব গেহ॥[১]

এর পর শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরচন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ঝাঁটা কোদাল নিয়ে সদলে ঠাকুর বাড়ী সাফা করলেন লোকশিক্ষার নিমিত্ত ও কুষ্ঠরোগী উদ্ধার করলেন। এক ব্রাহ্মণ গৌরচন্দ্রের রুদ্ধদ্বার গৃহে কীর্তন নর্তন দেখতে না পাওয়ায় গঙ্গার ঘাটে তাঁকে সংসারসুখরহিত হওয়ার অভিশাপ দিলেন, এই সংবাদে শচী শোকপ্রকাশ করলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্নে দীক্ষামন্ত্র লাভ করলেন। কেশব ভারতী নবদ্বীপে এলে সন্ন্যাস সম্পর্কে গৌর-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হোল। শচীদেবী পুত্রের সংসার ত্যাগের সম্ভাবনায় শোককাতর হয়ে পড়লেন। তিনি পুত্রকে বললেন—

হাপুতির পুত মোর সোনার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই॥

১ লোচন—চৈ. ম. মধ্যখণ্ড

বিষ খাঞা মরিব যে তোর বিশ্বমানে।
তোমার সন্ন্যাস কথা না শুনিব কানে॥
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে;
আগুনি জ্বালিয়া তাহে করিব প্রবেশে॥[১]

গৌরচন্দ্র তখন মাকে প্রবোধ দিলেন—

বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার আজ্ঞায় চিত্তে শুদ্ধ হই আমি॥
আমার নিস্তার আর তোর পরিত্রাণ।
শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ ছাড় কৃষ্ণজ্ঞান॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে।
দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেমধনে॥[২]

পুত্র বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হওয়ায় শচীর মায়াভ্রান্তি দূর হয়ে গেল। নিমাই বললেন, যখনি আমাকে দেখতে ইচ্ছা হবে তখনি আমাকে দেখতে পাবে। রাত্রিতে নৈশ ভোজনের পরে তাম্বুল চর্বণ করতে করতে বিশ্বম্ভর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসের কথা জিজ্ঞাসা করে শোকে কাতর হয়ে পড়লেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন। তারপর গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া মিলনসাজে সজ্জিত হয়ে রতি-রভসে নিশা যাপন করলেন। প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে কণ্টকনগরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ মানসে যাত্রা করলেন। বলা বাহুল্য, লোচন দাস প্রদত্ত বিবরণ নিছক কবি-কল্পনা। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল সংসারত্যাগে কৃতসংকল্প গৌরচন্দ্রের পক্ষে রাত্রিকালে পত্নীর সঙ্গে সম্ভোগানন্দ উপভোগ করা স্বাভাবিক নয়। লোচনও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে—

যে জন যেরূপে ভজে তারে তেন প্রভু।
ভজন অধিক ন্যূন না করয়ে কভু॥[৩]

বৃন্দাবন বা কবিরাজ গোস্বামী গৃহত্যাগের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গের বিষ্ণুপ্রিয়া সম্ভাষণের কোন ইঙ্গিতও দেন নি। বৃন্দাবন লিখেছেন, গার্হস্থ্য আশ্রমের শেষ

১-৩ চৈ. ম. মধ্যখণ্ড

রজনীতে গৌরচন্দ্র গদাধর ও হরিদাসের সঙ্গে এক কক্ষে শয়ন করেছিলেন। যে তীব্র বৈরাগ্য এই সময়ে দেখা দিয়েছিল, তাতে স্ত্রী-সম্ভাষণ বা সম্ভোগ অসম্ভব বোধ হয়।

মুরারি লিখেছেন, সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক আগে থেকেই নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের চিন্তা করেছিলেন। একদিন ভক্তগণের সম্মুখে তিনি মাকে ত্যাগ করে যাওয়ার সমীচীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন।

প্রোবাচ ভগবাংস্তত্র সর্বেষামেব সন্নিধৌ।
শৃণুধ্বং বচনং মহ্যং যূয়ং কৃষ্ণরসপ্রদাঃ॥
মাতরং সংপরিত্যজ্য গতে ময়ি দিগন্তরম্।
সর্বে মাং সংবদিষ্যন্তি বিরুদ্ধং কৃতবানসৌ॥১

—ভগবান বললেন সকলের সম্মুখে, হে কৃষ্ণরসদাতা ভক্তগণ, শোন, মাতাকে পরিত্যাগ করে দেশান্তরে গেলে কি লোকে বলবে, এই ব্যক্তি অসঙ্গত কার্য করেছে?

তখন মুরারি আশ্বাস দিয়েছিলেন, না কেউ তা বলবে না। এরপরে একদিন গৌরচন্দ্র কোদাল ও ঝাঁটা নিয়ে লোকশিক্ষার নিমিত্ত দেবালয় পরিষ্কার করলেন, একদিন এক কুষ্ঠরোগীকে উদ্ধার করলেন, একদিন ব্রাহ্মণের অভিশাপ অর্জন করলেন, সংসারের বাহিরে থাক—সংসারাদ্বহির্ব্রজ। তারপর তিনি একদিন চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহাঙ্গনে অভিনয় করলেন ভক্তবৃন্দের সঙ্গে। অতঃপর কোন একদিন নগর সংকীর্তন করে ম্লেচ্ছদের উদ্ধার করলেন। পরে পুনরায় একদিন তিনি ভক্তদের আভাস দিলেন সন্ন্যাস গ্রহণের।

একদা ভগবানাহ নেত্রবারিভিরাপ্লুতঃ।
স্থাতুং নাহং সমর্থোঽস্মি গচ্ছামি মথুরাং পুরীম্॥
ছিত্বা যজ্ঞোপবীতং স্বং কৃষ্ণবিশ্লেষকাতরঃ।২

—একদিন ভগবান চোখের জলে আপ্লুত হয়ে বললেন, আমি আর গৃহে থাকতে সমর্থ হচ্ছি না, কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে যজ্ঞোপবীত ছিঁড়ে মথুরাপুরী যাব।

আরও পরে তিনি একদিন ভক্তদের বললেন, স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এসে

---

১ মু. ক.—২।১২।৬-৭ ২ মু. ক—২।১৭।১২-১৩

আমার কানে সন্ন্যাসের মন্ত্র দিয়ে গেলেন, সেই মন্ত্র শুনে থেকেই আমি দিবারাত্র কাঁদছি। এই কথা শুনে এবং মাথুর বিরহে ব্রজসুন্দরীর মত কৃষ্ণবিরহে প্রভুর কাতরতা দেখে ভক্তগণ ব্যথিত হলেন। এইসময়ে একদিন সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ কেশব ভারতী এলেন নবদ্বীপে। গৌরচন্দ্র তাঁকে দেখে প্রেমাশ্রুতে ভাসতে ভাসতে প্রণাম করলেন। এই সাক্ষাৎকারের পরে গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণে সংকল্প করলেন,—

ন্যাসং কর্তুং মনশ্চক্রে ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ।
ভগবান্ সর্বভূতানাং পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ॥[১]

একদিন শ্রীবাসের কাছে সন্ন্যাসের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন,—

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ শ্রীবাসং দ্বিজপুঙ্গবম্।
ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্॥[২]

শ্রীবাস বললেন, আমি কেমন করে তোমার বিরহে বাঁচবো? প্রভু বললেন, তোমার দেবালয়ে আমি নিত্য অধিষ্ঠিত থাকবো। তারপর তিনি হরিদাসকে সঙ্গে নিয়ে মুরারির গৃহে গিয়ে বললেন, অদ্বৈতাচার্যকে সযত্নে সেবা কোরো। মুরারিকে উপদেশ দেওয়ার পর গৌরচন্দ্র ভক্তজন সহ গৃহে গিয়ে মুগ্ধভাবে রাত্রি যাপন করে নিদ্রোত্থিত হয়ে গঙ্গা উত্তীর্ণ হয়ে কণ্টকপুরী গমন করলেন সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে, উপস্থিত হলেন গুরু কেশবভারতীর গৃহে।

কবিকর্ণপূর চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে মুরারীকেই অনুসরণ করেছেন। এই কাব্যে নিমাই-এর সন্ন্যাসের পূর্বে কেশব ভারতী নবদ্বীপে এসে গৌরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বপ্নে মন্ত্রলাভ করেছিলেন। তিনি প্রথমে শ্রীবাসের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, পরে মুরারিকে অদ্বৈতের আশ্রয় গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে গৌরচন্দ্র গৃহত্যাগ করেছিলেন সেই রাত্রেই নয়, অন্য এক রাত্রে। লোচন মোটামুটি মুরারি ও কবিকর্ণপূরকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আশ্বাসনের ব্যাপারে মুরারি ও কবিকর্ণপূর উভয়েই নীরব। শচীমাতাকে সান্ত্বনাদানের কথা বৃন্দাবন দাস বলেছেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াকে শান্ত করে সন্ন্যাস গ্রহণের বিবরণ জয়ানন্দ ও লোচন ভিন্ন আর কেউ বলেন নি। লোচনের প্রদত্ত বিষ্ণু-

---

১ মু. ক—২।১৮।১৬ ২ তদেব—২।১৮।১৯

প্রিয়া-সম্ভোগের বিবরণ অন্য কোথাও নেই। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক পাঠে মনে হয়, একমাত্র শচীদেবীকে একদিন সন্ন্যাসের আভাস দান ছাড়া আর কারো কাছে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসের কথা প্রকাশ করেন নি। কেশব ভারতীকে গৃহে আতিথ্য স্বীকার করানোর পরে শচী জিজ্ঞাসা করলেন, তাত! বল, তুমি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করবে? বিশ্বম্ভর হেসে বললেন, তোমার এরকম ভ্রম হোল কেন? এমন কি হতে পারে? শচী বললেন, বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসের আশংকায় বিশ্বরূপ রচিত একটি গ্রন্থ তিনি ভস্মসাৎ করেছেন। এই সময়ে বিশ্বম্ভর বললেন, মা কয়েকদিনের জন্য আমি অন্যত্র যাব, সেজন্যে খেদ কোরো না—"অম্ব! দিনানি কতিপয়ানি কুত্রাপি মম গন্তব্যমস্তি, ত্বয়া মনসি খেদো ন কার্যঃ।" শচী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে? নিমাই বললেন, যাতে আপনার ও বন্ধুবর্গের সর্বদা সুখলাভ হয়, অনুসন্ধান করতে যাব। শচী বললেন, তুমিই আমার সুখ। নিমাই: যদিও তাই, তথাপি যাতে আমারও অতিশয় শোভা হয়, সেইজন্য যত্ন করবো। শচী: যাতে মহাদুঃখ না হয় তাই কর। নিমাই: কৃষ্ণই তোমার পালক, পিতা, মাতা, পুত্র, জাতি, ধন, বন্ধু, দেবতা, তুমি তাঁরই ধ্যান কর। শচী: তুমিই আমার সব, যাতে তোমাকে সর্বদা দেখতে পাই, তাই কর। নিমাই: তুমি কৃষ্ণকে দর্শন কর, তিনিই তোমার সব দুঃখ দূর করবেন।[1]

এর বেশী কোন আলাপ আলোচনা সন্ন্যাস সম্পর্কে কবিকর্ণপূরের নাটকে নেই। নাটকে শ্রীবাসের গৃহে রাত্রে সংকীর্তন নৃত্যে তৃতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সকলে নিদ্রিত হলে গৌরচন্দ্র সকলকে পরিত্যাগ করে কাটোয়ার রওনা হন। নাটকে গৌরাঙ্গের সহযাত্রী হয়েছিলেন নিত্যানন্দ এবং চন্দ্রশেখর আচার্য। অদ্বৈতাচার্য মুকুন্দের মাধ্যমে শচীমাতার নিকট সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, "অয়ে মুকুন্দ! ত্বমনয়া বার্ত্তয়া মাতরমাশ্বাসয়, মাতস্তৎ প্রতি চিন্তা ন কার্য্যা, নিত্যানন্দাচার্যরত্নাভ্যাং কার্যবিশেষার্থং ক্বাপি দেবেন গতমস্তি সমাগতপ্রায়োঽয়মিতি বক্তব্যম্।"—ওহে মুকুন্দ তুমি এই সংবাদ দিয়ে মাতাকে আশ্বস্ত কর:—"হে মাতঃ তাঁর (বিশ্বম্ভরের) জন্য চিন্তা করো না, নিত্যানন্দ ও আচার্যরত্নের সঙ্গে বিশেষ কার্যসাধনের জন্য দেব কোথাও গেছেন, আগমনের সময় উপস্থিত।"

---

[1] চৈ. চন্দ্র. ৫র্থ অংক

এই বিবরণে নিমাই সন্ন্যাসের পূর্বে নিত্যানন্দ ও চন্দ্রশেখর আচার্য ছাড়া আর কাউকেই জানান নি। কবিরাজ গোস্বামী মুকুন্দকে সংযুক্ত করেছেন—

সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য।
মুকুন্দ এই তিন কৈল সর্বকার্য ॥[১]

বৃন্দাবনের বিবরণে গদাধর এবং ব্রহ্মানন্দ প্রভুর আদেশক্রমে কাটোয়ায় এসে মিলিত হলেন।

যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিয়া আছিলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥
শ্রী অবধূতচন্দ্র গদাধর শ্রীমুকুন্দ।
শ্রী চন্দ্রশেখরাচার্য আর ব্রহ্মানন্দ ॥[২]

জয়ানন্দ বলেন, মুকুন্দ, গোবিন্দানন্দ ও নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন।[৩] গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চায় পাই গোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া গিয়েছিলেন,—পশ্চাতে চলিনু মুহি খড়ম লইয়া।[৪] সন্ধ্যাকালে তিনি কাটোয়া পৌঁছালেন। তারপর রাত্রিকালে আরও অনেক ভক্তের সমাবেশ হোল।

তারপর রাত্রিযোগে মুকুন্দশেখর।
অবধৌত ব্রহ্মানন্দ আর গদাধর ॥
গুরুদেব গঙ্গাদাস গাথক শিবাই।
একে একে দেখা দিতে লাগিল সবাই ॥[৫]

এতগুলি ভক্ত কাটোয়ায় এসেছিলেন, এ কথা অন্য কোন চরিতকার বলেন নি। মনে হয় গৌরাঙ্গদেব তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের ঘটনাটা গোপন রাখতেই চেয়েছিলেন, ব্যক্ত করেছিলেন কয়েকজন মাত্র অন্তরঙ্গের কাছে। অদ্বৈত আচার্য বৈষ্ণব প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। আরও অনেক ভক্তই এ ঘটনা জানতেন না। গোবিন্দের কড়চায় অবধূতকে ডেকে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের অন্ততঃ একমাস পূর্বে বলেছিলেন তাঁর সঙ্কল্পের কথা।

অবধৌতে ডাকি প্রভু বলিলা বচন।
সন্ন্যাস করিব মুহি না কর বারণ ॥

১ চৈ. চ. আদি ১৭ পরি ২ চৈ. ভা. মধ্য ২৭ অঃ ৩ চৈ. ম. সন্ন্যাস—৪।১
৪ গো. ক.—পৃঃ ৮ ৫ গো. ক—পৃঃ ৮

পুণ্যমাঘ মাস উত্তর অয়নে।
সন্ন্যাস লইব কথা রাখ সংগোপনে॥
মুকুন্দ আর গদাধরে বোলো এ বচন।
না কবিও যথাতথা এ কথা কীর্তন॥
জননীর কাছে কথা ইঙ্গিতে বলিবে।
ভক্ত মণ্ডলীর মাঝে নাহি প্রচারিবে॥[১]

এরপর বিশ্বম্ভর মুকুন্দ ও গদাধরের বাড়ী গিয়ে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। কানাকানি এই সংবাদ শুনে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া শোকে অধীর হয়ে উঠলেন। শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে গোবিন্দদাসকে সঙ্গে নিয়ে নিমাই চললেন কাটোয়ায়। কড়চায় আছে :—

উথলিয়া পড়ে তবু শচীমাতার শোক॥
মিষ্টবাক্যে জননীরে বুঝায় তখন।
রন্ধন আলয়ে গিয়া দিলা দরশন॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশা অতীত হইলা।
ভোজন করিয়া প্রভু শয়ন করিলা॥
মুহি গিয়া নিজস্থানে করিনু শয়ন।
প্রভুর আদেশে কিন্তু করি জাগরণ॥
রজনীর শেষভাগে প্রভু দয়াময়।
হঠাৎ বাহিরে আসি মোরে ডাকি কয়॥
বসে থাক প্রস্তুত হইয়া এইখানে।
বিদায় লইয়া আসি মায়ের চরণে॥
এত বলি অন্তঃপুরে গেলেন চলিয়া।
পুনঃ আসি বাহিরিলা আমারে ডাকিয়া॥
ব্যগ্র হয়ে বলে মোরে চল মোর সনে।
কাটোয়া নগরে যাই কাটিতে বন্ধনে॥
এই বাক্য যথা তথা না বলিবে তুমি।
সন্ন্যাস করিয়া জীব উদ্ধারিব আমি॥[২]

---

১ গো. ক.—পৃঃ ৫ ২ গো. ক.—পৃঃ ৭

বিভিন্ন চরিতকারের বিবরণ থেকে মনে হয় বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে যেমন ঘনিষ্ঠ কয়েকজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে বলেছিলেন, তেমনি মাকেও সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। মাতৃভক্ত বিশ্বম্ভর যে মায়ের অনুমতি না নিয়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তা মনে হয় না। বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ত কানাকানিতে ব্যাপারটা শুনে থাকবেন, কিন্তু গৌরচন্দ্র যে পত্নীর কাছ থেকেও সম্মতি গ্রহণ করেছিলেন সে রকম তথ্য মুরারি, বৃন্দাবন, কবিকর্ণপুর ও গোবিন্দ কর্মকারের গ্রন্থ থেকে সমর্থিত হয় না। যাই হোক সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গোবিন্দের কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গ বলেছেন—

সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ও কারণ

স্বার্থপর দুরাচার মদ্যমাংস খায়।
কলির জীবের বল কি হবে উপায়॥
শিশ্নোদর পরায়ণ নিষ্ঠা বিবর্জিত।
অর্থের লাগিয়া মিথ্যা কহে অবিরত॥
যোনি-কীট রমণীর মুখ-লালা খায়।
ভক্তি অমৃতের ধারা নিছিয়া ফেলায়॥
বেশ্যার অন্নেতে রুচি বেশ্যা অনুগত।
কনক-কামিনী কলা কামকেলি রত॥
এ কারণে মুহি শিখাসূত্র তেয়াগিয়া।
বেড়াইব দ্বারে দ্বারে হরিনাম দিয়া।[১]

বলা বাহুল্য এ উক্তি তীব্র বৈরাগ্য পীড়িত বিরক্ত সন্ন্যাসীর নয়। কড়চা অনুসারে গৌরচন্দ্র আরও বলেছিলেন—

চণ্ডাল যুবক গৃহী বালবৃদ্ধ নারী।
নামে মত্ত হয়ে দাণ্ডাইবে সারি সারি॥
বালকে বলিবে হরি বালিকা বলিবে।
পাষণ্ড অঘোর পন্থী নামে মত্ত হবে॥
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে।
রাজা প্রজা একসঙ্গে গড়াগড়ি দিবে॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি না লই কৌপীন।
তবে কিসে উদ্ধারিব পাপী তাপী দীন॥

১ গো. ক.—পৃঃ ৭

কলির জীবের দশা মলিন দেখিয়া।
থাকিতে পারি না আর কাঁপে মোর হিয়া॥
করঙ্গ কৌপীন লয়ে সন্ন্যাস করিব।
রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া সবে উদ্ধারিব॥
যারা বড় পাপী তাপী তাদের লাগিয়া।
সদা মোর চিত্ত কান্দে আকুল হইয়া॥[১]

সন্ন্যাসের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে রাধাকৃষ্ণ নাম জপ করা বা প্রচার করার কথা অন্য কোন চরিত গ্রন্থে পাই না। কৃষ্ণনাম বা হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি তারক-ব্রহ্মজপই মহাপ্রভু করেছেন।

গোবিন্দদাসের কড়চার মতে জীব উদ্ধার করার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে তিনি প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন: যে সব দুর্বৃত্ত তাঁকে মারতে এসেছিল সন্ন্যাসী হয়ে তিনি তাঁদের বশীভূত করবেন, এইভাবে সমগ্র জীবজগৎকেই তিনি উদ্ধার করবেন। কবিরাজ গোস্বামীও বলেছেন: যারা নিমাই-এর নিন্দা করে, তাদের উদ্ধারের জন্যই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ। জয়ানন্দ এবং লোচন উভয়েরই মতে কৃষ্ণভজনার জন্যই গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ। কৃষ্ণকৃপালাভ এবং কৃষ্ণপ্রেমদানে জীবের কল্যাণ সাধন—এই দুটি আভ্যন্তরীণ প্রেরণা বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণের হেতু নিশ্চয়ই। কিন্তু দুটি বাহ্য কারণও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল মনে হয়। একটি নবদ্বীপে পাষণ্ডীগণের দৌরাত্ম্য। বৃন্দাবন এবং কৃষ্ণদাসের বাক্য অনুসারে গৌরচন্দ্রের বিরোধীর সংখ্যা নবদ্বীপে বেশ ভালই ছিল, তারা তাঁর নিন্দাও করতো এবং মারতেও যেত। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে সন্ন্যাসীর প্রভাবে এদের পরিবর্তন ঘটবে, এমন একটা আশা করা স্বাভাবিক। আর একটি বাহ্য হেতু লক্ষ্মীর বিয়োগ জনিত ব্যথা। গয়া থেকেই ত বিশ্বম্ভর মথুরা বৃন্দাবন যাত্রায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। গয়াতেই তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয়। এই বৈরাগ্যের কথা শুনতে পেয়েছি তাঁর মুখে পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে প্রিয়তমা লক্ষ্মীর মৃত্যুসংবাদ শুনে মাকে সান্ত্বনা দেবার কালে।

প্রভু বোলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমনে॥

---

১ গো. ক. —পৃঃ ৮

এই মত কালগতি কেহ কার নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥[১]

অন্ততঃ দুজন পণ্ডিত লক্ষ্মীর বিয়োগব্যথাকে গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যের অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। গয়াপ্রত্যাগত নিমাই-এর কৃষ্ণবিরহ সম্পর্কে গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী লিখেছেন, "প্রাকৃতে ইহা লক্ষ্মীর জন্য বিরহ। অতি-প্রাকৃতে বা অপ্রাকৃতে রূপান্তরে ইহা কৃষ্ণের জন্য বিরহ। লক্ষ্মীর বিরহের কথা গ্রন্থে লেখে না, কোন গ্রন্থই না। সব গ্রন্থই বলে কৃষ্ণবিরহ।"[২] ডঃ সুশীল কুমার দে লিখেছেন, "It is possible, however, that the first wife held a unique place in his affection, and the shock of her death had something to do with his sannyasa which occurred not many years later."[৩]

গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা অনুসারে গৌরাঙ্গদেব কাটোয়ায় গাছতলায় বহু লোকের সমাবেশে নানা উপদেশ দিয়ে রাত্রিদিন যাপন করে পরদিন স্নান সমাপনান্তে সন্ন্যাস গ্রহণের আয়োজন করলেন।

এইরূপে শিক্ষা দেয় চৈতন্য গোঁসাই।
সন্ন্যাস গ্রহণ — বহু বহু জনতা হইল এক ঠাঁই॥
বিল্ববৃক্ষতলে বসি কণ্টকনগরে।
নানা উপদেশ দিলা অতি উচ্চস্বরে॥
* * *
এইরূপে রাত্রিদিন অতীত হইলা।
পরদিন প্রাতে প্রভু সিনান করিলা॥[৪]

চৈতন্য ভাগবতে কিন্তু বিপুল জনসমাবেশে গৌরচন্দ্রের বক্তৃতা করার উল্লেখ নেই। এখানকার বিবরণে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে মত্ত সিংহের মত কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হলেন। কেশব ভারতীকে প্রণাম করে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—

---

১ চৈ. ভা. আদি ১২অঃ ২ চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ১২৮
৩ Vaisnava Faith & Movement—p. 75 ৪ গো. কড়চা—পৃঃ ১০

অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিতপাবন তুমি মহাকৃপাময়॥
তুমি যে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত॥
কৃষ্ণদাস্য বই যেন মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ দান॥[১]

প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করতে থাকেন। বহুলোকের সমাবেশ হয়েছে। গৌরাঙ্গপ্রভু সকলের নিকটেই দাস্যভাবে ভক্তি প্রার্থনা করেন।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ নিজ দাস্যভাবে।
দন্তে তৃণ করি সভাস্থানে ভক্তি মাগে॥[২]

এই অদ্ভুত কারুণ্য দেখে সকলেই কাঁদতে থাকে। নারীগণ এই দিব্য-কান্তি তরুণের মাতা ও ভার্যার দুঃখের কথা আলোচনা করে কাঁদে। কেশব ভারতী বলেন—

যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥[৩]

প্রভু এ ছলনায় ভুলবেন না, তিনি কৃষ্ণপ্রেম যাচ্ঞা করছেন।

প্রভু বোলে মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ যেন হঙ কৃষ্ণদাস॥[৪]

এইভাবে কৃষ্ণকথায় সকলের সঙ্গে রাত্রি যাপন করলেন গৌরাঙ্গ দেব। রাত্রি প্রভাত হলে প্রভুর আজ্ঞায় সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হলেন চন্দ্রশেখর আচার্য। মস্তক মুণ্ডনে বসলেন গৌরাঙ্গচন্দ্র। সেই সুন্দর চাঁচর চিকুরে ক্ষুর দিতে নাপিত কেঁদে অস্থির। ভক্তবৃন্দ এবং সমবেত নারীগণও ক্রন্দন করতে থাকে। এদিকে গৌরচন্দ্র প্রেমরসে চঞ্চল। অশ্রু কম্প ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাবসমূহ তাঁর দেহে ফুটে ওঠে। নাপিত ক্ষৌরকর্ম করতে পারে না।

কথং কথমপি সর্বদিন অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম নির্বাহ হইল প্রেমরসে॥[৫]

সন্ন্যাসের মন্ত্র গৌরাঙ্গদেব আগেই পেয়েছেন স্বপ্নে।। যিনি জগতের গুরু,

---

১-৫ চৈ. ভা. মধ্য ২৭ অঃ

তাঁর গুরু হবেন কে? তাই প্রভু কেশব ভারতীকে নিজের ইষ্টমন্ত্র শোনানোর ছলে দিলেন দীক্ষা।

প্রভু কহে স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র কহিল কথন॥
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।
এত বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহাবিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বোলেন এই মহামন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর॥
প্রভুর আকার তবে কেশব ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিল মহামতি॥[৩]

সন্ন্যাসে দীক্ষা হয়ে গেল। গুরু কেশব ভারতী তরুণ সন্ন্যাসী শিষ্যের সন্ন্যাসাশ্রমের নামকরণ করলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রভুর বক্ষে হাত দিয়ে তিনি বললেন,—

যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিলা॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥[৪]

মুরারিকেই অনুসরণ করেছেন বৃন্দাবন। মুরারির কড়চায় কণ্টকপুরে গৌরচন্দ্র উপনীত হলে আবালবৃদ্ধবনিতা দেখবার জন্য উপস্থিত হয়। প্রেম-নৃত্যের অবসানে গৌরহরি তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি গুরু কেশব ভারতীর গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করে সেখানেই অবস্থান করলেন শ্রীরামনারায়ণ নাম গান করতে করতে। অপরাহ্ন কালে সন্ন্যাসের জন্য বিহিত কর্ম করলেন আচার্যরত্ন, গৌরহরি কৃষ্ণের পূজা করলেন। তারপর গুরুর নিকটবর্তী হয়ে গুরুর কর্ণে স্বপ্নলব্ধ সন্ন্যাসের মন্ত্র বারত্রয় বলে ছলক্রমে গুরুকে দিলেন দীক্ষা, গুরু এই মন্ত্র অনুমোদন করলেন, গৌরচন্দ্র করজোড়ে বললেন, প্রভু আমাকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিন—

১-২ চৈ. ভা. মধ্য ২৭ অঃ

ততঃ সমীপং স গুরোর্হিতার্থী গত্বাবদৎ কর্ণসমীপ ঈশঃ।
স্বপ্নে ময়া মন্ত্রবরো হি লব্ধঃ শৃণুষ্ব তৎ কিং তব সম্মতং স্যাৎ॥
বারত্রয়ং তৎশ্রবণান্তিকং স্বয়ং প্রোবাচ স্যাসোক্তমন্ত্রং বিশুদ্ধম্।
ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দত্বা লোকৈকনাথোগুরুরব্যয়াত্মা।
শ্রুত্বাবদৎ সোঽপি হরেরিদং স্যাৎ সন্ন্যাসমন্ত্রং পরমং পবিত্রম্॥
ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দত্বা লোকৈকনাথোগুরুরব্যয়াত্মা।
গুরো দদস্বাত্ত মনীষিতং মে সন্ন্যাসমিত্যাহ পুটাঞ্জলিঃ প্রভুঃ।[১]

কবিকর্ণপূর বলেন যে, নাপিত রোদন করতে থাকায় প্রথমে সে ক্ষুর চালাতে অসমর্থ হয়। অবশেষে মুণ্ডনের পরে সন্ন্যাস গ্রহণের ঘটনা কবিকর্ণপূর একটিমাত্র শ্লোকে বর্ণনা করেছেন—

গুরুর্ভূত্বা ব্যাজাৎ স্বয়মিব পুরা শিষ্যবিধিনা
ততো মন্ত্রং লেভে জগতি করুণামেব বিকিরন্।
ততো রোমাঞ্চাঢ্যাং জিগিমিষুমবেক্ষ্য প্রভুমসৌ
গৃহাণেত্যাহুয়ারুণ বসন দণ্ডাদিকমদাৎ॥[২]

তারপর স্বয়ং গুরু হয়ে ও ছলে শিষ্যের রীতিতে জগতে করুণা বিকীর্ণ করে মন্ত্রলাভ করেছিলেন। তারপর রোমাঞ্চিতদেহ প্রভু গমনেচ্ছু দেখে 'গ্রহণ কর' এই বলে গেরুয়া বসন দণ্ড প্রভৃতি দিয়েছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেখানে অবস্থান করে গুরুর অনুমতি নিয়ে রাঢ় দেশে যাত্রা করেছিলেন।[৩]

মুরারি বলেছেন,—

ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতি মকরান্মনীষী।
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥[৪]

তারপর মকর থেকে কুম্ভরাশিতে রবির শুভ সংক্রমণকালে বিধিজ্ঞ মহাত্মা কেশব হরিকে সন্ন্যাসমন্ত্র প্রদান করেছিলেন।

সন্ন্যাসের পর যখন রোমাঞ্চিতদেহ শ্রীচৈতন্য চলে যাচ্ছিলেন তখন গুরু তাঁকে দিলেন গৈরিক বসন ও সন্ন্যাসীর দণ্ড। গুরুভক্ত নবীন সন্ন্যাসী গুরুর নির্দেশ মেনে নিয়ে একরাত্রি গুরুগৃহে বাস করলেন এবং গুরুর সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য করলেন।

---

১ মু. ক.—৩।২।৭-৯ ২ চৈ. চ. মহা—১১।৫৩ ৩ চৈ. চ. মহা—১১।৫৪
৪ মু. ক.—৩।২।১০

গচ্ছন্তমালোক্য হরিং গুরুঃ স্বয়ং দণ্ডং সচেলং ত্বরয়া দদৌ করে।
ভো ভো গৃহাণেতি বদন্ গুরোর্বচঃ শ্রুত্বা গৃহীত্বা গুরুভক্তিলম্পটঃ॥
গুরোর্নির্দেশং বহুমণ্যমানস্তত্রাবসত্তদ্দিবসং জিতারিঃ।
রাত্রৌ বসন্ কীর্তনমাশু চক্রে নৃত্যঞ্চ তস্মিন্ গুরুণা সমংপ্রভুঃ॥[১]

—গৌরহরিকে চলে যেতে দেখে গুরু স্বয়ং বস্ত্র ও দণ্ড 'ওহে ওহে গ্রহণ কর' বলতে বলতে সত্বর প্রদান করলেন। গুরুভক্ত জিতশত্রু গৌরাঙ্গ গুরুর কথা শুনে গুরুর নির্দেশকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাত্রিকালে সেখানে বাস করলেন এবং গুরুর সঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করলেন।

অতঃপর গুরুকে প্রণাম করে তাঁর অনুজ্ঞা নিয়ে রাঢ়দেশে যাত্রা করলেন। জয়ানন্দ বলেন যে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গৌরচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন ও গঙ্গাজলে তর্পণ করলেন মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদের। পিতৃপুরুষগণ এলেন দিব্যরথে, এলেন সন্ন্যাস দেখতে। গৌরচন্দ্র যাদের শ্রাদ্ধ তর্পণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পিতা জগন্নাথ মিশ্র, পিতামহ জনার্দন, প্রপিতামহ রাজগুরু ধনঞ্জয়, বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মী দেবী, শচীমাতা, গঙ্গাদাস, ঈশ্বরপুরী, ধাত্রীমাতা নারায়ণী, বৈষ্ণবী মালিনী, সীতা দেবী, চন্দ্রশেখর আচার্য প্রভৃতি।[২] শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক তর্পিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই জীবিত। কিন্তু এই তালিকায় বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম নেই,—লক্ষ্মীদেবীর নাম আছে। লক্ষ্মীর স্মৃতি গৌরাঙ্গের মনে এখনও বিদ্যমান।

লোচন বলেন, কেশব ভারতী থাকতেন কাঞ্চননগরে। যখন গৌরচন্দ্র ও কেশব ভারতী আলাপে রত, সেইসময় নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর প্রভৃতি মিলিত হলেন। ভারতী প্রথমে তরুণ বয়স্ক রূপবান ব্যক্তিটিকে সন্ন্যাস দিতে রাজি হলেন না।

ভারতী কহয়ে আরে শুন বিশ্বম্ভর।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর॥
এহেন সুন্দর তনু তরুণ বয়সে।
জনম অবধি না জানহ দুঃখ ক্লেশে॥

১ মু. ক.—৩।২।১২-১৩ ২ চৈ. ম. সন্ন্যাস—৫।৬-১২

অপত্য সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমায়।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার॥
পঞ্চাশের ঊর্ধ্ব হৈলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে সে সন্ন্যাস দিতে ভাল হয় যুক্তি॥[১]

গৌরচন্দ্র তখন অনেক অনুনয় করলেন,—প্রার্থনা করলেন কৃষ্ণভক্তি।

সংসারে দুর্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি পরধর্ম॥
বড়ই দুর্লভ তাহে ভক্তজন সঙ্গ।
মানুষের দেহ সে তিলেকে হয় ভঙ্গ॥
বিলম্ব করিতে এই দেহ যায় যাবে।
তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ হবে কবে॥
মানা না করিহ মোরে না করাহ সন্ন্যাস।
তোর পরসাদে মুঞি হঙ কৃষ্ণদাস॥[২]

কেশব ভারতী কিন্তু তাতেও রাজি হন না। তিনি বললেন, মাতা ও ভার্যার অনুমতি নিয়ে আসতে হবে।

সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর॥
সাক্ষাতে জননী ঠাঞি লইবে বিদায়।
তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তার ঠাঁয়॥
সাক্ষাতে সভার ঠাঁঞি বিদায় হইয়া।
আইসহ আমায় ঠাঁই সভা বুঝাইয়া॥[৩]

নিমাই চলে যাচ্ছেন ফিরে। কেশব ভারতীর নিমাইতে ঈশ্বরবুদ্ধি হোল। তিনি ফিরে ডাকলেন নিমাইকে। নিমাই স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র গুরুর কানে বলে নিজেই গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। মন্ত্র শুনে প্রেমে বিহ্বল হয়ে কেশব সন্ন্যাসে দীক্ষা দিতে রাজি হলেন।

বুঝিল সকল কাজ ভারতী-গোসাঞি।
সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাঞি॥[৪]

১ লোচন চৈ. ম. মধ্যখণ্ড পৃঃ ৬১ ২ চৈ. ম. মধ্যখণ্ড ৩ চৈ. ম. মধ্যখণ্ড
৪ চৈ. ম. মধ্যখণ্ড

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে নাপিতের নাম কলাধর, লোচনের মতে, হরিদাস। বিন্দের কড়চায় নাপিতের নাম দেবা। কিম্বদন্তীতে গৌরাঙ্গের মস্তক ন করেছিল মধু নাপিত। লোচনের মতে আকাশবাণী শুনে বিশ্বম্ভরের নাম রেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরু কেশব ভারতী। মুরারি বলেছেন, মকর থেকে রাশিতে সূর্যের সংক্রমণ হলে অর্থাৎ মাঘী সংক্রান্তিতে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ রছিলেন। লোচন মুরারির প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বললেন,—

ন্যাসের কাল মকর লেউটে কুম্ভ আইসে যেই বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্রগুরু কহে হেন কালে॥[১]

কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,—

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস॥[২]

এই হিসাবে নিমাই-এর সন্ন্যাস হয়েছিল ২৩ বৎসর ১১ মাস বয়সে মাঘ মাসে পক্ষে। কবিকর্ণপূর ও লোচনের বক্তব্য অনুসারে মাঘী সংক্রান্তিতে সন্ন্যাস ছিল। "শ্রীমন্ মহাপ্রভু ১৪৩১ শকে ২৮শে মাঘ শুক্রবার পূর্ণিমা রাত্রিতে সার্থ গৃহত্যাগ করেন এবং ২৯শে মাঘ শনিবার মাঘী সংক্রান্তিতে াস গ্রহণ করেন।"[৩] রাধাগোবিন্দনাথ বলেছেন যে ২৯সে মাঘ শনিবার র চার দণ্ড পর্যন্ত পূর্ণিমা ছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে পত্তি তুলেছেন। কারণ গৌরচন্দ্র গৃহত্যাগ করেছিলেন রাত্রি শেষে ; পরদিন ম চার দণ্ডের মধ্যে কাটোয়া পৌঁছে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে সন্ন্যাস ণ সম্ভব নয়। বরঞ্চ অধিকাংশ জীবনীগ্রন্থে গৌরচন্দ্র কাটোয়ায় কৃষ্ণনাম র্তন করে রাত্রি যাপন করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। ডঃ মজুমদার তাই ভিমত প্রকাশ করেছেন : প্রভু গৃহত্যাগ করেছিলেন ২৬শে মাঘ বুধবার ন সময়ে, ২৭শে মাঘ কোন সময়ে তিনি কাটোয়া পৌঁছান সে দিন তিনি কথা আলোচনা প্রসঙ্গে যাপন করেন, ২৮শে মাঘ সন্ন্যাসের আয়োজন চলে, রাহ্নে পূর্ণিমায় ক্ষৌরকর্মাদি সমাপনান্তে সংকল্প করে অবস্থান করেন এবং শে মাঘ চারদণ্ডের মধ্যে পূর্ণিমায় সন্ন্যাসের মন্ত্র গ্রহণ করেন।[৪] অধ্যাপক ময় মুখোপাধ্যায়ও সিদ্ধান্ত করেছেন যে ২৭শে মাঘ (২৫শে জানুয়ারী

---

১ চৈ. ম. মধ্যখণ্ড ২ চৈ. চ. মধ্য. ১ পরি ৩ শ্রীগৌরাঙ্গ

৪ শ্রীচৈতন্য চরিত্রের উপাদান—পৃঃ ৯-১০

১৫১০ খ্রীঃ) শ্রীগৌরাঙ্গ রাত্রি শেষে গৃহত্যাগ করেন ও ২৯শে মাঘ (২৮ জানুয়ারী) সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।[১] কিন্তু জয়ানন্দ লিখেছেন যে বসন্ত্ব শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রিতে গৌরচন্দ্র কাটোয়া পৌঁছেছিলেন—

বসন্তযামিনী তিথি শুক্লা ত্রয়োদশী।
প্রবেশিলা গৌরাঙ্গ কাটোয়া দ্বিজ শশী ॥[২]

বসন্তকাল ফাল্গুন-চৈত্র, মাঘ মাস নয়। অবশ্য মাঘের শেষ থেকেই ব ঋতুর সূত্রপাত হয় এবং মাঘী-শুক্লাপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমীকে বসন্ত পঞ্চমী ব থাকে। এই হিসাবে মাঘমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ ২৭শে মাঘ ক পৌঁছানো সিদ্ধ হতে পারে। প্রেমবিলাস মতে মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ -

মধ্যে পৌষ মাস আছে মাঘ শুক্লপক্ষে।
তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব যেন দেখে।[৩]

এই হিসাবে পৌষ মাস অন্তে মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া সন্ন্যাস গ্র দিন। চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলছেন,—

এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥[৪]

পৌষ মাসের সংক্রান্তিকেই উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে. মাঘী সংক্রান্তিকে প্রভুপাদ নিমাই চাঁদ গোস্বামীর মতে পৌষ সংক্রান্তিতেই মহাপ্রভুর স হয়েছিল বলে গ্রহণ করাই কর্তব্য। পঞ্জিকাতে পৌষ সংক্রান্তিকে মাঘের দিন বলে গণ্য করা হয়। এই হিসাবে কবিরাজ গোস্বামীর মাঘমাসের শু পৌষ সংক্রান্তিকেও লক্ষ্য করে বলা হতে পারে। তাছাড়া শ্রীপাট কাটো সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ স্মরণোৎসব পালিত হয় ১লা ম সংক্রান্তিতে সন্ন্যাসকৃত্য সমাপনের পর ১লা মাঘ স্মরণ মনন অনুষ্ঠান। দিনটিকে স্মরণ করা কাটোয়ার উৎসবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হতে পারে।

মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের বক্তব্যে সন্ন্যাস গ্রহণের তারিখে একমা ব্যবধান দেখা যায়। মুরারি যেহেতু প্রত্যক্ষদর্শী, সেইজন্য তাঁর বক্ত

১ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম—পৃঃ ২৮
২ চৈ. ম. সন্ন্যাস—৪।২০ ৩ প্রে. বি. ৭ম বি. পৃঃ ৪১ ৪ চৈ. ভা. মধ্য ২৭শ
৫ নিত্যানন্দ শক্তি মা জাহ্নবী—পৃঃ ৪৪২-৪৪

[পৌ]ষ। কবিরাজ গোস্বামী কথিত মাঘমাসের শুক্লপক্ষ পৌষসংক্রান্তিতে [হ]তে পারে না। চান্দ্রমাস হিসাবে পৌষসংক্রান্তিতে পৌষমাসেরই শুক্লপক্ষ • পৌষপূর্ণিমা। মাঘী শুক্লপক্ষ পরবর্তী অমাবস্যার পর থেকে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনের দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে তিনি পাষণ্ডীদলনের [নি]মিত্ত ভূভারহারী চক্রী কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। তাঁর নেতৃত্বে বৈষ্ণবগণ সঙ্ঘবদ্ধ [হ]তে পেরেছেন, পাষণ্ডীদের ও রাজশক্তির অত্যাচার দমন করতে পেরেছেন। [দ্বি]তীয় অধ্যায়ে তিনি জীব উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন এবং [ত্রি]তাপীর মুক্তির সহজ পথ নির্দেশ করেছেন এবং কৃষ্ণপ্রেমরসে নিমগ্ন হয়েছেন।

অতঃপর পরদিন গুরুকে প্রণাম করে গুরুর অনুমতি নিয়ে রাঢ়ভূমির পথে [যাত্রা] করলেন শ্রীচৈতন্য। কৃষ্ণনামগান করতে করতে ভাববিহ্বল হয়ে নৃত্য [কর]তে করতে চলেছেন নবীন সন্ন্যাসী।

নিত্যানন্দাবধূতেন সহ কৃষ্ণগাথাং মুহুর্মুহুঃ।
পথি গচ্ছন্ লপন্ নৃত্যন্ গায়ন্ স্বভক্তিভাবিতঃ॥
ধ্যায়ন্ কৃষ্ণপদাম্ভোজমাত্মনাত্মবিগ্রহম্।
বিপ্লুতাক্ষঃ ক্বচিৎ কম্পপুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ
বিহ্বলঃ স্খলিতঃ ক্বাপি ক্বচিদ্ দ্রুতগতির্ব্রজন্।
মত্তকরীন্দ্রবৎ ক্বাপি তেজসা ববৃধে ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্॥[1]

—অবধূত নিত্যানন্দের সঙ্গে মুহুর্মুহু কৃষ্ণগান করতে করতে কৃষ্ণভক্তিভাবিত [হয়ে] পথে চলতে চলতে বিলাপ করতে করতে নৃত্য করতে করতে গান করতে [কর]তে আত্মবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করতে করতে কখনও অশ্রুপূর্ণ [নয়]নে কখনও কম্পমান ও রোমাঞ্চিত দেহে বিহ্বল হয়ে কখনও স্খলিতগতি [ক]খনও মত্তহস্তিতুল্য দ্রুতগতিতে চলতে চলতে কখনও তেজের দ্বারা বর্ধিত হয়ে [ক]খনও গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে গান করতে করতে চললেন।

মুরারির কড়চা, কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটক, বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবত [প্র]ভৃতি চরিতগ্রন্থে কাটোয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে একটি ঘটনা উল্লিখিত [হ]য়েছে। কৃষ্ণকথারসে ও কৃষ্ণ নাম গানে মগ্ন শ্রীচৈতন্য রাঢ়দেশের কোন গ্রামে

---

[1] মু. ক.—৩।৩।২-৫

উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণনাম শুনতে না পাওয়ায় জলে দেহত্যাগ করতে উদ্যত হ[illegible]
এমন সময়ে কয়েকটি রাখাল বালকের মুখে কৃষ্ণনাম শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়ে[illegible]
রাঢ়দেশ থেকে প্রভু নিত্যানন্দকে বললেন,—

শান্তিপুরে আগমন

গচ্ছ ত্বং জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপং মনোরমম্ ॥
মাতরং পরয়া ভক্ত্যা মম নাম পুরঃসরম্ ॥
সংশান্তব্য সুখী কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণচরিতাদিনা ।
তত্রত্যান্ বৈষ্ণবান্ সর্বান্ শ্রীবাসাদি মম প্রিয়ান্ ॥
সমানয়াচার্যগেহং যাবত্তত্র ব্রজাম্যহম্ ।[১]

—তুমি গঙ্গাতীরে মনোহর নবদ্বীপে যাও। মাকে আমার নামে পরম ভ[illegible]
সহকারে কৃষ্ণচরিত বলে সুখী করে সেখানকার শ্রীবাস প্রভৃতি আমার [illegible]
সকল বৈষ্ণবদের অদ্বৈতাচার্যের গৃহে নিয়ে এস, আমি সেখানে যাব।

চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে যাবার সিদ্ধান্ত করে পথে হরিদা[illegible]
ফুলিয়া ও শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করলেন।

প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
শ্রীবাসাদি আছে যত ভাগবতগণ।
সভার করহ গিয়া দুঃখ বিমোচন ॥
এই কথা গিয়া তুমি কহিও সভারে।
আমি যাই নীলাচলচন্দ্র দেখিবারে ॥
সভার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
কহিবাঙ শ্রী অদ্বৈত আচার্যের ঘরে ॥
তা সভা লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে।
আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগরে ॥[২]

জয়ানন্দ বলছেন, প্রভু গোবিন্দানন্দকে শান্তিপুরে ও মুকুন্দকে পাঠাল[illegible]
নবদ্বীপে আর নিত্যানন্দ রইলেন তাঁরই সঙ্গে।

শান্তিপুর গেলা গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হয়্যা।
নবদ্বীপে মুকুন্দেরে দিল পাঠাইয়া ॥

---

১ মু. ক.—৩।৪।৪-৬ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য ১অঃ

*　*　*

সংকীর্তন লম্পটরাজ দুই ভাই।
চৈতন্য নিত্যানন্দ সংকীর্তনে গাই ॥[১]

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে যে নূতন গামছা উপহার দিয়েছিলেন, সেই গামছাটি প্রভু দিলেন নিত্যানন্দকে, অবধূত গামছাটি গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিলেন। জয়ানন্দের বর্ণনায় কাটোয়া থেকেই শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে চলে গেলেন মহাপ্রভু।

কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ ভারতী গৃহবাসে।
শান্তিপুর চলিলা অদ্বৈতসম্ভাষে ॥
অনেক পার্ষদ সনে গঙ্গা তীরে তীরে।
সমুদ্রগড়ি পার হয়্যা গেলা শান্তিপুরে ॥[২]

কবিকর্ণপূরও মহাকাব্যে লিখেছেন, শ্রীচৈতন্য প্রথম তিন দিন আত্মভাবে বিভোর হয়ে নিরবচ্ছিন্ন পশ্চিম দিকে চললেন, তারপর দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে ভাবলেন, কোথায় যাচ্ছি? তারপর নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি নবদ্বীপ গিয়ে সকলকে অদ্বৈতভবনে আসতে বল, আমিও সেখানে যাচ্ছি।

ততো দৈবাদেব ভবতি গমনে দক্ষিণদিশি
প্রবুদ্ধোঽভূৎ শ্রীমান্ ক্বচন নমু যামীতি মনসি।
বিচার্য্যাদ্বৈতস্যালয়মভি স গন্তুং সমকরো-
ন্মনো নিত্যানন্দ প্রভুমপি জগদাতিমধুরম্।
প্রযাহি ত্বং শীঘ্রং বিবুধতটিনীতীর মধুরে
নবদ্বীপে তৎস্থান্ মম নিগদিতৈর্ব্রূহি মধুরম্।
ভবন্তোঽদ্বৈতস্যালয়মভি চলন্ত্বেব চপলং
প্রয়ান্তে তত্রাহং সপদি স তথেতি প্রচলিতঃ ॥[৩]

—তারপর দৈবাৎ দক্ষিণদিকে গমন কালে তিনি চেতনালাভ করলেন, আমি কোথায় যাচ্ছি মনে মনে এই বিচার করে অদ্বৈতালয়ে যাবার মনস্থ করলেন। নিত্যানন্দ প্রভুকে মধুর কণ্ঠে বললেন, তুমি শীঘ্রগঙ্গাতীরে মনোরম নবদ্বীপে যাও, সেখানে আমার কথা মধুরভাবে বল, তোমরা অদ্বৈতালয়ের

---

১ চৈ. ম. সন্ন্যাস—৮।১।৪　২ চৈ. ম. সন্ন্যাস—১৪।১-২　৩ চৈ. চ. মহা—১১।৭২-৭৩

অভিমুখে চল, আমি সেখানে যাব। নিত্যানন্দ 'তাই হোক' বলে দ্রুত নবদ্বীপে চললেন।

মুরারিও বলেছেন, মহাপ্রভু তৃতীয় দিনেও নিজের কথা স্মরণ করেন নি। পরদিনে তিনি নিজের কথা স্মরণ করলেন। আমি গুরুর আজ্ঞায় এসেছি আগামী পরশু অদ্বৈতভবনে সকল স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এই বিবরণগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে গৌরচন্দ্র প্রথমে লক্ষ্যহীনভাবে পথ চলেছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে। পরে তিনি আত্মস্থ হয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, অদ্বৈতগৃহে মা ও ভক্তগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। তদনুসারে তিনি নিত্যানন্দকে পাঠালেন নবদ্বীপে সংবাদ দিতে।

বৃন্দাবন দাসের কাব্যে গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরাঙ্গপ্রভু যখন যাত্রা করলেন তখন গুরু কেশব ভারতী তাঁর সঙ্গে চললেন। তখন শ্রীচৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর আচার্যকে বললেন, তুমি বাড়ী যাও, আমি বৃন্দাবনে যাব কৃষ্ণ অন্বেষণে। চন্দ্রশেখর নবদ্বীপে এসে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের সংবাদ দিলেন। ভক্তগণ যখন শোকে বিহ্বল তখন আকাশবাণী থেকে জানা গেল, প্রভু দু' চারদিন পরেই সকলের সঙ্গে মিলিত হবেন। প্রভু পশ্চিমমুখে চলছিলেন, অগ্রে চলেছেন কেশব ভারতী, পশ্চাতে গোবিন্দ, সঙ্গে রয়েছেন নিত্যানন্দ, গদাধর ও মুকুন্দ। তাঁরা পশ্চিম মুখে চলতে চলতে রাঢ়দেশে পৌঁছালেন, এক ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে রাত্রি যাপন করলেন। চারক্রোশ দূরে বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বর গমনের মানসে অগ্রসর হয়েও প্রভু বক্রেশ্বর না গিয়ে পূর্বমুখে চলতে সুরু করলেন— "বলিলেন আমি চলিলাঙ নীলাচলে।" সন্ধ্যায় সময় সকলে গঙ্গাতীরে এলেন, গঙ্গায় স্নান করে গঙ্গাস্তব করলেন এবং এক গ্রামে রাত্রি যাপন করলেন। এখান থেকে তিনি নীলাচলের পথে ফুলিয়া ও শান্তিপুর গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করে নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ করলেন।

কিন্তু কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত কাব্যে আর একরকম গল্প পরিবেশিত হয়েছে। এই দুই গ্রন্থে সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন গমনের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। নিত্যানন্দ চন্দ্র-শেখর আচার্যকে নবদ্বীপ প্রেরণকালেই বলে দিয়েছিলেন যে তিনি কোন প্রকারে

১ মু ক.—৩৩।১৮-২০

মহাপ্রভুকে অদ্বৈতগৃহে নিয়ে যাবেন।[১] তারপর পথে গমনকালে ভাববিহ্বল শ্রীচৈতন্য রাখাল বালকদের মুখে কৃষ্ণনাম শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করলেন। নিত্যানন্দের নির্দেশমত একটি বালক তাঁকে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়। এই সুযোগে নিত্যানন্দ বৃন্দাবন বলে শান্তিপুরের অপর পারে কালনায় নিয়ে আসেন এবং গঙ্গাকে যমুনা বলে পরিচয় দেন। যমুনাভ্রমে গঙ্গাস্নানাদি কালে নিত্যানন্দের চেষ্টায় অদ্বৈতাচার্য সংবাদ পেলেন এবং গৌরহরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে তাঁকে প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করে স্বালয়ে নিয়ে এলেন।[২] এ কাহিনী কিন্তু পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা। কারণ কবিকর্ণপুর মহাকাব্যেও এ ঘটনার উল্লেখ করেন নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনকে অনুসরণ না করে কবিকর্ণপুরের নাটককেই অনুসরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

তবে ত চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেল যমুনা বলিয়া ॥
শান্তিপুরে আচার্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহা রাত্রে সঙ্কীর্তন ॥
মাতা ভক্তগণের তাহা করিল মিলন।
সর্ব সমাধান করি কৈলা নীলাদ্রিগমন ॥[৩]

ফুলিয়া গমনের কথা কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেন নি। কিন্তু পুষ্পগ্রাম বা ফুলিয়া থেকে শান্তিপুরে আগমনের কথা মুরারি তাঁর কড়চায় উল্লেখ করেছেন।[৪]

নবদ্বীপ থেকে শচীদেবী এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে, এলেন আরও বহু ভক্ত। বৃন্দাবন বলেন, কাতারে কাতারে আবালবৃদ্ধ নরনারী আসে ফুলিয়ায়। ফুলিয়া থেকে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ সঙ্গে এলেন শান্তিপুরে। ভক্তগণ সঙ্গে হরিনাম করে, কৌতুক সহকারে ভোজন করে প্রভু অদ্বৈতগৃহে রাত্রি যাপন করে প্রভাতে নীলাচলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

১ চৈতন্য চন্দ্রোদয়—৪র্থ অংক ২ চৈতন্য চন্দ্রোদয়—৫ম অংক
৩ চৈ. চ. মধ্য ১ম পরি ৪ মু. ক.—৩।৪।১২

বহুবিধ আপন রহস্য কথা রঙ্গে।
সুখে রাত্রি গোঙাইলা ভক্তগণ সঙ্গে॥
পোহাইলা নিশা প্রভু করি নিত্যকৃত্য।
বসিলেন চতুর্দিগে বেড়ি সব ভৃত্য॥
প্রভু বোলে আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা সকলে॥
নীলাচলচন্দ্র দেখি আমি পুনর্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা সভাকার॥[১]

নীলাচল গমন

এই সময়ে প্রভুর ভক্তবৃন্দ বাধা দিলেন। এখন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে গৌড়ের সুলতানের বিবাদ চলছে, অতএব উড়িষ্যা যাওয়া নিরাপদ নয়।

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়
সে রাজ্যে এখনে কেহো পথ নাহি বয়॥
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥
যাবৎ উৎপাত কিছু উপশম নয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥[২]

প্রভু কোন বিপদকে গ্রাহ্য না করে ভক্তগণকে প্রবোধ দিয়ে পুরীর পথ ধরলেন। মুরারিও অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি শচীমাকে আশ্বাস দিলেন যে মায়ের সঙ্গে সর্বদাই তিনি থাকবেন। অদ্বৈতাচার্য-প্রদত্ত অন্ন ভোজন করে রাত্রিতে নিদ্রা উপভোগ করার পর শেষযামে উত্থানান্তর কীর্তন করতে করতে শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে স্ব স্ব স্থানে ফিরে যেতে অনুরোধ করে পুরুষোত্তম দর্শনে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

যাস্যামি দেবদেবেশ পুরুষোত্তমদর্শনে।
সার্বভৌম দ্বিজেন্দ্রেণ সার্ধং পশ্যামি তং হরিম্॥[৩]

—দেবদেবেশ পুরুষোত্তমদর্শনে যাব, সার্বভৌম দ্বিজশ্রেষ্ঠের সঙ্গে হরিকে দর্শন করবো।

---

১ চৈ ভা. অন্ত্য. ২অঃ   ২ চৈ. ভা. অন্ত্য. ২অঃ   ৩ মু. ক.—৩।৪।২৫

ভক্তগণকে আলিঙ্গন করে বিদায় দিয়ে চললেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু। এই সময়ে হরিদাস দন্তে তৃণ ধারণ করে তাঁর পদে পতিত হলেন। তোমার জন্ম জগন্নাথের কৃপা প্রার্থনা করবো বলে তিনি নীলাচলে যাত্রা করলেন। জয়ানন্দও একরাত্রি শান্তিপুরে বাসের কথাই বলেছেন—"রজনী প্রভাতে শান্তিপুর ছাড়িয়া আসুয়া এ দিল দরশন॥"[১] লোচনও একরাত্রি যাপনের কথাই বলেছেন। কিন্তু কবিকর্ণপুর বলেছেন যে একরাত্রি যাপন করে অদ্বৈতগৃহ থেকে যখন শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রা করছিলেন সেই সময়ে ভক্তগণের সুগভীর বিরহার্তি দেখে তিনি কয়েকদিন অদ্বৈতগৃহে যাপন করেছিলেন—

ততোঽদ্বৈতপ্রীত্যা প্রণতহরিদাসস্য চ মুদা
জগন্নাথক্ষেত্রং জিগমিষুরপি স্বপ্রিয়বশঃ।
শচীদেব্যা তৎপাচিতমতুলমন্নং নিজজনৈঃ
সমং তৈর্ভুঞ্জানঃ কতি চ গময়ামাস দিবসান্॥[২]

—তারপর ভক্তের বশীভূত গৌরচন্দ্র জগন্নাথক্ষেত্রে গমনে ইচ্ছুক হয়েও অদ্বৈতের প্রীতিবশতঃ এবং প্রণতঃ হরিদাসের আনন্দের নিমিত্ত শচীদেবীর পাচিত অতুলনীয় সুস্বাদু অন্ন নিজভক্তগণের সঙ্গে ভোজন করে কতিপয় দিবস যাপন করেছিলেন।

কবিকর্ণপূরের নাটক অনুসারে শ্রীচৈতন্যজননী ও ভক্তবর্গের প্রীতির নিমিত্ত তিন দিন অবস্থান করেছিলেন শান্তিপুরে; চতুর্থদিনে শান্তিপুর ত্যাগ করে জগন্নাথক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[৩] কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যকে অনুসরণ করেছেন। তিনি বলছেন যে মহাপ্রভুর পুরুষোত্তমে অবস্থানের সিদ্ধান্ত হলে অদ্বৈত আচার্য আরও দু চার দিন তাঁর গৃহে বাস করতে অনুরোধ জানালেন। তদনুসারে মহাপ্রভু আরও কয়েকদিন রয়ে গেলেন অদ্বৈতালয়ে।

তবে ত আচার্য কহে বিনীত হইয়া।
দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া॥
আচার্য বচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈতগৃহে না কৈলা গমন॥[৪]

---

১ চৈ. ম. উৎকল—১।১ ২ চৈ. চ. মহা.—১১।৭৪ ৩ চৈ. চন্দ্র. ৬ অংক
৪ চৈ. চ. মধ্য. ৪ পরি

কৃষ্ণদাস আবার বললেন—বঞ্চিল কতকদিন নানা কুতূহলে।[১] তিনিই আবার অন্যত্র বলেছেন,—এই মত দশদিন ভোজন কীর্ত্তন।[২] অর্থাৎ দশদিন মহাপ্রভু অদ্বৈতাবাসে ছিলেন। অদ্বৈতপ্রকাশকারও বলেছেন,—

হেনমতে দিনকত সীতানাথের ঘরে।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে বর্ণিতে পারে॥[৩]

সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতগৃহে কদিন বাস করেছিলেন তা যথাযথ বলা সম্ভব না হলেও মনে হয় মুরারি, বৃন্দাবন ও লোচনের বক্তব্যই ঠিক। সন্ন্যাসীর পক্ষে অধিকদিন একস্থানে অবস্থান করা রীতি বিরুদ্ধ।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে সন্ন্যাসগ্রহণের পর গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরচন্দ্র নীলাচল গমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। লোচনও এই কথাই বলেছেন। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে একরাত্রি অদ্বৈতভবনে অবস্থানের পর পরদিন প্রাতে গৌরহরি নীলাচল গমনের সংকল্প ঘোষণা করলেন—

নীলাচল যাব জগন্নাথ দেখিবারে।
প্রসন্নবদনে যদি প্রভু দয়া করে॥[৪]

কিন্তু কবিকর্ণপূরের নাটকে জননীর এবং প্রিয় ভক্তবর্গের অনুমোদন না নিয়ে সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ফলে বিঘ্ন সংঘটিত হওয়ায় মথুরা গমনাকাঙ্ক্ষা অচরিতার্থ থাকে। মহাপ্রভু এক্ষণে প্রব্রজ্যার জন্য সকলের অনুমতি প্রার্থনা করলে শচীদেবী বলেন, তাঁর আত্মসুখের জন্য বিশ্বম্ভরকে কাছে রাখলে সন্ন্যাসীর ধর্মহানি হবে, খল ব্যক্তিরা নিন্দা করবে, অথচ জগন্নাথক্ষেত্র পুরীতে অবস্থান করলে ধর্মরক্ষাও হবে দূরত্বের স্বল্পতাহেতু ভক্তগণের যাতায়াতের ফলে শচীর পক্ষে পুত্রের সংবাদ পাওয়াও সম্ভব হবে।[৫] তদনুসারে মহাপ্রভু জননীর স্বহস্তপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করে ভক্তদের সঙ্গে তিনদিন অতিবাহিত করে নীলাচলে যাত্রা করেন।

কবিরাজ গোস্বামী মোটামুটি কর্ণপূরের নাটক অনুসরণ করেছেন। তাঁর কাব্যে অদ্বৈতগৃহে শ্রীচৈতন্য ও শচীমাতার মিলনের দৃশ্যটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে কান্দিতে শচী কোলেতে করিঞা॥

---

১ চৈ. চ. মধ্য. ৪ পরি ২ চৈ. চ মধ্য ৪ পরি ৩ অ. প্র. ১৫ অঃ
৪ চৈ. ম. মধ্য—পৃঃ ৭২ ৫ চৈ. চন্দ্র. নাঃ, ৬ অংক

দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥
কান্দিয়া কহেন শচী বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥
প্রভু ত কান্দিয়া বলে শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটিজন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি বা না জানি কৈল যদ্যপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাহাই রহিমু।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিমু॥[১]

প্রভু ভক্তগণের কাছেও অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে জন্মস্থানে বাস করা নিন্দনীয়, অথচ যিনি অগ্রজের প্রব্রজ্যার পরে পিতামাতার ভরণপোষণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি কেমন করে মাকে ও ভক্তজনকে ছেড়ে দূরে চলে যাবেন? তাই তিনি প্রার্থনা করলেন—"সেই যুক্তি কহ যাতে রহে দুই ধর্ম।" এই সংকটে শচীমাতা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে রায় দিয়েছিলেন—

তেঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি সেহো মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর॥

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৩ পরি

তুমি সব কহিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু হবে তাঁর আগমন॥[১]

অদ্বৈতপ্রকাশেও শচী দেবী বলেছেন একই কথা—

মাতা কহে বৃন্দাবন হয় দূর দেশ।
শ্রীপুরুষোত্তমের পাইমু সন্দেশ॥[২]

এই কথাগুলিই বাসুঘোষের একটি পদে মহাপ্রভুর মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

ছাড়ি নবদ্বীপ বাস পরিনু অরুণ বাস
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া।
মনে মোর এই আশ করি নীলাচলে বাস
তোমা সবার অনুমতি লৈয়া।
নীলাচল নদীয়াতে লোক করে যাতায়াতে
তাহাতে পাইবে তত্ত্ব মোর॥[৩]

কতকগুলি গ্রন্থে নীলাচলে বসবাস করার আকাঙ্ক্ষা স্বয়ং গৌরাঙ্গের, কতকগুলি গ্রন্থে শচীর ইচ্ছায় তাঁর নীলাচলে বাস। মনে হয়, সবদিক বিবেচনা করেই শ্রীগৌরাঙ্গ পুরীতে বসবাসের কথা চিন্তা করেছিলেন। পরে শচীদেবীর অভিলাষ তাঁর সেই চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করে। বৃন্দাবন-মথুরায় বাস করলে বাঙ্গালার বৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে মহাপ্রভুর সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হোত না। পুরীর সঙ্গে বাঙ্গালার তথা নবদ্বীপের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। মহাপ্রভু পুরীতে অবস্থান করায় এই সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। মহাপ্রভুও তাই ভক্তদের বলেছিলেন—

কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রিগমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥[৪]

জননী ও ভক্তবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাত্রা করলেন নীলাচলের পথে। অদ্বৈত আচার্য সঙ্গে দিলেন চারজনকে।

নিত্যানন্দ গোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারিজনে আচার্য দিল প্রভু সনে।[৫]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৩ পরি ২ অ. প্র. ১৫ অঃ—পৃঃ ১৭৪ ৩ গৌরপদতরঙ্গিণী—৪৭ সং পদ
৪ চৈ. চ. মধ্য. ৩ পরি ৫ চৈ. চ. মধ্য ৩ পরি

কবিকর্ণপূরের নাটকেও ভক্তগণ মন্ত্রণা করে উক্ত চারজনকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে দিয়েছিলেন।[১] অদ্বৈতপ্রকাশেও ঐ চারজন সঙ্গীরই নাম পাই।[২] গোবিন্দদাসের কড়চায় মহাপ্রভুর সঙ্গী হিসাবে নূতন নাম পাই—

নীলাচলের সঙ্গী — ঈশান প্রতাপ গঙ্গাদাস গদাধর।
ন্যাসীর সহিতে চলে আর বাণেশ্বর ॥[৩]

এই চারজনের সঙ্গে অবশ্য গোবিন্দ কর্মকারও ছিলেন। বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রভুর সহচর হিসাবে নীলাচলেও পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাস পাঁচজন সঙ্গীর কথা বলেছেন—

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥[৪]

এই চারজন বা পাঁচজন অনুচর নিয়ে নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চললেন নীলাচলের পথে।

উড়িয়া ভক্ত মাধব পট্টনায়ক শ্রীচৈতন্যের নীলাচল গমনের সঙ্গী হিসাবে অদ্বৈত, গদাধর, নিত্যানন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন—

সঙ্গে অদ্বৈত গদাধর পণ্ডিত।
নিত্যানন্দাদি আর যে যে ভকত ॥[৫]

এঁদের মধ্যে অদ্বৈত কিছুদূর গিয়ে মধ্যপথ থেকে ফিরে এসেছিলেন।[৬]

শ্রীচৈতন্য সকলকে নির্দেশ দিলেন ঘরে বসে হরিনাম সংকীর্তন করতে—যুষ্মাভিরত্র কর্তব্যং সদৈব হরিকীর্তনম্।[৭] বৃন্দাবন বলেন, চৈতন্যদেব কিছুদিনের মধ্যেই নদীয়ায় ফিরে আসার আশ্বাসও দিয়েছিলেন—

কৃষ্ণনাম সভে বসি লহ গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন কথোক ভিতরে ॥[৮]

চৈতন্যভাগবত অনুসারে সে সময়ে গৌড়রাজ ও উৎকলরাজের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল, সুতরাং পথ বিপদসংকুল হওয়ার জন্য অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভক্তগণ তাঁকে পুরী যেতে নিষেধ করেছিলেন।

---

১ চৈ. চন্দ্র. ৬ অংক ২ অ. প্র. ১৫ অঃ ৩ গো. ক. ৪ চৈ. ভা. অন্ত্য.
৫ চৈতন্যবিলাস নবম ছান্দ—৫০, চৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ—২৮২
৬ তদেব—১০ম ছান্দ ৭ মু. ক.—৩।৪।২৬ ৮ চৈ. ভা. অন্ত্য ২ অঃ

নীলাচলে যাত্রাপথ

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখনে কেহো পথ নাহি বয়॥
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥
যাবৎ উৎপাৎ কিছু উপশম নয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়॥[১]

প্রভু কিন্তু কোন বিপদের ভয় গ্রাহ্য করলেন না। তিনি সঙ্গী কয়েকজন নিয়ে চলেছেন পথে। পথে তিনি সঙ্গীদের কাছে কার কি সম্বল আছে জিজ্ঞাসা করলেন। সকলেই নিঃসম্বল জেনে তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করলেন। চলতে চলতে প্রভু আঠিসারা নগরে এসে অনন্ত নামে এক পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে কৃষ্ণকথালাপনে রাত্রি যাপন করে প্রভাতে যাত্রা করলেন। শান্তিপুর থেকে জাহ্নবীর পূর্ব কূলে কূলে অগ্রসর হয়ে গৌরচন্দ্র উপনীত হলেন ছত্রভোগ।[২] বর্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত জয়নগর মজিলপুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে মথুরাপুর গ্রামের নিকটে ছত্রভোগ গ্রাম।[৩] এখানে গঙ্গা শতধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরাভিমুখে চলতো। শতমুখী গঙ্গাধারায় প্রভু স্নান করলেন। ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গঘাটে জলরূপী অম্বুলিঙ্গ শিব আছেন। দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারী হোসেন শাহের লস্কর রামচন্দ্র খানের অধিকারে ছিল ছত্রভোগ। রামচন্দ্রের অনুরোধে প্রভু তাঁর গৃহে ভিক্ষান্নগ্রহণ করে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ প্রকটিত করে কীর্তনানন্দে রাত্রিযাপন করলেন। রামচন্দ্র বলেছিলেন, গৌড়দেশ ও উৎকলের মধ্যে যাতায়াত বন্ধ; স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুঁতে রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত হয়েছে; পথ বিপদসংকুল, কোন অঘটন ঘটলে রামচন্দ্রকে বিপদাপন্ন হতে হবে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য পুরী গমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে রামচন্দ্র খান প্রভুকে গঙ্গা পার করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে তীরে উঠে প্রভু উৎকল দেশে প্রবেশ করলেন।

গোবিন্দদাসের কড়চায় ছত্রভোগের উল্লেখ নেই। কড়চায় মহাপ্রভু বর্ধমানে গোবিন্দদাসের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং গোবিন্দের পত্নীর

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য ২অঃ ২ চৈ. ভা অন্ত্য ২ অঃ

৩ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—সারদা চরণ মিত্র, পৃঃ ১১

ব্যাকুলতা দেখে প্রভু গোবিন্দকে গৃহে থাকতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু গোবিন্দ সে কথা না শুনে প্রভুর সঙ্গেই যাত্রা করে। মহাপ্রভু অতঃপর হাজিপুরে এসে রাত্রিযাপন করলেন। হাজিপুর থেকে তিনি পৌছালেন মেদিনীপুর। এখানে কেশব সামন্ত ও অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিদের শিক্ষা দিয়ে তিনি উপনীত হলেন নারায়ণগড়ে। নারায়ণগড়ে তিনি গ্রাম্যদেবতা ধলেশ্বর শিব দর্শন করলেন।[১] কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে এই স্থানগুলির উল্লেখ নেই। শান্তিপুর থেকে পশ্চিমে বর্ধমান না গিয়ে গঙ্গার তীরে তীরে চব্বিশ পরগণায় ছত্রভোগে যাওয়াই নীলাচলের সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ। গঙ্গার পশ্চিমতীরে শ্রীপ্রয়াগ ঘাট। বর্তমান চব্বিশ পরগণার কতক অংশ এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ উৎকল বা ওড্রদেশ নামে পরিচিত ছিল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।[২] প্রয়াগ ঘাটে শ্রীচৈতন্য ঘরে ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন, জগদানন্দ করলেন রন্ধন এবং প্রভু সগণে পরমানন্দে ভোজন করলেন। দানী এসে বাধা দিল, তার প্রাপ্য কর না পেলে সে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যেতে দেবে না। কিন্তু প্রভুর করুণার্তি ও প্রবল অশ্রুমোচন দেখে দানী বিগলিত হয়ে পথ ছেড়ে দিল। বৃন্দাবনের মতে ভাগীরথী পার হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চলতে চলতে উপনীত হলেন সুবর্ণরেখার তীরে, সুবর্ণরেখার নির্মল জলে স্নান করে পার্ষদগণসহ চললেন এগিয়ে।[৩] জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গৌরচন্দ্র শান্তিপুর থেকে এলেন অম্বুয়া (অম্বিকা কালনা), তৎপরে কুলীনগ্রাম, তৎপরে দেবনদ (দামোদর ? ; পার হয়ে শিয়াখালা হয়ে তমোলিপ্তে পৌছান।[৪] মুরারিও মহাপ্রভুর যাত্রাপথে তমোলিপ্তের উল্লেখ করেছেন। মুরারি বলেন, শ্রীচৈতন্য তমোলিপ্তে মধুসূদনের (জিষ্ণু নারায়ণ) বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন—

তমোলিপ্তে মহাপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদ্গুরুঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডে কৃতস্নানো দদর্শ মধুসূদনঃ॥[৫]

আধুনিককালে মেদিনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীর তীরে তমোলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত (তমলুক) বন্দর অবস্থিত। এককালে তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতটে তাম্রলিপ্ত প্রদেশের রাজধানী ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতবর্গের মতে এই প্রদেশ কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শ্রীচৈতন্যের সময়ে তাম্রলিপ্ত উৎকলের অন্তর্গত ছিল।

---

১ গো. ক. পৃঃ—১৩-১৮ ২ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—পৃঃ ১২-১৩
৩ চৈ. ভা. অন্ত্য ২ অঃ ৪ চৈ. ম. উৎকল—১ ৫ মু. ক.—৩।৩।২

এখানে রূপনারায়ণের ঘাটের উপরেই জিষ্ণুনারায়ণের মন্দির ও বর্গভীমার মন্দির ছিল।[১]

জয়ানন্দ বলেন, তমলুকের পরে সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে শ্রীচৈতন্য আসেন বারাশতে, তৎপরে দাঁতিন জলেশ্বর পার হয়ে আমরদা, বাশদা ও রামচন্দ্রপুর অতিক্রম করে, রেমুণাতে গোপীনাথ দর্শন করে শবনগরে দেউলে সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গ দর্শনান্তর বাঙ্গালপুরের মাঝ দিয়ে অজুরগড় ডাইনে রেখে ভদ্রকে পৌঁছালেন। ভদ্রকে জগন্নাথ দর্শন করে তিনি উপনীত হলেন যাজপুর; যাজপুরে আদ্যাশক্তি বিরজা দর্শন করে লবণ সমুদ্রকূলে অগ্রসর হয়ে তিনি উপনীত হলেন পুরুষোত্তম-পুর, তৎপরে অমরাল্য, একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা পার হয়ে তিনি উপস্থিত হলেন পুরুষোত্তমক্ষেত্র নীলাচলে।[২]

গোবিন্দের কড়চা অনুসারে নারায়ণগড়ের পরে শ্রীচৈতন্য উপনীত হয়েছিলেন জলেশ্বরে, এখানে বিশ্বেশ্বর শিব দর্শন করে পরদিন তিনি সুবর্ণরেখার তীরে উপস্থিত হন।[৩] কিন্তু বৃন্দাবন বলেছেন, আগে সুবর্ণরেখা পরে জলেশ্বর। সুবর্ণরেখা পার হয়ে গৌরচন্দ্র কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে চলেছেন আগে আগে, পশ্চাতে চলেছেন নিত্যানন্দ, স্বরূপ, জগদানন্দ প্রভৃতি। নিত্যানন্দের হাতে দণ্ড দিয়ে প্রভু একাই গেলেন ভিক্ষায়। সুযোগ বুঝে নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড ভেঙ্গে তিন খণ্ড করে ফেললেন। প্রভু দণ্ড ভগ্ন দেখে কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করলেও কাউকে তিরস্কার করলেন না, তিনি মত্ত সিংহের মত সকলের অগ্রে পথ চলতে চলতে এসে পৌঁছালেন জলেশ্বর গ্রামে, জলেশ্বরে পূজারতি দেখে প্রভু প্রীত হলেন।[৪]

গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চায় উল্লিখিত নারায়ণগড় মেদিনীপুর থেকে ৩২ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত।[৫] জয়ানন্দ উল্লিখিত দাতন বা দাঁতন বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের একটি ষ্টেশন। দাঁতন বা দন্তপুর জলেশ্বর থেকে ছয় ক্রোশ উত্তরে, সম্ভবতঃ সমুদ্রযাত্রীদের বিশ্রামস্থান ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধের তীর্থক্ষেত্র ছিল দাঁতন।[৬] জলেশ্বর বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের ষ্টেশন, অত্যন্ত পুরাতন

---

১ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—পৃঃ ১৭ ২ চৈ. ম. উৎকল—১

৩ গো. ক.—পৃঃ ১৮ ৪ চৈ. ভা. অন্ত্য ২ অঃ

৫ নীলাচলে মহাপ্রভুর যাত্রাপথ—অমৃত ১৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা পৃঃ ২৮

৬ উৎকলে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ১৮-১৯

স্থান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্গ বা কুঠি ছিল এখানে, এখনও ধ্বংসাবশেষ আছে। সারদাচরণ মিত্রের মতে সেকালে জলেশ্বর সুবর্ণরেখার পশ্চিমে ছিল।[১] ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, জলেশ্বর সুবর্ণরেখার তীরে অবস্থিত। এখানে একটি পুকুরের প্রধান ঘাটের নাম চৈতন্য ঘাট; জনশ্রুতি: এই ঘাটে শ্রীচৈতন্য স্নান করেছিলেন।[২] সুবর্ণরেখা বর্তমান উড়িষ্যা ও পশ্চিম-বঙ্গের সীমা। জয়ানন্দ উল্লিখিত অমরদা বা অর্মদা গ্রাম অদ্যাপি বর্তমান। অর্মদার কাছে সুন্দরকুলি গ্রামে ভিক্ষার গ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য রাত্রি যাপন করেছিলেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত।[৩]

বৃন্দাবন বলেন, জলেশ্বরে এক রাত্রি যাপন করে বাঁশদহ এলেন মহাপ্রভু, এখানে এক শাক্তের সঙ্গে আলাপ করে তিনি পৌঁছালেন যাজপুর ব্রাহ্মণ নগর। জয়ানন্দের মতে বাশদা, রামচন্দ্রপুর ও তৎপরে রেমুণা।[৪] বাঁশদার আধুনিক নাম সদানন্দপুর, রামচন্দ্রপুর বালেশ্বরের কাছে, বালেশ্বর থেকে পাঁচ মাইল দূরে রেমুণা।[৫] "রেমাণা বালেশ্বর শহরের পশ্চিমে আড়াইক্রোশ দূরে পুরী যাইবার রাজপথে অবস্থিত। এখানে ফাল্গুন মাসে গোপীনাথের তের দিন ধরিয়া মেলা হয়। গোপীনাথের মন্দির দাক্ষিণাত্য রীতিতে নির্মিত।... রেমুণার মন্দিরাভ্যন্তরে দ্বিভুজ মুরলীধর বালকৃষ্ণ অর্থাৎ গোপাল মূর্তি।"[৬] রেমুণার গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। গোপীনাথ ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ক্ষীর চুরি করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।[৭] মহাপ্রভু গোপীনাথ মন্দিরে একরাত্রি যাপন করে ক্ষীর প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। রেমুনা থেকে যাজপুরের পথে গোবিন্দদাসের কড়চায় হরিপুর বালেশ্বর ও নীলগড়ের উপর দিয়ে মহাপ্রভুর গমনের কথা উল্লিখিত হয়েছে।[৮] বালেশ্বর বর্তমান জেলা শহর—বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশন। জয়ানন্দের বিবরণে রেমুণার পরে শবনগর, বাব্দালপুর, অন্তরগড় ও ভদ্রক। ভদ্রকে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করেছিলেন। ভদ্রকের উপকণ্ঠে সাইথা গ্রামের মদনমোহন মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের ব্যবহৃত কাঁথা আছে। ধর্মনগর বা ধামনগর ভদ্রক থেকে ৪৮ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে।[৯] যাজপুর

১ উৎকলে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ২১-২২ ২ অমৃত—১৬ ব, ৪১ সং—পৃঃ ২৮

৩ অমৃত—১৬ ব. ৪১ সং পৃঃ ২৮ ৪ চৈ. ভা. অন্ত্য ২ অঃ

৫ তদেব ৬ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—পৃঃ ২২ ২৩

৭ চৈ. চ. মধ্য. ৪ পরি ৮ গো. ক.—পৃঃ ১৮ ৯ অমৃত—১৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা—পৃঃ ২৮

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান, হিন্দু ও বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থ। এখানে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা বিষ্ণুকে তুষ্ট করে বেদোদ্ধার করেছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে, যজ্ঞ থেকে যাজপুর নামের উৎপত্তি। যাজপুর উড়িষ্যার কেশরী রাজাদের রাজধানী ছিল। কেউ কেউ মনে করেন, রাজা যযাতি কেশরীর নাম থেকে যাজপুর নাম হয়েছে।[১] যাজপুরে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। এখানে আদি বরাহ বা যজ্ঞবরাহ বিগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ। বৈতরণীর দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীচৈতন্য স্নান করে আদি বরাহ বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। এখানে আরও অনেক দেবমন্দির ও বিগ্রহ ছিল, প্রভু সবই দর্শন করলেন।[২] যে স্থানে তিনি বৈতরণীতে স্নান ও পিতৃতর্পণ করেছিলেন, সেই গ্রামের নাম গৌরাঙ্গপুর। এখানে গৌরাঙ্গমন্দিরে প্রায় চার ফুট উঁচু গৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছে। গৌরাঙ্গপুর থেকে দশ মাইল দূরে বর্তমান যাজপুর।[৩] যাজপুরে আদ্যাশক্তি বিরজার অষ্টভুজ বিগ্রহ আছে। বিরজা একান্ন মহাপীঠের অন্যতমা পীঠদেবতা। মুরারি ও জয়ানন্দ বলেছেন যে মহাপ্রভু বিরজা দর্শন করেছিলেন। একরাত্রি যাজপুরে যাপন করে তিনি কটকে উপস্থিত হয়ে সাক্ষিগোপাল দর্শন করেছিলেন। গোবিন্দ কর্মকার বলেন, মহানদী পার হয়ে তিনি সাক্ষিগোপাল দর্শন করে-ছিলেন। জয়ানন্দের কাব্যে যাজপুরের পর মন্দাকিনী নদী পার হয়ে পুরুষোত্তমপুর, পাটনা ও আমরালা, তৎপরে কটক। কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে ও নাটকে মহাপ্রভুর রেমুণায় গোপীনাথ দর্শন, কটকে সাক্ষিগোপাল দর্শন, যাজপুরীতে আগমন, তৎপরে একাম্রক্ষেত্রে বা কমলপুরে গমন ও সর্বশেষে শ্রীক্ষেত্রে আগমনের বার্তা উল্লিখিত হয়েছে।[৪] মুরারির কড়চায় প্রভুর যাজপুরে বিরজা-দর্শনের পরেই একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরে শিববন্দনা, প্রসাদ ভক্ষণ ও তৎপরে মহাপ্রভুর জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিতির বিবরণ রয়েছে। যাজপুরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে তালুটমল গ্রামের পাশ দিয়ে মন্দাকিনী প্রবাহিত ছিল। পুরুষোত্তমপুর যাজপুর থেকে ১২ কি. মি. দক্ষিণে। মহাপ্রভু বিরূপা নদীর বাঁধ ধরে মহানদীর উত্তরে অবস্থিত চৌদ্বারে পৌঁছেছিলেন। মহানদীর চাষাপাড়া ঘাটে একটি পাথরে মুদ্রিত পদচিহ্ন মহাপ্রভুর পদাংক বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে।[৫] চৌদ্বারের

---

১ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—পৃঃ ২৮ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য ২ অঃ

৩ অমৃত—১৬ বর্ষ, ৪১ সং, পৃঃ ২৮ ৪ চৈ. চ. মহা. ১১ সর্গ, চৈ. চন্দ্র নাটক—৬ অঃ

৫ অমৃত—১৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা—পৃঃ ২৮

পরে কটক। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের পুরী যাওয়ার শাখা রেলপথের ষ্টেশন সাক্ষিগোপাল। ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে গুপ্তবৃন্দাবন গ্রামে সাক্ষি-গোপালের মন্দির।[১] দীর্ঘকাল উড়িষ্যার রাজধানী ছিল কটক। কটকের পরেই ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন, কটকে আগমনের পরে মহানদীতে স্নান করে প্রভু সাক্ষিগোপাল দর্শন করেন। তৎপরে তিনি ভুবনেশ্বরে উপনীত হলেন। ভুবনেশ্বর শিবের পূজা করলেন গৌরচন্দ্র।

শিব রাম গোবিন্দ বলিয়া গৌররায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥[২]

অতঃপর মহাপ্রভু এলেন কমলপুরে। এখান থেকেই জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়। প্রেমার্তি প্রকাশ করতে করতে তিনি পৌঁছালেন আঠারনালায়। এখানে বসে মহাপ্রভু পার্ষদদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন জগন্নাথ দর্শন সম্পর্কে। মুকুন্দ বললেন, 'তুমি আগে যাও।' মত্তসিংহের গতিতে চললেন শ্রীচৈতন্য নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরে।

১ উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃঃ ৪৪ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য ২ অঃ

নবম অধ্যায়

নীলাচল পর্ব

সার্বভৌম মিলন

নীলাচলে উপস্থিত হলেন তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জগন্নাথ মন্দিরের সমীপে গমন করে তিনি প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বৃন্দাবন দাসের বিবরণে প্রভু আঠারনালা থেকে সরাসরি জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করলেন; জগন্নাথ-সুভদ্রা-সঙ্কর্ষণ বিগ্রহ দর্শন করে প্রভুর ভাববিকার উপস্থিত হয়।

দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্ছিত।
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥[১]

এই সময়ে জগন্নাথ-মন্দিরের পড়িহারিরা তাঁকে প্রহার ক'রতে উদ্যত হোল। সেই সময়ে বাসুদেব সার্বভৌম মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অতি দ্রুত নবীন সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠের উপরে পড়ে তাঁকে রক্ষা করলেন। তৎপরে সার্বভৌম স্থির করলেন, এই মহাপুরুষটিকে স্বগৃহে নিয়ে যাওয়া উচিত। সার্বভৌমের অনুরোধে পড়িহারিগণ মূর্ছিত শ্রীচৈতন্যকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি পরিকরবর্গও সার্বভৌমগৃহে সমাগত হলেন। সার্বভৌম সকলেরই জগন্নাথ দর্শনের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিন প্রহর পরে প্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করে নিত্যানন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সার্বভৌমকে কোলে করলেন এবং অতঃপর জগন্নাথের নিকটে না গিয়ে দূর থেকে গরুড়স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দেখবেন বলে সিদ্ধান্ত করলেন।

আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥[২]

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য ২অঃ ২ তদেব

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দর্শনের বিবরণ প্রদান করেছেন বৃন্দাবনের অনুসরণে। তাঁর গ্রন্থেও বাসুদেব জগন্নাথ মন্দির থেকে মূর্ছিত চৈতন্যদেবকে স্বগৃহে এনেছিলেন পড়িছাদের হাত থেকে রক্ষা করে। তারপর বাসুদেবের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্য পূর্বপরিচিত মুকুন্দের কাছ থেকে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ, নীলাচলে আগমন প্রভৃতি বৃত্তান্ত শুনলেন এবং চৈতন্য পার্ষদগণ সহ বাসুদেবের গৃহে উপনীত হলেন।

ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্বভৌম লইয়া গেল আপন ভবন ॥[1]

বাসুদেব পুত্র চন্দনেশ্বরকে প্রেরণ করলেন, নিত্যানন্দাদি ভক্তগণকে জগন্নাথ দর্শন করাতে। জগন্নাথ দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন করে সকলে উচ্চরবে হরিসংকীর্তন করতে থাকলে বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চৈতন্য সম্পাদিত হয়। তৎপরে সমুদ্র-স্নানান্তে প্রভু সার্বভৌমগৃহে সগণে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।[2]

মুরারি ও কবিকর্ণপূরের বিবরণ উপরি-উক্ত বিবরণ থেকে ভিন্ন। মুরারি বলেন, চৈতন্যপ্রভু নীলাচলে পৌছেই আগে বাসুদেবের গৃহে গিয়ে তাঁকে জগন্নাথ দর্শনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলেন।

গত্বাদৌ বাসুদেবস্য সার্বভৌমস্য বেশ্মনি।
সত্বরং স ননাম দণ্ডবৎ সুধীঃ ॥
দৃষ্ট্বা তং প্রাহ ভগবান্ সগদ্গদগিরা হরিঃ।
কথং দ্রক্ষ্যামি দেবেশং জগন্নাথং সনাতনম্ ॥[3]

—প্রথমে বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেই সুধী (বাসুদেব) সত্বর উঠে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখে ভগবান হরি (গৌরাঙ্গ) গদ্গদভাষায় বললেন, দেবেশ জগন্নাথ সনাতনকে কখন দেখবো ?

বাসুদেব অপূর্বদর্শন তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে বিস্ময়াপন্ন হয়ে পুত্রকে প্রেরণ করলেন শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দর্শনের ব্যবস্থা করে দিতে—

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তনুজং প্রাহ শুদ্ধধীঃ।
গচ্ছ ত্বং শ্রীযুতেনাদ্য চৈতন্যেন মহাত্মনা ॥
পুরং ভগবতঃ শীঘ্রং যথাসৌ পুরুষোত্তমম্।
পশ্যত্যনন্তপুরুষমনায়াসেন তৎকুরু ॥[4]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৬ পরি　২ চৈ. চ. মধ্য. ৬ পরি　৩ মু. ক.—৩।১১।৪-৫
৪ মু. ক.—৩।১১।১৪-১৫

—এই কথা মনে মনে চিন্তা করে শুদ্ধমতি (সার্বভৌম) পুত্রকে বললেন, তুমি মহাত্মা শ্রীযুক্ত চৈতন্যের সঙ্গে আজই ভগবানের মন্দিরে যাও, যাতে তিনি অনন্ত পুরুষ পুরুষোত্তমকে অনায়াসে দর্শন করতে পারেন, তাই কর।

তখন সার্বভৌমনন্দন শ্রীচৈতন্যকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে গমন করলেন, শ্রীচৈতন্যও পুরুষোত্তম দর্শন করে প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো, দেহ কম্পিত হতে লাগলো, ঝড়ে ভগ্ন হেমাদ্রিশৃঙ্গের মত ভূপতিত হয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁকে সত্বর বাহু দ্বারা ধরে ফেলে কোলে করে সার্বভৌমালয়ে নিয়ে গেলেন। সার্বভৌমগৃহে তিনি কীর্তন ও নৃত্য করলেন, ভিক্ষা করলেন এবং ভক্তগণ সহ মহাপ্রসাদ ভোজন করলেন।[১]

কবিকর্ণপূরও মুরারিকে অনুসরণ করেই বলেছেন যে শ্রীচৈতন্য শ্রীক্ষেত্রে উপনীত হয়ে বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, বাসুদেব এই দিব্যকান্তি তরুণবয়স্ক সন্ন্যাসীর নয়নাভিরাম রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন দান করে প্রণামপূর্বক তাঁর পরিচয় জ্ঞাত হওয়ার পর পুত্রকে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দর্শনের ব্যবস্থা করতে আদেশ করলেন। শ্রীচৈতন্যও বাসুদেবতনয়ের সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দর্শন করে হৃষ্টান্তঃকরণে স্তুতিনতি ও প্রদক্ষিণ করে শ্রীক্ষেত্রে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন।[২]

কবিকর্ণপূরের নাটক অনুসারে শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ মুকুন্দের সঙ্গে বাসুদেব সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যের পরিচয় ছিল। গোপীনাথ মুকুন্দের মুখে গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস বৃত্তান্ত ও জগন্নাথ দর্শনাকাঙ্ক্ষার কথা অবগত হয়ে বললেন, সার্বভৌমের চেষ্টা ব্যতীত জগন্নাথ দর্শনের সুযোগ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং গোপীনাথ সপরিকর চৈতন্যদেবকে সার্বভৌমের গৃহের নিকটে অবস্থান করতে বলে অধ্যাপনান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশোন্মত সার্বভৌমের নিকট মহাপ্রভাবশালী মহাপুরুষের আগমনবার্তা জ্ঞাপন করলেন। সার্বভৌম স্বয়ং অগ্রবর্তী হয়ে শ্রীচৈতন্যকে স্বাগত জানালেন এবং গোপীনাথকে জিজ্ঞাসা করে তরুণ সন্ন্যাসীর পরিচয় জ্ঞাত হলেন। সার্বভৌমের আদেশে তৎপুত্র চন্দনেশ্বর সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যের নির্বাধ জগন্নাথদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩]

---

১ ম. ক.—৩।১১।১৬-২০ ২ চৈ. চ. মহাকাব্য—১২।১-৯

৩ চৈ. চন্দ্র নাটক—৬ষ্ঠ অংক

লোচন দাস মুরারি ও কবিকর্ণপূরের বিবরণকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর কাব্যেও শ্রীচৈতন্ত প্রথমে বাসুদেব সার্বভৌমের শরণাপন্ন হয়েছিলেন জগন্নাথ দর্শনে সহায়তা লাভের আশায়।

উত্তরিল বাসুদেব সার্বভৌম ঘর॥
সার্বভৌম প্রভুরে দেখিয়া হরষিতে।
সন্তুষ্ট হইয়া দিল আসন বসিতে॥
নমো নারায়ণ বলি কৈল নমস্কার।
রাধাকৃষ্ণে শীঘ্র মতি হউক তোমার॥
প্রভু আশীর্বাদ বাণী শুনি ভট্টাচার্য।
বুঝিলেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মহাচার্য॥
সার্বভৌম দেখি প্রভু কহিল বচন।
জগন্নাথ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন॥
কেমনে দেখিব আমি দেবদেব রায়।
সাক্ষাৎ করিতে মোর সম্ভ্রম হিয়ায়॥[১]

এই কথা শুনে সার্বভৌম পুত্রকে বললেন—

সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্ত সংহতি।
সাবধানে শুনিবে যে কহে মহামতি॥
শ্রীজগন্নাথ সহিত ইহায় থোবে তার কাছে।[২]

জগন্নাথ দর্শনের পর প্রভু ফিরে এলেন সার্বভৌম গৃহে, সার্বভৌম তাঁকে ভিক্ষায় গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং জগন্নাথের মহাপ্রসাদ এনে প্রভুকে ভোজন করালেন।

তবে মহাপ্রভু নৃত্য অবসানে।
ভিক্ষা আমন্ত্রণ তারে দিল সার্বভৌমে॥
প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মণের গণ।
প্রভু সঙ্গে সার্বভৌম করয়ে মিলন॥
* * *
জগন্নাথ অন্ন মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মস্তকে বন্দিলা প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥[৩]

১-৩ চৈ. ম. মধ্যখণ্ড

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের সঙ্গে উৎকলাধীশ প্রতাপরুদ্রদেবের বিবাদ থাকার জন্যই হোক বা হোসেন শাহের সৈন্যদল উড়িষ্যার মঠ-মন্দির ধ্বংস করার জন্যই হোক জগন্নাথ মন্দিরে রাজপুরুষগণের অনুমতি ভিন্ন অপরিচিত বিদেশীর প্রবেশাধিকার ছিল না বলে মনে হয়। তাই পূর্ব পরিচিত গোপীনাথের সাহায্যে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরই সার্বভৌমের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং মুরারি, কবিকর্ণপুর ও লোচনের বিবরণ যথার্থ বোধ হয়। বিশেষতঃ মুরারি সমসাময়িক লেখক এবং তাঁর বিবরণ বাস্তবতা-সম্মত।

যাই হোক্ নবীন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে দেখে বাসুদেব ভাবলেন—

অয়ং মহাবংশসমুদ্ভবঃ পুমান্ সুপণ্ডিতঃ স্বল্পবয়াঃ কথং চরেৎ।
সন্ন্যাসধর্মং তদমুং দ্বিজং পুনঃ কৃত্বাত্মবেদান্তম্ শিক্ষয়ামহি॥[1]

—এই মহৎ বংশে উদ্ভূত পুরুষ সুপণ্ডিত স্বল্পবয়স্ক ইনি কি করে সন্ন্যাসধর্ম আচরণ করবেন? এঁকে পুনরায় ব্রাহ্মণ করে বেদান্ত শিক্ষা দোব।

কবিকর্ণপুরের মহাকাব্যে সার্বভৌম বলেছেন—

অসৌ মহাবংশসমুদ্ভবশ্চ মহাশয়শ্চাল্পবয়োবিকাশঃ।
কলৌ তদর্হাং যতিতাং সুদুর্গাং কথং তরিষ্যত্যহহাতিকষ্টম্॥[2]

—ইনি মহাবংশে জাত, মহদাশয়, অল্পবয়স প্রকটিত। হা অতি কষ্ট! কলিতে তদনুরূপ সুদুর্গম যতিধর্ম কিরূপে পার হবেন?

তদেতমত্যন্তসুশান্তচিত্তং সংশ্রাব্য বেদান্তমজস্রমেব।
করোমি বৈরাগ্যরসেন ভাগবজ্ঞানৈকতানেন চ মোক্ষপান্থম্॥[3]

—সুতরাং এই অত্যন্ত সুশান্তচিত্ত ব্যক্তিকে অবিরত বেদান্ত শ্রবণ করিয়ে বৈরাগ্য রসের দ্বারা এবং ভাগবৎজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের একতানের দ্বারা তাঁকে মোক্ষ পথের পথিক করতে হবে।

কবিকর্ণপুরের নাটকে বাসুদেব সার্বভৌম গোপীনাথের কাছে শ্রীচৈতন্য ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত কেশবভারতীর নিকট থেকে দীক্ষাগ্রহণ করেছেন জেনে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাভরেই বলেছিলেন—ভদ্রতর সাম্প্রদায়িকভিক্ষোঃ পুনর্যোগপট্টং গ্রাহয়িত্বা

১ মু. ক.—৩।১২।৯ ২ চৈ. চ. মহা—১২।১৫ ৩ চৈ চ. মহা—১২।১৬

বেদান্তশ্রবণেনায়ং সংস্করণীয়ঃ ॥[1] —কোন ভক্তজন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর দ্বারা পুনরায় তাঁকে যোগপট্ট গ্রহণ করিয়ে বেদান্ত শুনিয়ে সংস্কার সাধন করা উচিত।

জয়ানন্দের কাব্যে সার্বভৌম বলেছেন—

এ হেন বয়সে তুমার ধর্ম নয় ॥
বেদান্ত না পড়িলে সন্ন্যাস নিতে নাই।
বেদান্ত পড়াব গোসাঞি তুমার ঠাঁই ॥
শিখাসূত্র ধর পুন বেদান্ত পড়িয়া।
সন্ন্যাস লইবে তুমি বারাণসী গিয়া ॥[2]

বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাস একই প্রকার বিবরণ দিয়েছেন। চৈতন্য ভাগবতে সার্বভৌম বললেন,—

না বুঝিয়া শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥
অতএব তোমারে সে কহিলাঙ আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি ॥
যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখাসূত্রত্যাগে কোন লভ্য আর ॥
যদি বোল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ।
তাঁরাও করিয়াছেন শিখাসূত্র ত্যাগ ॥
তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইল অধিকার।[3]

বাসুদেব রীতিমত তর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু মহাপ্রভু তর্কের পথ গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন যে কৃষ্ণবিরহে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছেন—

প্রভু বোলে শুন সার্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখাসূত্র মুড়াইয়া ॥

---

১ চৈ. চন্দ্র. নাটক—৬ অংক ২ চৈ. ম. উৎকল—১২ ৩ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৩ অঃ

সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥[১]

বৃন্দাবন বলেন, অতঃপর শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমের কাছে ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। সার্বভৌম আত্মারামশ্চ মুনয়ো ইত্যাদি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ষষ্ঠ শ্লোকের তেরো প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। তখন গৌরচন্দ্র উক্ত শ্লোকের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা শোনালেন এবং সার্বভৌমকে ষড়ভুজ মূর্তি দেখালেন। এই আশ্চর্য মূর্তি দেখে সার্বভৌম মূর্ছিত হলেন, গৌরাঙ্গদেব 'ওঠ' বলে তাঁর মাথায় হাত দিলে সার্বভৌম চেতনা ফিরে পেলেন, তখন শ্রীচৈতন্য 'পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয় উপর।'[২] সার্বভৌম পুলকিত অন্তরে শত শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের স্তব করলেন। এই শত শ্লোক সার্বভৌম শতক নামে পরিচিত।

কবিরাজ গোস্বামীর মতে সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যের অবস্থানের জন্য তাঁর মাতৃস্বসার গৃহ নির্দিষ্ট করে দিলেন এবং তরুণ সন্ন্যাসীকে বেদান্ত পড়াবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

নিরন্তর ইহাঁরে আমি বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥[৩]

এরপর ঈশ্বরতত্ত্ব ও কলিতে ভগবানের অবতারত্ব নিয়ে আলোচনা হোল, সার্বভৌম ভট্টাচার্য সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। অন্য একদিন জগন্নাথ দর্শনের পরে বাসুদেব সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে বেদান্ত পড়াতে আরম্ভ করলেন। প্রভু সাতদিন ধরে মৌনভাবে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনলেন, কোন কথা বললেন না। বাসুদেব বললেন,

তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥[৪]

প্রভু উত্তরে জানালেন, সার্বভৌমকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ, দুর্বোধ্য।

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য ৩ অঃ ২ চৈ. ভা অন্ত্য ৩ অঃ ৩ চৈ. চ. মধ্য ৬ পরি
৪ চৈ. চ মধ্য ৬ পরি

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনা অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন॥[1]

জয়ানন্দের কাব্যে শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমকে বলেছিলেন—

তুমার গুরুর গুরু কিছু জানে বেদান্ত।
বেদান্ত হইল কি কবিকল্প সিদ্ধান্ত॥[2]

মহাপ্রভুর পক্ষে এই দম্ভোক্তি যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি বাসুদেবের প্রতিক্রিয়াও আরও অস্বাভাবিক। জয়ানন্দ বলেন,—

একথা শুনিয়া ক্রোধে সার্বভৌম উঠে।
হাসিয়া চৈতন্য গোসাঞি গেলা সিন্ধুতটে॥
জগন্নাথের আজ্ঞা সার্বভৌম দ্বার রাখে।
আসিতে না দিহ বলি সিংহদ্বারে থাকে॥
আমার সনে বিবাদ করিলে চিড়ি পো।
নীলাচল হইতে বাহির কর্যা খো॥
চক্রবেড় প্রবেশিতে বেত্র মার শিরে।
সার্বভৌম বলেন জগন্নাথের আজ্ঞা শিরে॥[3]

মন্দিরের দ্বারে পাহারা দিয়েও বাসুদেব শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ দর্শনের পথ রুদ্ধ করতে পারলেন না, কারণ জগন্নাথ সার্বভৌমকে আজ্ঞা দিলেন—"চৈতন্যদেবের ঝাট করাহ সন্তোষ।" বাসুদেব তখন জগন্নাথ ও চৈতন্যদেবকে অভিন্ন জেনে ক্ষৌমবস্ত্র উপহার দিয়ে শ্রীচৈতন্যকে তুষ্ট করলেন, শ্রীচৈতন্যও বাসুদেবকে আলিঙ্গন করে ধন্য করলেন।

জয়ানন্দ পরিবেশিত এই গল্প নিছক ছেলেভোলানো গল্প। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের পিতৃতুল্য বৃদ্ধ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিতের প্রতি অপমানকর দম্ভোক্তি যেমন অস্বাভাবিক—

---

১ চৈ চ. মধ্য ৬ পরি ২ চৈ. ম. উৎকল—১২।১১ ৩ চৈ. ম. উৎকল—১২।১২-১৫

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবীয় আদর্শের পরিপন্থী, তেমনি বৃদ্ধ পণ্ডিতের পক্ষেও ক্রোধে আত্মহারা হয়ে জগন্নাথমন্দিরের দ্বারে পাহারা দেওয়াও অসম্ভব। বৃন্দাবনের বিবরণও স্বকপোলকল্পিত মনে হয়। বেদান্ত শিক্ষা দিতে গিয়ে বাসুদেব কেন যে ভাগবতের একটি শ্লোকের তেরো রকমের ব্যাখ্যা করে নিজের পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দিতে গেলেন তাও যেমন বলা কঠিন, তেমনি বাসুদেবের বক্ষে শ্রীচৈতন্যের পদস্থাপনও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কবিরাজ গোস্বামীর মতে প্রভু বাসুদেবের বেদান্তব্যাখ্যা খণ্ডিত করে নিজের মত অর্থাৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল ॥[১]

সার্বভৌম চৈতন্যদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বিস্মিত হলেন। মহাপ্রভুর অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি আত্মারামশ্চ মুনয়ো ইত্যাদি (১।৭।১০) শ্লোকটির নয় প্রকার ব্যাখ্যা শোনালেন। শ্রীচৈতন্য বাসুদেবের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেও উক্ত শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করেছিলেন।

নানাবিধ অর্থ তর্কশাস্ত্রমত লৈয়া।
শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥
ভট্টাচার্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে কারো নাহি ঐছে শক্তি ॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বৈ শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায় ॥
ভট্টাচার্যের প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নব অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল ॥
আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।
পৃথক পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ॥
তত্তৎ পদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া ॥[২]

চৈতন্যচন্দ্রের এই অসাধারণ শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বাসুদেব তাঁকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভেবে তাঁর শরণ গ্রহণ করলেন।

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৬ পরি   ২ চৈ. চ. মধ্য. ৬ পরি

শুনি ভট্টাচার্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিকার॥
ইহোঁ ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্বিত হইয়া॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ॥[১]

অতঃপর চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখালেন। সার্বভৌমও তাঁকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তব করলেন। তিনি বললেন—

তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥[২]

মুরারি বলেছেন, সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বেদান্তজ্ঞান দিয়ে সন্ন্যাস ত্যাগ করাতে ইচ্ছুক জেনে মহাপ্রভু হেসে বললেন, আমার আবার উপনয়ন হবে— যজ্ঞোপবীতং পুনরেব মে ভবেৎ।[৩] তারপরে অপরাহ্নে মহাপ্রভু সার্বভৌমের কাছে গিয়ে বেদান্তের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করলেন, সার্বভৌমও বেদান্তের সারসত্য উপলব্ধি করে শ্রীচৈতন্যের পদে শরণ নিলেন॥

তথাপরাহ্নে দ্বিজবৃন্দসন্নিধৌ স সার্বভৌমস্য পুরো মহাপ্রভুঃ।
উবাচ বেদান্ত নিগূঢ়মর্থং বচো মুরারেশ্চরণাম্বুজাশ্রয়ম্॥
বেদান্তসিদ্ধান্তমিদং বিদিত্বা গতং পুরা যত্তদলং স মত্বা।
চৈতন্যপাদাব্জযুগে মহাত্মা স বিস্ময়োৎফুল্লমনাঃ পপাত॥[৪]

—অনন্তর অপরাহ্নে ব্রাহ্মণগণের সান্নিধ্যে মহাপ্রভু সার্বভৌমের সমক্ষে কৃষ্ণের চরণপদ্ম আশ্রয়রূপ বেদান্তের নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। এই-ই বেদান্তের সিদ্ধান্ত জেনে পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা অনর্থক বুঝে মহাত্মা সার্বভৌম বিস্ময়ে আনন্দিতমনে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মযুগলে পতিত হলেন।

কবিকর্ণপুর চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে জানিয়েছেন যে মহাপ্রভু মঙ্গল আরতির পরে জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণ করে সার্বভৌমগৃহে উপনীত হয়ে শয্যাত্যাগ করে হস্তমুখ প্রক্ষালনের পূর্বেই সার্বভৌমের হাতে মহাপ্রসাদ প্রদান করলেন। সার্বভৌমও উন্মত্তবৎ বাসিমুখেই সেই 'প্রসাদ ভক্ষণ করে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তৎপরে তিনি স্বীয় মাতৃস্বসার আলয়ে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান

১ চৈ. চ. মধ্য. ৬ পরি   ২ চৈ. চ. মধ্য   ৩ মু. ক.—৩।১২।৯
৪ মু. ক.—৩।১২।১২-১৩

স্থানে গমন করে কৃষ্ণজ্ঞানে শ্রীচৈতন্যের স্তব আবৃত্তি করলেন দুটি শ্লোকে। আত্মপ্রশংসা শুনে শ্রীচৈতন্য স্বীয় কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করেছিলেন। অতঃপর দামোদর ও জগদানন্দ সার্বভৌম ভট্টাচার্য রচিত দুটি শ্লোক আনয়ন করেন ও মুকুন্দ শ্লোকদ্বয় পাঠ করেন। শ্লোকদুটি নিম্নরূপ :

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥[১]

—বৈরাগ্য বিদ্যা ও নিজ (কৃষ্ণ) ভক্তিযোগ শিক্ষা দেবার জন্য পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে দেহধারণ করেছেন, যিনি দয়ার সাগর, তাঁর আমি শরণ গ্রহণ করি।

—কালপ্রভাবে নষ্ট নিজভক্তিযোগ (কৃষ্ণভক্তিযোগ) পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরই পাদপদ্মে আমার চিত্তভৃঙ্গ প্রগাঢ়ভাবে লীন হোক।

এই শ্লোকদুটি যদি কবিকর্ণপূরের রচিত না হয়ে সার্বভৌমের রচিত হয়, তাহলে সার্বভৌমের চৈতন্যশরণাগতি সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। তবে বাসুদেব শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেছিলেন তা রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী থেকেই জানা যায়। কবিরাজ গোস্বামী কবিকর্ণপূরের নাটক থেকে শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করে সার্বভৌমের চৈতন্যভক্তির বিবরণ দিয়েছেন—

এই দুই শ্লোক ভক্তিকণ্ঠে রত্নহার।
সার্বভৌমের কীর্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যকার ॥
সার্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেব্য নাহি জানে আন ॥[২]

---

১ চৈ. চ. ৬ অঙ্ক ২ চৈ. চ. মধ্য

প্রেমবিলাসে সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বলেছেন—

অবিদ্যমানের কথা কি কহিব আমি।
যে তোমার মনে হয় তাহা কয় তুমি॥
তার সাক্ষী আছে প্রভু! মোর মায়াবাদ।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তিব্যাখ্যা তোমার প্রসাদ॥
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি পথে হৈনু তব দাস।
প্রভুর দর্শনে মোর বন্ধ গেল নাশ॥[১]

সার্বভৌম এবং তাঁর বংশ যে মহাপ্রভুর প্রভাবে বৈষ্ণব হয়েছিলেন, তার আর একটি প্রমাণ সার্বভৌমের পৌত্র জলেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র স্বপ্নেশ্বরাচার্য ভক্তিশাস্ত্রের আকর গ্রন্থ শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছিলেন।[২]

বৃন্দাবন দাস বলেছেন, বাসুদেবকে কৃষ্ণপরায়ণ নিজভক্তে পরিণত করার পর মহাপ্রভু কীর্তন-বিহারে কালযাপন করতে থাকেন—

হেন মতে করি সার্বভৌম উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্তন বিহার॥
নিরবধি নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে।
রাত্রিদিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে॥[৩]

অতঃপর একে একে ভক্ত পরিকরগণ সমবেত হতে লাগলেন। নীলাচলে এসে উপনীত হলেন পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, দুই ভাই পরমানন্দ ও রামানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি।

এই মত যতেক সেবক যথা ছিলা।
সভেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিলা॥[৪]

কিছুদিন পরে প্রভু সমুদ্রতীরে বাস করতে লাগলেন, এখানে তিনি সপরিকর কীর্তনরসে নিমগ্ন থেকে নৃত্যগীতে রাত্রি যাপন করতে থাকেন।

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে।
সর্ববৈকুণ্ঠাদিনাথ কীর্তনে বিহরে॥
বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিহরেন প্রভু ভক্তি আনন্দ-সাগরে॥[৫]

---

১ প্রেম. বি. ১ম বি. ২ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ৩৫৪
৩ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৩ অঃ ৪ চৈ. ভা. অন্ত্য, ৩ অঃ ৫ চৈ. ভা. অন্ত্য, ৩ অঃ

দশম অধ্যায়

দাক্ষিণাত্য পরিক্রমা

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে ফাল্গুন মাসে নীলাচলে উপনীত হয়েছিলেন। ফাল্গুনে তিনি নীলাচলে দোলযাত্রা উৎসব প্রত্যক্ষ করেন, চৈত্রমাসে বাসুদেব সার্বভৌমকে স্ববশে আনয়ন করে বৈশাখের প্রথমে তিনি দক্ষিণ ভারত যাত্রা করেছিলেন।

চৈত্রে রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥[১]

বৃন্দাবন দাস নীলাচল থেকে প্রভুর গৌড়ে গমন বর্ণনা করেছেন, দক্ষিণ দেশে গমনের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু অন্যান্য চরিতগ্রন্থগুলি সমস্বরে প্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার বিবরণ দিয়েছে বা উল্লেখ করেছে। কবিকর্ণপূর মহাকাব্যে লিখেছেন—

অথৈষ নাথঃ কতিচিদ্দিনানি নীত্বা প্রযাতুং দিশি দক্ষিণস্যাম্।
চক্রে মনস্তং সমনুব্রজন্তঃ সর্বে চ জগ্মুর্হরিনামপূর্বকম্ ॥
গত্বা কিয়দ্দূরমসৌ কৃপাবান্ বিসর্জয়ামাস তদা সমস্তান্।
তত্রান্তরে বর্ত্মনি সোঽপি গোপীনাথাহ্বয়ো ভূসুর আননাম ॥[২]

—তারপর প্রভু কতিপয় দিবস যাপন করে দক্ষিণ দিকে যাত্রায় মনস্থ করেন, তাঁর ভক্তগণও সকলেই হরিনাম কীর্তন পূর্বক অনুগামী হয়েছিলেন। কিছুদূর গিয়ে কৃপাময় সকল ভক্তকে পরিত্যাগ করেন। সেই সময় গোপীনাথ নামক এক ব্রাহ্মণ এসে প্রভুকে প্রণাম করেছিলেন।

প্রভু গোপীনাথের হাতের পুঁথিখানি নিয়ে বৃক্ষতলে বসে পড়তে লাগলেন। ঐ পুঁথিতে বাসুদেব সার্বভৌমের রচিত কাব্যে কৃষ্ণ নামটি দেখে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে বৃক্ষতলে অবশিষ্ট দিন ও রাত্রি যাপন করলেন। পরে সার্বভৌমের ন্যায় কৃষ্ণভক্তকে পরিত্যাগ করে আসা অনুচিত কর্ম ভেবে শ্রীচৈতন্য পুনর্বার ফিরে গেলেন নীলাচলে। পরদিন প্রাতে প্রভু সার্বভৌমের প্রাতঃকৃত্যাদি

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৭ পরি   ২ চৈ. চ. মহা.—১২।৩৫-৩৬

সমাপনের পূর্বেই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ভোজন করালেন। এই সময়ই প্রভু সার্বভৌমের ইচ্ছানুসারে ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দুটি শ্লোকের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নয় প্রকার নয় প্রকার অর্থাৎ মোট আঠারো প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। সার্বভৌমও প্রভুর অসাধারণ শক্তিতে মোহিত হয়ে তার স্তবস্তুতি করেন। এই সময়েতেই সার্বভৌম রচিত বৈরাগ্যবিদ্যা ইত্যাদি শ্লোক দুটি সার্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। শ্লোকদুটি পড়ে মহাপ্রভু পত্রিকাটি ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর অষ্টাদশ দিবস নীলাচলে যাপন করে তীর্থভ্রমণার্থ দক্ষিণদেশে যাত্রা করেছিলেন।[১]

দক্ষিণভারতে যাত্রা করে পথিমধ্য থেকে ফিরে এসে সার্বভৌমকে স্বমতে আনয়নের কাহিনী অন্য কোন চরিতগ্রন্থে নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন, বাসুদেব শ্লোকদুটি লিখে পত্রিকাটি জগদানন্দের হাতে দিয়েছিলেন মহাপ্রভুকে দেবার জন্য। মুকুন্দ দত্ত শ্লোকদুটি প্রাচীর গাত্রে (বাহির ভিতে) লিখে রেখেছিলেন। মহাপ্রভু শ্লোকদুটি পড়ে পত্রিকাটি ছিঁড়ে ফেললেও ভিত্তি গাত্রে লিখিত শ্লোকদুটি ভক্তগণ মুখস্থ করেছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী কবি-কর্ণপূরের মহাকাব্য অনুসারে এই কাহিনী রচনা করেছেন। কবিকর্ণপূরের নাটকে দক্ষিণযাত্রাপথ থেকে ফিরে আসার কথা বলা হয় নি।[৩] মুরারি কেবল বলেছেন যে, সার্বভৌম কৃষ্ণরূপে মহাপ্রভুর স্তুতি করেছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রভু তাঁকে সত্বর বাহুযুগলে আবদ্ধ করে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন।[৪] মনে হয়, পথ থেকে ফিরে আসার গল্পটি কবিকর্ণপূরের কল্পনা প্রসূত।

চরিতামৃত অনুসারে দাক্ষিণাত্য গমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহাপ্রভু ভক্তদের বলেছিলেন—

দাক্ষিণাত্য গমনের উদ্দেশ্য

বিশ্বরূপ উদ্দেশ্যে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব॥[৫]

দক্ষিণে যাত্রাকালে তিনি বাসুদেব সার্বভৌমের অনুমতি নিতে গিয়েও বলেছিলেন—

সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে॥[৬]

১ চৈ. চ. মহা ১২ সর্গ ২ চৈ. চ. মধ্য ৬ পরি ৩ চৈ. চন্দ্র. না—৬ অংক
৪ মু. ক.—৩।১২ ৫ অবেব ৭ পরি ৬ চৈ. চ. মধ্য ৭ পরি

জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপের অনুসন্ধানই কি শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল? বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের দু বৎসর পরে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে দেহ রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে ফল কি? এ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে বিশ্বরূপের লোকান্তর সম্পর্কে যদিও শ্রীচৈতন্য অবহিত ছিলেন তথাপি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানের ছলে তিনি দাক্ষিণাত্যবাসীদের উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন।

বিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥[১]

বিশ্বরূপের লোকান্তর প্রাপ্তির সংবাদ সকলের জানা থাকা সত্ত্বেও এরূপ ছলনা অর্থহীন। হরিনাম প্রচার করতে যাওয়ার জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? হরিনাম প্রচার করে দক্ষিণদেশের মানুষকে উদ্ধার করার বিবরণ কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে অনুপস্থিত, অন্য কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থেও পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চায় দক্ষিণদেশে মহাপ্রভু কর্তৃক পাপী তাপী পাষণ্ডী উদ্ধারের বিবরণ আছে। কবিকর্ণপূরের নাটকে মল্লভট্ট রাজা প্রতাপরুদ্রকে জানিয়েছেন যে দক্ষিণ দেশে জ্ঞাননিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ, শৈব, সাত্বত, পাষণ্ডী (বৌদ্ধ?) প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব মত পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণ করেছিলেন।[২] বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে তীর্থ সন্দর্শনের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। মুরারির বিবরণে মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের গৃহে ভক্তদের বলেছিলেন—

ভবন্ত এব পশ্যন্তু পুরুষোত্তমমীশ্বরম্।
অহং তীর্থাটনে যামি জগন্নাথেন বঞ্চিতঃ ॥[৩]

—তোমরা ভগবান্ পুরুষোত্তম দর্শন কর, আমি জগন্নাথ বিরহিত হয়ে তীর্থ পর্যটনে গমন করবো।

কবিকর্ণপূরও তীর্থযাত্রার কথাই উল্লেখ করেছেন—

অষ্টাদশাহানি তত্র নীত্বা বিলোক্য তং দেবমতিহর্ষাৎ।
প্রচক্রমে চংক্রমণায় নাথো বিমোহয়ন্ কাংশ্চন বিপ্রযোগৈঃ ॥[৪]

---

১ চৈ চ. মধ্য ৭ পরি ২ চৈ. চন্দ্র নাটক ৭ অংক ৩ মু ক.—৩।১৩।১৫

৪ চৈ. চ মহা —১২।৯৪

—আঠারো দিন সেখানে কাটিয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করে ভক্তগণকে বিরহে কাতর করে প্রভু তীর্থ পর্যটনে বাহির হলেন।

নাটকে বাসুদেব সার্বভৌম রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলেছিলেন,—"তীর্থী কুবন্তি তীর্থানি স্বন্তঃস্থেন গদাভৃতা ইতি সামান্যানামেব মহতাময়ং নিসর্গঃ। পরন্ত ভগবানেব স্বয়ম্॥"[১]—মহৎ ব্যক্তিগণের স্বভাবই এই যে তাঁরা নিজের হৃদয়ে গদাধর বিষ্ণুকে ধারণ করে তীর্থযাত্রায় তীর্থ সকলকেই তীর্থ অর্থাৎ পবিত্র করে থাকেন। ইনি ত স্বয়ং ভগবান।

লোচনদাস কেবলমাত্র বলেছেন—"সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর।"[২] মনে হয় তীর্থদর্শনই মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। তবে সুযোগমত তিনি দক্ষিণাঞ্চলে নিজ মতবাদও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রভুর দৃঢ়সংকল্প দেখে ভক্তবৃন্দ প্রভুর বিরহদুঃখ সহ্য করেও তাঁকে দক্ষিণদেশে গমনের অনুমতি দিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম গোদাবরী নদীর তীরে পরম ভক্ত বৈষ্ণব রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতে অনুরোধ করলেন—"গন্তব্যমিতি নিশ্চয়ে কৃতে মম্নোক্তং গোদাবরীতীরে রামানন্দো বর্ততে সোঽবশ্যমেবানুগ্রাহ্যঃ।"[৩]

তত্রাস্তি পরমো মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ।
নোপজিহীথা বিষয়ীতি রামানন্দং ভবানন্দতনুজরত্নম্॥[৪]

—সেখানে পরম মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের মত্তভৃঙ্গ ভবানন্দের পুত্ররত্ন রামানন্দ, তাঁকে বিষয়ীজ্ঞানে ত্যাগ কোরো না।

কবিরাজ গোস্বামী এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন—

রায় রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্রবিষয়ীজ্ঞানে তারে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তারে অবশ্য মিলিবা॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥[৫]

মুরারি এ ব্যাপারের উল্লেখ করেন নি। মহাপ্রভু ভক্তগণকে শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস দিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলেন। কবিকর্ণপূরের চৈতন্য

---

১ চৈ. চন্দ্র. না. ৭ অংক ২ চৈ. ম. শেষখণ্ড ৩ চৈ. চন্দ্র. না. ৭ অংক
৪ চৈ. চ. মহা.—১২।৯৯ ৫ চৈ. চ. মধ্য ৭ পরি

চন্দ্রোদয় নাটক অনুসারে বাসুদেব সার্বভৌম কর্তৃক নিযুক্ত একদল বিপ্র গোদাবরী-তীরবর্তী বিদ্যানগরে অবস্থানরত রায় রামানন্দের আবাস পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তৎপরে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলে শ্রীচৈতন্য একাই দক্ষিণাপথে অগ্রসর হন। চৈতন্য চরিতামৃত অনুসারে মহাপ্রভু একাকী দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সঙ্কল্প করলে নিত্যানন্দপ্রভুর অনুরোধক্রমে তিনি কৃষ্ণদাস নামে এক সরল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন ॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে ॥
তবে তাঁর বাক্যে প্রভু কৈল অঙ্গীকারে।
তাহা সবা লঞা গেলা সার্বভৌম ঘরে ॥[১]

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস। অন্য কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গীর উল্লেখ নেই। গোবিন্দদাসের কড়চা অনুসারে মহাপ্রভুর একাকী দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সংকল্পে ব্যাকুল হয়ে নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে মহাপ্রভু স্বীকৃত হলেন না। শেষপর্যন্ত সকলের অনুরোধে তিনি গোবিন্দ কর্মকারকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন।

এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি।
গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি ॥
যে যাক্ যে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে।
আমার যে কার্য তাহা গোবিন্দ করিবে ॥[২]

গোবিন্দ কর্মকারের নাম অন্যত্র পাওয়া গেলেও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে গোবিন্দের নাম সঙ্গী হিসাবে অন্য কোথাও উল্লিখিত না হওয়ায় সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সে যাই হোক্, দক্ষিণে যাত্রায় মহাপ্রভু প্রথমে উপনীত হলেন আলালনাথে।

আলালনাথমাগত্য প্রেমান্দেহমধৈর্যতঃ।[৩]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৭ পরি   ২ গো. ক —পৃঃ ২১   ৩ মু. ক.—৩।১৪।২

আলালনাথ দর্শনে প্রেমাপ্লুতদেহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ নাম গান করতে করতে প্রভু কখনও হলেন ভূলুণ্ঠিত, কখনও হলেন মূর্ছিত।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি উবাচোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ।
ক্ষণং বিলুঠতে ভূমৌ ক্ষণং মূর্চ্ছতি জল্পাত॥
ক্ষণং গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ রামেতি নামভিঃ।
মহাপ্রেমপ্লুতং গাত্রমালালনাথদর্শনে॥[১]

আলালনাথে তিনি একরাত্রি অবস্থান করেছিলেন—"আলালনাথ ক্ষেত্রে স রাত্রৈকং সংন্যবাসয়ৎ।"[২]

আলালনাথে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করে মহাপ্রভু উপনীত হলেন কূর্মক্ষেত্রে, দর্শন করলেন বিষ্ণুর কূর্মাবতার বিগ্রহ—আগতে কূর্মক্ষেত্রে চ কূর্মরূপী জনার্দনঃ।[৩] কবিকর্ণপূর লিখেছেন,—"ততস্তত্রৈব কূর্মক্ষেত্রে কূর্মদেবং প্রণম্য স্তুত্বা কূর্মনাম্নো দ্বিজবরস্য গৃহমুত্তীর্ণবান্।"[৪]

এই মত যাইতে যাইতে গেলা কূর্মস্থানে।[৫]
ভগবান্ কৃপালুঃ কৌমে জগাম প্রথমং প্রমোদাৎ।[৬]

কূর্মক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য কূর্ম নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। মুরারি, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ এখানে বাসুদেব নামক এক কুষ্ঠরোগীর মহাপ্রভুর কৃপালাভ ও কুষ্ঠরোগ মোচনের বিবরণ প্রদান করেছেন। অতঃপর মহাপ্রভু এসে হাজির হলেন জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে—

কিয়দ্দূরং সমাগত্য জিয়ড়াখ্যং নৃসিংহকম্।
দদর্শ পরমপ্রীতঃ প্রেমাশ্রুপুলকাঞ্চিতঃ॥[৭]

—কিয়দ্দূর গিয়ে জিয়ড় নামক নৃসিংহ দর্শন করলেন প্রেমাশ্রুরোমাঞ্চিত দেহে পরম প্রীত হয়ে।

অথৈষ তস্মাৎ পরমঃ কৃপালুর্ব্রজন্ নৃসিংহঃ স তু নারসিংহে।
ক্ষেত্রে সমাগত্য নৃসিংহদেবং নমস্কার স্তবমাপ্যকার্ষীৎ॥[৮]

—তারপর সেই স্থান থেকে অগ্রসর হয়ে পরম কৃপাময় নৃসিংহ নারসিংহ ক্ষেত্রে আগমন করে নৃসিংহদেবকে নমস্কার করলেন, স্তবও করলেন।

---

১ মু. ক.—৩।১৪।৪ ২ মু. ক.—৩।১৪।৮ ৩ মু. ক.—৩।১৪।১১
৪ চৈ. চন্দ্র নাটক—৭ অংক ৫ চৈ. চ. মধ্য ৭ পরি ৬ চৈ. চ. মহা.—১২।১০০
৭ মু. ক.—৩।১৪।১৯ ৮ চ. চৈ. মহা—১২।১১৮

"ততশ্চ নৃসিংহক্ষেত্রমুপগম্যাগম্যানুভাবো ভগবন্তং নৃসিংহং দৃষ্ট্বা স্তুত্বা প্রণম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রতস্থে।"[১]

জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কতদিনে॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহুনৃত্যগীত স্তুতি॥[২]
তবে গোরা পহুঁ জীয়ড় নৃসিংহ দেখিয়া।
চলিলা ত পরদিনে সে দিন বঞ্চিয়া॥[৩]

কূর্মক্ষেত্র ও নৃসিংহক্ষেত্রে মহাপ্রভুর গমনের কথা গোবিন্দের কড়চায় পাওয়া যায় না। কড়চায় শ্রীগৌরাঙ্গ আলালনাথ থেকে একেবারে গোদাবরীতে উপস্থিত হয়েছেন। জয়ানন্দ কূর্মস্থান বাদ দিলেও নৃসিংহক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন—

জিয়রে নৃসিংহ দেখি তবে গেলা পঞ্চনখী।
গোদাবরী নদী পার হয়্যা॥[৪]

"কূর্মস্থান মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলায় একটি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। এই স্থানে বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্মদেবের মন্দির আছে। জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র বা সিংহাচলম্ ভিজাগাপট্টম জেলায়। এখানে ভগবান নৃসিংহদেবের মূর্তি বিরাজমান।[৫]

চরিতকারেরা সকলেই অতঃপর শ্রীচৈতন্যের গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বর্ণনা করেছেন।

ইহা শুনি গোদাবরীতীরেতে আইল।
সেই স্থানে রামানন্দ আসিয়া মিলিল॥[৬]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোদাবরীতীরে লোকজন সহ রাজকীয় আড়ম্বরে স্নানে আগত রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের পরে সন্ধ্যাকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর তত্ত্ব আলোচনা হয়।[৭] গোবিন্দের কড়চাতেও রামানন্দের সঙ্গে

---

১ চৈ. চন্দ্র. না. ৭ অংক   ২ চৈ. চ. মধ্য ৮ পরি   ৩ চৈ. ম. লোচন—শেষখণ্ড
৪ চৈ. ম. জয়ানন্দ—উৎকল—১০
৫ চৈতন্যদেবের দক্ষিণভ্রমণ, ২য়, চারুচন্দ্র শ্রীমানি—পৃঃ ৪২
৬ গো. ক.—পৃঃ ২১   ৭ চৈ. চ. মধ্য ৮ পরি

শ্রীচৈতন্যের তত্ত্বালোচনার বিবরণ আছে। কিন্তু মুরারি গুপ্ত বলেছেন যে পরদিন প্রাতঃকালে রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

তত: প্রভাতে বিমলে শুভে প্রভুর্গায়ন্ হরিং প্রেমবিভিন্নধৈর্যঃ।
যযৌ স কাঞ্চীনগরং জগদ্গুরুর্দ্রষ্টুং শ্রীরামানন্দাখ্য রায়ম্॥[১]

মুরারির বিবরণে মহাপ্রভু রামানন্দের গৃহে গিয়েছিলেন, কৃষ্ণপূজার অবসানে রামানন্দ সম্মুখে আশ্চর্য কান্তিময় সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখেছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দকে বৃন্দাবনলীলা স্মরণ করিয়ে তাঁকে শ্রীক্ষেত্রগমনের আদেশ দিয়ে আরও দক্ষিণে যাত্রা করেছিলেন। এখানে রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তত্ত্বালোচনা একেবারেই অনুল্লিখিত। কবিকর্ণপূরের নাটকে মহাপ্রভুর অলৌকিক রূপগুণের কথা শুনে রায় রামানন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন গোদাবরীতীরে এবং এখানেই উভয়ের মধ্যে তত্ত্বালোচনা হয়েছিল।[২] কবিকর্ণপূর আবার মহাকাব্যে বলেছিলেন যে উদাসীনতা দেখিয়ে শ্রীচৈতন্য রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন—তথাপ্যভিব্যজ্য বিভুর্বিরাগং ন তং বিলোক্যৈব যথা বাচীম্।[৩] চৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে মহাপ্রভু দশদিন রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় কালযাপন করেছিলেন।

এইরূপে দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥[৪]

কৃষ্ণদাস বলেছেন, স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে তিনি রামানন্দ মিলন বর্ণনা করেছেন। জয়ানন্দ রামানন্দ-প্রসঙ্গই বর্জন করেছেন। লোচন রামানন্দ মিলনের উল্লেখ মাত্র করেছেন।

রায় রামানন্দ আর প্রভুতে মিলন।
গোরাগুণ গাথা গায় এ দাস লোচন॥[৫]

কবিরাজ গোস্বামী যে কবিকর্ণপূরের নাটক অনুসরণ করে রামানন্দ সংবাদ বর্ণনা করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার শ্রীচৈতন্য ও রামানন্দের সাধ্য-সাধন আলোচনা কথোপকথনের রিপোর্ট নয় বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন।[৬] কথোপকথনের রিপোর্ট না হলেও রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্য-

---

১ মু. ক—৩।১৫।১ ২ চৈ চন্দ্র. না ৭ অংক ৩ চৈ চ মহা—১২।৩।১১
৪ চৈ. চ. মধ্য—৮ পরি ৫ চৈ. ম. শেষখণ্ড ৬ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ৩৫৬

দেবের তত্ত্বালোচনা হয়েছিল বলেই মনে হয়। কারণ শ্রীচৈতন্যের জীবন সাধনা এর পর নূতন পথে অগ্রসর হয়েছিল।

কৃষ্ণদাসের বিবরণে-মহাপ্রভু অতঃপর গৌতমী গঙ্গায় স্নান করে মল্লিকার্জুন তীর্থে মহেশ্বর দর্শন করে অহোবলে নৃসিংহকে দর্শন করেছিলেন।

গৌতমী গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গাস্নান ॥
মল্লিকার্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
* * *
অহোবল নৃসিংহেরে করিল গমন ॥

অহোবল ও মল্লিকার্জুন কর্ণুল জেলায় অবস্থিত দুটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। "অহোবল রামানুজাচার্য প্রতিষ্ঠিত একটি মঠের নাম।"[৩] অন্য কোন চরিতগ্রন্থে এই দুই তীর্থে শ্রীচৈতন্যের আগমনের উল্লেখ নেই। গোবিন্দদাসের কড়চা অনুসারে মহাপ্রভু দশদিন রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় যাপন করে ত্রিমন্দ নগরে উপস্থিত হলেন। এখানে ছিল বৌদ্ধদের বাস। বৌদ্ধদের প্রধান রামগিরি রায় বিতর্কে পরাজিত হয়ে মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করেছিলেন। মুরারির কাব্যে (কড়চা) গোদাবরী পার হয়ে শ্রীচৈতন্য পঞ্চবটি বনে উপস্থিত হন।[৪] কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণে মহাপ্রভু অহোবলে নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করে সিদ্ধবট দর্শন করলেন। সিদ্ধবট কুডাপা নগরের দশ মাইল পূর্বে সিদ্ধৌট। সিদ্ধবটে মহাপ্রভু সীতাপতি রঘুনাথের বিগ্রহ দর্শন করেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করে তিনি এলেন স্কন্দক্ষেত্রে।

স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন।
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম ॥[৫]

স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ-কার্তিকেয়ের বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য ত্রিমঠে দেখলেন ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মূর্তি। স্কন্দক্ষেত্র চিঙ্গেলপুট জেলায় চেয়ূর গ্রামে। এখানে সুব্রহ্মণ্য স্বামী বা ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তি বিরাজমান।[৬] গোবিন্দদাস কর্মকারের ত্রিমন্দ কি ত্রিমঠ? চারুচন্দ্র শ্রীমাণি লিখেছেন, "আমার বোধ হয়, ত্রিমন্দ ত্রিমঠ হইবে। কাঞ্চীকে ত্রিমঠ বলে। কাঞ্চীপুরে বৌদ্ধদিগের,

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি ২ চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ—পৃঃ ৪৩

৩ চৈ. চ. পরাণচাঁদ গোস্বামী সম্পাদিত, পাদটীকা- পৃঃ ১১৭

৪ মু. ক.—পৃঃ ২৫ ৫ চৈ চ. মধ্য ৯ অঃ ৬ চৈতন্যদেবের দক্ষিণভ্রমণ—পৃঃ ৪৪

শৈবদিগের এবং বৈষ্ণবদিগের মঠ ছিল বলিয়া উহা ত্রিমঠ নামে পরিচিত।"[১] ত্রিমঠ থেকে মহাপ্রভু পুনরায় সিদ্ধবটে ফিরে এলেন সেই ব্রাহ্মণের গৃহে এবং রামভক্ত বিপ্রকে কৃষ্ণোপাসকে পরিণত করলেন।[২] মুরারির কড়চায় ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে কাঞ্চীতে রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়। তারপর মহাপ্রভু গোদাবরী পার হয়ে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করেছিলেন।

এই মনে ক্রমে ক্রমে পথ চলি যায়।
গোদাবরী করি পঞ্চবটীতে সান্তায়॥[৩]

শ্রীরাম গোবিন্দকৃষ্ণেতি গায়ন্নুত্তীর্য গোদাবরীমেব কৃষ্ণঃ।
বিবেশ শ্রীপঞ্চবটীবনং মহৎ শ্রীরামসীতাস্মরণাতিবিহ্বলঃ॥[৪]

গোদাবরী পার হয়ে শ্রীচৈতন্য কাবেরী নদীর তীরে এসে হাজির হলেন। মুরারির মতে কাবেরী নদী উত্তীর্ণ হয়ে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করেছিলেন।

কাবেরীমুত্তীর্য্য শ্রীরঙ্গনাথং দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো হি ননর্ত সাদরম্।[৫]

কবিকর্ণপূরও কাবেরীর পরপারে রঙ্গনাথ দর্শনের কথা বলেছেন—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রকমসৌ দয়ালুঃ কাবেরিকাবেষ্টিতমুচ্চদেশম্।[৬]

জয়ানন্দ মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণে লিখেছেন যে মহাপ্রভু গোদাবরী পার হয়ে পঞ্চবটী দর্শন করে এক তেলেঙ্গা ব্রাহ্মণের ঘরে অবস্থান পূর্বক কাবেরী নদীর জলে স্নান করে বেঙ্কট পর্বতে ত্রিমল্লনাথ দর্শনের পরে প্রমোদা নদী উত্তীর্ণ হযে অরণ্যপথে বানর রাজার দেশে প্রবেশ করে সেতুবন্ধে উপনীত হয়েছিলেন।[৭] কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে সিদ্ধিবট ত্রিমঠ পরিক্রমার পর তিনি "বৃদ্ধকাশী আসি কৈল শিব দরশনে।" এখান থেকে একটি গ্রামে এসে তিনি বিশ্রাম করেছিলেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিত দার্শনিক বৌদ্ধ প্রভৃতিদের পরাজিত করে গৌরাঙ্গ প্রভু স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপর তিনি ত্রিপতি ত্রিমল্লে চতুর্ভুজ বিষ্ণু দর্শন করে এলেন বেঙ্কটাচলে, ত্রিপতিতে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম জানালেন—

মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপতি ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ মূর্তি দেখি বেঙ্কটাদ্রো চলে॥

---

১ চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ—পৃঃ ৪৩ ২ চৈ. চ মধ্য ৯ অঃ
৩ লোচন—চৈ. ম. শেষখণ্ড ৪ মু. ক.—৩।১৫।৬ ৫ মু. ক. —৩।১৫।৭
৬ চৈ. চ মহা—১৩।৩ ৭ জয়ানন্দ—চৈ. ম.—উৎকল ১০

ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম দরশন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥[১]

তারপর প্রভু এলেন পানা-নৃসিংহে, নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করে নৃসিংহের স্তবস্তুতি করলেন। পানা-নৃসিংহ কৃষ্ণা জেলায় বেজওয়াদা সহরের সাত মাইল দূরে মঙ্গলগিরির মধ্যে অবস্থিত ॥[২] তিরুপতি এম্. এস্. এম্. রেলপথের রেলষ্টেশন। বেঙ্কটাচলের উপত্যকায় 'নিম্ন তিরুপতি' অবস্থিত। এখানে গোবিন্দরাজ ও রামচন্দ্র বিগ্রহ আছেন।[৩] শিবকাঞ্চী কঞ্জিভরম্—দক্ষিণকাশী নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণু কাঞ্চী কঞ্জিভরম্ থেকে পাঁচ মাইল দূরে। বিষ্ণুকাঞ্চীর পরে প্রভুর গমনস্থান ত্রিমলয়, ত্রিকালহস্তী, পক্ষিতীর্থ, বৃদ্ধকাল তীর্থ ও শিয়ালী।

ত্রিমলয় দেখি গেলা ত্রিকালহস্তী স্থানে।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিল প্রণামে ॥
পক্ষিতীর্থ দেখি কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধকোলতীর্থে তবে করিলা গমন ॥
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্করি।
পীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহরি ॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥[৪]

ত্রিমলয় তাঞ্জোর জেলায়, পক্ষিতীর্থ চিংলিপট থেকে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, বৃদ্ধকোল মহাবলিপুরম্ থেকে এক মাইল দক্ষিণে, পীতাম্বর চিদাম্বর কুডালোর নগর থেকে ২৬ মাইল দক্ষিণে, শিয়ালি তাঞ্জোর জেলায় তাঞ্জোর সহর থেকে ৪৮ মাইল উত্তরপূর্বে।[৫] চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে অতঃপর শ্রীচৈতন্য কাবেরী-তীরে গো সমাজ শিব, বেদাবন অমৃতলিঙ্গ শিব, দেবস্থানে বিষ্ণু, কুম্ভকর্ণকপালে সরোবর, শিবক্ষেত্রে শিব, পাপনাশনে বিষ্ণু দর্শন করে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হয়েছিলেন।[৬] বেদাবন তাঞ্জোর জেলায় তিরুত্তরাইপণ্ডি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং পয়েণ্ট্ কলিমিয়ারের পাঁচ মাইল উত্তরে, কুম্ভকর্ণকপাল

---

১ চৈ. চ মধ্য ৯ পরি ২ চৈ. চ. গৌড়ীয় মঠ সং—পৃঃ ৪৯১
৩ চৈ. চ. গৌড়ীয় মঠ সং—পৃঃ ৪৯১ ৪ চৈ চ মধ্য ৯ পরি
৫ তদেব পৃঃ ৪৯৫ ৬ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি

কুম্ভকোনম্,—তাঞ্জোর জেলায়, পাপনাশন কুম্ভকোনম্ থেকে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।[১]

গোবিন্দকর্মকারের কড়চায় মহাপ্রভু-পর্যটিত স্থান নামের সঙ্গে বহু ঘটনার বিবরণ আছে। কড়চায় ত্রিমন্দ নগরের পরেই ঢুণ্ডিরাম তীর্থে ঢুণ্ডিরাম স্বামী নামক এক পণ্ডিত মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হয়ে ধন্য হলেন। তারপর চৈতন্যদেব অক্ষয়বটের কাছে বটেশ্বর শিবের নিকটে রাত্রি যাপন করলেন। তীর্থপতি নামে এক ধনবান ব্যক্তি সত্যবাই ও লক্ষীবাই নাম্নী দুই বারাঙ্গনার সাহায্যে শ্রীচৈতন্যকে পরীক্ষা করতে উদ্যত হয়ে বিফল হয়ে বারাঙ্গনাদ্বয় সহ তীর্থরাম মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে, তীর্থরাম সর্বস্ব ত্যাগ করে হরিনাম গ্রহণ করেন। প্রভু মুন্নানগরের পাশে জঙ্গল দিয়ে চলছিলেন, মুন্নাবাসীদের কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে তিনি এক দুঃখিনীকে দান করলেন। এইখানে রামানন্দ স্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং রামানন্দ স্বামী বিতর্কে পরাজিত হয়ে মহাপ্রভুর ভক্ত হয়ে পড়েন। এরপর মহাপ্রভু এলেন বেঙ্কটনগরে, এখানে তিনি তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। পন্থভীল নামে এক দস্যু দস্যুতা ত্যাগ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে গিরীশ্বর শিবের পূজা করলেন তিনি। তারপর মহাপ্রভু এলেন ত্রিপদী (ত্রিপদী ?) নগরে। মথুরানাথ নামে এক রামাত পণ্ডিত তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। মথুরানাথকে বিদায় দিয়ে প্রভু এলেন পান্না নরসিংহে। পূজারী মাধবেন্দ্র ভুজা প্রভুকে আপ্যায়িত করেন। প্রভু বিষ্ণুকাঞ্চীতে উপনীত হয়ে লক্ষীনারায়ণ দর্শন করার পরে ছয় ক্রোশ দূরে ত্রিকাল ঈশ্বর শিব দর্শন করেছিলেন। পক্ষতীর্থে ভদ্রা নদীতে স্নান করে পঞ্চক্রোশ দূরে কালতীর্থে (বৃদ্ধকোশ তীর্থ ?) বরাহদেবের বিগ্রহ দর্শন করেন। পাঁচ ক্রোশ দূরে নন্দা ও ভদ্রানদীর সঙ্গমস্থলে সন্ধিতীর্থে স্নান করে অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে তর্কে পরাজিত করে তিনি চাঁইপল্লীতীর্থে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবীর দর্শন পেলেন। শৃগালী ভৈরবী সন্দর্শনের পরে তিনি কাবেরী নদী প্রাপ্ত হলেন। তিন দিন নাগর নগরে হরিনামে মানুষজনকে মাতিয়ে মহাপ্রভু সাতক্রোশ দূরে তাঞ্জোর নগরে (বর্তমান নেগাপট্টম্) রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ, গোসমাজ শিব, কুম্ভকর্ণ কর্পর সরোবর ও চণ্ডালু গিরি দর্শন করলেন। ভট্ট নামে

১ চৈ. চ. গৌড়ীয় মঠ সং—পৃঃ ৯২

এক ভক্ত ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী সুরেশ্বর ও অন্যান্য বহু লোককে হরিনামে মাতিয়ে প্রভু এলেন পদ্মকোট, পদ্মকোটে অষ্টভুজা ভগবতীকে প্রণাম করলেন তিনি। এখানে এক অন্ধকে তিনি দিলেন দৃষ্টি, ত্রিপাত্র নগরে এসে তিনি চণ্ডেশ্বর শিব দর্শন করলেন। বৃদ্ধ শিবভক্ত ভর্গদেবকে কৃপা করে দুই সপ্তাহ ত্রিপাত্র নগরে অবস্থান করে ঝাষিবনের মধ্য দিয়ে অরণ্যপথে রঙ্গধামে (শ্রীরঙ্গমে) এসে শ্রীচৈতন্য নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করলেন। এখানে এক ভক্ত ব্রাহ্মণের ভ্রান্তিপূর্ণ গীতাপাঠকে মহাপ্রভু যথাযথ বলে সমর্থন করে ঋষভ পর্বতে গমন করেন।[১]

শ্রীরঙ্গনাথস্য সমীপং বিপ্রো গীতাং পঠন শুদ্ধবিচার শূন্যম্।
প্রেমাশ্রুপূর্ণং স নিরীক্ষ্য কৃষ্ণ আলিঙ্গ্য প্রাহ শ্রুতমেব যোগ্যম্॥[২]

শ্রীরঙ্গমে বৈষ্ণবভট্ট নামে এক বৈষ্ণব ভক্ত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর বাড়ীতে রাখলেন—

শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥[৩]

বেঙ্কটভট্ট চার মাস তাঁর গৃহে অবস্থানের জন্য শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ করেন। চৈতন্যদেবও এক এক ব্রাহ্মণের গৃহে এক একদিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে সেখানে চার মাস যাপন করলেন।

এক এক দিনে চাতুর্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল॥[৪]
তার প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হঞা।
চাতুর্মাস্য রহিল পরম সুখ দিয়া॥[৫]

শ্রীরঙ্গসঙ্গং প্রবিলোক্য দেবং নিনায় মাসাংশ্চতুরঃ কৃপালুঃ।[৬]

ভট্টগৃহে বর্ষার চারমাস যাপন করে চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপনান্তে বেঙ্কটভট্ট ও তাঁর পত্নীপুত্রের সেবায় পরিতুষ্ট প্রভু আবার যাত্রা করলেন দক্ষিণ দেশে—

চাতুর্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্ট আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥[৭]

মুরারির কড়চায়, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ও লোচনের

---

১ গো. ক. পৃঃ ৪০, চৈ. চ. মধ্য. ৯.পরি ২ মু. ক.—১৫।৮
৩ চৈ. চ. মধ্য, ৯ পরি ৪ চৈ. চ. মধ্য, ৯ পরি ৫ চৈ. ম. লোচন—শেষখণ্ড
৬ চৈ. চ. মহা—১৩।৫ ৭ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি

চৈতন্য মঙ্গলে ব্রাহ্মণের নাম ত্রিমল্লভট্ট। ত্রিমল্লভট্টের পুত্র গোপালের মস্তকে পাদপদ্মস্থাপন করে প্রভু কৃপা করেছিলেন।

শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে যাবার পথে দেখা হোল মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে।

উষিত্বৈবং রঙ্গক্ষেত্রাদ্ গচ্ছন্ পথি দদর্শ সঃ।
শ্রীমাধবপুরীশিষ্যং পরমানন্দ নামকম্॥[১]

মহানুভাবং পরমং পুরস্তাদানন্দমধ্যং পুরী চ তদন্তম্।
বিলোক্য সংভাষ্য সুজাতহর্ষৌ বভূবুস্তৌ পরমপ্রভাবৌ॥[২]

—মহানুভব পরমানন্দ পুরীকে দেখে সম্ভাষণ করে উভয়ে আনন্দিত হয়ে উভয়ে পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

গোবিন্দর কড়চা অনুসারে ঋষভ পর্বতে মহাপ্রভু পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

ঋষভ পর্বত তবে কারলা গমন॥
ঋষভ পর্বতে থাকে পরমানন্দ পুরী।
তাহারে দেখিতে প্রভু হৈল আগুসারী॥[৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঋষভ পর্বতে পরমানন্দ সাক্ষাৎকার বর্ণনা করেছেন—

ঋষভ পর্বতে চলি আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি-স্তুতি করি॥
পরমানন্দ তাহা রহে চতুর্মাস।
শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরী গোসাঞির পাশ॥[৫]

মহাপ্রভু পরমানন্দের সঙ্গে তিন দিন কাটালেন—

তিন দিন পুরী প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথারঙ্গে।
সেই বিপ্রঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে॥[৫]

তিন দিন পরে পুরী গেলেন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে, মহাপ্রভু যাত্রা করলেন দক্ষিণে। ঋষভ পর্বত দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা জেলায়, মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে পালনি হিল্।[৬] এর পরে প্রভু এলেন শ্রীশৈল। শ্রীশৈলে তিনদিন অবস্থান করে

১ মু. ক.—৩।১৫।১৫ ২ মু. ক.—৩।১৪।১৯ ৩ চৈ. চ. মহা.—১৩।১৫ ৪ গো. ক.—পৃঃ ৪০
৫ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি ৬ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি ৭ চৈ. চ. গৌড়ীয় মঠ সং—পৃঃ ৫১৩

প্রভু এলেন কামকোষ্ঠী—কামকোষ্ঠী থেকে দক্ষিণ মথুরা, এখানে কৃতমালায় স্নান করলেন তিনি। তৎপরে প্রভু এলেন দুর্বসন (দর্ভশয়ন) তীর্থে, তৎপরে মহেন্দ্র শৈলে পরশুরাম সন্দর্শনের পরে, তিনি পৌঁছালেন সেতুবন্ধ রামেশ্বর। গোবিন্দের কড়চায় ঋষভ পর্বতের পরেই মহাপ্রভু এসেছিলেন রামনাথ নগরে, এখানে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করলেন তিনি। তৎপরে তিনি উপনীত হলেন রামেশ্বরে—

রামেশ্বর তীর্থে গিয়া তথি স্নান করি।
শিব দরশন করে মোর গৌরহরি ॥[২]

দক্ষিণ মথুরা বর্তমান মাদুরা, ভাগাই নদীর তীরে, এখানে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। কৃতমালা ভাগাই বা বৈগাই নদীর একটি অববাহিকা। মহেন্দ্র পর্বত পূর্বঘাট পর্বতমালা। গোবিন্দদাসের কড়চায় শ্রীশৈল, কাম-কোষ্ঠী, দক্ষিণ-মথুরা ও কৃতমালার উল্লেখ নেই। রামনাথের অনুল্লেখ চৈতন্য চরিতামৃতে, দুর্বসন বা দর্ভশয়ন অনুল্লিখিত গোবিন্দের কড়চায়। কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে রঙ্গনাথের পরেই মহাপ্রভু রামেশ্বর এসেছিলেন। মুরারির কড়চাতেও একই বৃত্তান্ত, পরমানন্দপুরীকে বিদায় দিয়েই সেতুবন্ধে এসে রামেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করেছিলেন—

ইত্যাদি নামামৃত পানমত্তঃ শ্রীসেতুবন্ধং পরিব্রজ্য সত্বরম্।
দদর্শ রামেশ্বর লিঙ্গমদ্ভুতং শ্রীশঙ্করঃ প্রেষ্ঠতমঃ সদাহরিঃ ॥[৩]

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে মহাপ্রভু পথে শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব সপ্ততালকে মুক্ত করে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পৌঁছেছিলেন—

সেতুবন্ধ উত্তরিল পথে ক্রমে ক্রমে।
সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ ॥[৪]

গোবিন্দদাসের কড়চায় আছে—

রামেশ্বর তীর্থে গিয়া তথি স্নান করি।
শিব দরশন করে মোর গৌর হরি ॥[৫]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কাবেরী নদীর তীরে ত্রিমঃনাথ বেঙ্কট পর্বতের পরেই শ্রীচৈতন্যের আগমন হয়েছিল সেতুবন্ধে—

বানর রাজার দেশে প্রবেশিয়া মহাক্লেশে
সেতুবন্ধ দেখিল সম্মুখে।[৬]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি ২ গো. ক.—পৃঃ ৪০ ৩ মু. ক.—৩।১৬।৫
৪ চৈ. ম. শেষখণ্ড ৫ গো. ক. ৬ চৈ. ম. উৎকল—১০

চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু সেতুবন্ধে এসে ধনুতীর্থে (ধনুষ্কোটি) স্নান করে রামেশ্বর দর্শন করেন।

বিলোক্য সেতুং রঘুনাথকীর্তিং সেতোস্ততঃ শ্রীময় গৌরচন্দ্রঃ।
নিবর্তিতুং তত্র কৃপালসমুদ্রশ্চকার চিত্তং পরমপ্রভাবঃ॥
স তেনৈব পথা বিলোক্য শ্রীরঙ্গদেবং পুনরার্দ্রচিত্তঃ।
গোদাবরীমেত্য তথৈব রামানন্দস্য দর্শনমেষ চক্রে॥[১]

—রঘুনাথের কীর্তি সেতুবন্ধ দর্শন করে মহাপ্রভাব করুণাসাগর শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র প্রত্যাবর্তনে মনস্থ করলেন। সেই পথে আর্দ্রচিত্তে রঙ্গনাথ দর্শন করে গোদাবরী প্রাপ্ত হয়ে তিনি রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

মুরারি কেবল বলেছেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ সকল তীর্থ দর্শন করে জগন্নাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সেতুবন্ধের পরে আর কোন তীর্থদর্শনের উল্লেখ মুরারি করেন নি। তিনি লিখেছেন—

সর্বাণি তীর্থানি ক্রমেণ দৃষ্ট্বা পরাবৃত্য কৃপাম্বুধিঃ প্রভুঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথদিদৃক্ষয়া ভৃশং শ্রীক্ষেত্ররাজং গময়াঞ্চকার॥[২]

—ক্রমে ক্রমে সকল তীর্থ দর্শন করে কৃপাসমুদ্র মহাপ্রভু শ্রীমন্ জগন্নাথ-দর্শনের অভিলাষে দ্রুত শ্রীক্ষেত্রে গমন করলেন।

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও সেতুবন্ধ থেকে প্রত্যাগমনের কথা আছে—যাবৎ সেতুবন্ধং ততঃ প্রত্যাগমনাবধি…।[৩] জয়ানন্দও লিখেছেন—সেতুবন্ধ ছাড়িয়া চলিলা নীলাচলে।[৪] লোচনও সেতুবন্ধ থেকেই প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন।

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে এবং গোবিন্দ দাসের কড়চায় মহাপ্রভুর এই পরিক্রমণ বোম্বাই ও গুজরাট পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে মহাপ্রভু একরাত্রি রামেশ্বরে অবস্থান করে পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণীতে স্নান করে নয় ত্রিপতি (তিরুপতি) অর্থাৎ নয়টি মন্দিরে নয়টি বিষ্ণুমন্দির (তিনিভেলি থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণপূর্বে), চিয়ড়তলায় রাম লক্ষ্মণের বিগ্রহ, তিলকাঞ্চীতে শিব, গজেন্দ্রমোক্ষণতীর্থে বিষ্ণুমূর্তি, পানাগড়ি তীর্থে (তিনিভেলি থেকে ত্রিবান্দ্রমের পথে ৩০ মাইল দক্ষিণে) রামচন্দ্র এবং চামতাপুরে রামলক্ষ্মণ

১ চৈ. চ. মহা.—১৩।৩৩-৩৪ ২ মু. ক.—৩।১৬।৮ ৩ চৈ. চন্দ্র. ৭ অংক
৪ চৈ. ম. উৎকল—১১

এবং বৈকুণ্ঠে (আলোয়ার তিরুনগরী থেকে ৪ মাইল উত্তরে এবং তিনিভেলি থেকে ১৬ মাইল দক্ষিণ পূর্বে তাম্রপর্ণী নদীর বামতটে অবস্থিত)[১] বিষ্ণু দর্শন করে কন্যাকুমারী এসে পৌছালেন—

মলয় পর্বতে কৈল অগস্ত্যবন্দন।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥[২]

তারপর মল্লার দেশে[৩] (মালাবার) আমলিতলায় শ্রীরাম বিগ্রহ দর্শন করে তমালকার্তিক (তিনেভেলির ৪৪ মাইল দক্ষিণে এবং অরমবল্লী গিরিসঙ্কট থেকে দুই মাইল দক্ষিণে)[৩], চেতাপণি (বাতাপানী—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে)-তে রামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করেন শ্রীচৈতন্য। এখানে রাত্রিবাস করে পয়স্বিনী (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে তিরুবত্তর) নদীর তীরে আদিকেশব বিগ্রহ দর্শনকালে তিনি নতিস্তুতি নৃত্যগীতে সর্বজনকে মোহিত করেন। এখানে তিনি ব্রহ্মসংহিতার পুঁথি নকল করিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। অনন্ত পদ্মনাভ (ত্রিবাঙ্কুরে) এবং শ্রীজনার্দন (ত্রিবান্দ্রমের ২৬ মাইল উত্তরে—বারকলাই) দর্শনান্তর তিনি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরি মঠে (মহীশূর রাজ্যে, কাডার জেলায়) উপনীত হন। মৎস্য-তীর্থ (সম্ভবতঃ মালাবার জেলায় সমুদ্রোপকূলে মাহে নগর)[৪] দর্শনের পরে মহাপ্রভু তুঙ্গভদ্রায় স্নান করেন। মাধবাচার্যের জন্মস্থান উড়ুপীতে মধ্বাচার্য প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণবিগ্রহ ও নর্তক গোপাল দর্শনের পরে তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবের অহংকার চূর্ণ করে প্রভু এলেন ফল্গুতীর্থে। ত্রিতকূপে বিশালা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে পঞ্চাপ্সরা তীর্থ পর্যটন, গোকর্ণে (কানাড়া জেলায়) মহাবলেশ্বর শিব, দ্বৈপায়নী তীর্থ, সূর্পারক (বোম্বাই থেকে ২৬ মাইল উত্তরে থানা জেলায় সোপারা), কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গল গণেশ ও চোরা ভগবতী, পাণ্ডুপুরে (পাণ্ডরপুরে—শোলাপুর) বিঠ্ঠলদেব শ্রীচৈতন্য দর্শন করেছিলেন। মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে পাণ্ডরপুরে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরঙ্গপুরীর মুখে মহাপ্রভু সংবাদ পেলেন যে এখানে বিশ্বরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীরঙ্গপুরী গেলেন দ্বারকা দর্শনে। এখানে চারদিন অবস্থান করে ভীমরথী নদীতে স্নান করে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর তীরে উপনীত হলেন চৈতন্যদেব। এখান থেকে তিনি

---

১ চৈ. চ. গৌড়ীয় মঠ সং পৃঃ ৫০৪ ২ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি
চৈ. চ. গৌড়ীয় সং—পৃঃ ৫০৫ ৪ চৈ. চ. গৌড়ীয় সং—পৃঃ ৫০৭

কৃষ্ণপ্রেমমূলক কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতার পুঁথি সংগ্রহ করেন, তৎপরে তাপ্তী নদীতে স্নান করে এলেন মাহিষ্মতীপুরী। এর পরে তিনি আগমন করেন নর্মদা তীরে, দর্শন করলেন ধনুস্তীর্থ, নির্বিন্ধ্যাতে স্নান করে ঋষ্যমূক পর্বত ও দণ্ডকারণ্য অতিক্রম করে উপনীত হলেন পম্পা সরোবর ও পঞ্চবটী বনে। নাসিকে ত্র্যম্বক শিব দর্শন করে ব্রহ্মগিরি ও গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান কুশাবর্ত (পশ্চিমঘাট পর্বতের নিকট কুশট্ট) পেরিয়ে মহাপ্রভু সপ্ত গোদাবরী অতিক্রম করে প্রত্যাবর্তন করলেন রায় রামানন্দের আবাসে বিদ্যানগরে।

গোবিন্দ দাসের কড়চার বিবরণে চৈতন্যচরিতামৃতের বিবরণ থেকে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। কড়চায় মহাপ্রভু তিন দিন সেতুবন্ধে যাপন করে মাধবীবনে গমন করলেন।

তিনদিন সেতুবন্ধে করিয়া কীর্তন।
বামে চলে মাধবীবন করিতে দর্শন ॥[১]

মাধবীবনে এক যোগী সন্ন্যাসীর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় আলাপ করে, তত্ত্বকুণ্ডী তীর্থে স্নান করে, তাম্রপর্ণী নদীর তীরে একপক্ষকাল অবস্থানের পর মাঘী পূর্ণিমায় তাম্রপর্ণী-স্নান সেরে সমুদ্রতীরে মহাপ্রভু চললেন কন্যাকুমারী। পথে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গোবিন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেব পনেরো ক্রোশ পথ হেঁটে হাজির হলেন সাঁতাল পর্বতে। পরদিন প্রভাতে যাত্রা করে তাঁরা উপনীত হলেন ত্রিবঙ্কুনগরে। এখানে এক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর নিকট মহাপ্রভু মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা ব্যাখ্যা করেন। ত্রিবঙ্কুর রাজা রুদ্রপতি প্রেমভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করলেন। অতঃপর প্রভু এলেন রামগিরি পর্বতে। পর্বতের উপরে উঠে তিনি রাম-সীতা-লক্ষ্মণের বিশ্রামস্থল দর্শন করেন। পয়োষ্ণি নগরে উপনীত হয়ে তিনি শিবনারায়ণ বিগ্রহ দর্শন করলেন। শিঙারির মঠে শঙ্করপন্থীদের বিচারে পরাস্ত করে মৎস্যতীর্থ দর্শনান্তর কাচাড়ে (বেদাবতী নদীর তীরবর্তী কডার) ভগবতী দর্শন করে, ভদ্রা (বেদাবতী) নদীতে স্নানান্তে নাগ পঞ্চপদীতে উপস্থিত হন শ্রীগৌরাঙ্গ। এখানে তিনদিন অবস্থানের পরে চিতোল গমন, তুঙ্গভদ্রা নদীতে স্নান, কাবেরীর উৎপত্তিস্থল কোটিগিরি দর্শন, বামে

১ গো. ক.—পৃঃ ৪৪

সত্যগিরি রেখে চণ্ডপুর নগরে আগমন, চণ্ডপুরে শ্রীচৈতন্যের নিকট ঈশ্বর ভারতী নামে এক সন্ন্যাসীর পরাভব ও শ্রীচৈতন্যের মত গ্রহণ, অজ্ঞাতপর্ব অতিক্রমের পর কাণ্ডার দেশের কাছে নীলগিরি পর্বতে আগমন কড়চায় বর্ণিত হয়েছে। গুর্জরী নগরের ধারে অগস্ত্যকুণ্ডে মহাপ্রভু স্নান করেছিলেন। এখানে অর্জুন পণ্ডিত মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁর অদ্ভুত প্রেমার্তি দেখার জন্য দলে দলে সমবেত হয়। গুর্জরী নগর পরিত্যাগ করে পূর্ণনগরের (পুনা) পথে বিজাপুর পর্বতে আরোহণ করে হরগৌরী বিগ্রহ দর্শন করে, সহ্যপর্বত (উত্তর পশ্চিমঘাট) দেখে তিনি পূর্ণনগরে উপস্থিত হয়েছিলেন। অচ্ছসর (পুনার দক্ষিণস্থিত হ্রদ) দর্শন করে নাটস (পারশ্) গ্রাম পেরিয়ে গোরঘাটের (পারঘাট?) নিকটে পর্বতের উপরে প্রকাণ্ড মন্দির মধ্যে ভোলেশ্বর শিব দর্শন করে নিকটবর্তী সিদ্ধকূপের জলে স্নান সমাপন করে নিকটস্থ দেবলেশ্বর পর্বতে দেবলেশ্বর দর্শন ও জিজুরী নগরীতে খাণ্ডবাদেব দর্শন করলেন, খাণ্ডবার নারী নামে পরিচিত দেহ-ব্যবসায়িনীদের কৃষ্ণনাম দিয়ে মহাপ্রভু উদ্ধার করলেন। জিজুরী থেকে শ্রীচৈতন্য এলেন চোরাবন্দী বনে। এই অরণ্যে দস্যুসর্দার নারোজী সদলে দস্যুবৃত্তি করতো। নারোজী মহাপ্রভুর কৃপালাভ করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছিলেন। চোরাবন্দী কানন থেকে প্রভু মূলা নদীতীরে খণ্ডলা তীর্থ (পুনা জেলায়) দর্শন, মূলানদীতে স্নান, নাসিকনগর দর্শন, ত্রিমুকের (ত্র্যম্বক) কাছে রামের কুটীরে প্রস্তরোপরি রামচন্দ্রের চরণ চিহ্ন দর্শন, পঞ্চবটীতে লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত গণেশ দর্শন, প্রভাতে দমন নগরী গমন, পথিকে একপক্ষকাল ভ্রমণ করে সুরাট নগরে প্রবেশ ও তত্রস্থ সুরথ রাজা প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা ভগবতী দর্শন প্রভৃতি সমাধা করে তিন দিন সুরাটে অবস্থান করেন। এইখানে দেবীমন্দিরে পশুবলিদানের বিরোধিতা করে মহাপ্রভু বলিদান রহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তৎপরে তিনি মহাতীর্থ তাপ্তী নদীর কাছে বলিরাজা প্রতিষ্ঠিত বামনদেবের বিগ্রহ দর্শন করেন এবং ভঁরোচ নগরে (Broach—ভারুকচ্ছ) বলিরাজার যজ্ঞকুণ্ড দর্শনে ইচ্ছুক হয়ে নর্মদার তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড দেখে আনন্দিত হলেন তিনি, স্নান করলেন নর্মদার জলে। এবার তিনি এলেন বরোদা নগরে, দর্শন করলেন বরোদার পূর্বভাগে ডাঁকোরজী ঠাকুর এবং গোবিন্দ বাড়ীতে গোবিন্দ বিগ্রহ। এইখানেই ভক্ত

নারোজীর মৃত্যু হয়, প্রভু স্বয়ং নারোজীকে সমাধিস্থ করেন। পরে মহানদী অতিক্রম করে আমেদাবাদ পৌছালেন শ্রীচৈতন্ত ও তাঁর সঙ্গী গোবিন্দ দাস। অতঃপর শুভ্রামতী নদী পার হয়ে গৌরাঙ্গদেব দ্বারকার পথে চললেন। পথে দুই ভক্ত বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী কুলীননগর নিবাসী রামানন্দ দাস ও গোবিন্দচরণের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। সকলে মিলে দ্বারকা যাত্রার পথে ঘোগা নামে এক গণ্ডগ্রামে বারমুখী নামে এক বারাঙ্গনাকে প্রভু কৃপা করেন। বারমুখী পতিতাবৃত্ত ত্যাগ করে অসৎপথে উপার্জিত সমস্ত ধনসম্পদ বিলিয়ে দিয়ে হরিনামে নিমগ্ন হয় তুলসীতলায় জপমালা নিয়ে। প্রভু সদলে সোমনাথের পথে রওনা হন।

বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া।
সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া॥

এরপর মহাপ্রভু এলেন জাফরাবাদ, এখানে এক মালীর বাগানে রাত্রি যাপন করর সোমনাথের পথে অগ্রসর হন তাঁরা—ছয়দিন পরে তাঁরা সকলে সোমনাথ পৌছালেন। সোমনাথ ছেড়ে তাঁরা পৌছালেন জুনাগড়। এখানে আছেন রণছোড়জী। জুনাগড়ে গৌরচন্দ্র দুদিন যাপন করলেন। রণছোড়জী দর্শন করে গৃণার (গির্ণার) পর্বতের পাশ দিয়ে চলেছেন শ্রীচৈতন্ত ও তাঁর তিন সঙ্গী। পথে সন্ন্যাসীদের দলপতি ভর্গদেব অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রভুর আদেশে গোবিন্দ কর্মকার, রামানন্দ ও গোবিন্দচরণ তাঁর সেবা করে এবং নিমের রস খাইয়ে সুস্থ করে তোলেন এবং সন্ন্যাসীদলের সঙ্গে গির্ণার পর্বতের চূড়ায় শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল দর্শন করলেন। পর্বত থেকে নেমে ভদ্রানদীর তীরে রাত্রি যাপন করে প্রভাতে নদী পার হয়ে ধবিধর ঝারিতে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলেন শ্রীচৈতন্ত। ধবিধর ঝারি নামক জঙ্গলটি সাতদিনে অতিক্রম করে অমরাপুরী গোপীতলা বা প্রভাসতীর্থে এসে পৌছালেন সকলে। প্রভাসের দক্ষিণে যদুপতির যজ্ঞকুণ্ড দর্শন করে তাঁরা সমুদ্রতীর ধরে এলেন দ্বারকাধাম আশ্বিনের প্রথম দিনে। দ্বারকাধামে পনেরো দিন যাপন করে নীলাচলের পথে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্তে যাত্রা করলেন। খাড়ির ধার দিয়ে গুজরাটে এসে হাজির হলেন তাঁরা, আশ্বিনের শেষ দিনে তাঁরা বরদা এসে পৌছালেন। ষোল দিন পরে তাঁরা উপনীত হলেন নর্মদার তীরে। এখান থেকে ভর্গদেব সন্ন্যাসীর দল সহ মহাপ্রভুর কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন। চারজনে চললেন নর্মদা তীর ধরে। দোহদ নগরে তাঁরা রাত্রি যাপন করলেন। জঙ্গলের ভেতর

দিয়ে তাঁরা এলেন আমঝোরা, তারপর উপনীত হলেন লক্ষ্মণকুণ্ড। অতঃপর বিন্ধ্যপর্বতে তাঁরা সমাগত হলেন—বিন্ধ্যপর্বতের উপরে মন্দুরা নগর। সেখানে গৌরচন্দ্র পর্বতগুহায় এক তপস্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বামে বিন্ধ্যগিরি ও দক্ষিণে নর্মদাকে রেখে তাঁরা তিন দিনে পৌঁছালেন দেবঘর, তারপরে দুদিনে উপস্থিত হলেন ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী শিবানী নগরে। শিবানী নগরের পরে মলয় পর্বত দর্শন করে চণ্ডীপুরে চণ্ডীদেবী দর্শন করে গৌরচন্দ্র উপনীত হলেন রায়পুর। অতঃপর বিদ্যানগরে এসে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হলেন মহাপ্রভু। বিদ্যানগর থেকে চারজনে এলেন রত্নপুর, রত্নপুর থেকে স্বর্ণগড। স্বর্ণগডের রাজা শাস্ত্রীশ্বরের প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য স্বীকৃত হলেন ভিক্ষা গ্রহণ করতে, তার ইঙ্গিতে গোবিন্দ কর্মকার ভিক্ষা করে আনলেন, বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করে প্রভাতে চৈতন্যচন্দ্র সম্বলপুরের দিকে রওনা হলেন। সম্বলপুরে রাত্রি কাটিয়ে দশ ক্রোশ দূরে ভ্রমরা নগরীতে বিষ্ণুরুদ্র নামে এক ভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতাপনগরীতে হরিনাম দান করে পরদিন রসালকুণ্ডে কূর্মদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তিন দিন তথায় অবস্থান করে আবালবৃদ্ধবনিতাকে হরিনামামৃত দান করে এক পাষণ্ড মাড়ুয়া ব্রাহ্মণকে প্রেমভক্তিদানে উদ্ধার করে ঋষিকুল্যা নদীর তীর দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন আলালনাথে। মাঘ মাসের তৃতীয় দিনে দশমাস পরে শ্রীচৈতন্য পুরীতে ফিরে এসেছিলেন।

মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরা রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌঁছায়॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিবরণগুলির যাথার্থ্য বিচার নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য ব্যাপার। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণে স্থানের অনুক্রম ঠিক নেই। কৃষ্ণদাস নিজেই সে কথা স্বীকার করে লিখেছেন—

দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন॥

* * *

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফিরি॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥[১]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি

বৃন্দাবনে বসে মহাপ্রভুর জীবন বৃত্তান্ত লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে। সুতরাং মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের বিবরণে স্থানের অনুক্রম না থাকাই সম্ভব। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৭৯ অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থ যাত্রার বর্ণনায় যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, কৃষ্ণদাস সেই ক্রম অনুসরণ করেছেন। অবশ্য ভাগবত বহির্ভূত কিছু তীর্থের উল্লেখ চৈতন্য চরিতামৃতে আছে। গোবিন্দ দাসের কড়চায় উল্লিখিত তীর্থগুলির সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতের কতকাংশের মিল থাকলেও গরমিল যথেষ্ট। চারুচন্দ্র শ্রীমাণি গণনা করে দেখিয়েছেন যে চৈতন্য চরিতামৃতে দাক্ষিণাত্যের ৯০টিরও অধিক তীর্থ উল্লিখিত হয়েছে, গোবিন্দের কড়চায় ৭২টি তীর্থের উল্লেখ আছে, দুই গ্রন্থের মধ্যে সাধারণ তীর্থের নাম ৩৬টি, চৈতন্য চরিতামৃতে অতিরিক্ত ৫৪টি তীর্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু কড়চায় এই ৩৬টি বাদে আরও ৩৬টি তীর্থে মহাপ্রভু পদার্পণ করেছিলেন।[১] কৃষ্ণদাসের রচনায় কিছু কিছু বাদপড়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু গোবিন্দদাস যেহেতু মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন বলে উল্লিখিত এবং তিনি দিনপঞ্জী রচনা করেছেন, সেইজন্য তাঁর ক্ষেত্রে বিবরণ যথার্থ হওয়া উচিত। নানা কারণে গোবিন্দদাসের কড়চায় প্রামাণিকতায় অনেকেই সন্দিহান। চারুচন্দ্র শ্রীমাণি দেখিয়েছেন যে গোবিন্দের অনুক্রমে ভুল আছে। কিন্তু গোবিন্দর বিবরণ পড়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলে বোধ হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য নাসিক পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যিনি নাসিক এসেছিলেন তিনি যে প্রভাস ও দ্বারকা পরিদর্শন না করেই ফিরে যাবেন তা মনে হয় না, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের মত কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল ব্যক্তি! তবে কৃষ্ণদাস দ্বারকাকে তীর্থভ্রমণ তালিকা থেকে বাদ দিলেন কেন?

বিস্ময়ের কথা এই যে মহাপ্রভুর সমকালীন কবি ও ভক্ত মুরারি গুপ্ত, কবিকর্ণপূর, পরমানন্দ সেন, জয়ানন্দ এবং লোচন সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকেই শ্রীচৈতন্যের পুরীতে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ দিয়েছেন। বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গ তাঁর গ্রন্থ থেকে নির্বাসিত করলেও আদিখণ্ডে গ্রন্থবিষয় বর্ণনা কালে লিখেছেন,—শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌর রায়। সুতরাং সেতুবন্ধ পর্যন্ত মহাপ্রভুর গমন বৃত্তান্ত বৃন্দাবনও জানতেন। বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-

১ চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ—পৃঃ ৫৩

পার্ষদ নিত্যানন্দের মুখে শুনেছেন চৈতন্য-জীবন-কাহিনী ; লোচনদাস শুনেছেন চৈতন্য-পার্ষদ নরহরির মুখ থেকে। কৃষ্ণদাস মুরারি ও কবিকর্ণপূরকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণবিবরণ সম্পর্কেও অনুসরণ করেছেন। তবে অতিরিক্ত তথ্য তিনি কিভাবে সংগ্রহ করলেন? তবে কি অতিরিক্ত সংবাদগুলি পুরাণাদি থেকেই সংগ্রহ করেছেন? গোবিন্দের কড়চায় যে সকল তীর্থ ও তীর্থযাত্রাকালে বৈচিত্র্যময় ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তা কি সকলই কাল্পনিক? মুরারি কবিকর্ণপুর প্রভৃতি সেতুবন্ধতেই মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভ্রমণে ইতি টানলেন কেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত অন্য কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই।

স্বাভাবিকভাবেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সেতুবন্ধের পরে অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন, "চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গে সর্বসমেত ১৭টি ঘটনা আছে। তন্মধ্যে ১৪টি কবিকর্ণপূর ও মুরারির নিকট হইতে লওয়া। বাকী তিনটির মধ্যে একটি হইতেছে শ্রীচৈতন্যের ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত থেকে সংগ্রহ করা।"[১] চরিতামৃতে যে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বৌদ্ধগণের পরাভবের কথা উল্লিখিত হয়েছে সে সম্পর্কে ডঃ অমূল্য সেন বলেন, "১৬ শতকে দাক্ষিণাত্যে জৈনদের কথা কৃষ্ণদাস জানিতেন না বলিয়া তাহারা অজিত রহিয়া গিয়াছে।"[২] ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণকর্ণামৃতের পুঁথি সংগ্রহের জন্য শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণবেনা নদী পর্যন্ত নিয়ে গেলেন ও শুধু পুঁথি সংগ্রহের জন্য যাওয়া যদি বিশ্বাসযোগ্য মনে না হয়, তাই নির্বিন্ধ্যা নদীর নিকট আরেক ধনুতীর্থ পর্যন্ত তাঁকে নেওয়া হলো। সেকালে অনেক শৈব ভক্ত চারধাম পর্যটন করতেন। কবিরাজ গোস্বামী রামেশ্বর থেকে শৈবপীঠ দ্বারকা পর্যন্ত ভ্রমণের কাহিনী শুনে থাকবেন। কিন্তু তিনি আরও কয়েকটি স্থানের নাম জুড়ে দিলেন। ...গোদাবরীর উৎসের কাছে নাসিক থেকে গোদাবরীর মোহানায় রাজমহেন্দ্রী যাবার কোন যাত্রীপথ ছিল না। কৃষ্ণদাস এই দীর্ঘ পদযাত্রার কোন বিবরণ দেন নি; কারণ তাঁর ভৌগলিক জ্ঞান সীমিত ছিল।"[৩]

---

১ শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ ৬৬১ ২ ইতিহাসে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ১১১

৩ উৎকলে শ্রীচৈতন্য ও চরিতামৃতের ঐতিহাসিকতা—অমৃত, ১৬ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, পৃঃ ২৬

সম্ভবতঃ মহাপ্রভু সেতুবন্ধ পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁর সমকালীন চরিতকারেরা সেতুবন্ধের পরবর্তী তীর্থ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন না কেন? কৃষ্ণদাসের চরিতামৃতেও মহাপ্রভু দক্ষিণযাত্রা কালে ভক্তদের বলেছিলেন—

সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ॥[১]

মোটকথা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত কাল মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ পর্যটন করেছিলেন এবং অন্ততঃপক্ষে সেতুবন্ধ পর্যন্ত গিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

দক্ষিণ ভারতকে শ্রীচৈতন্য যে কিছুটা অন্ততঃ প্রভাবিত করেছিলেন তা একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায়। মহামণ্ডলেশ্বর বীরপ্রতাপ বীর অচ্যুতদেবের রাজত্বকালে রয়প বোদেয়রের পুত্র চেন্নপ তাঁর গুরু চৈতন্যদেবকে অগ্নিগেহল্লি স্থল নামে দুটি গ্রাম দান করেছিলেন। বিপিন বিহারী দাসগুপ্ত 'Govinda's Kadcha, a black forgery' গ্রন্থে 'Epigraphica Carnatika' থেকে উক্ত তাম্রলিপিটি উদ্ধৃত করেছেন। বিজয় নগরাধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-৩০) পর অচ্যুতদেব (১৫৩০-৪২) রাজত্ব করেছিলেন।[২] দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তিগীতি থেকে এবং সাধু তুকারামের 'চৈতন্য' উপাধিক গুরুকরণ থেকে দক্ষিণে চৈতন্য প্রভাবের আভাষ পাওয়া যায়।

---

১ চৈ. চ মধ্য ৭ পরি   ২ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পা. টী.— পৃঃ ৩৬৪

একাদশ অধ্যায়

রায় রামানন্দ মিলন

কবিকর্ণপূরের নাটক, কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, মুরারির কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচনের চৈতন্যমঙ্গল এবং গোবিন্দ কর্মকারের কড়চায় চৈতন্যদেব দক্ষিণ ভারতে যাত্রার পথে রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য অনুসারে সেতুবন্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন পথে মহাপ্রভু রামানন্দের গৃহে উপনীত হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন—

> গোদাবরীমেত্য তথৈব রামানন্দস্য সন্দর্শনমেষ চক্রে ॥
> উপেত্য গোদাবরিকাং স নাথঃ প্রমোদসত্ত্বং পরিচালনায়।
> জগামস্তবেশ্মনি শীতরশ্মিরিবোদয়াদ্রিং জলদামাস্তে ॥[১]

—গোদাবরীতীরে উপস্থিত হয়ে তিনি রামানন্দকে সন্দর্শন করলেন। বর্ষার অপগমে শীতাংশু চন্দ্রের উদয়াচলে গমনের মত সেই প্রভু সানন্দে রামানন্দকে দেখবার জন্য তাঁর গৃহে গমন করেছিলেন।

নাটকে তত্ত্বালোচনার উল্লেখ থাকলেও মহাকাব্যে মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে রামানন্দ প্রথমে বৈরাগ্য বিষয়ক ও পরে প্রেমভক্তি সম্পর্কিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে দেখে রামানন্দ প্রণাম করলেন। মহাপ্রভুও তাঁকে জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন,—ভোঃ কবিতাং পঠেতি,—ওহে কবিতা পাঠ কর। রামানন্দ তখন বৈরাগ্য রসাশ্রিত কবিতা পাঠ করলেন। মহাপ্রভু কবিতা শুনে বললেন, বাহ্য, অত্যন্ত বাহ্য। তখন রামানন্দ ভক্তি বিষয়িনী কবিতা পাঠ করলেন। মহাপ্রভু তখনও বললেন, এও বাহ্য, অন্য কবিতা পাঠ কর। রামানন্দ তখন প্রণাম করে রাধা গোবিন্দের প্রেমের প্রগাঢ়তা বিষয়ক ব্রজবুলি ভাষায় স্বরচিত প্রসিদ্ধ "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' ইত্যাদি পদটি পাঠ করলেন এবং মহাপ্রভু এই কবিতা শ্রবণ করে পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে রামানন্দকে আলিঙ্গন করলেন।

---

১ চৈ. চ. মহা. ১৩৷৩৪-৩৫

মুরারির কড়চায় মহাপ্রভু কাঞ্চীনগরে রামানন্দ রায়কে দর্শনের নিমিত্ত গমন করেছিলেন—যযৌ স কাঞ্চীনগরং জগদ্গুরুর্দ্রষ্টুং শ্রীরামানন্দাখ্যরায়ম্।[১] রামানন্দ তখন নিজগৃহে কৃষ্ণপূজায় নিরত ছিলেন। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করেই সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে দেখলেন। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে রামানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু কোথা থেকে আসছেন? হেসে প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, রাধিকার চরণভৃঙ্গ স্মরণ করতে পারছ না কেন? প্রভু নিজেকে স্বয়ং কৃষ্ণরূপে উল্লেখ করে বাহুযুগলের দ্বারা রামানন্দকে আলিঙ্গন করলেন। বৃন্দাবনকেলি রহস্য প্রকাশ করে রামানন্দকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন। কবিকর্ণপূরের নাটকেও দাক্ষিণাত্য গমনকালেই নৃসিংহক্ষেত্রে নৃসিংহদেবকে দর্শন করে গোদাবরীতীরে মহাপ্রভুর আগমন সংবাদ প্রচারিত হলে রামানন্দ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁর চরণে পতিত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু বললেন রামানন্দকে: সার্বভৌমের অনুরোধে আমি তোমায় দেখতে এসেছি, তুমি এখন আমাকে কিছু বল। রামানন্দ বললেন: মন বশীভূত না হলে তপস্যার কি প্রয়োজন? চিত্ত সংযমে কি প্রয়োজন যদি শ্রীকৃষ্ণে মন নিযুক্ত না হয়? চিত্ত বিগলিত না হলে হরিচিন্তা অর্থহীন এবং বাসনা ক্ষয় না হলে চিত্তবিগলিত হওয়া নিরর্থক।

মনো যদি ন নির্জিতং কিমমুনা তপস্যাদিনা
কথং সমনস্তে জয়ো যদি ন চিন্ত্যতে মাধবঃ।
কিমস্য বা বিচিন্তনং যদি ন কৃষ্ণচেতোদ্রবঃ
স বা কথমহো ভবেদ্ যদি ন বাসনাক্ষালনম্।।[২]

এর পর প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, এত বাহ্য, বিদ্যা কি?

রামানন্দ—হরিভক্তিই প্রকৃত বিদ্যা, বেদাদিতে পাণ্ডিত্য নয়।

প্রভু—কীর্তি কি?

রামা—ভগবৎপরতাজনিত খ্যাতি, দানাদি জনিত খ্যাতি নয়।।

প্রভু—শ্রী বা সম্পদ কি?

রামা—কৃষ্ণপ্রিয়তা, ধনজন গ্রামাদি নয়।

প্রভু—দুঃখ কি?

১ মু. ক. ৩।১৫।১ ২ চৈ. চন্দ্র না—৭।১৩

রামা—ভগবদ্ভক্তির অভাব, রোগযন্ত্রণা জনিত দুঃখ নয়।

প্রভু—মুক্ত কে?

রামা—শ্রীহরির চরণে যাঁদের আসক্তি, বিষয়সম্পত্তিতে নয়; সপ্রেম হরি ভক্তিতে প্রীতি, অষ্টাঙ্গ যোগে নয়; ভগবদ্বিগ্রহে আস্থা, জড় দেহে নয়, তাঁরাই প্রকৃত মুক্ত।

প্রভু—গানের বিষয় কি?

রামা—ব্রজলীলা।

প্রভু—এ জগতে শ্রেয়: কি?

রামা—সাধুসঙ্গ।

প্রভু—স্মরণীয় কি?

রামা—কৃষ্ণ নাম।

প্রভু—ধ্যানের বিষয় কি?

রামা—মুরারির চরণ।

প্রভু—কোথায় বাস করা উচিত?

রামা—ব্রজে।

প্রভু—শ্রবণের পক্ষে আনন্দদায়ক কি?

রামা—বৃন্দাবনলীলা।

প্রভু—উপাস্য কি?

রামা—রাধাকৃষ্ণ

মহাপ্রভু আরও জানতে উৎসুক হলে রামানন্দ রাধা ও গোপী-প্রেম-বিলসিত তনু শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করলেন। প্রভু এতেও তুষ্ট না হওয়ায় রামানন্দ বললেন—

সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদন নিষ্পিপেষ বলাৎ॥
অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ-
ন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্তা ভার্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্॥[১]

১ চৈ. চ. না. ৭ অংক

—তখন আমি কান্তা ও তুমি কান্ত এই বুদ্ধি ছিল না, প্রেমরভসের দ্বারা মদন উভয়ের মন সবলে নিষ্পেষিত করেছিলেন, তখন চিত্তবৃত্তি লুপ্ত হওয়ায় আমি আমরা দুজন—এই বুদ্ধিও লুপ্ত হয়েছিল, তুমি ভর্তা ও আমি ভার্যা এই ভেদবুদ্ধির এখন উদয় হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রাণ রয়েছে, এর চেয়ে আর আশ্চর্য কি ?

রামানন্দের মুখে রাধাকৃষ্ণের নির্মল প্রেমের কথা শ্রবণ করে এই প্রেমকে পরম পুরুষার্থ জেনে মহাপ্রভু দুই হাত দিয়ে মুখ আবৃত করলেন। রামানন্দও তাঁর পদযুগলে পতিত হয়ে ঈশ্বরজ্ঞানে স্তুতি নতি করলেন। মহাপ্রভুও রামানন্দকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করে দক্ষিণ গমনে উদ্যত হলেন।

কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের সাক্ষাৎকারের পরে প্রভু তাঁকে সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়সূচক শ্লোক পাঠ করতে বললেন।

রামানন্দ স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্য ভক্তি, প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও কান্তাপ্রেমকে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কান্তাপ্রেম বা মধুর রসকে তিনি সর্বোচ্চ আসনে স্থাপন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য আরও কিছু অর্থাৎ মধু রসের অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর সাধন পর্যায় জানতে ইচ্ছুক হওয়ায় রামানন্দ মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার প্রেমকেই শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে স্থাপন করেন। মহাপ্রভুর অভিলাষানুসারে রামানন্দ রাধাকৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন।

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥[১]

মহাপ্রভু এর উপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় রামানন্দ স্বরচিত—

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥[২] ইত্যাদি গানটি আবৃত্তি করলেন। প্রভুর অনুরোধে রামানন্দ সাধ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা অর্থাৎ গোপীপ্রেমের

১ চৈ. চ. মধ্য ৮ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ৮ পরি

মহিমা কীর্তন করলেন। রামানন্দের অনুরোধে দশদিন তথায় অবস্থান করে রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় মূর্তি তাঁকে দেখিয়ে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণে যাত্রা করেছিলেন।

গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চায় সংক্ষেপে মহাপ্রভু ও রামানন্দের তত্ত্বালোচনা কথিত হয়েছে—

প্রভু কহে কোন তত্ত্বে শুদ্ধ হয় মন।
রায় কহে সেই তত্ত্ব সাধুর মিলন॥
তাহাতেও সূক্ষ্মতর চাই তব ঠাঁই।
রায় কহে ত্যাগ বিনু আর তত্ত্ব নাই॥
প্রভু কহে সূক্ষ্মতত্ত্ব হয় অনুরক্তি।
রায় কহে তা হতেও উচ্চ প্রেমভক্তি॥
প্রভু কহে আরো সার কহ মহামতি।
রায় কহে সর্বসার রাই রসবতী॥[১]

রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যগমন কালেই তত্ত্বালোচনা হয়েছিল নিঃসন্দেহে। কবিকর্ণপুর মহাকাব্যে মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রামানন্দের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা বর্ণনা করলেও নাটকে দাক্ষিণাত্যগমনকালেই তত্ত্বালোচনার বিবরণ দিয়েছেন। নাটকটি মহাকাব্যের পরে রচিত হওয়ায় নাটকের বিবরণই যথার্থ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রামানন্দ ও মহাপ্রভুর মধ্যে যে সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় আলোচনা করেছেন তা যে কবিকর্ণপুরের নাটক ও মহাকাব্যের অনুসরণে তাতে সন্দেহ নেই। মহাকাব্যে, নাটকে এবং গোবিন্দের কড়চায় রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সর্বোত্তম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণ প্রেমের মহত্ত্ব সম্পর্কিত কবিকর্ণপুরের আলোচনার উপরে বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রের রঙ্ মিশিয়েছেন। কবিকর্ণপুরের বিবরণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এ সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন—"কবিরাজ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাধন ও উজ্জ্বল নীলমণি বর্ণিত সাধ্যতত্ত্ব কবিকর্ণপুরের বর্ণনার সহিত যোগ করিয়া এই অধ্যায় লিখিয়াছিলেন। চরিতামৃতে লিখিত শ্রীচৈতন্য রামানন্দ সংবাদ যে প্রকৃত কথোপকথনের রিপোর্ট নহে, তাহা প্রকারান্তরে কবিরাজ গোস্বামী নিজেই বলিয়াছেন।"[২]

---

১ গো. ক.—পৃঃ ২২ ২ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ৩৫৬

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রতাপরুদ্র উদ্ধার

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীতে উপনীত হন সে সময়ে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রদেব পুরীতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বিজয়-নগর-রাজ কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়ানগরে।
অতএব প্রভু না দেখি সেইবারে।।[১]

বৃন্দাবন দাস বলেন যে, শ্রীচৈতন্য গৌড় পরিভ্রমণ করে যখন ফিরে এলেন নীলাচলে সেই সময়ে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন রাজা প্রতাপরুদ্র, তিনি শ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভের আশায় রাজধানী কটক থেকে জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥
সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ।।[২]

আমরা জানি যে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য নীলাচলে উপনীত হওয়ার দুই মাস পরে দক্ষিণ ভারতে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন। গৌড় পরিক্রমা তিনি করেছিলেন পরে। দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এসে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল।

যাই হোক, বৃন্দাবন বলেন যে রাজা প্রভুর দর্শনের জন্য ব্যাকুল। তিনি সার্বভৌম প্রভৃতি চৈতন্যভক্তকে ধরলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের বিরাগের ভয়ে কেউ তাঁর কাছে রাজার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করতে সাহসী হচ্ছিলেন না। তখন সকলে মিলে যুক্তি করে স্থির করলেন যে মহাপ্রভু যখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য ৩ অঃ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য ৩ অঃ

কীর্তন নর্তন করবেন সেই সময়ে রাজা অগোচরে থেকে দর্শন করবেন এই প্রেমবিহ্বল সন্ন্যাসীকে। ধূলা ধূসরিত প্রভুর চোখের ধারা মুখের লালা ও নাসিকার জল দেখে রাজার মনে অবিশ্বাসের উদয় হওয়ায় তিনি অবজ্ঞাভরে স্বালয়ে চলে এলেন। রাত্রিতে স্বপ্নে রাজা জগন্নাথদেব ও চৈতন্যদেবকে অভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করে প্রভুর দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মহাপ্রভু পুষ্পকাননে উপবিষ্ট থাকাকালীন প্রতাপরুদ্র একদিন প্রভুর চরণোপান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং প্রভুর হস্তস্পর্শে সংজ্ঞালাভ করে প্রভুর স্তবস্তুতি করতে থাকেন। প্রভু প্রতাপরুদ্রকে বর দিলেন কৃষ্ণভক্তিলাভের, উপদেশ দিলেন কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করতে। তিনি বললেন—

রাজদর্শনে প্রভুর অনিচ্ছা

তুমি সার্বভৌম ও রামানন্দ রায়।
নিজের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ এথায়।[১]

প্রভুর গলার মালা উপহার নিয়ে প্রতাপরুদ্র ফিরে গেলেন নিজাবাসে। মুরারি বলেছেন যে, নিত্যানন্দ সহ গৌরাঙ্গ দর্শনের আশায় প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ও রামানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সার্বভৌম বললেন, সম্মুখ ভাগে ত দর্শন সম্ভব নয়, গৌর-নিতাই যখন সংকীর্তনানন্দে নৃত্য করবেন তখনই তাঁদের দর্শন লাভ সমীচীন। তদনুসারে উৎকলেশ্বর অশ্রুকম্পপুলকাদি সমন্বিত প্রেমৈকবিগ্রহ গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দকে দর্শন লাভে ধন্য হয়ে স্বগৃহে প্রস্থান করলেন। রাত্রিতে প্রতাপরুদ্র বার তিনেক রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দকে দেখে প্রভাতে শ্রীচৈতন্যের নিকটে গিয়ে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর পায়ে ধরে স্তুতি করতে লাগলেন। প্রভুও স্তবে তুষ্ট হয়ে রাজাকে দেখালেন ষড়্‌ভুজ মূর্তি।[২] কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যে সার্বভৌমের পরামর্শ অনুসারে গজপতিরাজ প্রতাপরুদ্রদেব অন্তরাল থেকে গৌরচন্দ্রকে দেখে গদ্গদ্‌নয়নে ভূতলে পতিত হয়ে স্তব করতে থাকলে শ্রীচৈতন্য তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।[৩] কবিকর্ণপূরের নাটকে দক্ষিণভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে বাসুদেব সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যের কাছে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞাপিত করেছিলেন। এই কথা শুনেই মহাপ্রভু দুহাত দিয়ে কান ঢেকে বলেছিলেন—

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য ৩ অঃ ২ মু. ক.—৪।১৬ ৩ চৈ. চ. মহা. ১৩ সর্গ

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্‌ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥[১]

—রিক্ত, ভগবদভিমুখী এবং ভবসাগরের পরপারে গমনে ইচ্ছুক বিষয়ীদের এবং রমণীগণের দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অনিষ্টকর।

মহাপ্রভু সার্বভৌমকে স্পষ্টভাবে জানালেন, সার্বভৌম এ বিষয়ে পুনরায় তাঁকে অনুরোধ করলে তিনি পুরী ত্যাগ করবেন। এদিকে রাজাও প্রভুর কথা শুনে সংকল্প করলেন, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন না পেলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন।

সার্বভৌম পরামর্শ দিলেন, জগন্নাথের রথযাত্রার দিন শ্রীচৈতন্য নৃত্যের পর যখন বিশ্রাম করবেন, সেই সময়ে রাজা সাধারণ বেশে তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁকে দর্শন করবেন। ইতোমধ্যে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়দেশ থেকে সমাগত হলেন চৈতন্য ভক্তবৃন্দ। রথযাত্রার দিন নৃত্যাবসানে শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণসহ যখন তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব সাধারণ বেশে মহাপ্রভুর চরণদ্বয় দুই বাহুর দ্বারা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেন। মহাপ্রভু আত্মানন্দে বিভোর অবস্থাতেই নিমীলিত নেত্রে রাজাকে আলিঙ্গন করে বললেন—

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥[২]

—রাজন্, সর্বতঃ মৃত্যু দেখেও কোন্ ইন্দ্রিয়বান্ শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও উপাস্য মুকুন্দের চরণপদ্মকে না ভজনা করে?

কবিকর্ণপূরের কাব্যেও অনুরূপভাবে বাসুদেবের মুখে রাজার অভিলাষ শুনে প্রভু কানে হাত দিয়েছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণে জগন্নাথের রথযাত্রায় চোদ্দ মাদল ও সাত সাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে কীর্তন নর্তনকালে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যকে দেখে বিস্মিত হলেন—

প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে শরীর যার হৈল প্রেমময়॥[৩]

---

১ চৈ. চন্দ্র. না.—৮।২৭ ২ চৈ. চন্দ্র. না—৮।৭১ ৩ চৈ. [illegible]

প্রতাপরুদ্র মন্ত্রী হরিচন্দনের কাঁধে হাত দিয়ে প্রভুর নৃত্য দর্শন করছিলেন—

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥[১]

হরিচন্দন নৃপতির অগ্রে নৃত্যরত শ্রীনিবাস (শ্রীবাস)কে বার বার ঠেলে একপাশে থাকতে বলছিলেন। বিরক্ত হয়ে শ্রীবাস হরিচন্দনকে এক চড় কষালেন। হরিচন্দন ক্রুদ্ধ হয়েও রাজার ইঙ্গিতে নীরব রইলেন। প্রায় বাহ্যজ্ঞান হারা হয়ে শ্রীচৈতন্য নৃত্য করছিলেন। এই সময় তাঁকে পড়ে যাবার উপক্রম দেখে রাজা প্রভুকে ধরে ফেললেন। রাজাকে দেখেই প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান ফিরে এলো।

রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥[২]

নিত্যানন্দ সতর্ক না থাকায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী বললেন, রাজাকে রথের সম্মুখে পথ মার্জনা করতে দেখে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কেবল ভক্তগণকে শিক্ষা দেবার জন্যই তাঁদের ভর্ৎসনা করে-ছিলেন। নৃত্য শেষে মহাপ্রভু পরিশ্রান্ত ঘর্মাক্ত দেহে পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় শুয়েছিলেন, এমন সময় সার্বভৌমের পরামর্শানুসারে রাজা বৈষ্ণব বেশে সেখানে আগমন করে ভক্তগণের অনুমতিক্রমে প্রভুর চরণ ধারণ করলেন, তাঁর পদসেবা করলেন এবং রাসলীলার শ্লোক পড়ে স্তুতি করলেন। প্রভু তুষ্ট হয়ে বার বার "বোল বোল" বলতে লাগলেন এবং উঠে রাজাকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। এইভাবে প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

প্রতাপরুদ্র-উদ্ধারের ঘটনা বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী পূর্বসূরীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেও কিছুটা নিজস্ব ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। প্রতাপ-রুদ্রের মত বিষয়াসক্ত নরপতির সংসর্গ যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনভিপ্রেত ছিল তা জীবনীকাররা কেউ স্পষ্টভাবে, কেউ ইঙ্গিতে বলেছেন। রামানন্দ বা বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে রাজার পরামর্শ এবং অন্তরাল থেকে শ্রীচৈতন্যের দর্শনলাভের ঘটনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। অবশেষে রাজার ব্যাকুলতায় এবং দৈন্যপ্রকাশে প্রভু সন্তোষ প্রকাশ করে তাঁকে কৃপা

১ চৈ. চ. মধ্য. ১৩ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ১৩ পরি

করেছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর একজন অনুরাগী ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রতাপরুদ্রদেব কোন্ সময়ে মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেছিলেন এ বিষয়ে জীবনীগ্রন্থগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। বৃন্দাবন দাসের মতে গৌড় রামকেলি থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রতাপরুদ্রকে প্রভু কৃপা করেছিলেন, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে দক্ষিণভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে এই ঘটনা ঘটে, কিন্তু মুরারি গুপ্তের মতে মহাপ্রভুর মথুরা-বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তী এই ঘটনা। এ ক্ষেত্রে কবিকর্ণপূরের বিবরণই গ্রাহ্য; কারণ মহাপ্রভুর লোকান্তরের পরে শোকার্ত রাজা প্রতাপরুদ্রকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে কবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লিখেছিলেন। প্রতাপরুদ্রের সমক্ষে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল, তাতে প্রতাপরুদ্র সম্পর্কে যথার্থ বিবরণই প্রত্যাশিত। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণভারত পরিক্রমায় মহাপ্রভুর ছয় বৎসর সময় অতিবাহিত হয়েছিল। প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত তীক্ষ্ণধী উৎকলে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠাবান সার্বভৌম মহাপ্রভুর ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যযাত্রার পূর্বেই সন্ন্যাসগ্রহণের ছমাস পরেই। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দেখা যায়, মহাপ্রভু দক্ষিণে যাত্রা করলে রাজা তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যাপারেও বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন। তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতি রাজার অনুরাগ যে ভাবে বর্ধিত হচ্ছিল, তাতে তাঁর পক্ষে ছয় বৎসর অপেক্ষা করা সম্ভব বোধ হয় না। লোচন মুরারিকে অনুসরণ করেছেন। মুরারির বিবরণে কোন ত্রুটি আছে মনে হয়। মুরারির কড়চায় উল্লিখিত ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ যদি গ্রন্থ রচনার কাল হিসাবে যথার্থ হয় তাহলে এই সকল বিবরণ প্রক্ষিপ্ত, আর যদি গ্রন্থরচনার কালোল্লেখ ভুল হয় তাহলেও কড়চা অর্থাৎ দিনলিপিকে কাব্যাকারে রূপ দেবার সময় হয়ত কালানুক্রমের বিপর্যয় হতেও পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের গৌড় ভ্রমণ

উৎকলাধীশ্বর প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করার পরে মহাপ্রভু মথুরাগমনের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। কিন্তু রায় রামানন্দের অনুরোধক্রমে আজ যাব কাল যাব করে তিনি দুই বৎসর নীলাচলে যাপন করেছিলেন—"তেন তদুপরোধান্মথুরাং জিগমিষুরপি বর্ষদ্বয়মত্যখ ইতি কৃত্বা বিলম্বিতো ভগবান্।"[১] কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপূরকে অনুসরণ করেই বলেছেন—

তবে প্রভু সার্বভৌম রামানন্দস্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥
অবশ্য চলিব দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি॥[২]

দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দুই বৎসর মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে নীলাচলে কীর্তনানন্দে যাপন করেছেন। বাসুদেব সার্বভৌমের ব্যবস্থাপনায় কাশী মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। এই কালে উড়িষ্যার অনেক বৈষ্ণব ভক্ত তাঁর চরণতলে মিলিত হলেন। জগন্নাথের সেবক জনার্দন, স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখন-অধিকারী শিখি মাহিতী, উৎকলরাজের অমাত্য চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, ব্রাহ্মণ মুরারি, বিষ্ণুদাস মহাপাত্র প্রহররাজ, পরমানন্দ, রায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় প্রভৃতি মহাপ্রভুর অপূর্ব ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে সমবেত হতে লাগলেন। এদিকে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর পরামর্শ করে মহাপ্রভুর অনুমতিক্রমে কৃষ্ণদাসকে পাঠালেন নবদ্বীপে শচীমাকে আশ্বাস দেবার জন্য। কৃষ্ণদাসের মুখ থেকে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত থেকে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ শচীমাতার অনুমতি নিয়ে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের নিকট উপনীত হলেন। অদ্বৈতের সঙ্গে এলেন কুলীন গ্রামনিবাসী

১ চৈ চন্দ্র. না.—৯।১৩ ২ চৈ চ. মধ্য—১৬ পরি

সত্যরাজ, রামানন্দ, শ্রীখণ্ড থেকে এলেন মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন, দক্ষিণ ভারত থেকে নবদ্বীপ ঘুরে উপনীত হলেন পরমানন্দ পুরী, উপনীত হলেন সন্ন্যাসী স্বরূপ দামোদর (পূর্বাশ্রমে পুরুষোত্তম আচার্য)। ঈশ্বর পুরীর শিষ্য গোবিন্দ গুরুর সিদ্ধিপ্রাপ্তির পূর্বে প্রদত্ত আদেশানুসারে নীলাচলে এলেন শ্রীচৈতন্যের সেবার নিমিত্ত। কয়েকদিন পরে ব্রহ্মানন্দ ভারতী মিলিত হলেন চৈতন্যদেবের সঙ্গে। গৌড় থেকে দুইশত ভক্ত এসেছেন।[১] যবন হরিদাসের জন্য পুষ্পোদ্যানে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা হোল।

দক্ষিণ দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের থেকেই গোপীভাব বা রাধাভাবের স্ফুরণ হতে থাকে শ্রীচৈতন্যের আচরণে। স্নানযাত্রা দর্শনের পর তিনি গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে আলালনাথ চলে গেলেন একাকী। আবার সার্বভৌম তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন নীলাচলে—

গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥
পাছে প্রভুর নিকট আইল ভক্তগণ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইল কৈলে নিবেদন॥
সার্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।[২]

রথযাত্রায় ভক্তগণসহ কীর্তন নর্তন, রথযাত্রার পূর্বদিনে চার সম্প্রদায় সহ মন্দির বেষ্টন করে বেড়ানৃত্য, পরের দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব, পরদিন পাণ্ডু বিজয় বা রথারোহণ উৎসব, সাত সম্প্রদায়ের চোদ্দ মাদল সহ কীর্তন-নৃত্য, হোরাপঞ্চমী ও লক্ষ্মীবিজয়মহোৎসব দর্শন, নরেন্দ্র সরোবরে ভক্তবৃন্দসহ জলক্রীড়া, উদ্যানে বনভোজন, জগন্নাথের পুনর্যাত্রা উৎসবে ভক্তগণসহ কীর্তন-নর্তন ইত্যাদি প্রকারে প্রভু চারমাস যাপন করলেন। কৃষ্ণ জন্মোৎসবে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ জন্ম-লীলাভিনয় করেন ভক্তগণ সঙ্গে। দীপাবলী যাত্রা, রাসযাত্রা ও উত্থান দ্বাদশী যাত্রা উৎসবান্তে শ্রীচৈতন্য ভক্তগণকে গৌড়ে প্রেরণ করলেন। ভক্তবৃন্দের প্রস্থানের পরে বাসুদেব সার্বভৌম প্রভুকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে পাঁচ দিন ভিক্ষার গ্রহণে সম্মত করান। সার্বভৌম-জামাতা ষষ্ঠীর স্বামী অমোঘ প্রভুর ভোজন দেখে তাঁর অসম্মান করায় সার্বভৌম পত্নীসহ জামাতাকে তিরস্কার

১ চৈ. চ. মধ্য ১১ পরি ২ তদেব

করেন এবং অমোঘ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হলে মহাপ্রভু তাকে কৃপা করেন, অমোঘও সুস্থ হয়ে প্রভুর ভক্তে পরিণত হয়।[১]

এবার শ্রীচৈতন্যের আকাঙ্ক্ষা হোল, তিনি বৃন্দাবন দর্শনে যাবেন। এই বার্তা শুনে মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রভুর বিরহচিন্তায় ব্যাকুল হয়ে রায় রামানন্দ ও বাসুদেব সার্বভৌমকে অনুরোধ করলেন প্রভুকে নীলাচলে ধরে রাখতে। তাঁরা নানা অজুহাতে প্রভুকে বৃন্দাবন গমন থেকে নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট।

রামানন্দ সার্বভৌম দুই জনা স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে॥
দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্তিক আইলে তবে করিহ গমন॥
কার্তিক আইলে কহে এবে মহাশীত।
দোলযাত্রা দেখি যাইহ এই ভাল রীত॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়॥[২]

ভক্ত-পরবশ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্তের বাধা অতিক্রম করে বৃন্দাবন যেতে পারলেন না। এইভাবে নীলাচলে মহাপ্রভুর দুই বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তৃতীয় বৎসরে গৌড় থেকে ভক্তগণ সমবেত হলেন। এবারে সমাগত হলেন সপত্নীক অদ্বৈত আচার্য, সপত্নীক শ্রীবাস, পত্নীপুত্রসহ শিবানন্দ সেন, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়, নিত্যানন্দ অবধূত, শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার, রঘুনন্দন প্রভৃতি, এবারও মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ রথযাত্রা, হোরাপঞ্চমী যাত্রা দর্শন করলেন। এইভাবে চার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। পঞ্চম বৎসরে রথযাত্রার পরে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন পরিক্রমার অভিলাষ কার্যকর করলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন,—

এই মত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ-যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥

১ চৈ. চ. মধ্য ১৫ পরি   ২ চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি

পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি না রহিল গৌড়ে চলিলা ।।[১]

নীলাচলে অবস্থানের পঞ্চম বৎসরে শ্রীচৈতন্য রামানন্দ ও সার্বভৌমকে বললেন—

বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন ।।
অবশ্য চলিব দোঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্যগতি ।।
গৌড়দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময় ।।
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া।।[২]

প্রভুর কাতরতা দেখে ভক্তদ্বয় বর্ষার অন্তে বিজয়া দশমীর শুভদিনে প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার দিন স্থির করলেন।

আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়াদশমী দিনে করিল পয়ান ।।[৩]

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মহাপ্রভু মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। কবিকর্ণপূরের নাটকে ভক্তদের অনুরোধকে মর্যাদা দিয়ে শ্রীচৈতন্য দুই বৎসর বিলম্ব করে রামানন্দের অনুমতি নিয়ে গৌড়ের পথে যাত্রা করেছিলেন—তেনাম্বু মিতং গৌড়বর্ত্মনৈব গন্তুমুক্তোঽস্তি।[৪]

চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে বিদায় নিয়ে গৌড়ের পথে যাত্রা করলে প্রভুর যাত্রাপথে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাজা গ্রামে গ্রামে বিষয়ীদের কাছে আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেছিলেন।

বাহিরে আসি রাজা আজ্ঞাপত্র লেখাইল।
নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল ।।
গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ সাত নবগৃহে সামগ্রী ভরিবা ।।

১-৩ চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি   ৪ চৈ. চন্দ্র না. ৯।১৩

আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উতরিবা।
রাত্রি দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা ॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা কর সর্বকাজ ॥
এক পথ নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
যাহা স্নান করি প্রভু যান নদীপারে ॥[১]

কবিকর্ণপূরের নাটকে (৯ম অংক) এবং মহাকাব্যে (১৯ সর্গ) রাজার পত্রিকা যারা মহাপ্রভুর যাত্রাপথে গ্রামে গ্রামে তাঁর পথক্লেশ দূর করার আয়োজন করেছিলেন এবং পুরীশ্বর, দামোদর, জগদানন্দ, গোপীনাথ ও গোবিন্দ প্রভুর সহযাত্রী হয়েছিলেন। রামানন্দ গিয়েছিলেন ভদ্রক বা ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত। মহাকাব্যে মহাপ্রভুর যাত্রা সুরু হয়েছিল বিজয়া দশমীর পরে, বিজয়া-দশমীর দিনে নয়।[২] মহাপ্রভু যাত্রাকালে সঙ্গীদের আদেশ করলেন গঙ্গাতীরস্থ বৈষ্ণবদের জন্য জগন্নাথের মহাপ্রসাদ সঙ্গে নিতে। তিনিও প্রতাপরুদ্র-প্রদত্ত জগন্নাথের নির্মাল্য মাতার তৃপ্তির জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন।

জয়ানন্দ বলেন, নবদ্বীপ গমনই মহাপ্রভুর অভিপ্রেত ছিল, কারণ সন্ন্যাস গ্রহণের পর সন্ন্যাসীর একবার জন্মভূমি দর্শন করা বিধি।

চৈতন্য গোসাঞি বলেন জন্মভূমি দেখি।
মাএ নমস্করি আ'স ধর্ম রক্ষি ॥[৩]

অদ্বৈতপ্রকাশকার বলেন যে শ্রীচৈতন্য একদিন ভক্তগণের কাছে বৃন্দাবন গমনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন। ভক্তগণ বর্ষাকালে বৃন্দাবনযাত্রা অনুচিত বলে পরামর্শ দেওয়ায় সাধু বৈষ্ণবের বাক্য লঙ্ঘন না করে প্রভু গৌড়দেশে যাত্রা করলেন।

সাধু বৈষ্ণবের বাক্য মহাবেদ হয়।
তাহার লঙ্ঘনে সর্বশুভ করে ক্ষয় ॥
এত কহি গৌরভক্ত বাক্য স্বীকারিলা।
নিজ গণ লঞা গৌর দেশেরে চলিলা ॥[৪]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি   ২ চৈ চ. মহা. ১৯।৫   ৩ চৈ. ম. উৎকল—১৩
৪ অ. প্র. ১৬ অং—পৃঃ ১৮০

বৃন্দাবন দাস গ্রন্থারম্ভে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উল্লেখ করলেও অন্ত্যখণ্ডে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নীলাচলে কিছুকাল অবস্থানের পরেই মহারাজ প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার কালে গৌড় পরিক্রমার বিবরণ দিয়েছেন।

ঠাকুরো থাকিয়া কথো'দন নীলাচলে।
পুন গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে॥
গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাঢ়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌরদেশে আইলা চলিয়া॥[১]

মুরারির কড়চায় মহাপ্রভুর দুবার গৌড় আগমনের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে: একবার মথুরা গমনের ইচ্ছায় গৌড়রামকেলি পর্যন্ত গমন করে শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, আর একবার মথুরা বৃন্দাবন পরিক্রমান্তে নবদ্বীপ শান্তিপুর ঘুরে নীলাচলে পুনরাগমন। গৌড়যাত্রার পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি-কর্ণপুর মহাকাব্যে বলেছেন যে, মহাপ্রভু নীলাচল ত্যাগ করে প্রথমে উপনীত হলেন ভুবনেশ্বর, এখানে রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণসহ রজনী যাপন করে কটকাভিমুখে রওনা হলেন। কটকে গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করার পর মহারাজ প্রতাপরুদ্র কটকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে মহাপ্রভুর অনুবর্তনের আদেশ করেন। মঙ্গরাজ, হরিচন্দন ও রামানন্দ প্রভুকে বৃহৎ নৌকায় মহানদীর পরপারে নিয়ে গেলেন। যে পথ দিয়ে মহাপ্রভু চলছিলেন সেই পথেরই উভয় দিক প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় সুসজ্জিত হয়েছিল। ভদ্রেশ্বর থেকে রামানন্দ প্রত্যাবর্তন করলেন, উৎকলীয় অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও প্রত্যাবর্তন করলেন। গৌরচন্দ্র উত্তর দিকে গমন করে শ্রীরাঘবের আশ্রমে আগমনের পরে তথায় ৫/৬ দিন অবস্থান করে নিত্যানন্দকে প্রেরণ করলেন নবদ্বীপে, তিনি নিজে অবস্থান করলেন ২/৩ দিন শ্রীবাসের গৃহে। এরপর তিনি নৌকায় গঙ্গাপার হয়ে এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে। জননী শচীদেবী সমাগতা হলেন অদ্বৈতগৃহে। মাতৃহস্তপরিবেশিত অন্ন পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করে মহাপ্রভু তথায় ছয় দিন অতিবাহিত করেছিলেন। পরে তিনি নবদ্বীপের গঙ্গার অপর পারে কোন একটি

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য ৩ অঃ

গ্রামে ৫/৬ দিন কাটিয়ে অত্যধিক জনসমাগম হেতু নীলাচলের অভিমুখে প্রস্থান করেন।[১]

কবিকর্ণপূরের নাটকে রাজা প্রতাপরুদ্রের অভিলাষানুসারে রায় রামানন্দ কিছু সংখ্যক উৎকলীয় ব্যক্তিকে মহাপ্রভুর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক উৎকলরাজের অধিকার সীমা পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিল, কিছু গিয়েছিল গৌড়রাজ্য পর্যন্ত। সে সময়ে গৌড়দেশে প্রবেশের তিনটি পথের মধ্যে দুটি স্থলপথ রুদ্ধ ছিল। তৃতীয় পথটি জলপথ। গৌড় রাজ্যের সীমায় হোসেন শাহের অধীনস্থ এক মদ্যপ দুর্বৃত্ত তুরস্কদেশীয় শাসনকর্তা ছিল। কিন্তু সেই সীমাধিকারী মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে পৃথক নৌকায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং পৃথক নৌকায় জলদস্যুদের ভয় নিবারণের জন্য অগ্রবর্তী হয়ে মন্ত্রেশ্বর নদ উত্তীর্ণ হয়ে পিচ্ছলদা গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। নাবিকগণ হরিনাম কীর্তন করতে করতে দ্রুত নৌকা চালনা করে একদিনেই পানীয়হাটিতে উপনীত হয়েছিল। পানীয়-হাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে রাত্রিবাস করে মহাপ্রভু গঙ্গাপথে কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হন। জগদানন্দ শিবানন্দের গৃহ পর্যন্ত পথ সুসজ্জিত করে রাত্রিপ্রভাতে মহাপ্রভুকে নিয়ে গেলেন শিবানন্দ ভবনে। এখানে কিছুকাল অবস্থান করে মহাপ্রভু এলেন শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে। তারপরে তিনি জলপথে এলেন নবদ্বীপের অপরপারে কুলিয়া গ্রামে মাধব দাসের বাড়ীতে। নবদ্বীপ থেকে বহুলোক শ্রীচৈতন্যের দর্শনার্থী হয়ে এখানে সমবেত হয়। এখানে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর স্থলপথে উত্তরবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করলেন মহাপ্রভু। কেশব বসু নামে এক অমাত্যকে গৌড়েশ্বর বিপুল জন সমাগমের হেতু অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কেশব বসু গৌড়েশ্বরকে জানালেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক এক মহাপুরুষ পুরুষোত্তম থেকে মথুরায় পথে গমন করছেন বলেই তাঁকে দেখার জন্য এই বিপুল জন-সমাগম। তারপর কিছু দূর গিয়ে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন বনপথে মথুরা যাবার মনস্থ করে।[২]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মোটামুটি কবিকর্ণপূরকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর

১ চৈ. চ মহা. ২০ সর্গ ২ চৈ. চন্দ্র না. ৯ অংক

বিবরণে মহাপ্রভু চিত্রোৎপলা নদীতে স্নান করে ভক্তগণকে বিদায় দিয়ে নৌকা পথে উপনীত হলেন রেমুণায়। এখান থেকে রামানন্দ রায়কেও বিদায় দিয়ে প্রভু ওড্রদেশের সীমায় উপনীত হন। গৌড়রাজ্যের সীমান্ত রাজ্যে উপনীত এক রাজকর্মচারী স্থানীয় যবন শাসকের প্রসঙ্গে বলে—

মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কত রহ সন্ধি করি তাহা সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥[1]

হিন্দু চরের মুখে শ্রীচৈতন্যের অদ্ভুত রূপগুণের কথা শুনে যবন শাসকের মতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে স্বয়ং এলো মহাপ্রভুর সম্মুখে। শ্রীচৈতন্য তাকে কৃষ্ণনাম বলালেন। সেই শাসনকর্তা প্রভুকে পিছলদা পর্যন্ত নিজে পৌঁছে দিয়েছিল—

জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশনৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল।
পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল॥[2]

যবনকে বিদায় দিয়ে নৌকাযোগে পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন ও রাত্রিযাপন, প্রাতে কুমারহট্টে শ্রীনিবাসের (শ্রীবাস) গৃহে, তৎপরে শিবানন্দ, বাসুদেব, বাচস্পতি ও মাধবদাসের গৃহে, অতঃপর শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে প্রভুর পদার্পণ ঘটে। শান্তিপুরে শচীমাতা এসে মিলিত হন। এর পরেই কৃষ্ণদাস প্রভুর রামকেলি গ্রামে গমন এবং কানাই-এর নাটশালা থেকে শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করেছেন। অদ্বৈতগৃহ ভক্তগণের সমাগমে কীর্তনানন্দে মুখর হয়ে ওঠে। সপ্তগ্রাম নিবাসী গোবর্ধন দাস নামে এক দানশীল ধার্মিক ধনীর পুত্র রঘুনাথ দাস প্রবল বৈরাগ্যের তাড়নায় শান্তিপুরে এসে প্রভুর কৃপালাভ করলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে অনাসক্ত হয়ে

১-২ চৈচ: মধ্য ১৬ পরি

সংসার ধর্ম আচরণ করতে নির্দেশ দিলেন। দশদিন শান্তিপুরে অবস্থান করে মাতা ও ভক্তগণের নিকট থেকে বৃন্দাবন যাত্রার অনুমতি নিয়ে চৈতন্যচন্দ্র নীলাচলে প্রত্যাগমন করলেন।

ইঁহা প্রভু একেক করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি যত ভক্তগণ॥
সবা আলিঙ্গন করি কহে গোসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই॥

*   *   *

ইঁহা হইতে অবশ্য আমি বৃন্দাবন যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্বিঘ্নে আসিব॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা নিল॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লইয়া॥[১]

গৌড় পরিক্রমার বিবরণের ভার বৃন্দাবনের উপরে দিয়ে সংক্ষেপে সেরেছেন। বৃন্দাবন পথের বিবরণ একেবারেই অনুক্ত রেখেছেন। বৃন্দাবনের মতে মহাপ্রভু প্রথমে বিশারদনন্দন বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি মিশ্রের ঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন। মুরারিও বাচস্পতি মিশ্রের গৃহে মহাপ্রভুর আগমনের কথা বলেছেন।[২] কিন্তু কুলিয়ায় মহাপ্রভুর দর্শনলাভের জন্য এত লোক সমাগম হয় যে "লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর।"[৩] কুলিয়া নবদ্বীপের গঙ্গার পরপারে। কুলিয়াতে দেবানন্দ পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ সমবেত হন। এখানেও বহুজনের সমাগম হতে থাকে। বৃন্দাবন বলেন, কুলিয়া থেকে গঙ্গার তীরে তীরে মথুরা গমনের উদ্দেশ্যে গৌড়ের অভিমুখে চললেন মহাপ্রভু। গৌড়ের নিকটে ব্রাহ্মণপ্রধান রামকেলি গ্রামে তিনি চার পাঁচ দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণ সমাজ তার রামকেলি নাম॥

---

১ চৈ. চ. মধ্য. ১৬ পরি ২ মু. ক.—৪।১৭।৫ ৩ চৈ. ভা অন্ত্য. ৪ অঃ

দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে ॥[১]

এখানেও বহু লোক সমবেত হতে থাকে, অহোরাত্র চলে সংকীর্তন। কোটাল গিয়ে সুলতান হোসেন শাহের কাছে এই আশ্চর্য সন্ন্যাসীর বিবরণ দেয়। রাজা অমাত্য কেশব খানকে ডেকে সন্ন্যাসীর তত্ত্ব গ্রহণ করতে আদেশ করেন। পাছে সুলতান গৌরাঙ্গ প্রভুর কোন অপ্রিয় আচরণ করেন, এই আশংকায় কেশব খাঁ রাজাকে বললেন—

হোসেন শাহ

কে বোলে গোসাঞি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরি গরিব বৃক্ষের তলবাসী ॥[২]

কিন্তু সুলতান হোসেন শাহ্, যাঁকে দেখবার জন্য কাতারে কাতারে মানুষ ছোটে, সেই মানুষটিকে সামান্য ভিক্ষুক মনে করতে পারলেন না। বৃন্দাবনের বিবরণ মত তিনি শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলে গণ্য করেছিলেন এবং নিরুপদ্রবে কীর্তনাদি করবার অনুমতি ঘোষণা করেছিলেন।

রাজা বোলে এহ মুঞি বলিলুঁ সভারে।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে ॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে ॥
সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তার মন ॥
কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছুই বলিলেই তার লইমু জীবনে ॥[৩]

যদিও সুলতানের এই আদেশে সকলেই পরিতুষ্ট হয়েছিলেন তথাপি হোসেন শাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করে যে ভাবে দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির ধ্বংস করেছিলেন সেই কথা চিন্তা করে ভক্তবৃন্দ মন্ত্রণা করে মহাপ্রভুর রামকেলি গ্রাম ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। নির্ভীক প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য সুলতানকে ভয় পেলেন না।

প্রভু বোলে তুমি সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা দেখিবারে নিবেক কারণে ॥

১-৩ চৈ. ভা. অন্ত্য, ৪ অঃ

আমা চাহে হেন জন আমিও তা চাও।
সবে আমা চাহে হেন কোথাও না পাও ॥
তোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে মুঞি যাইমু আপনে ॥[১]

এ কথা বলা সত্বেও মহাপ্রভু কয়েকদিন সেখানে কীর্তনে কাল যাপন করার পরে মথুরা না গিয়ে নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে শান্তিপুরে এলেন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে। শচীমাতার রান্না খেয়ে এক বৈষ্ণবদ্বেষী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে রোগমুক্ত করে প্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাসগৃহে কয়েকদিন যাপন করবার পর পাণিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের ঘরে কয়েকদিন অবস্থান করে আসেন বরাহনগরে। বরাহনগরে এক পণ্ডিতের গৃহে তিনদিন ভাগবত পাঠ শুনে ব্রাহ্মণকে ভাগবতাচার্য উপাধি প্রদান করে প্রভু নীলাচলে প্রস্থান করেছিলেন। বৃন্দাবন অতঃপর নীলাচলে মহাপ্রভুর স.ঙ্গ প্রতাপরুদ্রের মিলনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পাঠে মনে হয়, চৈতন্যদেব দুবার গৌড়ে আগমন করেছিলেন: একবার বাসুদেব সার্বভৌমকে হরিনাম চিন্তামণি প্রদানের পরে জন্মভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় কারণ "সন্ন্যাস লইলে জন্মভূমি দেখি একবার।"[২] আর দ্বিতীয় বার রাজা প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে বিজয়নগরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর জন্মভূমি নবদ্বীপ দর্শন করে মাকে প্রণাম করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন—

গঙ্গাপার ডাহিনে রহিল শান্তিপুর।
নবদ্বীপে উত্তরিলা চৈতন্য ঠাকুর ॥
জন্মভূমি দেখি মাএ নমস্কার করি।
রহিলা বারুণা গ্রামে বঞ্চিয়া শর্বরী ॥[৩]

এবার গৌড়যাত্রার কারণ জগন্নাথের আজ্ঞা—

চৈতন্য চলিলা গৌড় দেশে।
শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা বিশেষে ॥[৪]

জয়ানন্দের বিবরণে শ্রীচৈতন্যের গৌড়যাত্রা পথে তুঙ্গদা, তম্রক, অম্বরগড়া, সরোনগর, রেমুণা, বাঁশদহ, দাঁতন, জলেশ্বর, দেবশরণ, মন্দারণ ও বর্ধমান পড়েছিল। বর্ধমানের সন্নিকটে মাঞ্জিপুরা বা আমাইপুরা গ্রাম নিবাসী জয়ানন্দের

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৪ অঃ ২ চৈ. ম. উৎকল—১০ ৩ চৈ. ম. উৎকল—১০।১১-১২

পিতা সুবুদ্ধিমিশ্রের গৃহে বিশ্রাম করে সুবুদ্ধিপত্নী রোদিনীর হাতের রান্না খেয়ে জয়ানন্দের নামকরণ করে বায়ড়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্যের গৃহে একরাত্রি যাপন করেছিলেন। সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হেতু প্রভু লুকিয়ে পালিয়ে আসেন কুলিয়া গ্রামে। তিনি কুলিয়ানগরে তিন রাত্রি যাপন করেন। এখানেও দলে দলে মানুষ আগমন করতে থাকে। শচীমাতাও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন। গঙ্গাতীরে ওপার থেকে দেখে মহাপ্রভু নিষেধ করলেন মাকে।

মাএরে দেখিয়া প্রভু হইলা নমস্কার।
বধূ লয়্যা জাহ মা না হইহ গঙ্গাপার॥[১]

জয়ানন্দবর্ণিত শ্রীচৈতন্যের গৌড়যাত্রায় পথের বর্ণনার সঙ্গে কবিকর্ণপূর-বর্ণিত পথের মিল নেই। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে কবিকর্ণপূর বর্ণিত পথক্রম ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[২]

কুলিয়া গ্রাম থেকে অগ্রসর হয়ে গৌড়ের নিকবটর্তী কৃষ্ণকেলি (রামকেলি ?) গ্রামে হরি সংকীর্তনে প্রভু সকলকে উন্মত্ত করে তুললেন। জয়ানন্দ বলেছেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেমনৃত্য দেখে বনের পশু কাঁদে, গাছেরা মাথা নত করে, পাথর কেটে যায়। মহাপ্রভুর সংকীর্তনের সংবাদ কোটালের মুখে শুনে হোসেন শাহ্ হুকুম দিলেন সন্ন্যাসীকে ধরে আনতে। সেই শুনেই শ্রীচৈতন্য সদলে শান্তিপুরে ফিরে এলেন।

রাজা বলে কেশব খাঁ ধরিয়া আন এথা।
কেমন কৃষ্ণচৈতন্য তারে গাছে মুণ্ডাএ মাথা॥
তা শুনি নিবর্ত হইলা চৈতন্য ঠাকুর।
সর্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা শান্তিপুর॥[৩]

জয়ানন্দের অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনীর মত এই কাহিনীও সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য নয়। জয়ানন্দ বলেন, শান্তিপুরে শচী ঠাকুরাণী এসে পুত্রকে রান্না করে খাইয়েছিলেন। জয়ানন্দের মতে শান্তিপুরে রাত্রি যাপন করে প্রভু আসেন কুমারহট্টে শিবানন্দের গৃহে, তৎপরে পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে এসে তিনি শাকান্ন ভোজন করেছিলেন। তারপর বরাহনগর ঘুরে তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন।

১ চৈ. ম. বিজয়—৪।১৩ ২ চৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ ২১৯
৩ চৈ. ম. বিজয়—৪।৩০-৩১

নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস অনুসারে নীলাচল থেকে গৌড়দেশে এসে পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে, তারপর কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে, তৎপরে বাসুদেব শিবানন্দের বাড়াতে ভিক্ষা নির্বাহন করে শান্তিপুরে গিয়ে ছিলেন অদ্বৈতালয়ে। এখান থেকে কুলিয়ায় মাধব আচার্যের গৃহে সাত দিন অবস্থান করে নবদ্বীপবাসীদের দর্শনদানে ধন্য করেছিলেন।[১]

প্রেমবিলাসকার আর একটি খবর দিয়েছেন: মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে পদ্মাপার হয়ে পদ্মাপারের গ্রামের শোভা দেখে নিত্যানন্দের গলা ধরে বসে পড়লেন এবং বললেন, এমন মনোরম স্থান ছেড়ে বৃন্দাবন যাব না, এখানেই থাকবো। নিত্যানন্দ হেসে বললেন, ভাল, ভাল, তুমি সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ ছাড়বে। একথা শুনে প্রভু উঠলেন, গৌড়ের নিকটে চতুরপুর গ্রামে উপনীত হলেন, এখানে সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি উপনীত হন কানাই-এর নাটশালায়।[২] এই বিবরণও কাল্পনিক বলে বোধ হয়।

বিভিন্ন চরিতগ্রন্থে প্রদত্ত মহাপ্রভুর গৌড়পরিক্রমার বিবরণে বেশ পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই যাত্রার বিবরণের এবং যাতায়াতের ক্রমের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য যে জন্মভূমি নবদ্বীপ, জননী এবং জাহ্নবী দর্শনের উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ থাকে না। তবে গৌড়দেশ ভ্রমণ করে মথুরা যাত্রার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল বলেই মনে হয়। মনে হয় অত্যধিক জনসমাগমের হেতু মথুরা গমন সংকল্প পরিত্যাগ করে তিনি নীলাচলে ফিরে এসেছিলেন এবং একাকী অরণ্যপথে মথুরা যাত্রা করেছিলেন। নিত্যানন্দ দাস এই কথাই লিখেছেন—

রূপ সনাতনে প্রভু কৃপা কৈলা।
কানাইর নাটশালা হৈতে ফিরিয়া আসিলা॥
লোকভিড় দেখি না গেলা বৃন্দাবন।
শীঘ্র করি নীলাচল করিলা গমন॥[৩]

বৃন্দাবনের মতে হোসেন শাহ্ শ্রীচৈতন্যকে অবাধে তাঁর রাজ্যে কীর্তনাদি সহ অবস্থান করার অনুমতি দিলেও ভক্তদের ইচ্ছানুসারে সুলতানের মতি পরিবর্তনের আশংকাতেই বৃন্দাবন গমনাভিলাষ ত্যাগ করেছিলেন। কবিরাজ

১-২ প্রে. বি.—৮ বি, পৃঃ ৪১ ৩ প্রে বি.—২৪ বি, পৃঃ ২৪১

গোস্বামীর মতে সুলতান কৌতূহল বশে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তত্ত্ব জাত হয়েই নীরব হয়েছিলেন। তিনি কেশব ছত্রীকে মহাপ্রভু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করায় কেশব শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক মহিমা গোপন করে বলেছিলেন—

ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন।
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি।[১]

রাজাকে নিরস্ত করে কেশব মহাপ্রভুকে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন এক ব্রাহ্মণের মাধ্যমে। এখানে বৃন্দাবনের প্রতিধ্বনি করেছেন কৃষ্ণদাস। কিন্তু তিনি আরও জানালেন যে, কেশবের উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে সুলতান দবির খাসকে জিজ্ঞাসা করলেন। দবির খাস শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বর বলে বর্ণনা দিলে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

হোসেন উড়িষ্যায় এবং কামরূপে হিন্দুদের দেববিগ্রহ ও দেবমন্দির ধ্বংস করলেও মোটামুটি হিন্দুদের উপরে উদার মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। সমকালীন সাহিত্যে তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন। শ্রীচৈতন্যকে জয়ানন্দের মতে ধরে আনতে আদেশ দেওয়াটা হোসেন শাহের চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। বৃন্দাবনের বিবরণে হোসেন শাহ্ যখন শ্রীচৈতন্যকে সশ্রদ্ধভাবে কীর্তনের অনুমতি দিয়েছেন, কৃষ্ণদাসের বিবরণে নীরব সম্মতি জানিয়েছিলেন তখন রাজভয়ে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-মথুরা পরিক্রমা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কাজী দমন এবং জগাই মাধাই উদ্ধারের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিপক্ষতার ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর চরিত্রে নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়. এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া রাজভয়ে গৌড় থেকে দক্ষিণে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে পশ্চিমে বৃন্দাবনের পথে গেলে কি এমন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল?

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের রামকেলিতে আগমন সম্পর্কে আর একরকম তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানালেন যে, গৌড়েশ্বরের দুই প্রতাপশালী মন্ত্রী সাকরমল্লিক ও দবির খাস পত্র মারফতে শ্রীচৈতন্যের কাছে নিজেদের

অন্তর্গত দৈন্য প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা রামকেলিতে মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করার পরে মহাপ্রভু তাঁদের বলেছিলেন—

দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠাইলে বারবার।
সে পত্রীতে জানিঞাছি তোমার ব্যবহার॥[১]

মহাপ্রভু তাঁদের আরও বললেন,

গৌড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেন আইলা রামকেলি গ্রামে॥[২]

কবিরাজ বৃন্দাবনে বসে মহাগ্রন্থ রচনাকালে রূপসনাতনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে প্রকৃত তথ্য অবগত হয়েছিলেন। শান্তিপুর-নবদ্বীপ-গৌড়-রামকেলি ঘুরে বৃন্দাবন গমনে মহাপ্রভুর পরিকল্পনার লক্ষ্য যে জননী-জন্মভূমি দর্শন এবং রূপ সনাতন সাক্ষাৎকার তা সত্য বলেই প্রতীয়মান। কিন্তু অত্যধিক লোক সংঘট্টের জন্য তাঁকে গৌড় থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল।

হোসেন শাহকে নিবৃত্ত করে সাকরমল্লিক ও দবির খাস দুই ভাই দন্তে তৃণ ধারণ করে গলবস্ত্র হয়ে মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করে স্তুতি করলেন এবং মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করলেন—

ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসেবী করি ম্লেচ্ছকর্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কু-বিষয় বিষ্ঠাগর্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাই ত্রিভুবনে।
পতিত পাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজ বল।
পতিত পাবন নাম তবে সে সফল॥[৩]

আর্তের ভগবান বৈরাগ্য দৃষ্টে প্রীত হয়ে তাঁদের কৃপা করলেন এবং দুই ভাই-এর নাম রাখলেন রূপ ও সনাতন।

---

১ চৈ. চ. মধ্য. ১ অঃ ২ তদেব ৩ চৈ চ. মধ্য ১ পরি

শুনি মহাপ্রভু কহেন শুন দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপসনাতন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥[১]

রূপসনাতন মহাপ্রভুকে বিপুল জনসমষ্টি সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন না গিয়ে গৌড় ত্যাগ করে যেতে পরামর্শ দিলেন,—

ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাত্রার এ নহে পরিপাটী॥[২]

কৃষ্ণদাস বলেছেন, যদিও মহাপ্রভুর চিত্তে কিছুমাত্র ভয় ছিল না, তথাপি তিনি রূপ সনাতনের পরামর্শ অনুসারে পরদিনই রামকেলি ত্যাগ করে কানাই-এর নাটশালায় চলে এসেছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে সাত দিন শচীদেবীর স্নেহচ্ছায়ায় যাপন করে বলভদ্র ভট্টাচার্য ও দামোদর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে নীলাচলের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।

বিভিন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও অসমীয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ সম্পর্কে বিবরণ আছে। এ সম্পর্কে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। অসমীয়া গ্রন্থ ভট্টদেবের সৎসম্প্রদায় কথা, কৃষ্ণভারতীর সন্তনির্ণয়ে,

আসাম ভ্রমণ

কৃষ্ণ আচার্যের সন্তবংশাবলী, আধুনিক কালে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার শ্রীশঙ্করদেব আরু শ্রীমাধবদেব প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম ও মণিপুর গমনের উল্লেখ আছে। কামরূপ বিভাগে হাজো অঞ্চলে মহাপ্রভুর আগমনের কিম্বদন্তী আজও প্রচলিত। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মনে করেন, বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে শ্রীচৈতন্য আসাম গিয়েছিলেন।[৩] কিন্তু কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে মহাপ্রভুর আসাম গমনের উল্লেখ না থাকায় নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। প্রদ্যুম্ন মিশ্রের চৈতন্যোদয়াবলী ও

১-২ চৈ. চ মধ্য ১ পরি

৩ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—২য় সং পৃঃ ৫১৮ ২২

চূড়ামণি দাসের গৌরাঙ্গবিজয় কাব্যানুসারে প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে গৌরচন্দ্র মাতার ইচ্ছায় শ্রীহট্টে গমন করেছিলেন। সম্ভবতঃ অসমীয়া গ্রন্থে এই ঘটনারই উল্লেখ আছে।

রূপ-সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন-কাহিনী বর্ণনায় কবিরাজ কতকটা মুরারিকে অনুসরণ করলেও, তাঁর স্বতন্ত্রতা আছে। মুরারি বলেন শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আগমন করলে সনাতন অনুজকে নিয়ে প্রভুর দর্শনে এসে দন্তে তৃণ ধারণ করে নিজের পাপ স্বীকার করলে প্রভু তাঁর মস্তকে চরণ স্থাপন করে বলেছিলেন,—

বৃন্দাবনবন নিবাসী ত্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
মথুরাং গন্তুমিচ্ছামি ত্বয়া সার্ধং যথাসুখম্।
লুপ্ততীর্থস্য প্রকট্যং তথা বৃন্দাবনস্য চ ॥
কর্তুমর্হসি তৎ সর্বং মৎকৃপাতো ভবিষ্যতি ॥[1]

—তুমি সত্যই বৃন্দাবনবাসী হবে, এতে সংশয় নেই। আমি তোমার সঙ্গে সুখে মথুরাগমনের ইচ্ছা করি। লুপ্ততীর্থের এবং বৃন্দাবনের প্রকাশ তুমি করবে এবং আমার কৃপায় সম্ভব হবে।

সনাতন তখন মহাপ্রভুকে বলেছিলেন, বহুজন সমাবৃত হয়ে নির্জন বৃন্দাবনে গেলে কি সুখ হবে?—নির্জনং জনাঢ্যৈশ্চ গত্বা কিং স্যাৎ সুখায় চ।[2] সনাতন প্রার্থনা করলেন মহাপ্রভুর কৃপা,—যে কৃপাবলে রাজামাত্যের দৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্ন হয়ে যাবে। মহাপ্রভু হেসে 'কৃষ্ণ তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন' বলে চলে এলেন কানাই-এর নাটশালায়। তিনি ভাবলেন সনাতন ঠিকই বলেছেন, এত লোক নিয়ে বৃন্দাবন গেলে নিত্য দুঃখ ভোগ করতে হবে, সুতরাং সঙ্গী ছেড়ে একাই যাব, এখন দক্ষিণে যাত্রা করি—

লোকসংঘৈর্গতে নিত্যং দুঃখমেব ন সংশয়ঃ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি দক্ষিণং চাধুনা ব্রজে।[3]

কানাই-এর নাটশালা থেকে প্রভাতে উঠে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সহ অদ্বৈতগৃহে গমন করলেন। সেখানে মাকে আনিয়ে মায়ের হাতের রান্না খেয়ে ভক্তগণসহ কীর্তন করে পুরুষোত্তমে ফিরে গেলেন।

---

১ মু. ক.—৪।১৮।৬ ২ তদেব—৪।১৮।৯ ৩ তদেব—৪।১৮।১৪

মুরারির বিবরণে গৌড়রাজের প্রসঙ্গও নেই, কেশব খাঁর উল্লেখও নেই। এখানে সনাতনের পরামর্শে জনসংঘট্টের ভয়েই চৈতন্য মহাপ্রভু রামকেলি থেকে বৃন্দাবন মথুরা না গিয়ে ফিরে এসেছিলেন। রূপসনাতনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে মহাপ্রভু গৌড়-রামকেলিতে এসেছিলেন, মুরারির কথায় তা স্পষ্ট। তবে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের কৌতূহল ও উদার সহিষ্ণুতার কথা ব্যক্ত করেছেন, তা ঐতিহাসিক সত্য হওয়াই সম্ভব।

চতুর্দশ অধ্যায়

বৃন্দাবন পরিক্রমা

কবিকর্ণপূরের নাটক অনুসারে চৈতন্যদেব গৌড়দেশ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে লোক সমাগম ভয়ে একাকী বনপথে মথুরার পথে যাত্রা করেছিলেন।[১] মহাকাব্যেও তিনি বলেছেন যে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে ভক্তগণকে বিরহাতুর করে কালিন্দীতীরে গমন করেন।[২] বৃন্দাবন দাস সূত্রাকারে মহাপ্রভুর মথুরাগমনের উল্লেখমাত্র করেছেন—

বারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায় ॥

*　　　*　　　*

শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার ॥[৩]

কৃষ্ণদাস বলেছেন যে মহাপ্রভু গৌড় গমনের পথে শান্তিপুরে মাতার নিকট থেকে বৃন্দাবন গমনের অনুমতি নিয়েছিলেন। কানাইর নাটশালায় এসে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, একাকী যাবেন বৃন্দাবন, বহুজন সঙ্গে নিয়ে নয়।

বৃন্দাবন যাব কাঁহা একাকী হইয়া।
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ॥[৪]

নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পরে গদাধর পণ্ডিত ও অন্যান্য ভক্তদের অনুরোধে প্রভু চার মাস অতিবাহিত করেন—সবার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা।[৫] চার মাস পরে শরৎকালে রামানন্দ স্বরূপের সঙ্গে যুক্তি করে, রামানন্দ ও স্বরূপের ইচ্ছানুসারে বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে নিয়ে একদিন রাত্রিশেষে লুকিয়ে বনপথ দিয়ে মহাপ্রভু মথুরা বৃন্দাবন যাত্রা করলেন। ঈশান নাগরের মতে অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ বৃন্দাবনযাত্রায় মহাপ্রভুর সঙ্গী হয়েছিলেন। এ তথ্য অন্য কোন স্থান থেকে সমর্থিত হয় না। কবিরাজ বলেন, বৃন্দাবন গমনপথে বনমধ্যে ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নাচতে থাকে।

---

১ চৈ. চন্দ্র না. ৯ অংক　　২ চৈ চ মহা—২০।৩৫　　৩ চৈ ভা. আদি ১ অঃ

৪ চৈ চ. মধ্য. ১৬ পরি　　৫ চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি

জয়ানন্দও কেবলমাত্র মথুরা যাত্রার উল্লেখ করেছেন- পুনরপি মথুরা চলিল গৌরচন্দ্র।[১] লোচন ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমনের কথা বলেছেন—ঝারিখণ্ড পথে প্রভু চলিলা সত্বর।[২] ঈশান নাগর বললেন—

কত দিন পরে শ্রীমান্ গৌর 'বশম্ভব ।।
বৃন্দাবন যাইতে দৃঢ় করিয়া অন্তর ।
একদিন গূঢ়ভাবে রজনীর শেষে।
ব্রজধামে চলে গোরা মহাভাবাবেশে ।
সুপ্রশস্ত পথ ছাড়ি উপপথে যায় ।
ঝারিখণ্ডের পথে চলে লোকের বিস্ময় ।[৩]

মুরারি বলেন, গৌড় থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে গৌরহরি নীলাচলবাসী সার্বভৌম, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ও গৌড়াগত কাশীশ্বর রাম, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর, রাঘব, বাসুদেব, শঙ্কর, হরিদাস, গৌরীদাস, শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন প্রভৃতি ভক্তগণ সহ কীর্তনে নর্তনে কালযাপন করেছিলেন। একদিন নৃত্যাবসানে তিনি ভক্তগণের কাছে বৃন্দাবন যাত্রার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন—বৃন্দাবনং রম্যমতীব দুর্লভং গচ্ছামি যুষ্মদ্ভবতাং কৃপা ভবেৎ।[৪] সঙ্গীদের আলিঙ্গন করে সত্বর প্রত্যাগমনের আশ্বাস দিয়ে উৎকণ্ঠাবশতঃ মত্তসিংহের মত ধাবমান মহাপ্রভু চললেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে। মুরারির বিবরণে তিনি গোপনে পুরী ত্যাগ করেন নি, বয়স্ক বলদেব প্রভৃতি সঙ্গিগণ প্রভুর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন—সঙ্গিনো বলদেবাদ্যা ধাবন্তি তমনুব্রতাঃ। মুরারির রচনায় যদি প্রক্ষেপ না থাকে, তাহলে মুরারির কথাই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু গৌড়ের অভিজ্ঞতা থেকে লোকের ভিড় এড়িয়ে একাকী যাত্রা করার ব্যাপারটাও অবিশ্বাস্য নয়। পথে চলেছেন যখন শ্রীচৈতন্য তখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। পথিপার্শ্বে নদী পর্বত অরণ্য দেখে যমুনা গোবর্ধন বৃন্দারণ্য ভাবছেন তিনি। তাঁর এই সময়ের বৃন্দাবনযাত্রার বিবরণ :—

মত্ত হুঙ্কার নির্ঘোষো মত্তদ্বিরদবিক্রমঃ।
নৃত্যতি ধাবতি রৌতি ক্ষিতৌ বিলুণ্ঠতি কচিৎ।[৫]

---

১ চৈ. ম. উত্তর—১০৯ ২ চৈ. ম. শেষখণ্ড ৩ অ. প্র. ১৫ অঃ—পৃঃ ১৮৪

৪ চ. ক.—৪।১।৬ ৫ মু. ক.—৪।১।১৩

—মত্ত হুঙ্কারের গর্জন সহ মত্ত হস্তীর বিক্রমে প্রভু কখনও নৃত্য করছেন, কখনও ধাবিত হচ্ছেন, কখনও কাঁদছেন, কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন।

এইভাবে মহাপ্রভু ক্রমে কাশীতে উপনীত হলেন, তিনি বিশ্বেশ্বর দর্শন করে আনন্দে বিহ্বল হলেন। কাশীতে তপন নামে কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাঁকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে নিয়ে ভিক্ষায় গ্রহণ করালেন। মহাপ্রভু তপনের পুত্র রঘুনাথের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। অতঃপর চন্দ্রশেখর নামক বৈদ্যের গৃহে অবস্থান করে তিনি হরিভক্তি বিতরণ করেছিলেন। তারপর প্রয়াগে উপস্থিত হয়ে মাধব ও অক্ষয়বট দর্শন করে ত্রিবেণীতে স্নান করে যমুনায় নিমজ্জিত হয়ে প্রভু অগ্রসর হলেন। যমুনা পার হয়ে অরণ্যপথে রেণুকা নামে গ্রাম ও রাজগ্রাম অতিক্রম করে গোকুল দর্শন করে তিনি উপনীত হলেন মথুরায়।[1]

লোচন বলেছেন, ঝারিখণ্ডপথে অগ্রসর হয়ে প্রভু উপস্থিত হয়েছিলেন বারাণসী। কাশীতে বিশ্বনাথ, প্রয়াগে মাধব ও অক্ষয়বট দর্শনান্তে ত্রিবেণীতে স্নান করে আগ্রার নিকটে যমুনা পার হয়ে পরশুরামের আবির্ভাবস্থান রেণুকা গ্রাম অতিক্রম করে প্রভু রাজগ্রামের অপর পারে গোকুল দর্শন করলেন। মথুরায় আগমন করে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাত্রিযাপন করার পর প্রভু পরদিন কৃষ্ণদাসের সহায়তায় মথুরামণ্ডল পরিদর্শন করেন।[2] অদ্বৈত-প্রকাশকারও ঝারখণ্ডের পথে কাশীতে উত্তরণের কথা বলেছেন। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান, তপনমিশ্রের গৃহে অবস্থান, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও আদি কেশব বিগ্রহ দর্শন, প্রয়াগে মাধব দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন ঈশান নাগর। ঈশান একটি নূতন সংবাদও দিয়েছেন: প্রয়াগে যমুনা দেখে শ্রীচৈতন্য যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এবং সারাদিন জলমগ্ন থাকার পর সায়ংকালে ভেসে উঠলে কৈবর্তরা তাঁকে নৌকায় তুলে নিয়েছিল। তারপর ধ্রুবঘাটে স্নান করে তিনি বৃন্দাবন গমন করেছিলেন।[3]

কবিরাজ গোস্বামীর মতে কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে আতিথ্য এবং চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে ভিক্ষায় গ্রহণ করে দশদিন মহাপ্রভু কাশীতে অবস্থান করেছিলেন। রামানন্দ ও স্বরূপ পুরী থেকে প্রভুর সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছানুসারে নিবৃত্ত হয়ে তাঁরই অনুমতিক্রমে বলভদ্র ভট্টাচার্যকে

---

১ মু. ক.—৪।২ ২ চৈ. ম. শেষখণ্ড ৩ অ. প্র.—পৃঃ ১৮৭-৮৮

সঙ্গে গিয়েছিলেন। পথে ভিল জাতিকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। কাশীর পরে তিনদিন প্রয়াগে অবস্থান করে মথুরায় ও পরে বৃন্দাবনে উপনীত হন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্য চরিতামৃত, অদ্বৈতপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণে মথুরা বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর প্রেমবিহ্বলতা বর্ণিত হয়েছে। কবিরাজ বলেছেন যে যমুনা-দর্শন মাত্রেই প্রভু যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছেন এবং যমুনার চব্বিশ ঘাটে তিনি স্নান করেছিলেন। মথুরা বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদনা সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দর্শনে।
লক্ষগুন প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে॥

*   *   *

প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্বাহ করেন অভ্যাসে॥[১]

বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ রাধাকুণ্ড উদ্ধার, গোবর্ধন দর্শন, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, কৃষ্ণলীলাস্থলগুলি সন্দর্শন প্রভৃতি সমাপনান্তে শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুর প্রত্যাগমনকালের দু-একটি কাহিনী শুনিয়েছেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য প্রভুকে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ফলে পথশ্রান্তিতে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করেছিলেন। এই সময়ে গোচারণকালে রাখাল বালকদের বংশীধ্বনি শুনে শ্রীচৈতন্য প্রেমাবিষ্ট হয়ে ভূতলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। তাঁর মুখ দিয়ে ফেণা নির্গত হতে থাকে। মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন প্রেমিক কৃষ্ণদাস এবং আরও তিন ব্যক্তি। এই সময় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল দশজন পাঠান ঘোড়সওয়ার।

পাঠান উদ্ধার

তারা ভাবলে, এই সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাইয়ে পাঁচজন ঠক তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করেছে। সুতরাং তাদের বেঁধে তারা হত্যা করত উদ্যত হোল। স্থানীয় মাথুর ব্রাহ্মন কৃষ্ণদাসের সমস্ত যুক্তিতর্ক ব্যর্থ হলো। এমন সময়ে প্রভু বাহ্যচেতনা লাভ করে হরি হরি বলে উর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। পাঠানরা তখন পাঁচজনের বন্ধন মোচন করে।

---

১ চৈ. চ. মধ্য ১৭ পরি

পাঠানগণ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করে মহাপ্রভুকে ধুতুরা খাইয়ে তাঁর সর্বস্ব লুঠ করার আশংকা তাঁর কাছে প্রকাশ করে। মহাপ্রভু তাদের আশংকা দূর করলেন।

প্রভু কহে ঠক নহে মোর সঙ্গীজন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥
মৃগীব্যাধিতে আমি হই অচেতন।
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন॥[১]

পাঠানদের মধ্যে কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত এক পীর শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের বিচারে পরাভূত হয়ে শ্রীচৈতন্যের শরণ গ্রহণ করে। প্রভু তাঁর নাম রাখেন রামদাস।[১] বিজুলি খান নামে আর একজন পাঠান রাজকুমার—যার ভৃত্য ছিল রামদাস প্রভৃতি—মহাপ্রভুর শরণ নিয়ে তীর্থে তীর্থে তাঁর মহিমা কীর্তন করে বেড়াতে থাকে।

বিজুলি খান

পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি॥
সেই বিজুলি খান হৈল মহাভাগবত।
সর্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব॥[২]

অন্য কোন চরিতগ্রন্থে এ কাহিনী স্থান পায় নি। সুতরাং এ কাহিনীর সত্যতা বিচারের অবকাশ নেই। প্রখ্যাত প্রাজ্ঞ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছেন যে বিজুলি খান সম্পর্কিত কাহিনীটি ঐতিহাসিক সত্য। তাঁর মতে বিজুলি খান্ কালিঞ্জর দুর্গের অধিপতি বিহার খান আফগানের পালিত পুত্র।[৩]

অতঃপর মহাপ্রভু সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করে গঙ্গার তীরে তীরে প্রয়াগে উপনীত হলেন। প্রয়াগে দশদিন অবস্থান করে মকর স্নান করে কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিয়ে প্রভু শ্রীক্ষেত্রের পথে রওনা দিলেন বলভদ্রের সঙ্গে। এদিকে শ্রীরূপ প্রবল বৈরাগ্যবশে ভ্রাতা অনুপম মল্লিক শ্রীবল্লভের সঙ্গে এসে প্রয়াগে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। ত্রিবেণীর নিকটে প্রভু বাসা নিয়েছিলেন। তাঁর বাসার নিকটেই দুই ভাই বাসস্থান নির্দিষ্ট করলেন। আড়াইল-গ্রাম

১ চৈ. চ. মধ্য ১৮ পরি ২ চৈ চ. মধ্য ১৮ পরি ৩ নানা চর্চা—পৃঃ ১১১-২৭

।নবাসী বৈদিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বল্লভ ভট্ট প্রভুকে স্বগৃহে নিয়ে এলেন ভিক্ষায় গ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যে। প্রভু প্রেমাবেশে যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন, ভক্তগণ তাঁকে নৌকায় তুললেন। প্রেমাবেশে প্রভু নৌকার উপরে নৃত্য করতে থাকায় নৌকা টলমল করতে থাকে। বল্লব ভট্ট মহাপ্রভুকে স্বগৃহে এনে সেবা-পূজা করতে লাগলেন। এই সময়ে বৈষ্ণবপণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় তাঁর স্বকৃত শ্লোকের দ্বারা মহাপ্রভুকে তুষ্ট করে তাঁর প্রেমালিঙ্গন লাভে ধন্য হয়েছিলেন। চতুর্দিক থেকে ভিক্ষা গ্রহণের আমন্ত্রণ আসতে থাকায় এবং বহু লোকের সমাগম হওয়ায় মহাপ্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপ গোস্বামীকে ভক্তিতত্ত্ব এবং ভক্তি-শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন।

লোকভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া।
রূপ গোসাঞি শিক্ষা করেন শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণভক্তি ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥[১]

শ্রীরূপ ও অনুপমকে বৃন্দাবন গমনের অনুমতি দিয়ে দশদিন প্রয়াগে অবস্থানের পর মহাপ্রভু উপনীত হলেন বারাণসীতে। বারাণসীতে চন্দ্রশেখর বৈদ্য প্রভুকে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। সংবাদ পেয়ে তপন মিশ্র এসে মিলিত হলেন এবং যে কয়দিন প্রভু বারাণসীতে অবস্থান করবেন সেই কয়দিন তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষায় গ্রহণের অঙ্গীকারাবদ্ধ করালেন প্রভুকে।

এদিকে রূপের সংসারত্যাগের পর সনাতনকে কারারুদ্ধ করেছিলেন গৌড়েশ্বর। রূপ গোস্বামীর পূর্বব্যবস্থা মত রূপের পত্র পেয়ে সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কারারক্ষী যবনের কাছ থেকে মুক্তি ক্রয় করে পথে এক লোভী ভুঁইঞাকে সাত মোহর দিয়ে তার সহায়তায় পার্বত্যপথ অতিক্রম করে সনাতন মিলিত হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে। প্রভুর ইচ্ছায় সনাতন মুণ্ডন করে কৌপীন পরিধান করলেন। সঙ্গের ভোট কম্বলটি পর্যন্ত ত্যাগ করে, মাধুকরী বৃত্তিতে করতে লাগলেন জীবনধারণ।

সনাতন মিলন

১ চৈ. চ. মধ্য ১৯ পরি

সনাতনের ব্যাকুলতায় প্রভু তাঁকে ভক্তিতত্ত্ব এবং ভগবৎলীলাতত্ত্ব উপদেশ দিলেন এবং আদেশ করলেন বৃন্দাবনে বাস করে ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র বা বৈষ্ণবীয় স্মৃতিশাস্ত্র রচনা ও প্রচার করতে। সনাতনের অনুরোধে প্রভু বৈষ্ণবীয় স্মৃতির সূত্রাকারে দিগ্‌দর্শন শ্রবণ করালেন। প্রভু সনাতনকে বললেন—

পূর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি-সঞ্চারে।
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরা লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার।।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তিস্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার।।[১]

দুই মাস বারাণসীতে অবস্থান করে সনাতনের শিক্ষা সমাপ্ত করলেন মহাপ্রভু। বারাণসীতেও বহুজনের সমাগম হতে থাকে। অনেকে প্রভুর সঙ্গে তর্কে জয়লাভ করতে চায়। প্রভু সকলকেই ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝালেন। এই সময়েই প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক প্রকাশানন্দকে প্রভু স্বমতে আনয়ন করেছিলেন। দুই মাস পরে শ্রীচৈতন্য অরণ্যপথে নীলাচলে উপনীত হলেন।

এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জনে বনপথে মহাসুখ পাইলা।।[২]

কিন্তু মুরারি ও লোচন প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন-মথুরা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে গৌড় মণ্ডলে এসেছিলেন। মুরারির বিবরণে গৌরচন্দ্র মথুরা বৃন্দাবন থেকে নীলাচলের পথে কুলিয়া গ্রামে উপনীত হয়েছিলেন। সেখানে নবদ্বীপ থেকে সমাগত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে নবদ্বীপে আগমন করে মাতৃভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিতে পতিত হয়ে মায়ের চরণ বন্দনা করেছিলেন এবং শচী দেবী পরিবেশিত চতুর্বিধ রসযুক্ত অন্ন নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ সহ ভোজন করে কীর্তনানন্দে নিমগ্ন হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছেও আগমন করে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এই প্রসংগে মুরারি লিখেছেন—

দ্বিতীয়বার গৌড় দেশে আগমন

১ চৈ. চ. মধ্য ২৩ পরি   ২ চৈ. চ. মধ্য ২৫ পরি

প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ সমীপমাসাদ্য নিজাংহি মূর্তিম্।
বিধায় তস্যাং স্থিত এব কৃষ্ণঃ সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম্।[১]

—প্রকাশরূপে নিজ প্রিয়ার নিকটে এসে নিজের মূর্তি বিধান করে সেই কৃষ্ণ (গৌরাঙ্গ) তাতে অবস্থান করলেন এবং সেই লক্ষ্মীরূপা বিষ্ণুপ্রিয়াও প্রভুকে সেবা করতে লাগলেন।

এই শ্লোকটির অর্থ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ মনে করেন যে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে আগমন করলে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর সেবা করেছিলেন। আবার কারো মতে মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজের মূর্তি গড়ে সেবা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মত কৃষ্ণপ্রেমপাগল সন্ন্যাসী যে স্বগৃহে এসে বিষ্ণু-প্রিয়ার সেবা গ্রহণ করবেন তা সম্ভব বোধ হয় না, বিশেষভাবে সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম যখন তিনি পালন করতেন। সন্ন্যাসের পূর্বেই বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁর বিরক্ত মনোভাবের বর্ণনা বৃন্দাবন করেছেন। সুতরাং মনে হয়, নবদ্বীপ আগমন করে ভক্তিমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দানের জন্যই মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে এত বড় একটা ঘটনার উল্লেখ নেই কেন?

অদ্বৈতপ্রকাশে জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে শচীমাতার সংবাদ নিয়ে এসে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে মহাপ্রভুকে বলছেন,—

তব রূপসাম্যে চিত্রপট নির্মাইলা।
প্রেম ভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা॥
সেই মূর্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।[২]

অদ্বৈতপ্রকাশকার মহাপ্রভুর মূর্তি গড়িয়ে পূজা করার কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, চিত্রপট নির্মাণ করিয়ে পূজা করার কথা। অদ্বৈতপ্রকাশকার এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলেছেন: জগদানন্দের মুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ প্রভু আর শুনতে চাইলেন না।

মহাপ্রভু কহে আর না কহ বাত।
শান্তিপুরে আচার্যের কহ সুসংবাদ।[৩]

এইরূপ আচরণই মহাপ্রভুর পক্ষে স্বাভাবিক বোধ হয়। প্রেমদাস মিশ্র রচিত

১ মু. ক.—৪।১৪৮ ২ অঃ প্রঃ ২১ অঃ—পৃঃ ৫৭ ৩ অ. প্র. ২১ অঃ—পৃঃ ২৫৭

বংশীশিক্ষা গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পরে বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বংশীবদন চট্ট যুগপৎ স্বপ্ন দেখেন যে মহাপ্রভু তাঁদের জগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গনে অবস্থিত নিম-গাছটি কাটিয়ে সেই নিম গাছে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ করিয়ে পূজা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

তবে প্রভু স্বপ্নযোগে কন দুইজনে।
মিছে কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে॥
আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্ব তলায় মাতা দিল মোরে স্তন॥
সেই নিম্ব বৃক্ষে মোর মূর্তি নির্মাইয়া।
সেবন করহ তার আনন্দিত হৈয়া॥[১]

তদনুসারে বংশীবদন কামার ডাকিয়ে নিমগাছ কাটিয়ে শ্রীচৈতন্যের দারু বিগ্রহ নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং সেই বিগ্রহের পশ্চাতে পাদদেশে নিজ নাম লিখে দিয়েছিলেন—লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিলা লিখনে।[২] বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেছিলেন। বর্তমানে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর মন্দিরে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিষ্ঠিত বলে যে দারুময় বিগ্রহ পূজিত হয়, তার পশ্চাতে বংশী-বদনের নাম উৎকীর্ণ আছে।[৩] শ্রীচৈতন্য যদি বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্ববিগ্রহ পূজার অনুমতি দিয়ে থাকেন বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে, তবে তাঁর অপ্রকটের পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষা করলেন কেন, তা বোঝা যায় না। মুরারি কথিত শ্লোকটি যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহলে মনে করতে হবে যে বংশীশিক্ষার বিবরণ কাল্পনিক। মহাপ্রভুর প্রকটকালেই বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য এই বিগ্রহ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীবাসাদি নবদ্বীপস্থ ভক্তগণের গৃহে কীর্তন নৃত্য করে অম্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে গমন করেন নিত্যানন্দের সমভি-ব্যাহারে। গৌরীদাসকে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ তাঁদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছিলেন।

তস্য প্রেম্না নিবদ্ধৌ তৌ প্রকাশ্য রুচিরাং শুভাম্।
মূর্তিং স্বাং স্বাং রসৈঃ পূর্ণাং সর্বশক্তিসমন্বিতাম্॥
দদতঃ পরম প্রীতৌ নিবসন্তৌ যথাসুখম॥[৪]

১ শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা—৪র্থ উঃ, পৃঃ ১৩১ ২ শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা—৪র্থ উঃ, পৃঃ ১৩১
৩ মহাপ্রভু বিগ্রহের সেবাইত অধ্যাপক চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামীর নিকট শ্রুত ৪ মু. ক.—৪।৬।১৩ ১৪

—তাঁর (গৌরীদাসের) প্রেমে নিবদ্ধ তাঁরা দুজন (গৌর ও নিতাই) সেখানে সুখে অবস্থান করে নিজ নিজ ভাবে পূর্ণ সর্বশক্তি সমন্বিত সুন্দর মঙ্গলময় মূর্তি প্রকাশ করেছিলেন (মূর্তি নির্মাণে অনুমতি দিয়েছিলেন)।

নিত্যানন্দ দাসের বিবরণে গৌর নিতাই-এর বিগ্রহ গৌরীদাস নির্মাণ করে-ছিলেন মহাপ্রভু গৌরীদাসের গৃহে আগমনের পূর্বেই। উভয়েই এই বিগ্রহ দর্শন করে অনুমোদন করেছিলেন।

শুনিয়া ত দুই প্রভু পণ্ডিতের স্থানে।
ডাকিয়া কহিল কিছু শুন বিবরণে॥
শুনিলাম দুই মূর্তি করিয়াছ প্রকাশন।
সাক্ষাতে আনহ তাঁরে করিব দর্শন॥
আনিয়া বিগ্রহ দুই সম্মুখে রাখিল।
যেই মত দুই প্রভু তেমত দেখিল॥[১]

নরহরি চক্রবর্তী বলেন, মহাপ্রভু গৌরীদাসকে নবদ্বীপ থেকে নিমগাছ আনিয়ে সেই গাছে গৌর নিতাই-এর বিগ্রহ নির্মাণ করতে অনুমতি দিয়ে-ছিলেন।

পণ্ডিতের মন জানি প্রভু গৌরহরি।
একদিন পণ্ডিতে কহয়ে যত্ন করি॥
নবদ্বীপ হৈতে নিম্ব বৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্মাণ করিবে॥
অনায়াসে নির্মাণ হইব মূর্তিদ্বয়।
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয়॥
শুনিয়া পণ্ডিত অতি উল্লসিত হৈলা।
যত্নে দারু বিগ্রহ নির্মাণ করাইলা॥[২]

অম্বিকা-কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ বিগ্রহ অদ্যাপি পূজিত হচ্ছেন। গৌরীদাসকে মহাপ্রভু যদি স্ববিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়াকেও তিনি অনুমতি দিয়ে থাকতে পারেন।

গৌরীদাসের গৃহ থেকে চৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে ভক্ত-

---

১ প্রে. বি. ১২ বি.—পৃঃ ৮৩ ২ ভ. র.—৮।৩৪৬-৪৯

বর্গ সহ উপস্থিত হয়েছিলেন। অদ্বৈত যথারীতি নবদ্বীপ থেকে আনালেন শচীমাতাকে। শচীমাতা ও অন্যান্য বৈষ্ণব পত্নীদের দ্বারা পাচিত অন্নাদি সুখে ভোজন করে হরিসংকীর্তন সহ নৃত্যে কয়েকদিন কাটিয়ে মাতা ও ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রভু নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।[১] ঠাকুর লোচন দাস যদিও একবার মাত্র মহাপ্রভুর গৌড়মণ্ডলে আগমনের উল্লেখ করেছেন, তথাপি সেই একবারই মথুরা-বৃন্দাবন থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে। লোচন বলেন, মহাপ্রভু রাঢ় দেশ দিয়ে ক্রমে ক্রমে উত্তরিত হলেন কুলিয়া নগরে, উদ্দেশ্য জন্মভূমি দর্শন।

জন্মভূমি দেখিব এ সন্ন্যাসীর ধর্ম।
নবদ্বীপ নিকটে গেলা এই তার মর্ম॥[২]

নবদ্বীপের লোক দলে দলে এলেন কুলিয়ানগরে প্রিয় নিমাইকে দেখতে, ছুটে এলেন শচীমাতাও।

বিহ্বল চেতন শচী ধায় উর্ধ্বমুখে।
এ ভূমি আকাশ যাব ভু'রয়াছে শোকে॥[৩]

শচীমাতা প্রিয়পুত্রকে নবদ্বীপে আসতে আহ্বান করলেন, নিমাইও মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে নবদ্বীপে আগমন করলেন, ভিক্ষা আচরণ করলেন নিজের বাড়ীর নিকটে বারকোণা ঘাটের কাছে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে। নবদ্বীপে রাত্রি যাপন করে প্রভাতে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রভু যাত্রা করলেন জগন্নাথ ক্ষেত্রের অভিমুখে। শান্তিনগর অতিক্রম করে তাম্রলিপ্ত দিয়ে তিনি শ্রীক্ষেত্রে পৌছালেন। লোচন বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের কোন বিবরণ দেন নি।

জয়ানন্দ মহাপ্রভুর দুবার গৌড়দেশে আগমন বর্ণনা করেছেন: একবার সেতুবন্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জননী জন্মভূমি দর্শনমানসে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ আগমন[৪], আর একবার গৌড়ে আগমনকালে কুলিয়া থেকে গৌড় এবং গৌড় থেকে শান্তিপুরে আগমন। শচীমাতার সঙ্গে নিমাই-এর সাক্ষাৎকার হয়েছিল দুবারই—একবার নবদ্বীপে, দ্বিতীয়বার শান্তিপুরে অদ্বৈতমন্দিরে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে একবারও সাক্ষাতের কথা বলেন নি জয়ানন্দ।

---

১ মু. ক.—৪।৫ ২ চৈ. ম. শেষখণ্ড—পৃঃ ২০৯ ৩ চৈ ম. শেষখণ্ড—পৃঃ ২০৯
৪ জ. চৈ. ম. উত্তর—৭৭-৭৮

কেবলমাত্র তিনি বলেছেন, গৌড়গমনকালে যখন চৈতন্যদেব কুলিয়ায় এসেছিলেন, সেইসময় বহু লোকের সঙ্গে শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে গঙ্গাপার হতে সচেষ্ট হলে ওপার থেকেই চৈতন্যচন্দ্র মাকে নিষেধ করেছিলেন।

আবার উত্তরখণ্ডে জয়ানন্দ বলেছেন—

জগন্নাথের আজ্ঞা মনে আনন্দ বিশেষ।
মথুরা জাইতে প্রবেশিলা গৌড়দেশ ॥
নিভৃতে রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি ঘরে।
সর্বলোক দেখিলেক কুলিয়া নগরে ॥[১]

জয়ানন্দের কাব্যে মোট তিনবার গৌড়-নবদ্বীপ-কুলিয়া আগমনের উল্লেখ পাচ্ছি। অথচ মহাপ্রভু তিনবার এসেছিলেন বঙ্গদেশে কিম্বা দুবার এসেছিলেন, তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তৃতীয় বারের গৌড় আগমন প্রথম দুইবারের উল্লেখের যে-কোন একটির পুনরাবৃত্তি হতেও পারে।

মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন ১৫১৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে।[২]

প্রকাশানন্দ উদ্ধার

মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্রভাবে কাশীর প্রখ্যাত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের ভক্তিধর্মগ্রহণের বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত কাব্যে বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। তিনি এই কাহিনী দুবার উল্লেখ করেছেন: একবার সংক্ষেপে আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে, আর একবার সবিস্তারে মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে। আদিলীলায় কবিরাজ বলেছেন, বৃন্দাবন যাত্রাপথে শ্রীচৈতন্য যখন কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করেন, সেই সময় কাশীতে অবস্থানকারী মায়াবাদী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় মূর্খ বেদান্তজ্ঞানহীন সন্ন্যাসীর ধর্ম বিসর্জন করে কীর্তন-নর্তনকারী মহাপ্রভুর আচরণের নিন্দা করেছিলেন। মহাপ্রভু এই নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করে হেসে মথুরা-বৃন্দাবন চলে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে যখন তিনি কাশীতে দু'মাস অবস্থান করে সনাতনকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই সময়ে চন্দ্রশেখর বৈদ্য ও তপন মিশ্র

১ জ. চৈ. ম. উত্তর—৭৭-৭৮ ২ চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ২৮০

প্রভুর নিন্দাবাদ সহ্য করতে না পেয়ে প্রভুকে এর প্রতিকার করতে অনুরোধ করেন। সেই সময়ে এক বিপ্র সন্ন্যাসীর দলকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি মহাপ্রভুকে সানুনয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। প্রভু বিপ্রের গৃহে আগমন করলে যদিও প্রকাশানন্দ ও তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে সম্মান করেছিলেন, তথাপি প্রভু সকলের থেকে দূরে অপবিত্রস্থানে বসলেন এবং প্রকাশানন্দকে বললেন, হীন সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই তিনি সন্ন্যাসী সভায় বসেন নি। প্রকাশানন্দ সমাদরে প্রভুকে সন্ন্যাসীসভায় বসিয়ে বললেন—

সন্ন্যাসী হঞা কর নর্তন গায়ন।
ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্তন॥
বেদান্ত-পঠন প্রধান সন্ন্যাসীর ধর্ম।
তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম॥[১]

প্রভু উত্তরে বললেন, গুরু আমাকে মূর্খ দেখে বলেছিলেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নেই, তুমি কৃষ্ণনাম জপ কর—

কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম॥[২]

গুরুর আজ্ঞায় কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে প্রভুর প্রেমোন্মাদের অবস্থা হয়, তখন তিনি গুরুকে এই তথ্য নিবেদন করলে গুরু বললেন,—

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তারে কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥[৩]

অতঃপর মহাপ্রভু উপনিষৎ-তত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেমের অনুকূলে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করলেন। সেই ব্যাখ্যা শুনে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মন ফিরে গেল, তারা প্রভুর কাছে অপরাধ স্বীকার করে কৃষ্ণনাম জপ করতে থাকে।

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥[৪]

১-৪ চৈ. চ. আদি ৭ পরি.

চৈতন্ত চরিতামৃতের মধ্যলীলায় সপ্তদশ ও পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে এই ঘটনার পুনরুক্তি আছে। প্রকাশানন্দ কাশীতে আগত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের মহিমার কথা শুনে উপহাস করে বলেছিলেন—

শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবক।
কেশব ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তার ভাবকগণ লইয়া।
দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া॥
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥[১]

প্রভু এই সংবাদ শুনে ঈষৎ হেসেছিলেন মাত্র। তৎপরে বৃন্দাবন-মথুরা থেকে ফিরে আসার পর শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে প্রকাশানন্দের সাক্ষাৎকার ও উপনিষদের তত্ত্ব আলোচনা বর্ণনা করেছেন কবিরাজ গোস্বামী। এই সময়ে সনাতনকে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু দুই মাস কাশীতে অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভুকে দর্শন করতে বহু লোকের সংঘট্ট হয়েছিল। বারাণসী নিবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের গৃহে আমন্ত্রিত সন্ন্যাসীসভায় প্রকাশানন্দের এক শিষ্য শ্রীচৈতন্তকে নারায়ণ বলে তাঁ'র ব্যাখ্যাত উপনিষদতত্ত্বের ও হরের্নাম ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রশংসা করেন। প্রকাশানন্দ প্রভুর মতকে ভ্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহাপ্রভু যখন বিন্দুমাধব দর্শন করে মন্দির প্রাঙ্গনে কীর্তন-নৃত্য করছিলেন, সেই সময়ে শিষ্যসহ প্রকাশানন্দ কৌতূহলবশে প্রভুকে দর্শন করতে আসেন। তিনি সাত্ত্বিক ভাবসহ কৃষ্ণ-প্রেমৈকবিগ্রহ শ্রীচৈতন্তকে দেখে মুগ্ধ হলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান লাভ করে প্রকাশানন্দের চরণ ধারণ করলেন, প্রকাশানন্দও প্রভুর চরণ বন্দনা করলেন। প্রকাশানন্দের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহাপ্রভু উপনিষৎ-তত্ত্ব ও মায়াবাদ ব্যাখ্যা করলেন এবং ভাগবতের আত্মা-রামাশ্চ ইত্যাদি শ্লোকটির একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করে শ্রীকৃষ্ণই পরমপ্রভু এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন।

শুনিয়া লোকের বড় চমক হৈল।
চৈতন্ত গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্ধারিল॥[২]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ১৭ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ২৫ পরি

অতঃপর হরিনাম সংকীর্তনে কাশীকে মাতিয়ে মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রা মনস্থ করেছিলেন।

চৈতন্য চরিতামৃতে প্রকাশানন্দ উদ্ধারের দুটি কাহিনীতে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া অন্য কোন চরিত-কার প্রকাশানন্দ উদ্ধার কাহিনীর বিবরণ দেন নি। চৈতন্য প্রবর্তিত মতে অবি-শ্বাসী পাষণ্ড সন্ন্যাসীদের অবস্থানের উল্লেখ লোচন জয়ানন্দ প্রভৃতি করেছেন। কিন্তু প্রকাশানন্দের নাম বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছাড়া আর কেউ উল্লেখ করেন নি। বৃন্দাবনের চৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভু নবদ্বীপ লীলায় ভাবা-বেশে মুরারিকে বলেছিলেন—

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পঢ়ায়ে বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে॥[১]

মুরারির কড়চায় কাশীবাসী ব্যক্তিদের শ্রীচৈতন্য কর্তৃক হরিভক্তি প্রদানের উল্লেখ থাকলেও প্রকাশানন্দের উল্লেখ নেই।[২] বৃন্দাবনের বক্তব্যেও প্রকাশানন্দকে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক স্বমতে আনয়নের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কবিকর্ণপূর বলেছেন কাশীর অনেক ব্রতপরায়ণ যাজ্ঞিক শ্রীচৈতন্যের শরণ নিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু সংখ্যক মাৎসর্য পরায়ণ সন্ন্যাসী তাঁর কাছে আসেন নি, তাঁকে দেখেনও নি।[৩] বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর লেখক জ্ঞানানন্দের শিষ্য প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্যের সমকালে বর্তমান ছিলেন। এই প্রকাশানন্দ কৃষ্ণদাস কথিত প্রকাশানন্দ কিনা বলা কঠিন। স্বাভাবিক ভাবেই ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার প্রকাশানন্দ উদ্ধার কাহিনীর সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন।[৪] কিন্তু বৃন্দাবন যাত্রার কাহিনী গৌড়ীয় চরিতকারগণ বিশদ ভাবে কেউই বর্ণনা করেননি,—অন্ত্যলীলাই কবি-রাজ গোস্বামী ছাড়া কেউ বিশদভাবে বলেন নি। কবিরাজ গোস্বামীর পক্ষে বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দের মুখে এই সকল ঘটনার বিবরণ জানা ও লিপিবদ্ধ করা সহজ তাই ঘটনাটি একেবারে অলীক নাও হতে পারে।

---

১ চৈ. ভা. মধ্য ২০ অঃ   ২ মু. ক.—৪।১।১৮, ৪।১৩।২০   ৩ চৈ. চন্দ্র. না.—১।৩২

৪ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান. ২য় সং—পৃঃ ৬৩০-৩২

পঞ্চদশ অধ্যায়

অন্ত্যলীলা

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ২৪ বৎসর বয়সে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবৎকালের অবশিষ্ট ২৪ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর কেটেছে পূর্বে উত্তরে দক্ষিণে যাতায়াতে।

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥[১]

অবশিষ্ট আঠার বৎসর তিনি পুরীতেই যাপন করেছেন, আর কোথাও যান নি।

বৃন্দাবন হইতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বৎসর তাঁহা বাস কাঁহা নাহি গেলা ॥[২]

মহাপ্রভুর প্রকটকালের শেষ আঠারো বৎসরের ঘটনাবলীর বিবরণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া অন্য কোথাও সুলভ নয়। প্রতাপরুদ্র উদ্ধারের পর মুরারির কড়চায় শ্রীচৈতন্যের প্রকটকালের আরও কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। গৌড়দেশ থেকে ভক্তগণ ও বৈষ্ণব পত্নীদের পুরীতে আগমন, মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ নরেন্দ্র সরোবরে জলক্রীড়া, গুণ্ডিচায় মহাপ্রভু কর্তৃক জগন্নাথের স্নানযাত্রা, হোরা পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর বিজয়োৎসব দর্শন, নিত্যানন্দকে হরিনাম প্রচারের জন্য গৌড়দেশে প্রেরণ, নিত্যানন্দের শচী সমীপে নবদ্বীপে আগমন এবং মহাপ্রভুর রাধাভাবতন্ময়তা মুরারির কড়চায় স্থান পেয়েছে। মহাপ্রভুর রাধাভাব বিহ্বলতার বর্ণনা দিয়েই মুরারি তাঁর বিবরণ শেষ করেছেন। শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার বিবরণ একমাত্র কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতেই পাওয়া যায়। কবিরাজের গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য ঘটনা: শ্রীক্ষেত্রে আগমনের পথে অনুপমের মৃত্যু, শ্রীরূপের নীলাচলে আগমন, রূপগোস্বামী কর্তৃক বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামক কৃষ্ণলীলাবিষয়ক দুটি নাটক রচনা, প্রভু কর্তৃক রূপকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ও লুপ্ততীর্থের উদ্ধারে নির্দেশদান, শিবানন্দ সেনের নীলাচলে আগমন, মাধবী দাসীর নিকট থেকে ভিক্ষা গ্রহণের অপরাধে ভক্ত ছোট হরিদাসকে বর্জন, ছোট হরিদাসের দেহত্যাগ, প্রভু কর্তৃক প্রতি বৎসর দামোদর

১-২ চৈ. চ. মধ্য ১ পরি

পণ্ডিতকে নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট প্রেরণ, সনাতনের নীলাচলে আগমন ও মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে চর্মরোগমুক্তি, রঘুনাথ দাসের নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে মিলন, বল্লভ ভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন, রাজার অর্থ আত্মসাতের দায়ে দণ্ডিত রামানন্দভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়কের প্রভুর কৃপায় মুক্তি, যবন হরিদাসের দেহত্যাগ ও মহাপ্রভুর দ্বারা তাঁর সৎক্রিয়া, গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে পরমানন্দ সেনের শ্রীচৈতন্যদর্শন, মহাপ্রভু কর্তৃক জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে শচীদেবীর নিকট প্রেরণ, প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের গীত শ্রবণে আনন্দ প্রভৃতি।

মহাপ্রভু যে একাদিক্রমে শেষ আঠারো বৎসর নীলাচলে অতিবাহিত করেছিলেন তন্মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণসহ কীর্তন-নৃত্যরঙ্গে যাপন করেছিলেন অবশিষ্ট বারো বৎসর তিনি কৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছেন।

শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে ॥[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও বলেছেন—

ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি দিনে ॥[২]

শেষ দ্বাদশ বৎসর সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামীর আরও বিবরণ :

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে ॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্তসব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥

---

১ চৈ. চ. মধ্য ১ পার ২ তদেব

গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।
ভিতে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কবাট কভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে প্রভু সিন্ধুনীরে॥[১]

এই সময়ে একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন, সেই সময়ে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী--মনে হয় বুঝি অস্থি গ্রন্থি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

প্রভু পড়ি আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
এক এক হস্ত-পাদ— দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্ত, পাদ, গ্রীবা, কটি, অস্থি, সন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হঞাছে তত॥
চর্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ॥[২]

কোন দিন চটকপর্বত দেখে গোবর্ধন জ্ঞানে বায়ুবেগে চলে প্রভু সমুদ্রতীরে এসে পতিত হলেন, সাত্ত্বিকভাব সমূহ মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গে—

প্রথমে চলিল প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাবে পথে হৈল চলিতে নাহি শক্তি॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর করে নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র করি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গাযমুনা ধার॥

১ চৈ. চ. মধ্য ২ পরি   ২ চৈ. চ. অন্ত্য. ১৪ পরি

বৈবর্ণ্য শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।[১]

কখনও-বা মহাপ্রভু রামানন্দ ও স্বরূপের গলা ধরে কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করতে থাকেন। কখনও তিনি গান করেন, নৃত্য করেন, কখনও এদিক ওদিক ছুটতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মূর্ছিত হন।

কভু প্রেমাবেশে করে গান নর্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ॥
কভু প্রেমোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্ছা কভু গড়ি যায়॥[২]

একদিন তো প্রভু যমুনাভ্রমে সমুদ্রেই ঝাঁপ দিলেন, শেষ পর্যন্ত জেলের জালে তাঁকে পাওয়া গেল।

এইভাবে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভুর অতিবাহিত হয় দ্বাদশ বৎসর। তবে সব সময়েই যে তিনি বাহ্যজ্ঞান-হারা হয়ে থাকতেন, তা নয়। যখন বাহ্যজ্ঞান থাকতো তখন তিনি ভক্তদের সঙ্গে আলাপ, নবদ্বীপের তথা শচীমাতার সংবাদগ্রহণ ইত্যাদিতেও কালযাপন করেছেন।

কেউ কেউ মনে করেন যে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা কৃষ্ণপ্রেমের উত্তেজনা জনিত বায়ুরোগ বা উন্মাদ রোগের প্রকাশ। মহাপ্রভুর জীবনীকাররা অনেকেই তাঁর বায়ুরোগ বা মৃগীরোগের কথা বলেছেন। কিন্তু ভক্তরা এই রোগকে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার বলে গ্রহণ করেছিলেন। নীলাচলে জগদানন্দ মহাপ্রভুর বায়ুরোগ প্রশমনের নিমিত্ত মাথায় দেবার সুগন্ধি তেল এনেছিলেন। সুতরাং এই ধরণের কোন রোগ তাঁর বাল্যকাল থেকেই ছিল বলে অনুমিত হয়। অবশ্য দিব্যোন্মাদ অবস্থা স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, মূর্ছা প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেম-জনিত সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশরূপে ব্যাখ্যাত হয়। এ সম্পর্কে একজন পণ্ডিতের অভিমত,—"বাহিরের প্রেরণায় কৃষ্ণপ্রেম মনে উদয় হয়। উদয় হওয়া মাত্রই বায়ুজনিত মূর্ছা আসিয়া পড়ে। মানসিক অবস্থার এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কেন না দিব্যোন্মাদের শেষ দ্বাদশ বৎসর এইরূপ মানসিক

---

১ চৈ. চ. অন্ত্য ১৫ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য. ১৮ পরি

অবস্থারই পূর্ণ পরিণতি ভিন্ন আর কিছু নহে। দিব্যোন্মাদ একদিনে হয় নাই।"[১]

কিন্তু আমাদের মত প্রাকৃত জনের পক্ষে দিব্যোন্মাদের রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। অনেক বৈষ্ণব সাধকের দেহে সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশের কথা শোনা যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেকবার মহাপ্রভুর তিন অবস্থার উল্লেখ করেছেন: অন্তর্দশা (যেন জড়বৎ সমাধিস্থ), কখন অর্ধবাহ্য; কখনও বা বাহ্যদশা।[২] তিনি বলতেন, "চৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ—বাহ্যশূন্য। অর্ধবাহ্যদশায় আবিষ্ট হইয়া নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা কইতে পারতেন না। বাহ্যদশায় সংকীর্তন।"[৩] রামকৃষ্ণদেব বলতেন, গৌরাঙ্গের মহাভাব প্রেম, এই প্রেম হলে জগৎ ত ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয় তাও ভুল হয়ে যায়। গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল।"[৪] সিদ্ধ সাধক পুরুষদের আচরণ—তাঁদের অবস্থা—প্রাকৃত জনের বুদ্ধির অগোচর,—সিদ্ধ সাধকগণই উপলব্ধি করতে পারেন। সুতরাং চৈতন্যদেবের বায়ুরোগ অথবা কৃষ্ণপ্রেমের ভাববিকার তা নির্ণয় করা সাধারণ বুদ্ধিতে সম্ভব নয়। শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

---

১ বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী—পৃঃ ১১৩

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—১ম ভাগ—১৫শ মুদ্রণ—পৃঃ ৪

৩ তদেব ৪র্থ ভাগ—২য় সং—পৃঃ ১৯২

৪ তদেব—পৃঃ ২৪

ষোড়শ অধ্যায়

মহাপ্রভুর অপ্রকট

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শেষ দ্বাদশ বৎসর কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও বাহ্যহারা দিব্যোন্মাদ অবস্থায় নীলাচলে অবস্থান করলেও প্রতি বৎসর মায়ের কাছে নবদ্বীপে পণ্ডিত জগদানন্দকে পাঠাতেন জগন্নাথের প্রসাদ সহ। জগদানন্দ নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রীক্ষেত্রে আসতেন। অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর কাছে একটি প্রহেলিকা বা তর্জা জগদানন্দের মারফতে প্রেরণ করলেন। তর্জাটি এই :

বাউলকে কহিহ, লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ, হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিহ, কার্যে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ, ইহা কহিয়াছে বাউল॥[১]

এই ছড়াটি শুনে মহাপ্রভু হাস্য করলেও তাঁর কৃষ্ণবিরহে উন্মাদ-দশা আরও বর্ধিত হয়।

সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা গমন।
উদ্‌ঘূর্ণা-দশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ॥[২]

অদ্বৈতাচার্য-প্রেরিত তর্জার অর্থ করা হয় : মহাপ্রভুকে বোলো যে লোক প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে, প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থান নেই। মহাপ্রভুকে বোলো যে আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল কাজে লিপ্ত নয়, মহাপ্রভুকে বোলো যে এই কথা বলেছেন অদ্বৈত আচার্য।

বক্তব্য এই যে, শ্রীচৈতন্যের কার্য সমাধা হয়েছে, মানুষ কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়েছে। সুতরাং তাঁর আর ধরাধামে থাকবার প্রয়োজন নেই। অদ্বৈতের

১-২ চৈ. চ. অন্ত্য—১৯ পরি

মত কৃষ্ণভক্ত—যিনি কৃষ্ণরূপী চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন সাধনার দ্বারা—তিনি আরাধ্য জীবন্ত কৃষ্ণকে ইহলোক ত্যাগ করতে বলবেন, একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী এই তর্জার ভিন্ন অর্থ করেছেন। তাঁর মতে এই প্রহেলিকায় প্রকৃত পক্ষে নিত্যানন্দের প্রচার ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দের গৌড়ে ফিরে এসে সংসার ধর্ম গ্রহণ ক'রে, আচণ্ডাল যবনে জাতিভেদ না করে চৈতন্যনাম প্রচার ও মহোৎসবে ভিক্ষা করে কীর্তনে নৃত্য অনেকেই পছন্দ করতে পারেন নি। মহাপ্রভুর কাছে পুরীতে নিত্যানন্দের আচরণের বিরুদ্ধে নালিশও গিয়েছিল। সম্ভবতঃ অদ্বৈত তরজায় নিত্যানন্দের প্রচার ধর্মে মুসলমান চণ্ডাল ব্রাহ্মণ একাসন লাভ করায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ব্যাপ্তি লাভ করছে না, এরূপ অভিযোগ নিহিত ছিল। সেইজন্যই তর্জা শেষের পর মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বর্ধিত হয়েছিল।[1] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মতবাদকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে এই তর্জার অর্থ: শ্রীচৈতন্যের অনুপস্থিতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে শৈথিল্য এসেছে, ভক্তিধর্মপ্রচার ব্যাহত হচ্ছে, চিঁড়াদধি মহোৎসবে নিত্যানন্দ জাতিধর্ম নির্বিশেষে চৈতন্যনাম বিতরণ করছেন। সুতরাং আদ্বিজচণ্ডালকে চৈতন্যপ্রেমে একাকার ও বাউল করার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল বৈষ্ণবের এই নালিশ।[2]

যাই হোক, তাঁর কর্তব্যকর্ম সমাপ্ত হয়েছে বলেই হোক আর তাঁর সাধনায় প্রেমধর্মপ্রচারের দ্বারা জীবের উদ্ধার কার্য যথাযথ হচ্ছে না বলেই হোক অদ্বৈতের হেঁয়ালি শোনার পর মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ তীব্রতর হয়ে ওঠে। তিনি সর্বত্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, রাত্রি জাগরণ করে নাম সংকীর্তন করেন। স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় তাঁকে গম্ভীরার মধ্যে শুইয়ে দেন। স্বরূপ ও গোবিন্দ দ্বারে প্রহরায় রত। কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল শ্রীচৈতন্য দিব্যোন্মাদ অবস্থায় গম্ভীরার দেওয়ালে মুখ ঘষতে থাকেন—

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥

---

১ বাংলা চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ৩৩৮
২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—২য় খণ্ড—২য় সং—পৃঃ ২২৪

মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানেন প্রভু, পড়ে রক্তধার॥
সর্বরাত্রি করেন ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করেন, স্বরূপ শুনিলা তখন॥[১]

এমনি ভাবেই রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে কৃষ্ণ কথা আলাপনে স্বরচিত শ্লোক আস্বাদনে কৃষ্ণপ্রেম-তন্ময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শেষ কটা দিন যাপন করলেন। ঈশান নাগর এই সময়ে শ্রীচৈতন্যের অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন—

শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ হৈল উদ্দীপন।
হা নাথ হা কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান মহাভাবাবেশে।
তরাস লাগয়ে ভক্তগণের মানসে॥[২]

এই সময়ে মহাপ্রভু তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতেন, এই তিন অবস্থা:—অন্তর্দশা, বাহ্যদশা ও অর্ধবাহ্যদশা।

তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল।
অন্তর্দশা বাহ্যদশা অর্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্ধবাহ্য নাম॥
অর্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আভাষে কহেন সব শুন ভক্তজনে॥[৩]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবৎকাল ৪৮ বৎসর—প্রাক্ সন্ন্যাস জীবন ২৪ বৎসর ও সন্ন্যাসোত্তর জীবন ২৪ বৎসর। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ গ্রামে।
লওয়াইল সর্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য গীত প্রেমভক্তিদান নিরন্তর॥

---

১ চৈ. চ. অন্ত্য. ১৯ পরি   ২ অঃ প্র. ২১ অঃ   ৩ চৈ. চ. মধ্য ১৮ পরি

সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা গমন॥

* * *

দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইল আস্বাদন ছলে॥[১]

কবিকর্ণপূর চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে বলেছেন যে শ্রীচৈতন্যের প্রকটকাল ৪৭ বৎসর।

চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ
প্রকামং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপতলতঃ।
ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়-
ন্তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা: ব্যনয়দখিলা বিংশতি সমাঃ॥
ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাংক্রমেণ।
নানালীলালাস্তমাসাদ্য ভূমৌ ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোহংসৌ জগাম॥[২]

—চব্বিশ বৎসরে কৃষ্ণপ্রেমে বিবশ হয়ে নবদ্বীপ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তিন বৎসর শ্রীক্ষেত্র থেকে ইতস্ততঃ গমনাগমনে কাটিয়ে বিশ বৎসর যাত্রা (দেবোৎসব) দেখে কাল যাপন করেছেন।

এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ ৪৭ বৎসরে ক্রমে ক্রমে নানা লীলা বিধান করে পৃথিবীতে ক্রীড়া করে স্বধামে গমন করেছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও লিখেছেন,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান॥[৩]

১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয়। লোচন দাসের মতে আষাঢ় মাসের সপ্তমীতে রবিবারে মহাপ্রভুর তিরোধান হয়েছিল। ফণিভূষণ দত্ত গণনা করে বলেছেন যে, ১৪৫৫ শকে ৩১শে আষাঢ় বা ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন শ্রীচৈতন্য লীলাসম্বরণ করেছিলেন।[৪] ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে

---

১ চৈ. চ. আদি ১৩ পরি ২ চৈ. চ. মহা. ২০।৪০-৪১ ৩ চৈ. চ.

৪ শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ ১৮

ফাল্গুন মাসে জন্ম ও ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণ হওয়ায় এই সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বৎসর ৪ মাস। জয়ানন্দের মতে শ্রীচৈতন্য আঠাশ বৎসর নীলাচলে ছিলেন—নীলাচলে বহিলা অষ্টবিংশতি বৎসরে। জয়ানন্দ বলেছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু টোটায় সমাগত ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলেছিলেন, আষাঢ় শুক্লা সপ্তমীতে বৈকুণ্ঠে যাব, তোমরা রথ পাঠাও।

ইন্দ্র শংকর সঙ্গে চলিলা আপনি।
সকল দেবতা মেলি করিয়া ধরণী ॥
নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল একাক্রমে ॥
আষাঢ় সপ্তমী শুক্লা অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ জাব বৈকুণ্ঠপুরী ।।[২]

নিত্যানন্দ প্রভু রথযাত্রার সময় রথের কাছে গেলে চৈতন্যদেব বৈকুণ্ঠ-গমনেচ্ছা প্রকাশ করে অদ্বৈতকে নিত্যানন্দের দায়িত্ব অর্পণ করে বললেন—

নিত্যানন্দে অদ্বৈতরে সমর্পণা করি।
সঙ্কীর্তন যজ্ঞ সব তোমায় অধিকারী ॥
আঠাইশ বৎসর আমি নীলাচলে রতি।
স্থানান্তরে জাব আমি নিষ্কপটে কহি ।।[৩]

জয়ানন্দ পরিবেশিত তথ্য অবশ্যই যথার্থ নয়। শ্রীচৈতন্য ২৮ বৎসর নীলাচলে ছিলেন না, ছিলেন ২৪ বৎসর। মহাপ্রভুর তিরোধান দিবস সম্পর্কে লোচন ও জয়ানন্দ একমত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্পর্কে নানাবিধ কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী গড়ে উঠেছে। তাঁর তিরোধানে ভক্তদের মধ্যে যে গভীর বেদনার সঞ্চার হয়েছিল তার পরিমাপ সাধ্যায়ত্ত নয়। কবিকর্ণপুরের মহাকাব্য ১ম সর্গ, লোচনের চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতপ্রকাশ, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন ও নীলাচলের ভক্তদের মর্মান্তিক বেদনা বর্ণিত হয়েছে। অনেকেই মহাপ্রভুর বিয়োগ বেদনা সহ্য করতে না পেরে অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ করেছেন। এই ভয়াবহ দুঃখকর ঘটনার বিবরণ প্রামাণ্য

১ চৈ. ম. উত্তর—১১৯ ২ চৈ. ম. উত্তর—১২৯-৩১ ৩ চৈ. ম. উত্তর—১৩৩-৩৫

চৈতন্যচরিত গ্রন্থে অনুপস্থিত। কবিরাজ গোস্বামী, বৃন্দাবন, কবিকর্ণপুর কেউই এই ঘটনার বিবরণ দেন নি। মুরারির কড়চায় কেবলমাত্র বলা হয়েছে—

তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠৈস্তৈঃ প্রসাধিতঃ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিমৎ ॥[১]

—সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠবাসীদের দ্বারা প্রসাধিত হয়ে মহান্ ঐশ্বর্যবান্ প্রভু আনন্দিত হয়ে স্বীয় বাসস্থানে (বৈকুণ্ঠ) গমন করেছিলেন।

কবিকর্ণপুর কেবলমাত্র বলেছেন যে গোপনারীদের বিরহে কাতর হয়ে শ্রীহরি (গৌরাঙ্গ) গোপাঙ্গনাদের কাছেই গমন করেছেন।[২]

প্রামাণ্যগ্রন্থ সমূহে স্পষ্ট বিবরণের অভাব থাকাতেই শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে নানাবিধ কিম্বদন্তী গড়ে ওঠা সহজ হয়েছে।

লোচনদাস লিখেছেন—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্তন সার ॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরণ ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥
তৃতীয় প্রহরে বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইলা তখন ॥
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা ॥
ভক্ত আর্তি দেখি পড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥

---

১ মু. ক.—১।২।১৪ ২ চৈ. চ. মহা—১।১০

সাক্ষাতে দেখিল গৌড় প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন ॥[১]

লোচনের মতে রবিবারে আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে রথযাত্রার পাঁচদিন পরে শ্রীচৈতন্য গুণ্ডাবাড়ীতে জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

ভক্তি রত্নাকর প্রণেতা শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর মতে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করে মহাপ্রভু গোপীনাথের বিগ্রহে মিশে গিয়েছিলেন। শ্রীরামু গোস্বামী নরোত্তম দাস ঠাকুরকে বলেছিলেন—

অহে নরোত্তম! এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি ॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয় ॥
ন্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার ॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হইলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥[২]

ঈশান নাগর বলেন, অদ্বৈতের তর্জা শোনার পর থেকেই শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ দশার বৃদ্ধি হয়েছিল, দিবানিশি তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকতো না। ফলে ভক্তবৃন্দ ভীত হয়ে পড়েন। তারপর একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথমন্দিরে (গুণ্ডা-বাড়ীতে নয়) প্রবেশ করে জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেলেন।

একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হা নাথ বলিয়া ॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল ॥
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা।
গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈলা ॥[৩]

মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত ঈশ্বর দাস চৈতন্যভাগবতে বারে বারে শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ মূর্তির মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার কাহিনী উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণে

---

১ চৈ. ম. শেষ খণ্ড—পৃঃ ১১৭ ২ ভ.র.—৮।৩৫৪-৫৭ ৩ অঃ প্রঃ ২১ অঃ—পৃঃ ২৫৮

বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ার অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ার জগন্নাথের চন্দনযাত্রার দিনে রাজা প্রতাপরুদ্র ও অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথের অঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছিলেন :

এমন্তে গলা কিছি দিন। পুনি যাত্রা হএ চন্দন ॥
বৈশাখ তৃতীয়া দিবস। চৈতন্য হোইলে সুবেশ ।।
কীর্তন মধ্যে বনমালী। বড় দাণ্ডরে যাই মিলি ।।
সঙ্গতে ছান্তি নৃপরান। অনেক অছন্তি ব্রাহ্মণ ।।
* * * * * *
চৈতন্য আপে জগজ্জ্যোতি। পতিত পাবন শ্রীপতি ।।
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন। প্রত্যক্ষে দর্শন রাজন ।।[১]

ঈশ্বর দাস লিখেছেন, অঙ্গে চন্দন লেপন করার সময়ে জগন্নাথ মুখব্যাদান করেছিলেন, আর শ্রীচৈতন্য মুখ মধ্যে লীন হয়েছিলেন।

চন্দন খোরা হস্তে পড়ি। শ্রীজগন্নাথ ভুজ ভিড়ি ।।
মুখ বিস্তারি গোসাঞি। গর্ভে চৈতন্য লীন হোই ।।[২]
শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন দেখন্তি সর্ব বিদ্বজ্জন।[৩]

মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত কবি অচ্যুতানন্দ শূন্যসংহিতায় শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়ার কথাই উল্লেখ করেছেন—

চৈতন্যঠাকুর মহানৃত্যকার রাধা রাধা ধ্বনি কলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রী অঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিশি গলে ।।[৪]

পরবর্তীকালে কবি দিবাকর দাস (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী) অচ্যুতানন্দকে অনুসরণ করে বলেছেন যে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময়েই জগন্নাথের দেহে চন্দন লেপন করতে করতে জগন্নাথের দেহে মিশে গিয়েছিলেন।

এমন্ত কহি শ্রীচৈতন্য শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন।
গোপন হইলে স্বদেহে দেখি কার দৃষ্টি মোহে ।।[৫]

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর উৎকলীয় ভক্ত কবি প্রেম-তরঙ্গিণী রচয়িতা (কবি সূর্য) সদানন্দ বলেছেন, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হয় 'টোটা গোপীনাথ স্থানে'।[৬]

---

১ ঈশ্বর দাসের চৈতন্যভাগবত ৬৪ অঃ—ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি পৃঃ ৫১।
২ তদেব ৩ চৈ. চ. উ.—বিমান বিহারী মজুমদার—পৃঃ ৪৯৭ ৪ শূন্যসংহিতা—১ম অঃ তদেব পৃঃ ২৭১ ৫ তদেব—পৃঃ ২৭২ ৬ ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—পৃঃ ১৯৭

জগন্নাথ বিগ্রহে ও টোটা গোপীনাথের বিগ্রহে লীন হয়ে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের দুটি কাহিনীই বিশেষভাবে প্রচলিত। উক্ত মত দুটি ছাড়া আরও দুটি মত এ বিষয়ে প্রচলিত আছে। একটি মত অনুসারে শ্রীচৈতন্য দিব্যোন্মাদ অবস্থায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রের জলেই দেহত্যাগ করেছিলেন। M. T. Kennedy লিখেছেন, "However, the common supposition that the end came by drowning in the ocean during one of his fits of ecstasy has a great deal of probability in his favour, considering the many times Chaitanya was rescued from just such a death. The body was probably buried in the temple by the priests, and the miraculous tales that arose, of the master's disappearance in various images were doubtless created and encouraged by them for purposes of revenue."[১]

এ রকম ঘটনা হয়ত অসম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর ভক্তরা সকল সময়েই থাকতেন। আর সমুদ্রে পতন জনিত মৃত্যু ঘটলে সে ঘটনা গোপন থাকা সম্ভব ছিল না। জীবনীকাররা কেউ এ বিষয়ে ইঙ্গিতও করেন নি। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রমাণ করেছেন যে শ্রীচৈতন্যের লোকান্তর সমুদ্র গর্ভে হয় নি।[২] তথাপি ডঃ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বিনা যুক্তিতেই মহাপ্রভুর সমুদ্রগর্ভে লীন হওয়ার কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন।[৩]

শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনী অবশ্যই অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। প্রভুর আত্মা জগন্নাথে লীন হতে পারে, প্রভুর ভক্তরা বিদ্যুৎপ্রায় মিশে যাওয়ার ব্যাপারটা দেখতেও পারেন, কিন্তু তাঁর দেহটা কি করে দারুবিগ্রহে মিশে যাবে? ঈশ্বর দাসের চৈতন্যভাগবতে তাই আর এক রকমের গল্প তৈরি হয়েছে। এই গল্পে সম্পূর্ণ নগরের রাজা অগস্ত্যমুনিকে শ্রীচৈতন্যের মরদেহের বিষয়ে প্রশ্ন করলে ঋষি বললেন, জগন্নাথ তাঁর পার্শ্বদেবতা ক্ষেত্রপালকে আদেশ করলেন পিণ্ড (শব) অন্তরীক্ষে বহন করে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করতে।

ক্ষেত্রপালংকু আজ্ঞাদেই। 'এপিণ্ড নিঅ বেগকরই।
অন্তরীক্ষে নিঅ গঙ্গাজল। মেলিণ দিঅ ক্ষেত্রপাল'।

১ The Chaitanya movement—p. 51.
২ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান প্রবন্ধ—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন—১৩৩৫ ৩ শ্রীচৈতন্যাষ্টক—পৃঃ ৫১

ক্ষেত্রপাল জগন্নাথের আজ্ঞানুসারে শব গঙ্গার জলে বিসর্জন দিলেন, চৈতন্য রূপ প্রকাশ করে গঙ্গায় লীন হয়ে গেলেন।

শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই। অন্তর্কে নেলে শব বহি॥
গঙ্গারে মেলি দেলে শব। সে শব হোইলা কি সর্ব॥
চৈতন্য রূপ প্রকাশিলে। গঙ্গারে লীন হোই গলে॥[১]

ডঃ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে পুরী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অমরেশ্বর মন্দিরের কাছে গোমতীর তীর্থে প্রাচী নদীকে গঙ্গা বোঝান হয়েছে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গঙ্গা এখানে উপনীত হন বলে 'প্রাচী মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বলা হয়েছে। সুতরাং জগন্নাথ মন্দিরের গুপ্ত দ্বার দিয়ে মহাপ্রভুর দেহ এনে এখানে জলে ফেলা হয়েছিল।[২]

ডঃ মুখোপাধ্যায় যদিও মহাপ্রভুর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে অন্তর্হিত হওয়ার কাহিনীতে আস্থাশীল তথাপি এ কাহিনীকে তিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন না। তাঁর বক্তব্য: ভাবাবেগে অকস্মাৎ জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে মহাপ্রভুর মৃত্যু হলে মন্দির শোধন করতে হোত। তাই লোক জানাজানির ভয়ে গুপ্ত পথ দিয়ে মহাপ্রভুর দেহ প্রাচী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনী প্রচার করা হয়।[৩]

এখানেও একই প্রশ্ন থেকে যায়। চন্দন যাত্রার উৎসবে বহুলোকের জগন্নাথ মন্দিরে সমাগম হয়। শ্রীচৈতন্যের ভক্তরাও ত ছিলেন। তবে গোপনে গুপ্ত দ্বার দিয়ে বার করে তাঁর দেহ ত্রিশ মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া হোল কি করে? আসলে অনেক গল্পের মত এও একটি কাল্পনিক গল্প।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে আর একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। পুরীতে এরূপ জনশ্রুতি নাকি প্রচলিত যে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের অসাধারণ চৈতন্যভক্তি এবং শ্রীচৈতন্যদেবেরও পুরীতে অভূতপূর্ব প্রভাব বৃদ্ধির ফলে জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাদের স্বার্থহানি ঘটায় তারা মহাপ্রভুকে জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যেই গোপনে হত্যা করে মন্দির মধ্যেই সমাধিস্থ করে এবং শ্রীচৈতন্যর জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনী প্রচার করে। এই কিম্বদন্তীর সত্যতায় বিশ্বাসী গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী। যদিও এ গল্প নিছক অনুমান নির্ভর,

১ শ্রীচৈতন্যচাষ্টক পৃঃ ৫১ ২ শ্রীচৈতন্যচাষ্টক পৃঃ ৫৭ ৩ শ্রীচৈতন্যচাষ্টক পৃঃ ৫৮

তথাপি এ অনুমানের কারণ হিসাবে গিরিজাশংকর লিখেছেন, "এই মৃতদেহের আকস্মিক অন্তর্ধানে গুপ্তহত্যার সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। জগন্নাথে লীন হওয়া সাধারণভাবে ভক্তদের বিশেষভাবে প্রতাপরুদ্রকে প্রবোধ দিবার জন্য হত্যাকারীদের তৈরি কথা।[১]

কিন্তু এই গল্পের কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিচার করা প্রয়োজন। উৎকলাধীশ প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভুর একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন মহাপ্রভুর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। পুরীতে বহু উৎকলীয় ভক্ত শ্রীচৈতন্যকে ঘিরে থাকতেন। স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, গদাধর, রামানন্দ রায়, গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সকল সময়েই মহাপ্রভুর কাছে কাছে থাকতেন। এমতাবস্থায় তাঁকে অচেতন বা অর্ধচেতন অবস্থায় খুন করে শব গোপন করে ফেলা সহজসাধ্য মনে হয় না। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পকে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত এবং লোমহর্ষক ডিটেক্‌টিভ গল্প বলে মন্তব্য করেছেন।[২]

ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় "কাঁহা গেলে তোমা পাই" গ্রন্থে উপন্যাসের আঙ্গিকে শ্রীচৈতন্যকে গুমখুন করার কাহিনীকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এব্যাপারে তিনি অভ্রান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন বলে গ্রন্থমধ্যে বলা হয়েছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে যথার্থ তথ্য প্রমাণের দ্বারা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

১। দীনেশ চন্দ্র সেন Chaitanya and his age গ্রন্থে লিখেছেন যে শ্রীচৈতন্যের দেহাবসানের প্রচণ্ড আঘাতে (great shock) উড়িষ্যায় এবং বাঙলায় ৫০ বৎসর কীর্তন বন্ধ ছিল।

২। উৎকলে স্মার্ত পণ্ডিতরা মহাপ্রভুর প্রতি রুষ্ট হয়েছিল।

৩। প্রতাপরুদ্রদেবের বৌদ্ধ বিদ্বেষের ফলে উড়িষ্যার বৌদ্ধরা শ্রীচৈতন্যের উপরে রুষ্ট হয়।

৪। পুরীর পূজারী ও পাণ্ডারা মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়।

৫। কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে প্রতাপরুদ্রদেবের পরাজয়ের কারণ হিসাবে বিপক্ষদল শ্রীচৈতন্যকে নির্দেশ করতেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরেকৃষ্ণ

---

১ চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য পৃঃ ৫৪৪ ২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত পৃঃ ২০

মহাতাব (History of Orissa, vol. I, p. 319)-এর মতে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যভক্ত হওয়ায় উড়িষ্যার সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

৬। উৎকলের সিংহাসনলোভী হীন ষড়যন্ত্রকারী গোবিন্দ বিদ্যাধর ভেবেছিল, প্রতাপরুদ্রের রাজকার্যে সকল প্রকার পরামর্শদাতা এবং সর্বজনের শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে অধিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যকে পৃথিবী থেকে না সরালে প্রতাপরুদ্রের সিংহাসন অধিকার করা সম্ভব নয়। অদ্বৈতের তর্জায় এই ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ছিল। গোবিন্দ মহাপ্রভু ও পরে প্রতাপরুদ্রের দুই পুত্র কালুয়াদেব ও কথারুয়াদেবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন।

৭। উৎকলীয় কবি বৈষ্ণবচরণ দাসের 'চৈতন্য চকড়া' অনুসারে মহাপ্রভুর দেহপাতের পর রাজা প্রতাপরুদ্র দারুণ ত্রাসে বিড়ানেসী বা কটকে পলায়ন করেছিলেন, তবে তিনি শ্রীচৈতন্যের মরদেহ হরিনাম সহকারে সমাধিস্থ করার আদেশ দিয়েছিলেন। রাত্রি দশদণ্ডের সময় মহাপ্রভুর দেহ জগন্নাথ মন্দিরে গরুড়স্তম্ভের পিছনে পতিত হলে টোটা গোপীনাথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

৮। সেই বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচলে এসে শচীদেবীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করায় শ্রীক্ষেত্রে বাস মহাপ্রভুর কাছে মর্মান্তিক বেদনাদায়ক হয়েছিল। তিনি সবার অলক্ষ্যে টোটা গোপীনাথে পলায়ন করেছিলেন। এখানে এসে জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে ঘোলাডুবলী নামক এক গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন। সেদিন তিনি আত্মগোপন না করলে গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচরেরা তাঁর জীবনান্ত ঘটাতো।

৯। লোচনের বিবরণে মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করার পরই গুঞ্জাবাড়ীর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন যে মহাপ্রভু অপরাহ্ন চার ঘটিকায় দেহত্যাগ করেছিলেন ও রাত্রি ১১টা পর্যন্ত মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপরুদ্রের অনুমত্যানুসারে ঐ সময়ের মধ্যে সমাহিত করে এবং মেঝে মেরামত করা হয় এবং জগন্নাথ বিগ্রহে লীন হওয়ার সংবাদ প্রচার করা হয়।

১০। রাজমহেন্দ্রী থেকে রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন যে তাঁর উৎকলীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই গোবিন্দ বিদ্যাধরের পাপ চক্রের চর।

১১। সম্বলপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বৈষ্ণবচরণ চৈতন্য ভাগবতে লিখেছেন

যে মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তাঁর অনেক ভক্ত স্বশরীরে অন্তর্ধান করেছিলেন।

১২। মহাত্মা শিশিরকান্তি ঘোষের অমিয় নিমাই চরিত ৬ষ্ঠ খণ্ডে ১৫ অধ্যায়ের শেষে পাদটীকায় আছে যে, মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর ভক্তগণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তন্মধ্যে স্বরূপ দামোদর মারা যান। তাঁর হৃদয় ফেটে প্রাণ বেরিয়েছিল। এ থেকে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান যে, স্বরূপ দামোদরকে এমন ভাবে হত্যা করা হয়েছিল যে তার গভীর ক্ষত থেকে হৃৎপিণ্ড দেখা গিয়েছিল।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য: কেবলমাত্র যে শ্রীচৈতন্যকেই হত্যা করা হয়েছিল তাই নয়, তাঁর অনেক ভক্তকেও হত্যা করা হয়েছিল, আর এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক গোবিন্দ বিদ্যাধর ও তার সহযোগী উড়িষ্যার স্মার্ত ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও পাণ্ডারা।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক,--কিন্তু ধোপে টেঁকে না। গোবিন্দ বিদ্যাধরের পাপচক্রে মহাপ্রভুকে কোথায় কিভাবে খুন করেছিল এবং কোথায় তাঁর দেহ সমাহিত করা হয়েছিল, সে ব্যাপারটি তিনি হেঁয়ালিতে আবৃত রেখেছেন। তাঁর প্রদত্ত যুক্তিগুলি পর্যালোচনা করা যাক।

(১) দীনেশ চন্দ্র সেন কথিত শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগের পরে ৫০ বৎসর বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় কীর্তন বন্ধ ছিল, এ মন্তব্য তথ্য-সমর্থিত নয়। বাংলায় নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত আচার্য জীবিত ছিলেন। তাঁরা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করেছেন, হরিনাম সংকীর্তনও করেছেন। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস অনুসারে মহাপ্রভুর অপ্রকটের দুই বৎসর পরে নিত্যানন্দ কীর্তন কালে অপ্রকট হন। উড়িষ্যায় যদি বৈষ্ণব নিধন হয় তাহলে ভয়ে বাঙ্গলায় কীর্তন বন্ধ হবে কেন? গৌড় বাঙ্গালা তখন মুসলমান সুলতানদের শাসনভুক্ত। উড়িষ্যার ভীতি এখানে থাকার কথা নয়। তাছাড়া ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাপ্রভুর হত্যা সম্পর্কিত কাহিনীর উল্লেখ করেন নি। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই বলেছেন। (২) উড়িষ্যার স্মার্তরা মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন, এ নিছক অনুমান। ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর করে সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। (৩) প্রতাপরুদ্রের বৌদ্ধ বিদ্বেষের সঙ্গে প্রেমধর্মের প্রবক্তা পণ্ডিতের ভ্রাতা গৌরচন্দ্রের সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। মহাপ্রভুর উড়িয়া

ভক্তরা তাঁকে জগন্নাথের অবতার বলে গণ্য করতেন, অনেকে বুদ্ধ অবতারও বলেছেন। সুতরাং বৌদ্ধরা শ্রীচৈতন্যের উপর রুষ্ট হয়ে তাঁকে খুন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন কেন? বৌদ্ধরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে প্রতাপরুদ্রের ক্রোধ বর্ধিত হওয়ার কথা। জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডারা অবশ্য মহাপ্রভুর প্রতি রুষ্ট হতে পারে। এও নিছক অনুমান। প্রতাপরুদ্রদেব জীবিত থাকতে অনুচর বেষ্টিত চৈতন্যদেবকে হত্যা করার কাহিনী নিছক আজগুবি কল্পনা। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর ৫০ বৎসর যাবৎ উড়িষ্যা ও বাঙ্গালায় কীর্তন গান বন্ধ হয়ে গেলে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে (১৫৮২ খ্রীঃ) খেতরীর মহোৎসবে এত বিপুল সংখ্যক বৈষ্ণব-সমাগম ও সাড়ম্বরে কীর্তন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হতো না।

৫। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব উড়িষ্যার সামরিক দুর্বলতা ও বিজয়নগর রাজ্যের কৃষ্ণদেব রায়ের হস্তে প্রতাপরুদ্রদেবের পরাজয়ের কারণ হিসাবে রাজার চৈতন্যানুরক্তি ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের ফল বলে ঘোষণা করলেও এ অভিমত যথার্থ নয়। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬। মহাপ্রভুর মত সংসারবিরাগী আত্মভাবমগ্ন সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে প্রতাপরুদ্রকে রাজকার্যে পরামর্শ দেওয়াও সম্ভব নয়। বিষয়ীর সংস্পর্শ তিনি সর্বপ্রযত্নে এড়িয়ে চলতেন। প্রতাপরুদ্রও শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও রাজকার্য পরিত্যাগ করেন নি। তিনি রাজকার্য পরিচালনার জন্য কটকে বাস করতেন। এ বিষয়টিও পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। গোবিন্দ বিদ্যাধর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কখনও অচেতন কখনও অর্ধচেতন সন্ন্যাসীকে হত্যা করে সিংহাসন লাভের পন্থা নির্ধারণ করলেন কি করে, তা বুদ্ধির অগম্য। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরেও প্রতাপরুদ্রদেব জীবিত ছিলেন এবং তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরে তাঁর অপদার্থ পুত্রদের আমলে উড়িষ্যার সিংহাসন নিয়ে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়েছিল। কবি-কর্ণপূরের বক্তব্য যদি বিশ্বাস্য হয় তবে মহাপ্রভুর তিরোধানের পর প্রতাপরুদ্র প্রভুর বিয়োগব্যথা লাঘব করতে চৈতন্যলীলাভিনয় দর্শন করেছিলেন। প্রতাপরুদ্রের পরাজয়ের জন্য মহাপ্রভু কোনপ্রকারেই দায়ী ছিলেন না।

অদ্বৈতের তর্জায় মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ছিল, এ কথা কি গ্রাহ্য হতে পারে? অদ্বৈত প্রেরিত হেঁয়ালিতে শ্রীচৈতন্যের কার্যকাল শেষ হওয়ার

ইঙ্গিত ছিল বলে সাধারণতঃ ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম দেশের লোক গ্রহণ করছে না, এরূপ ব্যাখ্যাও আছে। আবার নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ে মহাপ্রভু-আচরিত পন্থা পরিহার করে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতেন বলে নিত্যানন্দের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যকে অবহিত করা অদ্বৈতের উদ্দেশ্য বলে কোন কোন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করেছেন। নবদ্বীপে-শান্তিপুরে অবস্থান করে উড়িষ্যায় গোবিন্দ বিদ্যাধর ও পুরীর পাণ্ডা স্মার্ত পণ্ডিত এবং বৌদ্ধদের চৈতন্যহত্যায় সম্মিলিত চক্রান্ত সম্বন্ধে সংবাদ জানা ও পুরীতে মহাপ্রভুকে সাবধান করে দেওয়া কিভাবে সম্ভব? ষড়যন্ত্রের কথা নবদ্বীপ-শান্তিপুরে যদি পৌঁছে থাকে তবে প্রতাপরুদ্রদেব এবং উড়িষ্যায় স্থিত শ্রীচৈতন্যের ভক্তবৃন্দের পক্ষেই সর্বাগ্রে অবগত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

৭। বৈষ্ণবচরণ দাসের চকড়া কোন্ সময়ে লেখা আমাদের জানা নেই। এই গ্রন্থের যদি কোন প্রামাণিকতা থাকেও তাহলেও বৈষ্ণব চরণের বক্তব্য গ্রাহ্য হতে পারে না। মহাপ্রভুকে খুন করার পরেই প্রবল প্রতাপান্বিত উড়িষ্যাধিপতি তাঁর মরদেহ সমাহিত করার আদেশ দিয়েই দারুণ ত্রাসে পুরী ছেড়ে বিড়ানেসী বা কটকে পলায়ন করলেন তাঁর একান্ত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীচৈতন্যের হত্যাকারী বা সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের অনুসন্ধান না করে, এ কাহিনী কেমন করে বিশ্বাস্য মনে হবে? ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার চৈতন্যচরিতের উপাদান গ্রন্থে ও ডঃ প্রভাত মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যাষ্টক গ্রন্থে মহাপ্রভুর উড়িয়া ভক্তদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে বৈষ্ণব চরণ দাসের নাম উল্লিখিত নেই। উড়িয়া ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক তিরোভাবের কথাই উল্লেখ করেছেন।

৮। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে শচীদেবীর মৃত্যু হয়েছিল, পূর্বে নয়। জয়ানন্দ লিখেছেন যে শ্রীচৈতন্যের দেহাত্যয়ের সংবাদ শ্রবণ করে শচীদেবী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। লোকনাথ দাসের 'সীতা চরিত্র' অনুসারে মহাপ্রভুর তিরোধান বার্তা স্বরূপ দামোদর নবদ্বীপে শচীদেবী ও শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সমাগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মুখে শচীদেবীর মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মহাপ্রভুর জীবন সম্পর্কে বীতরাগ হওয়াটা নিতান্তই অবাস্তব। সবার অলক্ষ্যে গোপীনাথে পলায়ন আরও অবাস্তব।

টোটা গোপীনাথে গিয়ে জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘোলা দুবলী গ্রামে মহাপ্রভুর আত্মগোপনের কাহিনী শুধু অবাস্তবই নয়,—চৈতন্য-চরিত্রের বিরোধী এবং শ্রীচৈতন্যের চরিত্রমহিমার পক্ষে অসম্মানজনক। যিনি জগাই, মাধাই, নরোজী দস্যু, পাঠান বিজলী খাঁর মত ব্যক্তিদের নির্ভয়ে সম্মুখীন হয়ে তাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, যিনি নির্ভীকভাবে প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলমান শাসকের শাসন উপেক্ষা করে কাজীকে শাসন করেছিলেন, যিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি কখনও —যিনি তৃণের মত দীন অথচ তরুর মত সহিষ্ণু,—তাঁর পক্ষে কিছু সংখ্যক লোকের ষড়যন্ত্রের অথবা প্রাণনাশের ভয়ে ছদ্মবেশে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচানোর গল্পকাহিনী কোন প্রকারেই বিশ্বাস্য নয়।

৯। রাজমহেন্দ্রী থেকে রায় রামানন্দ পত্র মারফতে মহাপ্রভুকে ছদ্মবেশী উৎকলীয় ভক্তদের সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কোন গ্রন্থে ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায় না। উৎকলীয় ভক্তবৃন্দ সকলেই বিদ্যাধরের চর হতে পারে না। যদিই বা রামানন্দ কয়েকজন ভক্তবেশী চরের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে থাকেন, তাহলে তদ্বারা কি গুপ্তহত্যা প্রমাণিত হয়?

১০। মহাপ্রভুর তিরোধানের পরে তাঁর অনেক ভক্তের স্বশরীরে অন্তর্ধানের ব্যাপারটি যেমন আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা চলে না, তেমনি ভক্তদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল, এমন অর্থ করাই বা যায় কি ভাবে? কোন কোন ভক্ত প্রভুর বিরহ সহ্য করতে না পেরে হয়ত অল্পকালের মধ্যে দেহত্যাগ করেছিলেন। ভক্তি রত্নাকর অনুসারে শ্রীনিবাস আচার্য মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছুকাল পরেই নীলাচলে এসে গদাধর, বাসুদেব সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, শিখি মাহিতি মাধবী দাসী, কানাই খুঁটিয়া, বাণীনাথ পট্টনায়ক, গোবিন্দ, শংকর, গোপীনাথ আচার্য প্রমুখ চৈতন্য পরিকর ও ভক্তগণের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন।

খ্রীঃ ষোড়শ শতকের শেষভাগে খেতরির মহোৎসবের আগে নরোত্তম দাস ঠাকুরও নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর পরিকরদের অনেকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

নীলাচলে যে ছিলেন প্রভু প্রিয় গণ।
সে সবে শুনিলা নরোত্তমের গমন ॥[1]

ভক্তি রত্নাকরের মতে গোপীনাথ আচার্য, শিখি মাহিতি, মামু গোস্বামী, গোপালগুরু, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি চৈতন্য পরিকরবৃন্দের সঙ্গে নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়েছিল। নরোত্তম বিলাসের মতে নরোত্তমের সাক্ষাৎ হয়েছিল গোপীনাথ আচার্য, শিখি মাহিতি, বাণীনাথ পট্টনায়ক, কানাঞি খুঁটিয়া, মামু গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে।[2] খেতরির মহোৎসবে বৈষ্ণব ভক্তদের যে ভাবে সমাবেশ হয়েছিল তাতে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে উড়িষ্যায় বৈষ্ণব হনন হয়েছিল, এ কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। খেতরির উৎসবেও উৎকল থেকে ভক্তগণ এসেছিলেন—

রসিক মুরারি আদি ভক্ত সঙ্গে করি।
উৎকল হইতে শ্যামানন্দ আইল খেতরি ॥[3]

সুতরাং চৈতন্যভক্তদের হত্যার কাহিনীটি সম্পূর্ণ অলীক।

১১। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ উল্লিখিত স্বরূপ দামোদরের হৃদয় ফেটে প্রাণ বাহির হওয়ার গল্প সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন। কারণ লোকনাথ দাসের সীতা চরিত্র অনুসারে স্বরূপ মহাপ্রভুর অপ্রকট সংবাদ নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে প্রেরণ করেছিলেন। নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী রচিত বৈষ্ণবাচার দর্পণ নামক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে (পৃঃ ১১)। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুক্তা চরিতের ৪র্থ শ্লোক থেকে ডঃ সুশীল কুমার দে অনুমান করেন যে স্বরূপ জীবনের শেষ দিনগুলি বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেছেন।

"হৃদয় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল" বা "বুক ফেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল' বাক্যটি বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট বাগ্‌ধারা। আক্ষরিক অর্থে কথাটি কেউ গ্রহণ করে না। ছুরিকাঘাতে বক্ষঃস্থলে গহ্বর সৃষ্টি করাও এই কথায় বোঝায় না। গভীর দুঃখ শোক পাওয়া বোঝাতে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। স্বরূপ দামোদরের বুকে ছুরি মেরে বুক কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এ রকম অর্থ নিতান্তই হাস্যকর।

অতএব শ্রীচৈতন্যকেও তাঁর ভক্তদের হত্যা করার কাহিনী কোন প্রকারেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় প্রকৃতপক্ষে

১ ভ. র. ৮।২৬১ ২ ন. বি, ৪র্থ বি, ৩ প্রেমবিলাস—১৯ বি.

রহস্য উপন্যাস রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট-রহস্য উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হলেও মহাপ্রভুকে যে যথার্থই হত্যা করা হয়েছিল এবং তাঁকে খুন করা হলে কোথায় কিভাবে হয়েছিল, তা কিছুই প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি।

জয়ানন্দ মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্পর্কে আর একটি খবর দিয়েছেন। তাঁর মতে রথযাত্রার দিন ভাবোন্মত্ত অবস্থায় নৃত্যকালে পায়ে ইটে আঘাত লাগায় ছয় সাতদিন পরে অসহ্য বেদনায় মহাপ্রভুর টোটায় শয্যাগ্রহণ করেন এবং আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে তিনি মায়া শরীর ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে চলে যান।

আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে।

* * *

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠি দিবসে।
সেই লক্ষে টোটা এ শয়ন অবশেষে॥
মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥[১]

জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বহু জনসমাগমকালে গো অশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তুর পুরীষাকীর্ণ দূষিতধূলি সমাচ্ছন্ন পথে হোচট্ লেগে রক্তপাত হলে সেপটিক্ জ্বরে বা ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যু অসম্ভব ব্যাপার নয়। জয়ানন্দ স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে মায়া শরীর পড়ে রইলো মর্তে—টোটায়। জয়ানন্দ আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে রাত্রিকালে মহাপ্রভুর টোটায় মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন।

নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটাশ্রমে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল একাক্রমে॥[২]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন জয়ানন্দের বক্তব্যকেই যথার্থ বলে মনে করেছেন। শচী দেবী অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে বারংবার অনুরোধ করেছিলেন, ভাবমগ্ন নৃত্যরত নিমাইকে পতন-জনিত আঘাত থেকে রক্ষা করতে। কখনও বা তিনি নারায়ণের কাছে নিমাইকে রক্ষা করার বর চাইতেন। ডঃ সেন বলেন শচীমাতার

---

১ চৈ. ম. উত্তর—১৪৫, ১৪৭, ১৫১   ২ তদেব—১৬০

সেই আশংকা ফলে গিয়েছিল।[১] রথযাত্রার সময়ে মহাপ্রভু প্রাত্যহিক রীতি অনুসারে গুণ্ডিচায় বা গুঞ্জাবাড়ীতে যেতেন। সুতরাং পায়ে ক্ষত জনিত অসুস্থতাকালে গুঞ্জাবাড়ীতে তাঁর মহাপ্রয়াণ অসম্ভব নয়। কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর মরদেহ গোপনে টোটা গোপীনাথের মন্দিরে সমাধিস্থ করে গোপীনাথের বা জগন্নাথের বিগ্রহে লীন হওয়ার কাহিনী প্রচার করা হয়। সেকালে টোটা গোপীনাথের মাটির কুঁড়েঘর ছিল। এই মন্দিরেরই চত্বরের দক্ষিণে হ্রস্বাকার মন্দিরটি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ গদাধরের সমাধি বলে কিম্বদন্তীতে পরিচিত। টোটা গোপীনাথের প্রস্তরময় মন্দির নির্মাণকালে কোন কঠিন দ্রব্যে ভিত্তি খনন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।[২]

শ্রীচৈতন্যের মরদেহ যেখানেই সমাধিস্থ করা হোক না কেন, তাঁর দেহ-ত্যাগের যে বিবরণ জয়ানন্দ দিয়েছেন, তাকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু পাওয়া যায় না। অন্য কোন গ্রন্থে যখন অন্য কোন বিবরণ বা ইঙ্গিত নেই, তখন জয়ানন্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ সত্ত্বেও নিছক অনুমান বা কিম্বদন্তীর উপরে নির্ভর করার কোন যুক্তি নেই। জয়ানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত এবং শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত পার্ষদ গদাধরের শিষ্য। তিনি কাব্যমধ্যে চৈতন্যদেব ও গদাধরের চরণ বন্দনা করেছেন বারংবার। আদিখণ্ডে তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে বিষ্ণুর শ্রীচৈতন্যরূপে মর্তাবতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণ-অবতার কাহিনীর সাদৃশ্যে। এমতাবস্থায় জয়ানন্দ মিথ্যা কথা কেন লিখবেন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অলৌকিক কাহিনীর বর্তমানতা সত্ত্বেও? জয়ানন্দ নিশ্চয়ই চৈতন্য-তিরোভাবের ঘটনাকে মহাপ্রভুর অবতারত্বহানিকর বলে মনে করেন নি।

মাতৃগর্ভ থেকে যে পাঞ্চভৌতিক দেহ ভূমিষ্ঠ হয়, তার স্বাভাবিক বিনাশ আছেই। শ্রীচৈতন্যের মত অলৌকিক গুণসম্পন্ন মহামানবের দেহের মৃত্যু স্বাভাবিক রীতিতে বর্ণিত হলে কি তাঁর অমরত্ব ক্ষুণ্ণ হোত? মহাভারত-কর্ণধার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জরা ব্যাধের শরাঘাতে মৃত্যু বা রামচন্দ্রের সরযূর জলে আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী বর্ণনা করতে কুণ্ঠিত হন নি মহাভারত-রামায়ণের মহাকবিদ্বয়। মানবদেহের স্বাভাবিক অবসানের জন্য ভগবান্ রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

---

১ বুদ্বুদ—ক. বি. ১৩৩২—পৃঃ ৩৭১

২ ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য—অমূল্য সেন—পৃঃ ১৯৮

পরমহংসদেবের গলায় ক্যানসার রোগে মৃত্যু তাঁর মহিমা কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ করে নি। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু বর্ণনা তাঁর লোকোত্তর মহিমাকে কিছুমাত্র খর্ব করতো না নিঃসন্দেহে।

প্রসঙ্গতঃ একটি কৌতুককর বিষয়ের অবতারণা করছি। বৈষ্ণব সাধক, মহাজন এবং চৈতন্যভক্তদেরও শ্রীচৈতন্যের মত অলৌকিক প্রয়াণ বর্ণনা করা বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকারদের একটা রোগ বিশেষ। গৌরাঙ্গ প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াও মহাপ্রভুর দারুবিগ্রহে লীন হয়েছিলেন বলে কিম্বদন্তী আছে। সাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেববাণীর দ্বারা মহাপ্রভু বলেছিলেন,—

প্রিয়তমে বিষ্ণুপ্রিয়ে!
ব্রাহ্মমুহূর্তে আজি দারুমূর্তে লীন।
হবে তুমি মোর অঙ্গে, (নহি) তুমি আমি ভিন্।[১]

তারপর প্রভাতে অকস্মাৎ শচীর আঙিনা ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রিয়াজী গৌরাঙ্গ বিগ্রহে লীন হয়ে গেলেন।

প্রবেশিলা বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে।
পড়িল কবাট তবে অতি ধীরে ধীরে॥
ব্রাহ্ম মুহূর্তে প্রভুর জন্মদিনে।
দারুমূর্তে লীন দেবী হইলা আপনে॥[২]

মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী নিত্যানন্দের অপ্রকটও বর্ণিত হয়েছে অনুরূপ পদ্ধতিতে। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের দুই বৎসর পরে (প্রেমবিলাসের মতে) একদিন কীর্তন নর্তনকালে খড়দহে স্বগৃহে নিত্যানন্দপ্রভু সকলের অগোচরে চলে গেলেন।

অলক্ষ্যেতে নিত্যানন্দ অন্তর্ধান হৈলা॥
বাহ্যস্ফূর্তি পাই যত মহান্তের গণ।
নিত্যানন্দে না দেখিয়া করে অন্বেষণ॥
সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর।
বুঝিলা শ্রীনিত্যানন্দ হৈলা অগোচর॥[৩]

---

১ গৌরদীপিকা—হরিদাস গোস্বামী কৃত গম্ভীরায় বিষ্ণুপ্রিয়া গ্রন্থের ৪৪৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
২ কবি ধুপরাজকৃত বিষ্ণুপ্রিয়া মঙ্গল—ঐ পৃঃ ৪৫৩ ৩ অঃ প্রঃ ২২ অঃ—পৃঃ ২৬৮.

নিত্যানন্দের অপ্রকট সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাসের নামে প্রচলিত নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার নামক গ্রন্থে আর একপ্রকার কাহিনী লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে একদিন খড়দহে অদ্বৈত, গৌরীদাস প্রভৃতির সঙ্গে গৌরাঙ্গ-গুণকীর্তন করতে করতে নিত্যানন্দ হঠাৎ শ্যামসুন্দরের মন্দিরে প্রবেশ করে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহকে আলিঙ্গন করে বিলীন হয়ে গেলেন।

কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈল তিরোভাব॥

উক্ত গ্রন্থে আর এক অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ আছে। শ্যামসুন্দরের বিগ্রহে লীন হওয়ার পর নিত্যানন্দ পত্নীদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবাকে সঙ্গে নিয়ে জন্মভূমি একচাকা গ্রামে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বা কৃষ্ণের দেহে পুনরায় লীন হয়েছিলেন।

তথা হৈতে এক চাকা করিল গমন।
বঙ্কিম দেবেরে গিয়া করে দরশন॥
কত দিন বঙ্কিমদেবেরে দেখি তথা।
বঙ্কিমদেবে অন্তর্ধান হইল সেথা॥

অনুরূপ ভাবেই নিত্যানন্দ বংশবিস্তার ও রাজবল্লভ গোস্বামীকৃত মুরলীবিলাস গ্রন্থে জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গমন করে ব্রজের কাম্যবনে গোপীনাথের বিগ্রহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রধান প্রধান পরিকরগণের অনেকেই এইভাবে স্বশরীরে অন্তর্হিত হয়েছেন। অদ্বৈতপ্রকাশ অনুসারে অদ্বৈত আচার্য গৌরনাম কীর্তন করতে করতে মদনগোপালের মন্দিরমধ্যে অদৃশ্য হয়েছিলেন—

হঠাৎ মদন গোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হৈলা॥
প্রভু চাহি ভক্তগণ ইতি উতি ধায়।
তানে নাহি পাঞা কান্দি ধূলায় লোটায়॥[১]

গদাধর গোস্বামী বৃন্দাবনে বসে মহাপ্রভুর বিরহে ক্ষীণতনু হয়ে অকস্মাৎ একদিন বিলীন হয়ে গেলেন। রামু গোসাঞি নরোত্তমদাসকে বলেছিলেন—

অগ্নিশিখা প্রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস সঘনে।
অকস্মাৎ সঙ্গোপন হইলা এইখানে॥[২]

১ অঃ প্রঃ ২২ অঃ, পৃঃ ২৭৯ ২ ভ. র.—৮।৩৭৩

বিষ্ণুপ্রিয়ার অপ্রকটের পর গদাধর দাস কার্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অদৃশ্য হয়ে যান।

ক্রমে অতি ক্ষীণ হৈলা দাস গদাধর।
অল্পদিন মধ্যে হৈলা পৃথ্বি অগোচর॥
কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে গুপ্ত হৈলা।[১]

নরহরি সরকার ঠাকুরও এইভাবে সকলের অগোচর হয়েছিলেন।

এইরূপে নরহরি শোকেতে কাতর।
একদিন হৈলা সবার নেত্র অগোচর॥
অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা একাদশী দিনে।
সঙ্গোপন দেখি সবে করয়ে ক্রন্দনে॥[২]

নরোত্তম দাস ঠাকুরের মৃত্যু কাহিনী আরও অদ্ভুত। নরোত্তম তেলিয়া বুধুরী গ্রাম থেকে গাম্ভীলে গেলেন, সেখানে গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাজলে বসে দুই অনুচর রামকৃষ্ণ ও গঙ্গানারায়ণকে বললেন,—মোর অঙ্গ মার্জন করহ দুই জনে।[৩] তারপরের ঘটনা আরও অদ্ভুত। দুজনে নরোত্তমের দেহ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তমের দেহ দুধ হয়ে গঙ্গার জলে মিশে গেল।

দোঁহে কিবা মার্জনা করিব পরশিতে।
দুগ্ধ প্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে॥[৪]

এই সকল বিবরণ থেকে দেখা যায় যে অনেক বৈষ্ণব সাধুসন্তের মানবলীলা সম্বরণ তাঁদের অলৌকিক মহিমা খর্ব হওয়ার আশংকাতেই অস্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা যায় যে শ্রীচৈতন্যের নরদেহ টোটাতে বা জগন্নাথ মন্দিরের নিকটবর্তী কোথাও সমাহিত করা হয়েছিল এবং তাঁর ঐশ্বরিক মহিমা প্রকট করার উদ্দেশ্যেই অলৌকিক কাহিনী প্রচার করা হয়েছে।

১ ভ. র. ২ নরোত্তমবিলাস—১১ অঃ ৩ তদেব ৪ তদেব

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য চরিত্র

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চরিত্র মহিমা হাজার হাজার নর নারীকে তাঁর চরণতলে আকর্ষণ করে এনেছিল। তাঁর দিব্য আকৃতি প্রথম দর্শনেই উচ্চ নীচ নির্বিশেষে মানুষকে আকর্ষণ করতো। তাঁর চরিতকারগণ ও ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁর অনিন্দ্যকান্তির উল্লেখ করেছেন।

দিব্যকান্তি

সুবর্ণ বর্ণ, আজানুলম্বিত ভুজ, দীর্ঘ দেহ, উন্নত নাসা, বিস্তৃত বক্ষ অনেককেই মুগ্ধ করেছে। মুরারির কড়চায় বাসুদেব সার্বভৌম যখন সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যকে দেখলেন তখনকার তাঁর রূপের বর্ণনা :

সুতপ্তকাঞ্চনাভাসং মেরুশৃঙ্গমিবাপরম্।
রাকাসুধাকরাকারমুখং জলজলোচনম্॥
সুনসং কম্বুকণ্ঠাঢ্যং মহোরস্কং মহাভুজম্।
বন্ধূকমুকুরারক্তদন্তচ্ছদ মনোহরম্॥
কুন্দাভদন্তমত্যন্ত চন্দ্ররশ্মিজিতস্মিতম্।
আজানুলম্বিতভুজং বিলসৎপাদপঙ্কজম্॥
কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বলং শশ্বৎ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্।
কূর্মোন্নতপদদ্বন্দ্বং দৃষ্ট্বাদৌ বিস্মিতোঽভবৎ॥[১]

—অপর একটি মেরুপর্বতের শৃঙ্গের মত তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ, পূর্ণিমার চন্দ্রমাতুল্য মুখমণ্ডল, মেঘসদৃশ চক্ষুবিশিষ্ট, সুন্দর নাসিকা বিশিষ্ট, শঙ্খতুল্য কণ্ঠ শোভিত, বিশালবক্ষঃসমন্বিত, মহাবাহু, বন্ধূককুসুমতুল্য রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধরে মনোহর, কুন্দকুসুমতুল্য শুভ্রদন্ত শোভিত, চন্দ্রকিরণজয়ী মৃদুহাস্য শোভিত, আজানুলম্বিত ভুজদ্বয় বিশিষ্ট, পদ্মসদৃশ পাদশোভিত, কৃষ্ণপ্রেমে কান্তিময়, কৃষ্ণপ্রেমজনিত পুলকে রোমাঞ্চিত দেহ, কূর্মের মত উন্নত পদদ্বয় বিশিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন (বাসুদেব সার্বভৌম)।

রূপ গোস্বামী লিখেছেন—

বিশালবক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল খেলাঞ্চিত ভুজঃ।[২]—বিশাল বক্ষ ও দীর্ঘ অর্গলদ্বয় সদৃশ বাহুদ্বয় বিশিষ্ট।

---

১ মু. ক.—৩।১১।৭-১০ ২ স্তবমালা—৫

প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর রূপ বর্ণনা করে লিখেছেন—

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ
বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্।
বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্ ॥[১]

—নৃত্যাবেশে কর ও চরণকে যিনি উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করছেন, যাঁর প্রকাণ্ড স্বর্ণদণ্ডের মত বাহুদ্বয়, নৃত্যদ্বারা চঞ্চল দেহ, পদ্মপর্ণ সদৃশ আয়ত চক্ষু, বিশ্বের অমঙ্গল নাশী হরি হরি এই ধ্বনি যিনি আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উচ্চারণ করছেন, সেই দেবচূড়ামণি অতুল রসাবিষ্ট চৈতন্যচন্দ্রকে বন্দনা করি।

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায়—

প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন ॥[২]

বৃন্দাবন দাস প্রদত্ত বর্ণনা :

চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্বকলা ॥
ললাটে চন্দন শোভে কাণ্ডবিন্দুসনে।
বাহু তুলি হরি বোলে শ্রীচন্দ্রবদনে ॥
আজানুলম্বিতমালা সর্ব অঙ্গ দোলে।
সর্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম নয়নের জলে ॥
দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলক শোভয়ে যেন কনক কদম্ব ॥
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দর্শন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগপত্তন ॥
গজেন্দ্র জিনিঞা স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তহি শোভে শুক্লযজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥

১ চৈতন্য চন্দ্রামৃত—১০ ২ চৈ. চ. মধ্য—১৭ পরি

চরণারবিন্দরম্য তুলসীর স্থান।
পরম নির্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥
উন্নত নাসিকা সিংহগ্রীব মনোহর।
সভা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥[১]

এই অনন্যসাধারণ দেবোপম কান্তি এবং অমিত ব্যক্তিত্ব উচ্চ নীচ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষকে আকর্ষণ করে এনেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের দেবদুর্লভ কান্তির সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে সর্বজনের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিল। চরিতগ্রন্থগুলিতে গৌরচন্দ্রের মানবিক সত্তাকে উপেক্ষা করে তাঁর ভাগবত সত্তার উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তথাপি মানবিক রূপটি একেবারে আচ্ছাদিত হয়ে যায় নি। বিশেষতঃ চৈতন্য ভাগবতে প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনের বিবরণে শ্রীচৈতন্যের মানুষী মূর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাল্যের দুরন্ত বালক নিমাই দুরন্তপনায় যেমন সাধারণ বালকদের অতিক্রম করেছিলেন, তেমনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে নবদ্বীপের তৎকালীন ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গকে বিস্মিত করেছিলেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি বহুশাস্ত্রদর্শী হয়ে ব্যাকরণের টীকা রচনা করে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হয়ে বিপুল যশের অধিকারী হয়েছিলেন। গয়া থেকে প্রত্যাগমনের পরে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা নিমাই পণ্ডিত যখন নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তাঁর অসাধারণ রূপ ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে উৎপীড়িত বৈষ্ণব-সমাজের সহজ স্বাভাবিক নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যেই তাঁর নব-আবির্ভাব।

প্রতিভা

বাল্যকাল থেকেই অসাধারণ নির্ভীক ছিলেন বিশ্বম্ভর। তাঁর নির্ভীকতার প্রমাণ তাঁর জীবনীগ্রন্থে বাল্যলীলায় ভূরি ভূরি ছড়ানো। এই উন্নতশির নির্ভীক পুরুষটি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একাই মাথা তুলে দাঁড়াতেন। তাঁর নেতৃত্বে হরিনাম-কীর্তনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল অগণিত নরনারী। জগাই-মাধাই নারোজীব মত পাষণ্ডই শুধু নয়, অত্যাচারী শাসকশ্রেণীভুক্ত কাজিকেও মাথা নত করতে হয়েছিল। এমনিই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা।

নির্ভীকতা

১ চৈ. ভা. মধ্য—২৩ অঃ

বজ্রাদপি কঠোর অথচ কুসুমাদপি মৃদু লোকোত্তর চরিত্রবিশিষ্ট এই পুরুষটির অন্তঃকরণ ছিল পরদুঃখকাতর—জীবের দুঃখে সদাই বিগলিত। দীন দরিদ্র শিল্পজীবী মানুষের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে তিনি তাদের সুখদুঃখের অংশভাক্ হতেন। গোপ, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বুলি, শঙ্খবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের গৃহে উপনীত হয়ে, দরিদ্রের দীন উপহার সানন্দে গ্রহণ করে তাদের আপ্যায়িত করেছিলেন, খোলাবেচা শ্রীধরের ফুটো লোহার বাটিতে জলপান করে দরিদ্রের মর্যাদা তুলে স্থাপন করেছিলেন। দীনহীন পতিতের দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যেই তিনি বাৎসল্যময়ী জননী ও প্রেমময়ী-সুন্দরী যুবতী পত্নীকে দুঃখসাগরে ভাসিয়ে সন্ন্যাস-গ্রহণ করেছিলেন। দীনদুঃখীর জন্য তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না।

জীবে দয়া

গৃহাশ্রমে অবস্থানকালে ও লক্ষ্মী পরিণয়ের পরে দীনদরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি যথাসাধ্য দান করতেন।

দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার ॥
দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কড়িপাতি দেন গৌরহরি ॥[১]

অতিথি সন্ন্যাসী আর্তজন স্বগৃহে এলে গৌরচন্দ্র তাদের অন্নাদি প্রদান করে তৃপ্ত করতেন। বৃন্দাবন আরও লিখেছেন—

অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার কারণে ॥[২]

নীলাচলেও কীর্তনীয়াদের ও ভক্তদের আকণ্ঠ জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন করিয়ে, দীন দরিদ্রদেরও তিনি ভোজন করিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন।

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে ॥
কাঙ্গালের ভোজন রঙ্গ দেখি গৌরহরি।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি ॥[৩]

সর্বজীবের প্রতি গভীর প্রেম থেকেই অপরাধীকে অনায়াসে ক্ষমা করার ক্ষমতা তিনি লাভ করেছিলেন। পাষণ্ড জগাই-মাধাই কেবল তাঁর ক্ষমা পায় নি, মহাপ্রভু তাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বললেন—

১ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ ৩ চৈ. চ. মধ্য ১৪ পরি

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস সব দায় মোর ॥[১]

তিনি অন্যান্য বৈষ্ণব ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

এই দুইয়ে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুইর পাপ মুঞি লইলুঁ আপনে ॥[২]

শুধু জগাই মাধাই নয়, সকল পাপীতাপীই মহাপ্রভুর ক্ষমা পেয়েছিল। সার্বভৌম জামাতা অমোঘ তাঁকে অপমান করেছিল, তাঁর অহেতুক নিন্দা করেছিল, তবু করুণার অবতার শ্রীচৈতন্য তাকে ক্ষমা করতে কুণ্ঠিত হন নি। অমোঘ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হলে মহাপ্রভু স্থির থাকতে পারেন নি, তিনি সার্বভৌমের গৃহে আগমন করে অমোঘের বুকে হাত দিয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেছিলেন।

চৈতন্য চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর ভক্তবৎসলতা। সকল পতিত দুঃখিত মানুষের প্রতি যাঁর করুণার অন্ত ছিল না তাঁর যে নিজ ভক্তের প্রতি স্নেহ পারবশ্য থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? নীলাচলে অবস্থানকালে ভক্তদের প্রতি তাঁর সদয় ব্যবহার সম্পর্কে মুরারি গুপ্ত লিখেছেন,—

ভক্তবৎসলতা

ভুক্ত্বা চতুর্বিধং দ্রব্যং ভক্তসংকল্পপালকঃ।
ভোজয়ামাস তান্ ভক্তান্ পুত্রপ্রায়েণ পালয়ন্ ॥
ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষ্বেতি বাৎসল্যরস মূর্তিমান্।
জগদানন্দ স্বরূপাদ্যৈর্বাক্যৈরেব দয়া নিধিঃ ॥
এবং ক্রমেন প্রত্যক্ষং সংবোধ্য কৌশলান্বিতঃ।
সংভোজ্য ভূরিদ্রব্যেণ চাতুর্বিধ্যেন বৈষ্ণবান্ ॥
গণ্ডূষাদিক্রিয়াঃ সর্বং সমাপ্য জগদীশ্বরঃ।
চন্দন পুষ্পমাল্যাভ্যাং ভূষয়িত্বা যথাক্রমম্ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত মুখ্যান্ ভক্তান্ গৌড় বাসিনঃ।
উৎকলস্থানপি শ্বেতদ্বীপস্থান্ বৈষ্ণবান্ প্রভুঃ ॥
লালয়ামাস করুণো বাৎসল্যাদ্ ভক্তবৎসলঃ।[৩]

১ চৈ. ভা. মধ্য ১৩ অঃ ২ চৈ. চ. মধ্য ১৫ পরি ৩ মু. ক.—৪।১।৩-৮

—ভক্তের ইচ্ছাপূরণকারী মহাপ্রভু চতুর্বিধ ভোজ্য ভোজন করে নিজ ভক্তগণকে পুত্রের ন্তায় পালন করে ভোজন করিয়েছিলেন। মূর্তিমান্ বাৎসল্যরসের বিগ্রহ,দয়ানিধি জগদীশ্বর 'তুমি খাও তুমি খাও' বলে জগদানন্দ স্বরূপ প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষভাবে কৌশলে প্রবোধিত করে চতুর্বিধ প্রভূত খাগুদ্রব্যের দ্বারা বৈষ্ণবদের ভোজন করিয়ে গণ্ডুষ প্রভৃতি সকল কর্ম সমাপন করে চন্দন ও পুষ্পমাল্যদ্বারা যথাক্রমে ভূষিত করেছিলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ গৌড়বাসী ভক্তগণকে এবং উৎকলবাসী শ্বেতদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণকে ভক্তবৎসল করুণাময় বাৎসল্যবশে লালন করেছিলেন।

গোবিন্দদাস কর্মকার লিখেছেন, দক্ষিণভারতে এক সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্তকে আতিথ্যগ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি সন্ন্যাসীর নিকট থেকে নিজের জন্য ছুটি মাত্র 'পরটা' নামে ফল গ্রহণ করলেন এবং গোবিন্দকে ছু চারটি ফল দিয়েছিলেন। সুস্বাদু ফল খেয়ে প্রভুর ফলদুটির দিকে গোবিন্দ লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকানোর ফলে মহাপ্রভু তাঁর ফল ছুটিও গোবিন্দকে দিয়ে ভোজনের আদেশ দিলেন—

লোভ করি কতবার এ পাপ নয়ন।
প্রভুর ফলের পানে চাহে অনুক্ষণ ॥
গৌরাঙ্গ সুন্দর তাহে ঈষৎ হাসিয়া।
নিজফল ছুটি দিলা আমারে ধরিয়া ॥[১]

প্রভু গোপনে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরে নিত্যানন্দকে প্রেরণ করেছিলেন নবদ্বীপে ভক্তগণকে প্রবোধ দেবার জন্য। নীলাচলে গমনের প্রাক্কালে তিনি ভক্তদের বলেছিলেন সান্ত্বনা দিয়ে—

চিত্তে কেহো কোনো কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা সভা আমি নাহি ছাড়িব সর্বথা ॥
কৃষ্ণনাম সভে বসি লহ গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন কথোক ভিতরে ॥
এত বলি মহাপ্রভু সর্ব বৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে ॥[২]

---

১ গো. ক.—পৃঃ ৩১ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য. ২অঃ

সনাতন সংসার ত্যাগ করে কাশীতে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলে প্রভু সনাতনের দেহে হাত বুলিয়ে ভক্ত বাৎসল্যের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন—

তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপর আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জন।
তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শ আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥[১]

কঠিন চর্মরোগাক্রান্ত সনাতন যখন নীলাচলে এসেছিলেন তখন মহাপ্রভু সনাতনের নিষেধ অগ্রাহ্য করেও তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তখন জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলেছিলেন—

নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়া এ দুঃখ অপার॥[২]

সনাতন মহাপ্রভুকে বলেছিলেন—

সহজে নীচ জাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্তরস চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে॥
বীভৎস অঙ্গ স্পর্শিতে না কর ঘৃণালেশ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্বনাশ॥[৩]

তখন—

প্রভু কহে সনাতন না ভাবিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥[৪]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ২০ পরি ২ তদেব অন্ত্য. ৪ পরি ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ৪ পরি
৪ চৈ. চ. অন্ত্য ৫ পরি

প্রভু জোর করে ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন করতেন। অবশেষে প্রভুর কৃপায় সনাতন বীভৎস চর্মরোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। অদ্বৈতালয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ভক্তদের বলেছিলেন,—জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন।[১]

যদিও মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে সদাই আনন্দিত, তথাপি প্রতি বৎসর গৌড় থেকে নীলাচলে যাতায়াতের কষ্টের জন্য ভক্তদের নিষেধ করেছিলেন।

প্রতিবর্ষ আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাহ বহুমতে॥
তোমা সবার দুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গসুখ লোভ বাড়ে চিতে॥[২]

কাশীমিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্যের অবস্থানের ব্যবস্থা হলে তিনি সার্বভৌমকে বলেছিলেন—এই দেহ তোমাদেরই, তোমরা যা ব্যবস্থা করবে তাতেই আমার মত।[৩]

রঘুনাথ দাস গৃহত্যাগ করে পথক্লেশ স্বীকার করে নীলাচলে আগমন করলে মহাপ্রভু সাদরে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করে স্বরূপ দামোদরের হাতে তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন। পথক্লান্ত রঘুনাথের শুশ্রূষার জন্য তিনি ভৃত্য গোবিন্দকে আদেশ করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠিকই বলেছেন—চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।[৪] বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

প্রভু সে জানেন ভক্ত দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখী জীব না ভজে কেমতে॥
করুণাসাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে গুণমাত্র লয়॥[৫]

ভক্তবৎসলতার মত শ্রীচৈতন্যের আবাল্য পিতৃমাতৃভক্তি অটুট ছিল। বাল্যে ও কৈশোরে মায়ের উপরে নানাবিধ অত্যাচার করলেও তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মায়ের প্রতি আশ্চর্য মমতা প্রকাশ করেছেন এবং

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য ২অঃ ২ চৈ. চ. অন্ত্য. ১২ পরি ৩ চৈ. চ. মধ্য ১০ পরি
৪ তদেব অন্ত্য ৬ পরি ৫ চৈ. ভা. অন্ত্য ১ অঃ

মায়ের দুঃখ দূরীকরণের প্রয়াস করেছেন। নিমাই-এর বাল্যে যখন বিশ্বরূপ সংসারাশ্রম ত্যাগ করলেন, জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রব্রজ্যা গ্রহণের শোকে যখন পিতামাতা ব্যাকুল তখন বালক নিমাই তাঁদের পরিচর্যার সংকল্প ঘোষণা করে তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন।

মাতৃপিতৃ ভক্তি

তেতো হরিঃ প্রাহ পিতর্গতো মে ভ্রাতা ভবন্তং পরিহায় দূরম্।
ময়ৈব কার্য্যা ভবতশ্চ সেবা মাতুশ্চ নিত্যং সুখমাপ্নুহি ত্বম্॥[১]

—তারপর হরি বললেন, পিতঃ! আমার ভ্রাতা তোমাকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেছে। আমি তোমার এবং মায়ের নিত্য সেবা করবো—তুমি আশ্বস্ত হও।

তিনি মাকে বললেন—

গতোঽগ্রজো মে ভবতীমুপেক্ষ্য ব-
স্তিতিক্ষয়াসৌ পিতরঞ্চ শান্তিমান্।
ময়ৈব কার্য্যা জনকস্য তেঽপি চ
ক্ষণাৎ সপর্য্যা সকলৈব নিত্যশঃ॥[২]

—মা, আমার অগ্রজ তোমাকে ও শান্তিমান পিতাকে উপেক্ষা করে তিতিক্ষাবশে চলে গেছেন, আমি স্বল্পকাল মধ্যে তোমার ও জনকের সেবা নিত্যই করবো।

বৃন্দাবন বলেছেন, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণের পরই নিমাই-এর দুরন্তপনা কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল, তিনি পিতা-মাতার নিকটেই থাকতেন পিতামাতার দুঃখ লাঘব করতে—

নিরবধি থাকে পিতামাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয় যেন জননী জনকে॥[৩]

তারপর এল যখন ঘোরতর দুর্দিন,—জগন্নাথ মিশ্র হলেন অকস্মাৎ লোকান্তরিত, তখন সদ্যোবিধবা শচীর মত নিমাইও শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন—মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।[৪] মুরারির বিবরণে মুমূর্ষু পিতার চরণদ্বয় ধারণ করে গদগদভাবে বিলাপ করতে করতে নিমাই বলেছিলেন, আমার পরিত্যাগ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ?—

---

১ মু. ক.—১।৭।৯ ২ চৈ. চ. মহা.—২।৯৯ ৩ চৈ. ভা. আদি ৬ অঃ
৪ চৈ. ভা. আদি ৭ অঃ

অথ তস্য পদদ্বয়ং হরিঃ পিতুরালিঙ্গ্য সগদ্‌গদস্বরম্‌
অবদৎ পিতরাশু মাং প্রভো পরিহায় ক্ব ভবান্‌ গমিষ্যসি ॥[১]

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যেও নিমাই-এর অনুরূপ আচরণ ও বিলাপের বিবরণ আছে :

পিতুঃ পদং বক্ষসি দুঃখিতাত্মনা
নিধায় তেপে নিতরাং কৃপাবতা।
পিতঃ ক্ব মাং প্রোজ্‌ঝ্য সুদীনমেকং
শিশুং কথং হন্ত ভবান্‌ গমিষ্যসি ॥[২]

—কৃপাময় দুঃখিতাত্মা নিমাই পিতার পদ বক্ষে ধারণ করে অত্যন্ত শোক করতে লাগলেন—হে পিতঃ, একাকী সুদীন শিশু আমাকে ফেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?

লোচন লিখেছেন,—

পিতার চরণ ধরি কাঁদে বিশ্বম্ভর।
সম্বরিতে নারে কণ্ঠ গদগদ স্বর ॥[৩]

লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পরিণয়ের প্রাক্কালে পরলোকগত জগন্নাথের কথা স্মরণ করে মাতাপুত্রে শোক বিহ্বল হয়েছিলেন।

মাতুরিত্থং করুণোদিতং প্রভু-
র্নিশম্য তাতস্মৃতিদুঃখবিহ্বলঃ।
মুক্তাফলস্থূলবিলোচনাম্ভসাং
বিন্দূনুবাহ প্রববোরুবক্ষসি ॥[৪]

—মায়ের মুখে এইরূপ করুণ বাক্য শুনে পিতার স্মরণে দুঃখবিহ্বল প্রভু মুক্তাফলসদৃশ বক্ষঃস্থল প্রবাহিত লোচনাশ্রু বহন করতে লাগলেন।

মুক্তাফল স্থূলতরাশ্রুবিন্দূন্‌ উবাহ বক্ষঃস্থলহারবিভ্রমান্‌।[৫]

—বক্ষঃস্থলের হারের মত মুক্তাফলসদৃশ স্থুল অশ্রু বহন করতে লাগলেন।

মাতাপুত্রের আলাপনের এই দৃশ্য কী করুণ, কী মর্মস্পর্শী! মাকে বিশ্বম্ভর সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন,—মা, আমার ধনজন কি কিছুই নেই যে পিতা স্বর্গে

---

১ মু. ক.—১।৮।১৬ ২ চৈ. চ. মহা.—২।১১৮ ৩ চৈ. ম. আদিখণ্ড
৪ চৈ. চ. মহা.—৩।৫৩ ৫ মু. ক.—১।১০।৬

গেছেন বলে তুমি এখন এই কথা বলছ, দীনের মত পরাশ্রিত বোধ করছো।

ধনানি বা মে মনুজাশ্চ মাতর্ন সন্তি কিং যেন বচঃ সমীরিতম্।
ত্বয়াদ্য দীনেব পরাশ্রয়ং যতঃ পিতা মমাদর্শতামগাদিতি ॥[১]

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেও গৌরচন্দ্র অনাথা মায়েব কথা চিন্তা করছেন, ভক্তগণের সঙ্গে পরামর্শকালে তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—

মাতরং সংপরিত্যজ্য গতে ময়ি দিগন্তরম্।
সর্বে মাং সংবদিষ্যন্তি বিরুদ্ধং কৃতবানসৌ ॥[২]

—মাকে ত্যাগ করে দেশান্তরে গেলে, সকলে ত বলবে এই ব্যক্তি অশোভন কর্ম করেছে।

বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন যে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের সংবাদ পেয়ে শচী ভাবনায় চিন্তায় অস্থিচর্মসার হয়েছিলেন, করুণার্দ্রহৃদয় গৌরচন্দ্র তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। গৃহত্যাগ করার সময় তিনি দেখলেন, মা বসে আছেন বাইরের দরজায়, তখন করুণাময় নিমাই মাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাত্রা করেছিলেন।

জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর ॥
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পঢ়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥
আপনার তিলার্দ্ধেকো না লইলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলা ভোগ ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শুধিবার ॥[৩]

তারপর সন্ন্যাসী পুত্রের সঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে যখন মাতার মিলন হোল, তখন সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী সন্ন্যাসীপুত্রকে দেখে যখন শচী মা বিহ্বল হয়ে কাঁদছেন, তখন নিমাই মাকে প্রবোধ দিয়ে মায়ের আজ্ঞা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

---

১ মু. ক.—১।১০।৮ ২ মু. ক.—২।১২।৭ ৩ চৈ. ভা. মধ্য ২৫ অঃ

প্রভু ত কান্দিয়া বলে শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হতে।
কোটিজন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি বা না জানি কৈল যত্তপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ মুঞি তাহাই কহিমু।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ তাহাই করিমু॥[১]

শচীদেবী নবদ্বীপ ও জগন্নাথক্ষেত্র পুরীর মধ্যে সহজ যোগাযোগের কথা চিন্তা করে সন্ন্যাসী-পুত্রকে নীলাচলে বাস করার অনুমতি দিলেন। মায়ের অনুমতি ক্রমেই শ্রীচৈতন্য নীলাচলে বাস করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

মুরারি বলেছেন যে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবধূতকে নবদ্বীপে প্রেরণ করলেন মাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্তিপুরে নিয়ে আসার জন্য। শান্তিপুরে শচীদেবী আগমন করলে তিনি বলেছিলেন,—তিষ্ঠামি সততং মাতস্তব সন্নিহিতো হ্যহম্।[২] মা আমি সব সময়েই তোমার কাছে আছি।

লোচনদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্যকর্তৃক মাতৃসান্ত্বনা:

মায়ের কান্দনা দেখি জগৎ ঈশ্বর।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল বিশ্বম্ভর॥
মায়েরে কহিল আর না কান্দহ তুমি।
তোমার কান্দনায় চিত্তে দুঃখ পাই আমি॥[৩]

সর্বত্যাগী নির্মম সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অন্তরে অনাথিনী পতিপুত্রহীনা জননীর জন্য ছিল অপূর্ব মমত্ববোধ। মায়ের কথা তিনি কখনই বিস্মৃত হন নি। দক্ষিণভারত পরিক্রমা সেরে নীলাচলে ফিরে তিনি কৃষ্ণদাসকে মহাপ্রসাদ সহ নবদ্বীপে প্রেরণ করেছিলেন শচীমাতার কাছে।[৪]

নিত্যানন্দকে তিনি গৌড়ে পাঠালেন প্রেমভক্তি প্রচার করতে, সঙ্গে সঙ্গে বললেন—

---

১ চৈ. ভা. মধ্য ৩ পরি   ২ মু. ক.—৪।৪।২২   ৩ চৈ. ম. আদি—পৃঃ ৭১
৪ চৈ. চ. মধ্য. ১০ পরি

এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এ সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম নহে কৈল আমি নিজ ধর্মনাশ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি তাঁর সেবা ধর্ম।
তাঁহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥[১]

পুরী থেকে বৃন্দাবন-মথুরা যাবেন শ্রীচৈতন্য, কিন্তু যাবেন তিনি গৌড়দেশ ঘুরে, উদ্দেশ্য জননী জন্মভূমি দর্শন। তিনি বললেন,—

গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥[২]

বৃন্দাবন গমনের পরিকল্পনা বর্জন করে গৌড় থেকে নীলচলের পথে ভক্তদের অনুরোধে এলেন নবদ্বীপে, ভূমিষ্ঠ হয়ে বন্দনা করলেন মাতৃচরণ—আগত্য মাতুশ্চরণাভিবন্দনং ভূমৌ নিপত্য কৃতবান্ মাতৃভক্তঃ।[৩]

এবারেও অদ্বৈত আচার্যের গৃহে এসে তিনি মাকে আনালেন নবদ্বীপ থেকে, মায়ের রান্না ভক্তগণ সহ পরমানন্দে ভোজন করলেন।

মাতরং ভক্তবৃন্দঞ্চ মাতৃভক্তশিরোমণিঃ
নবদ্বীপাৎ সমানয্য তদ্দুঃখং পরিমোচয়ন্।
তয়া পাচিতমন্নঞ্চ চাতুর্বিধ্যং যথোচিতম্
ভক্তাহ্লাদশতৈর্ভুক্তো নিত্যানন্দকুতূহলী॥[৪]

শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন বটে কিন্তু মায়ের আজ্ঞা নেওয়া হয় নি। তাই এবার মায়ের অনুমতি নিলেন—

মাতার চরণে ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা নিল॥[৫]

নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে মায়ের দেখাশোনার জন্য নবদ্বীপে প্রেরণ করেছিলেন।

১ চৈ. চ. মধ্য. ১৫ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি ৩ মু. ক.—৪।৩।৪
৪ মু. ক.—৩।১৮।১৯-২০ ৫ চৈ. চ. মধ্য. ১১ পরি

প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা॥
তোমা বিনে তাহাকে রক্ষক নাহি আন্।[১]

তিনি দামোদরকে আরও বললেন,—

মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে॥
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাহা করিও গমনে॥
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখেরকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥
নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে॥[২]

দামোদরকে মায়ের সেবার জন্য নবদ্বীপে প্রেরণ করেও প্রভুর তৃপ্তি হোল না। তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠালেন মায়ের সেবার জন্য।

পূর্ববর্ষ জগদানন্দ আইসে দেখিবারে।
প্রভু আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া নগরে॥
আয়ীর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্রপ্রসাদ কৈল নিবেদন॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনতি স্তুতি মাতারে কহিলা॥[৩]

একবার নয় প্রতি বৎসরই মাতৃভক্ত গৌরাঙ্গ জগদানন্দকে নবদ্বীপে মায়ের কাছে পাঠাতেন জগন্নাথের প্রসাদ সহ।

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তারে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ-দুঃখিত জানি জননী আশ্বাসিতে॥
নদীয়া চলহ মাতাকে কহিয় নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥

---

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ১২ পরি

* * *

তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীনে আমি পুত্র সে তোমার ॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার অজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ নারিব ছাড়িতে ॥[১]

কেবল পিতামাতা নয় অগ্রজ বিশ্বরূপের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর স্নেহ। কবিরাজ গোস্বামীর বিবরণ মতে বিশ্বরূপের অনুসন্ধান ছিল তাঁর দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার অন্যতম লক্ষ্য।[২]

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এই অপূর্ব মাতৃভক্তি জগজ্জনের শিক্ষণীয়। তিনি যে বলেছিলেন জনক-জননীর সেবা করবেন, কাছে না থেকেও সেই বাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

অথচ এই কোমলহৃদয় সন্ন্যাসী সন্ন্যাসধর্ম আচরণে ছিলেন কঠোর, অবিচল। যদিও তিনি সার্বভৌমকে বলেছিলেন যে তিনি সন্ন্যাসী নন, কৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্ত হয়ে শিখাসূত্র মুড়িয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছেন[৩] তথাপি তিনি সন্ন্যাসের নিয়ম নিষ্ঠাভরে পালন করতেন। কেবল নিজের ক্ষেত্রে নয়, তাঁর ভক্ত যাঁরা সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন, তাঁদেরও কঠোর ভাবে সন্ন্যাসের রীতিনীতি মেনে চলতে হোত।

সন্ন্যাসধর্মের কঠোরতা

সন্ন্যাসগ্রহণ করার পর শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন—সঙ্গে ছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—তখন তিনি প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কারো কাছে কিছু সঞ্চয় আছে কিনা—

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সভা প্রতি।
কি সম্বল আছে কহ কাহার সংহতি ॥
কে বা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহ ত সকল ॥[৪]

বারাণসীতে সনাতন যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন সেই সময়ে

---

১ চৈ. চ. অন্ত্য ১৯ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ৭ পরি ৩ চৈ. ভা. অন্ত্য ২ অঃ
৪ চৈ. ভা. অন্ত্য ২ অঃ

সর্বত্যাগী সনাতনের দেহে ছিল একখানি মূল্যবান ভোটকম্বল। মহাপ্রভু সনাতনের দেহে এই সম্পদটি পছন্দ করছিলেন না, তিনি বারে বারে ভোট কম্বলের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ভোটকম্বলের পানে প্রভু চাহে বারে বার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥[১]

সুতরাং সন্ন্যাসী সনাতন প্রভুর প্রীতির জন্য এক ব্যক্তির কাছ থেকে ভোট কম্বলের পরিবর্তে একটি ছেঁড়া কাঁথা চেয়ে নিয়েছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর কৃপালাভেব আশায় অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষয়ী বলে তিনি প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে দূরে থেকেছেন। একদিন প্রতাপরুদ্র নৃত্যকালে ভূলুন্ঠিত চৈতন্যদেবকে স্পর্শ করায় মহাপ্রভু দুঃখিত হয়েছিলেন।

রাজা দেখি প্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥[২]

রঘুনাথ দাসকে তিনি বিষয়ের দোষ সম্পর্কে বলেছিলেন—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম করায় যাতে ভব হয় বন্ধ॥[৩]

অদ্বৈত আচার্যের ভৃত্য কমলাকান্ত বিশ্বাস অদ্বৈত আচার্যের তিনশত টাকা ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে আচার্যের আজ্ঞাতে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের কাছে একটি পত্রী পাঠিয়েছিলেন, সেই পত্রী পড়লো মহাপ্রভুর হাতে। পত্র পড়ে প্রভুর অত্যন্ত দুঃখবোধ হলো, তিনি গোবিন্দকে আদেশ করলেন কমলাকান্ত যেন তাঁর নিকটে না আসে।

গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ইঁহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে এথা না দিবে আসিতে॥[৪]

তিনি আচার্যকেও উপদেশ দিলেন—

প্রতিগ্রহ না করিবে কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥

---

১ চৈ. চ. মধ্য ২০ পরি   ২ চৈ. চ. মধ্য ১০ পরি   ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ৬ পরি
৪ চৈ. চ. আদি ১২ পরি

মন তুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্মকীর্তি হয় হানি।
এই কর্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥[১]

রঘুনাথ দাসকেও তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন—

গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানি মানদ কৃষ্ণ সদা নাম লবে।[২]

কিন্তু সকল বৈষ্ণবকেই তিনি এইভাবে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে কঠোর বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করতে বলেন নি। ঘরে বসে নাম সংকীর্তন করে কৃষ্ণোপাসনা গৃহীর কর্তব্য বলে তিনি নির্দেশ করেছেন। রঘুনাথ দাস যখন শান্তিপুরে মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গমনের মানসে সাক্ষাৎ করেন, তখন মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলেছিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরেতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥[৩]

ভণ্ড সন্ন্যাসীর মর্কট বৈরাগ্য স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীচৈতন্যের আদরণীয় ছিল না। সকল কার্যের মত সন্ন্যাসের অধিকার অর্জন করতে হবে, প্রভু এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তাই রায় রামানন্দের বাহ্যিক বিষয় ভোগ সত্ত্বেও আন্তরিক অনাসক্তি মহাপ্রভুর সশ্রদ্ধ প্রশংসা লাভ করেছিল। সন্ন্যাসীর আচরণীয় বিধি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য বলেছেন—

বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥

---

১ চৈ. চ. আদি ১২ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য ৬ পরি ৩ চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর রসে হয় বশ॥
বৈরাগার কৃত সদা নাম সংকীর্তন।
শাকপত্র ফলমূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি যায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥[১]

সন্ন্যাসীর আচরণীয় নিয়ম নিষ্ঠা তিনি যে কঠোর ভাবে পালন করতেন রায় রামানন্দের প্রতি তাঁর উক্তিতে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয়বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়॥[২]

শিবানন্দ সেনের বাড়ীতে জগদানন্দ গাগরি ভরে সুগন্ধি তেল এনেছিলেন মহাপ্রভুর জন্য। জগদানন্দের ইচ্ছানুসারে ভৃত্য গোবিন্দ মহাপ্রভুকে বলেছিল—

জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন॥
তার ইচ্ছায় প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত ব্যাধি প্রকোপ শান্ত হঞা যায়॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়েতে করিয়া।
ইহা আনিয়াছে বহু যতন করিয়া॥[৩]

কিন্তু প্রভু কোন প্রকার ভোগ বিলাসে আসক্ত ছিলেন না। লোক-শিক্ষার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন তিনি কাম্য মনে করেছিলেন।

প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈল নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥[৪]

---

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৬ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ১২ পরি ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ১২ পরি
৪ চৈ. চ. অন্ত্য ১২ পরি

দিন দশেক পরে গোবিন্দ আর একবার প্রভুকে সুগন্ধি তৈলের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে প্রভু ঈষৎ রুষ্ট হয়ে গোবিন্দকে তিরস্কার করেছিলেন।

শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে।
মর্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দনে।
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্বনাশ তোমা সবা পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈল গন্ধ মোর যে পাইবে।
দারি সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥[১]

জগদানন্দ ক্ষোভে প্রভুর সম্মুখেই তৈলের কলসী ভেঙ্গে ঘরে কপাট দিয়ে তিন দিন শুয়েছিলেন। তিন দিন পরে মহাপ্রভু জগদানন্দের গৃহে স্বেচ্ছায় অন্ন ভোজন করে ভক্তের দুঃখ মোচন করেছিলেন।

প্রভুর সুন্দর স্বাস্থ্য ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম পালন করতে গিয়ে তিনি কলার শরলাতে শয়ন করতেন। এতে তাঁর হাড়ে ব্যথা লাগে ভক্তরা দুঃখিত। পণ্ডিত জগদানন্দ সূক্ষ্ম বস্ত্র এনে গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে শিমুল তুলো ভরিয়ে দিলেন প্রভুর শয়নের জন্য গোবিন্দের কাছে। তিনি স্বরূপ দামোদরকে অনুরোধ করলেন এই তোষকে প্রভুকে শয়ন করাতে। প্রভু তুলার গাণ্ডু দেখে রুষ্ট হলেন। জগদানন্দের নাম শুনে সংকোচ বোধ করলেও গোবিন্দকে তিনি নির্দেশ দিলেন তুলার শয্যা দূর করতে এবং যথাপূর্বং কলার শরলার উপরেই শয়ন করলেন। তিনি স্বরূপকে বললেন রসিকতার সঙ্গে খাট এনে দিতে।

প্রভু কহেন খাট এক আনহ পড়িতে।
জগদানন্দ কি চায়ে আমার বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট তুলী বালিশ মস্তক মুণ্ডন॥[২]

সন্ন্যাসী রামচন্দ্রপুরী পুরীতে অবস্থান করে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের বিধিনিষেধ পালনের একটি ত্রুটি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থকাম হলেন। শেষে তিনি একটি ছিদ্র খুঁজে বার করলেন। মহাপ্রভু চিরদিনই

১ চৈ. চ. অন্ত্য ১২ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য ১৩ পরি

ভোজন রসিক ছিলেন এবং পরিমাণেও বেশী খেতেন। রামচন্দ্র এখানেই ছিদ্র পেয়ে গেলেন।

সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয় বারণ।।[১]

এই বলে রামচন্দ্র প্রভুর নিন্দা করে বেড়াতে লাগলেন। প্রভু পুরীকে গুরুর মত সম্মান করতেন। পুরীর মুখে নিন্দা শুনে তিনি গোবিন্দকে বললেন, তাঁর প্রাত্যহিক আহার্যের পরিমাণ হবে 'এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন'।

স্বল্প পরিমাণ খাদ্যের অর্ধেক ভোজন করতেন মহাপ্রভু, বাকী অর্ধেক গোবিন্দ। উভয়েই অর্ধাশনে কাল কাটাতে থাকেন। এই সংবাদ শুনে ভক্তরাও অনাহারে দিন কাটান। অর্ধাহারে প্রভুর দেহ শীর্ণতর হয়। পরমানন্দ পুরী প্রভুকে বললেন, রামচন্দ্র নিন্দুক, নিজে যথেষ্ট আহার করে, অন্যকে সযত্নে ভোজন করিয়ে আবার তার নিন্দা করে থাকেন। প্রভু কিন্তু ভক্তদের অনুরোধ রাখলেন না। তিনি তাঁদের বললেন—

যতি হঞা জিহ্বা লম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়।।[২]

দুপণ কড়ি মূল্যের খাদ্যের অর্ধাংশ মাত্র তিনি গ্রহণ করতেন, বাকী অর্ধাংশ ভক্তদের প্রসাদ। রামচন্দ্রপুরী জগন্নাথক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে গেলে তবে ভক্তরা স্বচ্ছন্দে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

এইভাবে যথাসাধ্য সন্ন্যাসীর সংযম নিয়ম পালন করে শ্রীচৈতন্য সকল মানুষকে যতিধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন।

এই বজ্রাদপি কঠোর কুসুমাদপি মৃদু সন্ন্যাসীর অভ্যন্তরে একটি রসিক প্রাণ বিরাজ করতো। প্রভুর রসিকচিত্তের স্ফূরণ বাল্যকাল থেকেই হয়েছিল।

ভোজন রসিকতা

একদিকে তিনি ছিলেন ভোজন-রসিক অন্যদিকে তিনি ছিলেন পরিহাস-রসিক। তাঁর ভোজন-রসিকতার উল্লেখ আছে চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈতগৃহে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের ভোজন বর্ণনায়। প্রচুর অন্ন-ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদির আয়োজন করেছিলেন

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৮ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য ৯ পরি

অদ্বৈতাচার্য; তাঁরই অনুরোধে তুই বিরক্ত সন্ন্যাসী প্রচুর ভোজন করেছিলেন। অদ্বৈতের পরিবেষণ ও প্রভুর ভোজন বর্ণনা :

অর্ধ অর্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য করেন পূরণ।
এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥
ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রভুকে প্রার্থনা।
প্রভু কহে আর কত করিব ভোজন ॥
আচার্য কহে যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্ধেক খাইবা ॥
নানা যত্ন দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন।
আচার্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥[১]

বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করিয়েছিলেন। সেই খাদ্যদ্রব্যের বিশাল ফর্দ অদ্যকার দিনে নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আয়োজন যেমন ছিল বিপুল, সন্ন্যাসী ভোজন করেছিলেনও তেমনি প্রচুর। এই আশ্চর্য ভোজনের দৃশ্য দেখে সার্বভৌম-জামাতা অমোঘ ক্রুদ্ধ হয়ে নিন্দা করেছিল :

এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥[২]

শচীমাতার বাহান্ন ব্যঞ্জন রন্ধন ও পুত্রকে ভোজন করানোর বিবরণও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

কৌতুকপ্রিয়তা ছিল নিমাই-এর সহজাত। বাল্যের দুরন্তপনাতেই এই কৌতুকবোধের প্রকাশ। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থী নরনারীদের উপর উপদ্রব এবং স্নানার্থিনী কুমারীদের বিয়ে করতে চাওয়ার মধ্যে বালক নিমাই-এর কৌতুকবোধের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। সহপাঠী মুরারিকে ডেকে জাতি ভুলে কিশোর নিমাই করতেন রসিকতা—

কৌতুকপ্রিয়তা

প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দঢ় ॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥[৩]

১ চৈ. চ. মধ্য. ৩ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ১৫ পরি ৩ চৈ. ভা. আদি ৯ অঃ

তরুণ অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিত ভট্টাচার্য পণ্ডিতদেরও ব্যঙ্গ করতেন।

প্রভু কহে সন্ধিকার্য নাহিক যাহার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার ॥[১]

নবদ্বীপের ছাত্র অধ্যাপকদের ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করার ঘটনাতেও নিমাই পণ্ডিতের কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় নিহিত। যদিও তিনি নিজে ছিলেন শ্রীহট্টের লোক জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, তবু পূর্ববঙ্গের মানুষদের বাঙ্গাল ভাষায় রসিকতা করে আনন্দ পেতেন।

বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিযা হাসিয়া ॥[২]

তরুণ অধ্যাপক ছাত্রদের সঙ্গেও রসিকতা করতে ছাড়তেন না। কোন ছাত্রের কপালে তিলক না থাকলে তিনি বলতেন—

তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে ॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥[৩]

জন্ম সম্পর্কে শ্রীহট্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই তিনি শ্রীহট্টিয়াদের শ্রীহট্টের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে বিব্রত করে তুলতেন। সুতরাং শ্রীহট্টাগত ছাত্রবর্গের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বিতর্ক চলতো।

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে হয় হয়।
তুমি কোন দেশী তাহা কহ ত নিশ্চয় ॥
পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কোন যুক্তি ইথে হয় ॥[৪]

১ চৈ. ভা. আদি ৯ অঃ ২ চৈ. ভা. আদি ৯ ১২ অঃ ৩ চৈ. ভা. আদি ১২ অঃ

৪ চৈ. ভা. আদি ১৩ অঃ

আর একটি সুন্দর রসিকতার বিবরণ দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। এই রসিকতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করে। একদিন শচীদেবী বললেন যে তিনি রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন, নিমাই ও নিতাই রাম ও কৃষ্ণসহ কাড়াকাড়ি করে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ভোজন করছেন। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ রসিকতা করে বলেছিলেন—

তোমার ঘরের মূর্তি পরতেক বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়॥
মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধা আধি না থাকে না কহোঁ কারে লাজে॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥[১]

শ্রীধরের কাছ থেকে থোড় কলা মূলা খোলা কিনতে গিয়ে প্রতিদিন কলহ করে ফিরতেন বিশ্বম্ভর, অর্ধমূল্য দিয়ে জিনিষ নিয়ে চলে আসার সময় শ্রীধরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।[২]

নীলাচলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়মব্রত পালন করতেন, তখনও তাঁর অন্তঃকরণ বিরক্ত সন্ন্যাসীর মত শুষ্ক রুক্ষ হয় নি, পরন্তু স্বাভাবিক সরসতায় পূর্ণ ছিল। পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌম, অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, রামানন্দ স্বরূপ, শ্রীবাস, রাঘব পণ্ডিত, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তবর্গের সঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলক্রীড়ায় মহাপ্রভুর রসিকতার বিবরণ আছে। শিশুসুলভ চাপল্যের সঙ্গে এই সব বয়ো-বৃদ্ধদের জলক্রীড়ার সময়ে মহাপ্রভু বৃদ্ধ অদ্বৈতের উপরে শয়ন করে শেষ শয্যার অভিনয় করেছিলেন।

হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁর শেষ-শয্যা কৈল॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।
শেষ-শায়ি-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥[৩]

কৃষ্ণ জন্মযাত্রায় মহাপ্রভুর গোপবেশে লগুড় ঘোরানোও তাঁর রসিক অন্তঃকরণের পরিচয় দেয়। গোপবেশে প্রভু দধিদুগ্ধের ভার কাঁধে নিয়ে

১ চৈ. ভা. মধ্য. ৯ অঃ ২ চৈ. ভা. মধ্য ৯ অঃ ৩ চৈ. চ. মধ্য ১৪ পরি

চলেছেন। অদ্বৈত বললেন, তুমি যদি সত্যই গোপ হও, তবে লগুড় ঘোরাতে হবে।

তবে লগুড় প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়ে ধরিলা॥
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।
পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে॥[১]

একদিন মহাপ্রভু অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা হৈতে আইলা করিলা কোন কার্য? অদ্বৈত বললেন, আগে জগন্নাথ দেখলাম, পরে পাঁচ সাতবার জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করলাম। শুনে প্রভু বললেন, তুমি হেরে গেলে। অদ্বৈত এ কথার হেতু জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বললেন, যতক্ষণ তুমি পিছন দিকে চলছিলে, ততক্ষণ ত তুমি জগন্নাথ দেখতে পাও নি; আমি ততক্ষণ জগন্নাথ দেখছিলাম, আমার চোখ আর কোথাও যায় নি।

যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠ দিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা॥
আমি ততক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত॥[২]

চৈতন্য পরিকরবৃন্দও অনেকে সুরসিক ছিলেন। স্বরূপ দামোদর ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দুই সখা চৈতন্যের আগে পরস্পরের পদধূলি নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন, কারণ উভয়েই তুল্য বলবান। শ্রীচৈতন্য রঙ্গ দেখে হাসতে থাকেন।

দুইজনে চাহেন দুঁহার পদধূলি॥
দুঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি॥
কেহো কারে না পারেন দুই মহাবলী।
করায়েন হাসেন গৌরাঙ্গ কুতুহলী॥[৩]

ধর্মচর্যায় নিরত রিক্ত সন্ন্যাসী ভক্তপরিকরগণের সঙ্গে নানাভাবে হাস্য-পরিহাসে কালযাপন করে অন্তঃকরণের সরসতাটুকু বজায় রেখেছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ নীলাচলে প্রভুকে ভিক্ষায় গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করতেন তিনি

১ চৈ. চ. মধ্য ১৫ পরি ২ চৈ. ভা. অন্ত্য. ১০ অঃ ৩ চৈ. ভা. অন্ত্য ১০ অঃ

তাদের বলতেন আগে লক্ষেশ্বর হও। এই শুনে ব্রাহ্মণগণ চিন্তিত হয়েছিলেন; কারো সহস্র টাকাও নেই, লক্ষপতি হবেন কি করে?

বিপ্রগণ স্তুতি করি বোলেন গোসাঞি।
লক্ষের কি দায় সহস্রেকো কারো নাঞি ॥[১]

প্রভু বললেন লক্ষেশ্বর শব্দের অর্থ লক্ষ টাকার মালিক নয়, যে প্রত্যহ লক্ষ সংখ্যক নাম জপ করে সেই লক্ষেশ্বর।

প্রভু বোলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে ॥
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর।
তথা ভিক্ষা আমার না যাই অন্য ঘর ॥[২]

রসিকতা করে লোক শিক্ষা দেওয়ার আশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। তাই ব্রাহ্মণগণ বলেছিলেন—

লক্ষ নাম লৈব তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥
প্রতিদিন লক্ষ নাম সব বিপ্রগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্র ভিক্ষার কারণে ॥[৩]

লোকশিক্ষার এমন সরস অথচ চাতুর্যপূর্ণ কৌশল জগতের ধর্মগুরুদের ক্ষেত্রে অভিনব নয় কি?

বাল্যে ও কৈশোরে বিশ্বম্ভর ছিলেন উদ্ধত প্রকৃতির। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ, সহপাঠিগণ ও জননীর সঙ্গে আচরণে সেই ঔদ্ধত্য প্রকটিত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে তাঁর ঔদ্ধত্য প্রশমিত হতে থাকে। কাজিদলন ও জগাই মাধাই উদ্ধারের ঘটনায় তাঁকে এক তেজস্বী দৃঢ়চেতা নির্ভীক যুবকরূপে দেখতে পাই। এখানে তাঁর ঔদ্ধত্য

বিনয়

একটা বিরাট গণশক্তির নেতার যথোপযুক্ত আচরণের মধ্যে নবরূপে প্রকাশিত। কৃষ্ণপ্রেমের প্রবলতা নিমাইকে সমস্ত উদ্ধত আত্মাভিমান থেকে মুক্ত করেছিল। তিনি তৃণাদাপ দীনভাবে কালযাপন করেছেন। তিনি হলেন বিনয়ের অবতার। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে

১-৩ চৈ. ভা. অন্ত্য ৯ অঃ

পরাভূত করার কালেই তাঁর চরিত্রে সহৃদয়তা এবং নম্রতা প্রকাশিত হতে দেখি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করেও তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—

তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার।
তোমার সমান কবি কোথা নাহি আর॥
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস॥

সবশেষে তিনি নিজের বয়সের স্বল্পতাহেতু বুদ্ধির অপরিপক্কতা স্বীকার করে বললেন—

শৈশব চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥[1]

কাশীতে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে স্বমতে আনয়নকালে তাঁকে অবজ্ঞা করেছিলেন যে প্রকাশানন্দ, তাঁরই চরণ ধারণ করে অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রকাশানন্দও প্রভুর অলৌকিক মহিমা উপলব্ধি করে তাঁর চরণ বন্দনা করেছিলেন। তখন নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনয় বশে বলেছিলেন—

আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্যসম।
শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেন কর হীনের বন্দন।
আমার সর্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্মসম॥[2]

সন্ন্যাসোত্তর জীবনে শ্রীচৈতন্য সকল সময়েই অত্যন্ত দীনভাবেই কালযাপন করেছেন। এমন কি, ভক্তগণের কাছে তিনি ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ভক্তগণের মুখে আত্মপ্রশংসা কোন সময়েই খুশীমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। সার্বভৌম ভট্টাচার্য একদিন শ্রীচৈতন্যকে দারুব্রহ্ম জগন্নাথের সঙ্গে অভিন্ন বলেও তাঁকে নরব্রহ্ম বলেছিলেন। এই কথা শুনে চৈতন্যদেব দুই কান ঢেকে বলেছিলেন—

অত্যুক্তিরেষা ভব সার্বভৌম
তনোতি কামং শ্রবসোঃ কটুত্বম্।

১ চৈ. চ. মধ্য. ১৬ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ২৫ পরি

তীক্ষ্ণো হি গৌড়স্য রসস্য পাক-
স্তিক্তত্বমায়াতি ন চেত্তি রম্যম্।[১]

—হে সার্বভৌম, এ তোমার অত্যুক্তি, কর্ণদ্বয়ের অত্যন্ত পীড়াদায়ক। গৌড়রসের (গুড়ের) কড়া পাক সুস্বাদু হয় না, তেতো হয়ে যায়॥

সার্বভৌম তথাপি নিরস্ত না হয়ে গৌড় দেশে চৈতন্যের আবির্ভাবহেতু তথাকার রসের পাক সুস্বাদু বলায় চৈতন্যদেব সার্বভৌমকে 'বিরম বিরম' অর্থাৎ থাম থাম বলে জগন্নাথ দর্শনে গমন করেছিলেন।

কবিকর্ণপুরের নাটকেও সার্বভৌম চৈতন্যকৃপা লাভ করার পর শ্রীচৈতন্যের স্তুতি করলে তিনি কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করে বলেছিলেন, আমি আপনার স্নেহের পাত্র, এরূপ বলছেন কেন ?[২]

বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় একদিন অদ্বৈতের প্ররোচনায় ভক্তগণ নীলাচলে গৌরাঙ্গকীর্তন সুরু করেছিলেন, মহাপ্রভু স্বমহিমাকীর্তন শুনে সলজ্জভাবে বাসায় চলে গিয়েছিলেন।

ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি॥
সভা শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান।
বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্তন॥[৩]

ললিত মাধব নাটকে প্রথম অংকের দ্বিতীয় শ্লোকে রূপ গোস্বামী শচীসুত চৈতন্যের বন্দনা করেছেন। রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীরূপের মুখে নাটক শুনতে শুনতে নিজের বন্দনা শুনে চৈতন্যদেব বললেন—

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি ক্ষারবিন্দু॥[৪]

রামানন্দ রূপের বাক্যকে অমৃতের মধ্যে একবিন্দু কর্পূর বলায় প্রভু বলেছিলেন—শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস।[৫] কৃষ্ণদাস কবিরাজও স্বগুণকীর্তন শ্রবণে মহাপ্রভুর অসন্তোষের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

একদিন শ্রীরামাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্তন॥

১ চৈ. চন্দ্র. না—৮।৭ ২ চৈ. চন্দ্র না ৬ অংক ৩ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৯ অঃ
৪ চৈ. চ. অন্ত্য ১ পরি ৫ চৈ. চ. অন্ত্য ১ পরি

শুনি ভক্তগণে প্রভু কহে ক্রোধ মনে।
কৃষ্ণ নামগুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে ॥
ঔদ্ধত্য করিতে জানি হৈল সভার মন।[১]

ভক্তগণ আজ প্রভুর আদেশ অমান্য করে প্রভুকে ঈশ্বররূপে স্তুতি করতে লাগলেন। শ্রীবাস বললেন, সূর্য উদিত হলে আর তাঁকে লুকিয়ে রাখা যায় না। মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিবৃত্ত করতে না পেরে ওঁদের মৃদু তিরস্কার করে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

প্রভু কহে শ্রীবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সভে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টিদান।
অভ্যন্তরে গেলা লোকের পূর্ণ হৈলা কাম ॥[২]

এই ঘটনাটি বৃন্দাবন দাসও উল্লেখ করেছেন। বৃন্দাবন বলেছেন, অদ্বৈত আচার্য একদিন ভক্তদের বলেছিলেন—

মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্য রায় ॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাঞি।
সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি ॥[৩]

ভক্তগণ সকলে যখন গৌরাঙ্গ গুণকীর্তনে উদ্দাম হয়ে উঠেছেন, সেই সময়ে আত্মস্তুতি শুনে লজ্জায় মহাপ্রভু নিজের ঘরে চলে গেলেন।

ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্মস্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি ॥
সভা শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান।
বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্তন ॥[৪]

গৌরাঙ্গকীর্তনাবসানে ভক্তবৃন্দ প্রভু সন্দর্শনে এসে দেখেন প্রভু ঘরে শুয়ে আছেন। ভক্তগণ ভীত হলেন। প্রভু শ্রীবাসকে বললেন—

আজি তুমি সব কি করিলা অবতার ॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি পাইলা আমারে ত বুঝাহ এখন ॥[৫]

---

১ চৈ. চ. মধ্য. ২ পরি ২ চৈ. চ মধ্য. ২ পরি ৩-৫ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৯ অঃ

শ্রীবাস হাত দিয়ে সূর্য আচ্ছাদন করে বলেছিলেন, সূর্যের মত তোমাকে আচ্ছাদিত করা সম্ভব নয়, সূর্যকে আবৃত করা সম্ভব হলেও তোমাকে আবৃত করা সম্ভব নয়।

গোবিন্দ দাস কর্মকারের কড়চায় অনুরূপ দুটি ঘটনার উল্লেখ আছে। দক্ষিণভারত পরিক্রমাকালে এক সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলেছিলেন। তখন,

সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত।
বার বার বলে ন্যাসী ছাড় ইহ বাত॥
সন্ন্যাসী কহিলা তুমি কভু নহ নর।
প্রভু কহে ন্যাসী তুমি আমার ঈশ্বর॥[১]

ত্রিপাত্র নগরে ভর্গদেব নামে এক ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্তদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলে প্রণাম করলে তিনি জিভ কেটে পিছিয়ে এলেন, তৎপরে নিজেকে সামান্ত মনুষ্য বলে সবিনয়ে পরিচয় দিলেন।

প্রভু বলে ছি ছি ভর্গ কি বলিলে তুমি।
নদীয়া নগরে হয় মোর জন্মভূমি॥
সামান্ত মানুষ আমি এই নিশ্চয়।
অবতার বলি কেন কর মিছে ভয়॥
ঈশ্বরের অবতার বলি বারে বারে।
অপরাধী কর কেন তোমরা আমারে॥[২]

গোবিন্দকে মহাপ্রভু আদেশ দিয়েছেন, তাঁর পাদপ্রক্ষালিত জল যেন কেউ পান না করে।

গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পাদ জল যেন না লয় কোন জন॥[৩]

একদিন রঘুনাথ দাসের জাতি খুড়া কালিদাস মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালিত জল পান করলে মহাপ্রভু তাঁকে নিষেধ করেছিলেন।

বজ্রাদপি কঠোর তৃণ অপেক্ষাও দীন অমানী এবং মানদ শ্রীচৈতন্তের চরিত্র মহিমা তাঁকে অতিলৌকিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

---

১ গো. ক.—পৃঃ ৩১ ২ গো. ক.—পৃঃ ৩৮ ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ১৬ পরি

অষ্টাদশ অধ্যায়
শ্রীচৈতন্য ও নারী

সন্ন্যাসীর জীবনে কামিনী ও কাঞ্চন সর্বথা বর্জনীয়। কঠোর নিয়মব্রতী শ্রীচৈতন্ত সন্ন্যাস জীবনে সর্বতোভাবে নারীসংস্পর্শ বর্জন করে চলতেন। কবিরাজ গোস্বামীর উল্লিখিত তিনটি ঘটনা থেকে চৈতন্তচরিত্রের এই দিকটি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পিতৃহীন এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার প্রভুর অত্যন্ত প্রীতি ভাজন হয়েছিলেন। দামোদর পণ্ডিত এই বালক সম্পর্কে মহাপ্রভুকে সাবধান করে বলেছিলেন—

পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর॥
যগ্ডপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি যাতে দেহ অবসর॥[১]

মহাপ্রভু অবশু ব্রাহ্মণবালককে এই অপরাধে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেছিলেন কিনা চরিতামৃতকার তা বলেন নি। তবে তিনি দামোদরের বাক্যদণ্ড শুনে দামোদরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

একদিন জগন্নাথক্ষেত্রে এক দেবদাসীর কণ্ঠে গীতগোবিন্দ গান শুনে ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্ত গায়িকার প্রতি ধাবিত হন। তাঁর অনুচর গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্ধাবন করে প্রভুকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'স্ত্রী গায়'। স্ত্রী শব্দ শুনে প্রভু বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে গোবিন্দকে সাধুবাদ দিলেন।

প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥[২]

ভগবান আচার্যের অনুরোধে সপরিকর শ্রীচৈতন্তের আহারের জন্তে শিখি মাহিতীর ভগিনী বৃদ্ধা তপস্বিনী বৈষ্ণবী মাধবী দাসীর কাছ থেকে এক মন

---

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য ১৩ পরি

উত্তম চাল ভিক্ষা করে আনার অপরাধে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন করেছিলেন। তিনি গোবিন্দকে নির্দেশ দিলেন—

আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহ আসিতে না দিবা ॥[১]

প্রভু বলেন, সন্ন্যাসী হয়ে প্রকৃতি সম্ভাষণ ভয়ংকর অপরাধ।

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥[২]

এক বৎসর অপেক্ষা করেও মহাপ্রভুর ক্ষমা না পেয়ে হরিদাস মনের দুঃখে প্রয়াগে গিয়ে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন করেছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত ঘটনাবলীতে নারী সম্পর্কে মহাপ্রভুর কঠোরতম মনোভাবের পরিচয় পাই। তিনি লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছেন নিজের জীবনাচরণের দ্বারা। নারীর প্রতি সাধুভক্তের সামান্যতম দুর্বলতা যাতে না থাকে তাই প্রভুর এই আচরণ।

কিন্তু জীবনচরিতগুলিতে নানাবিধ তথ্য উক্ত বিবরণের বৈপরীত্য সূচিত করায় নারী সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যর দৃষ্টিভঙ্গী বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বাল্যকালে গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থিনী বালিকাদের ও মহিলাদের বিরক্ত করে নিমাই আনন্দ পেতেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির পরে তাঁর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। পরিহাস রসিক গৌরচন্দ্র পুরুষদের সঙ্গে পরিহাস করলেও রমণীরা তাঁর হাস্য পরিহাস থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ ॥[৩]

নারীর প্রতি গৌরাঙ্গদেবের যে সম্ভ্রমবোধ ছিল তার উল্লেখ বৃন্দাবনের কাব্য থেকে পাই। এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী গৌরচন্দ্রের নারী-সম্পর্কিত মনোভাবও বৃন্দাবন ব্যক্ত করেছেন—

সবে স্ত্রীমাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোনে।
স্ত্রীহেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে ॥[৪]

১-২ চৈ. চ. অন্ত্য ২ পরি ৩-৪ চৈ. ভা. আদি ১৩ অঃ

কিন্তু স্ত্রী-সংস্পর্শ যে মহাপ্রভুর জীবনে কোথাও ঘটে নি, একথা বলা চলে না। বৃন্দাবন জানিয়েছেন যে, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ পত্নীসহ নীলাচলে উপনীত হয়ে নানাবিধ দ্রব্য রন্ধন করে প্রভুর তৃপ্তি বিধান করেছিলেন। অদ্বৈত প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

হরিষে করেন পত্নী সহিতে সেবন।
পাদ প্রক্ষালিয়া দেন চন্দন ব্যঞ্জন॥[১]

অদ্বৈত প্রকাশকার জানিয়েছেন যে রথযাত্রার সময় একবার অদ্বৈত তাঁর পত্নী সীতাদেবী সহ শ্রীচৈতন্যকে একাকী তৃপ্তিভরে ভোজন করিয়েছিলেন। সীতাদেবী স্বহস্তে পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন।[২]

কবিরাজ গোস্বামী এমন একটি সংবাদ পরিবেশন করেছেন যা মহাপ্রভুর ঔদার্যের পরিচায়ক হলেও নারী সম্পর্কে তার শুচিবাই এর পরিচয় দেয় না। একদিন যখন মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তরে গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করছিলেন সেই সময়ে এক উড়িয়া নারী দর্শনার্থী লোকের ভিড়ে বিগ্রহ দর্শনে অসমর্থ হওয়ায় মহাপ্রভুর কাঁধে পা দিয়ে জগন্নাথ দর্শন করছিল। গোবিন্দ এই দৃশ্য দেখে সেই রমণীকে ভৎ'সনা করে নেমে পড়তে বলে। কিন্তু মহাপ্রভু নিষেধ করলেন গোবিন্দকে। রমণী তখন দ্রুত ভূমিতে অবতরণ করে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করে কারুণ্য প্রকাশ করে। মহাপ্রভু মেয়েটির জগন্নাথ ভক্তি দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন।

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥
দেখিয়া গোবিন্দ আস্তে-ব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥
আদি বস্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥
আস্তে ব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।
মহাপ্রভু দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা॥[৩]

ছোট হরিদাসকে প্রকৃতি সম্ভাষণের অপরাধে ত্যাগ করলেও অন্তরে

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য ৯ অঃ ২ অ. প্র. ১৮ অঃ ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ১৪ পরি

নিরাসক্ত বাহ্যতঃ ভোগী রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুন্দরী যুবতী সেবিত রামানন্দকে মহাপ্রভু কোন প্রকার অনাদর করেন নি। রামানন্দ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

কাষ্ঠপাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব॥[১]

বাসুদেব সার্বভৌম স্বীয় অদ্বৈতমত পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত হয়েছিলেন। সার্বভৌম-গৃহিণী-ও মহাপ্রভুর ভক্ত হয়েছিলেন।

ষাঠীর মাতা নাম ভট্টাচার্য গৃহিনী।
প্রভুর মহাভক্তা তেঁহো স্নেহেতে জননী॥[২]

সার্বভৌম গৃহে নিমন্ত্রিত শ্রীচৈতন্যের ভোজন বিলাসিতা দেখে সার্বভৌম-জামাতা অমোঘ যখন শ্রীচৈতন্যকে নিন্দা করতে থাকে তখন সার্বভৌম জামাতাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন, গৃহিণীও জামাতাকে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু সার্বভৌম দম্পতিকে প্রবোধ দিয়ে উদর পূর্ণ করে ভোজন করেছিলেন।

দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিয়া।
দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈয়া॥[৩]

সার্বভৌম-দম্পতিকে যখন তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, তখন অবশ্যই ষাঠীর মাতার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ হয়েছিল। নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু স্বরূপকে রথযাত্রার পরে হোরা পঞ্চমী যাত্রায় লক্ষ্মী (সুভদ্রা) কেন জগন্নাথের সঙ্গে গমন করেন না 'এই তথ্য জিজ্ঞাসা করায় স্বরূপ লক্ষ্মীর ক্রোধভাবের বিবরণ দিলেন। সেই সময়ে—নানা বাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ। দেবদাসীগণ লক্ষ্মীর দাসীরূপে লক্ষ্মীর ক্রোধের অভিনয় করছিল। সেই সময়ে—

লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া।
হাসিতে লাগিলা প্রভু নিজগণ-লঞা॥[৪]

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও (১০ অংক) অদ্বৈতাদি পার্ষদগণ সহ মহাপ্রভুর লক্ষ্মীদেবীর কোপ ও যাত্রা মহোৎসবে অভিনয় দর্শনের বিবরণ আছে। দেবদাসীগণের নৃত্যাভিনয় দর্শন মহাপ্রভু অসমীচীন মনে করেন নি।

---

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৫ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য ১৫ পরি ৩ চৈ. চ. মধ্য ১৫ পরি
৪ চৈ. চ. মধ. ১৪ পরি

গৌড় দেশ থেকে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তাঁদের পত্নীগণ সহ আসতেন নীলাচলে। বৈষ্ণব পত্নীরা নানা দ্রব্য গৌড়দেশ থেকে এনে মহাপ্রভুকে ভোজন করাতেন।

মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরে ভাতে॥[১]

গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চায় শ্রীচৈতন্যের নারী সম্ভাষণের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য যখন বর্ধমানের সন্নিকটে গোবিন্দদাস কর্মকারের বাড়ীর কাছে গিয়েছিলেন সেই সময় গোবিন্দর গৃহত্যাগে দুঃখিতা গোবিন্দ-পত্নী অশ্রুমোচন করতে থাকলে শ্রীচৈতন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

কাঁদিয়া আকুল বামা চারিদিকে চায়।
তত্ত্বকথা বলি প্রভু তাহাকে বুঝায়।[২]

গোবিন্দর কড়চা অনুসারে দক্ষিণভারত পরিক্রমাকালে মহাপ্রভু যখন চারদিন বেঙ্কটনগরে বিশ্রাম করছিলেন সেই সময়ে চতুর্থ দিনে এক রমণী তাঁকে আতিথ্য গ্রহণ করান এবং এক বৃদ্ধা দুধ এনে দেন তাঁর ভোগের জন্য।[৩] গোবিন্দর কড়চা অনুসারে দক্ষিণভারত থেকে দ্বারকার পথে ঘোগা গ্রামে বারমুখী নামে এক বারাঙ্গনা মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেছিল। বারমুখী সমস্ত ধন সম্পদ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে চুলের রাশি কেটে ফেলে করজোড়ে প্রভুর কৃপা প্রার্থনা করেছিল। বারমুখীকে প্রভু তুলসী কাননে বসে কৃষ্ণ ভজনা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই স্থানে করি তুমি তুলসী কানন।
তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন॥[৪]

নাভাজীর ভক্তমাল গ্রন্থে এক বৈষ্ণব মহান্ত কর্তৃক বারমুখীর নবজীবন লাভের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে (১৫শ মালা)। এই বৈষ্ণব মহান্তের নাম ভক্তমালে উল্লিখিত না থাকলেও আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে এই মহান্তই শ্রীচৈতন্য।[৫]

১ চৈ. চ. অন্ত্য ১২ পরি ২ গো. ক.—পৃঃ ১৩ ৩ গো. ক.—পৃঃ ৩০
৪ গো. ক.—পৃঃ ২৬ ৫ তদেব ভূমিকা—পৃঃ ২৭

কিন্তু নাভাজীর ভক্তমালে যখন শ্রীচৈতন্য ও রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্ত-বর্গের কথা আলোচিত হয়েছে, তখন বারমুখীর উদ্ধারকর্তা শ্রীচৈতন্য হলে তাঁর নাম অনুল্লেখিত থাকা স্বাভাবিক নয়। ভক্তমাল থেকে ঘটনাটি গোবিন্দের কড়চায় প্রক্ষিপ্ত হওয়া কি অসম্ভব ? গোবিন্দদাস যেভাবে বারমুখীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর নৃত্য বর্ণনা করেছেন, তা চৈতন্যচরিতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয় না। গোবিন্দের কড়চায় দক্ষিণে মুন্না গ্রামে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা ভিক্ষুকীকে ভিক্ষা করে প্রভু অন্নবস্ত্র দান করেছিলেন।

হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গলে সন্ন্যাস গ্রহণের পর অদ্বৈতভবনে সমাগত চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে সীতাদেবী পরিবেশন করে ভোজন করিয়েছিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভু তাঁর প্রিয় ব্যঞ্জন সুক্তার উল্লেখ করলে সীতাদেবী তাঁকে অধিক পরিমাণে সুক্তা দিয়েছিলেন।

যাঁহার যাহাতে রুচি পুছিআ পুছিআ।
প্রভুরে আনিয়া দেন যতন করিআ ॥
মহাপ্রভু কহেন সুক্তা আমার বড় প্রিয়।
সুক্তার ব্যঞ্জন আনি দেন অতিশয় ॥[১]

গোবিন্দর কড়চায় দাক্ষিণাত্য থেকে দ্বারকা যাত্রাপথে গুর্জরী নগর ছাড়িয়ে জিজুরী নগরীতে তিনি মুরারি নামে পরিচিত খাণ্ডবা দেবের নারী আখ্যায় প্রসিদ্ধ পতিতাদের উদ্ধার করেছিলেন। দরিদ্র পিতামাতা কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ হয়ে অনূঢ়া যুবতী কন্যাদের খাণ্ডবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মন্দিরে রেখে যেত। মুরারী নামে পরিচিত খাণ্ডবা দেবতার নারীরা পুরুষের লোভের শিকার হয়ে গোপনে দেহ ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে বাধ্য হতো। এদের দু:খের কথা শুনে এবং অন্তরাল থেকে দেখে করুণাময় শ্রীচৈতন্য বিচলিত হয়ে হরিনাম মহামন্ত্র দিয়ে তাদের উদ্ধার করেছিলেন।

নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম।
নাম বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম ॥
বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি।
তাহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি ॥

---

১ অ. ম. ৫।৮, ব. বি—পৃঃ ২২৭

*　　　*　　　*

কৃষ্ণ পতি হইলে না রবে ভবভয়।
কৃষ্ণ সকলের পতি জানহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা ডাক ভক্তিভরে।
সর্বদা বলহ মুখে হরে কৃষ্ণ হরে॥
এত বলি প্রভু মোর নাম আরম্ভিল।
অমনি তাঁহার দেহ পুলকে পূরিল॥
দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণ।
পূজিতে লাগিল সবে প্রভুর চরণ॥
প্রভু বলে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে।
নিতান্ত অস্পৃশ্য মুঞি ছুঁওনা আমারে॥
ভক্তি করি বল হরি ঘুচিবেক তাপ।
নাম বলে ভস্ম হবে সকলের পাপ॥
না বুঝিয়া যেই জনে পাপে মগ্ন হয়।
হরিনাম বলে তার পাপ হয় ক্ষয়॥[১]

মুরারি গুপ্তের কড়চায় শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে এসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিজমূর্তি পূজা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। শ্লোকটি যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় তাহলে মুরারির বিবরণকে অপ্রামাণ্য বলা যাবে না। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হয়েছিল। মুরারির বিবরণ অস্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত বলেই প্রকৃত তত্ত্ব বোঝা যাচ্ছে না।

চরিতগ্রন্থগুলি থেকে নারী সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের যে বিপরীত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন ব্যাপার। তিনি ছোট হরিদাস সম্পর্কে যে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, নিজেও নারীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার যে প্রয়াস করেছিলেন তা তাঁর মত কঠোর নিয়মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বিপরীতধর্মী ঘটনাগুলি যে একেবারে মিথ্যা তাই বা বলা যায় কি করে? গোবিন্দদাসের কড়চার বিবরণ প্রামাণিক না হতেও পারে কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর পরিবেশিত ভিন্নধর্মী চিত্র, মুরারির বিবরণ, সবই কি অগ্রাহ্য করার মত? মালিনী দেবী, সীতা দেবী,

১ গো. ক.—পৃঃ ৫৫

ষাঠীর মাতা প্রভৃতি মাতৃসমা বর্ষিয়সী নারীর সঙ্গে আলাপন হয়ত মহাপ্রভু অসমীচীন মনে করেন নি, সন্ন্যাসীর নারী সংস্পর্শ পরিহারের ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন এবং লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল বৈরাগ্য-তাড়িত অন্তঃকরণ নারীর সংস্পর্শে বিচলিত হবে না, একথা তিনিও জানতেন, ভক্তরাও জানতেন। মহাপ্রভুর কঠোরতা তাঁর জীবনাচরণের মধ্যেমে লোকশিক্ষার জন্যই। স্কন্ধারূঢ়া জগন্নাথদর্শনার্থিনীর পাদস্পর্শ জনিত সংস্পর্শ মহাপ্রভুর ভক্তিরসাপ্লুত অন্তঃকরণে অপরাধ বোধ জাগায় নি, কারণ মেয়েটির অসাধারণ দেবভক্তি তাঁকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল। ভাববিহ্বল চৈতন্যচন্দ্রের পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান সকল সময় থাকতো না। ভাববিহ্বল অবস্থায় সকল সময সকল নিয়মরীতি পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাছাড়া সর্বত্রই অধিকার ভেদে বিধিব তারতম্য আছে। চৈতন্যদেবের মত সর্বত্যাগীর পক্ষে যে মোহ বর্জন করা নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার অন্যের পক্ষে সেটা সহজ না হওয়াই সম্ভব। নিত্যানন্দ প্রভুর মহাপ্রভুর আদেশে গৌড়দেশে আগমনের পরে ভক্তিধর্ম প্রচার কালে স্বর্ণরৌপ্যালংকারে ভূষিত হয়ে দিব্য পট্টবসন পরিধান করে কর্পূর তাম্বূল চর্বণ করতে করতে পরিক্রমণ করতেন। একদিন পুরীতে এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর কাছে নিত্যানন্দের আচরণ সম্পর্কে নালিশ করলে মহাপ্রভু হেসে বলেছিলেন—

শুন বিপ্র যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্ময় ॥[১]

সুতরাং অধিকারী ভেদে আচরণের পার্থক্য স্বীকার করা মহাপ্রভুর মত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। নারী সম্পর্কে কঠোর মনোভাব তিনি গ্রহণ করতেন লোক শিক্ষার জন্য কিন্তু আর্তের দুঃখের চিন্তায় ও ভক্তের ভক্তিতে যাঁর অন্তঃকরণ সদাই বিগলিত তিনি দুঃখিনী ও ভক্তিমতী নারীর ব্যাকুলতাকে উপেক্ষা করবেন কি করে? এই দৃষ্টিতে বিচার করলে নারী সম্পর্কে মহাপ্রভুর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্যের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

---

১ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৩ অঃ

ঊনবিংশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ও চৈতন্য তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে সহজ প্রেম ভক্তিমূলক ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সে ধর্মে কোন সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামি ছিল না। মহাপ্রভু ছিলেন কৃষ্ণোপাসক। শ্রীরাধার ভাবমূর্তি তাঁর সাধনায় প্রকটিত হয়েছিল। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায় বা দেবতার প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব তিনি কোন দিন পোষণ করেন নি। নবদ্বীপ থেকে নীলাচল, নীলাচল থেকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পুরী থেকে বৃন্দাবন-মথুরা গমনাগমন কালে পথে সকল তীর্থেই তিনি দেবদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কাছে বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি দেবতার মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার ছিল না। যাজপুরে আদ্যাশক্তি বিরজার অষ্টভুজ বিগ্রহ, কটকে সাক্ষিগোপাল, রেমুণায় গোপীনাথ, একাম্রক্ষেত্র বা ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ, জিয়াড়ে নৃসিংহদেব, স্কন্দতীর্থে স্কন্দ কার্তিকেয়, তাঞ্জোর জেলায় শিয়ালী ভৈরবী, রামনাথ নগরে রামচন্দ্র, কাশীতে বিশ্বনাথ প্রভৃতি মহাপ্রভুর সমান শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বিষ্ণু ভিন্ন শিব শক্তি কার্তিক গণেশ প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ দর্শন করেও ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মহাপ্রসাদ গ্রহণ সম্পর্কে মুরারি গুপ্ত লিখেছেন—

চৈতন্য ধর্মে উদারতা

মহাপ্রসাদং সংগৃহ্য পপৌ ভৃত্যৈঃ সুধামিব।
শিবপ্রিয়ো হি শ্রীকৃষ্ণ ইতি সন্দর্শয়ন্ হরিঃ ॥[১]

—মহাপ্রভু লিঙ্গরাজের মহাপ্রসাদ সংগ্রহ করে শ্রীকৃষ্ণ শিবের প্রিয় এই সত্য প্রতিপাদন করে সুধার মত ভৃত্যগণের সঙ্গে পান করেছিলেন।

সুতরাং শিবও কৃষ্ণের মত উপাস্য, এই কথা মহাপ্রভু জানিয়েছিলেন তাঁর আচরণের মাধ্যমে। কৃষ্ণে ভক্তি এবং কৃষ্ণনাম সংকীর্তন তাঁর ধর্মাচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম এদেশে নূতন নয়। বিষ্ণুর উপাসনা বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। কিন্তু সে ভাগবত বা বৈষ্ণবধর্মে ভক্তি মিশ্রিত ছিল না। ভক্তিধর্মের প্রধান প্রবক্তা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা ও ভাগবত পুরাণ।

---

১ মু. ক.—৩।১।৩

কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পূজা এদেশে যেমন বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত, তেমনি চতুর্ব্যূহ বা বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের উপাসনাও বহু প্রাচীন।

নারদীয় পুরাণে মহর্ষি সনক দেবর্ষি নারদের নিকট বৈষ্ণবীয় জ্ঞান ব্যাখ্যা করেছেন। এই আলোচনায় দেখা যায় যে পরম জ্ঞান মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, জ্ঞানের মূল ভক্তি এবং ভক্তির মূলে আছে কর্ম। যজ্ঞ দান তীর্থ ভ্রমণ প্রভৃতি কর্মদ্বারা ভক্তিলাভ সম্ভব। পরাভক্তির দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হলে বুদ্ধির নির্মলত্বপ্রাপ্তি হেতু জ্ঞান লাভ হয়। হরির অর্চনা কর্ম যোগ,—কর্মযোগ থেকে সিদ্ধ হয় জ্ঞান। ব্রাহ্মণ, ভূমি, অগ্নি, সূর্য, জল, হৃদয়, ধাতু (মূর্তি) এবং চিত্র—কেশবের প্রতিমা। ভক্তিভরে এদের পূজা করা কর্তব্য। সমগ্র বিশ্বচরাচর বিষ্ণু থেকে উৎপন্ন এবং বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা। তিনিই আনন্দময় জ্যোতির্ময় সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ।

নারদীয় মত

আনন্দমজরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
পরাৎ পরতরং যশ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
অদ্বয়ং নির্গুণং নিত্যমদ্বিতীয়মনৌপমম্ ।
পরিপূর্ণং জ্ঞানময়ং বিদুর্মোক্ষপ্রসাদকম্ ॥[১]

পরম ব্রহ্মরূপী বিষ্ণু এক অদ্বিতীয়। মায়া মোহিত জীব তাঁকে ভিন্ন দেখে। অজ্ঞান বা মায়াকে জয় করে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব। সম্যক ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব জ্ঞান নির্বিশেষাদ্বৈতজ্ঞান।[২] আচার্য শংকর বিষ্ণুকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বন্দনা করেছেন তাঁর হরিস্তুতিতে—

যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমনন্তং পরিপূর্ণং
হৃৎস্থং ভক্তৈর্লভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্ ।
ধ্যাত্বাত্মস্থং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥[৩]

—যিনি ব্রহ্ম নামে অভিহিত, একমাত্র দেব, পরিপূর্ণ, হৃদয়ে অবস্থিত,

---

১ না. পু—১।৩৩।২২-২৩
২ ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড—শ্রীমৎস্বামী বিদ্যারণ্য—পৃঃ ৩৪
৩ শংকরাচার্যের গ্রন্থমালা—বসুমতী ১৩১৮—পৃঃ ১৪৬

ভক্তগণের দ্বারা লভ্য, অজ, সূক্ষ্ম, তর্কাতীত, যে ঈশকে ব্রহ্মবিদ্গণ নিজের অন্তরে ধ্যান করে জেনে থাকেন, সেই সংসারের অন্ধকারনাশকারী হরিকে স্তুতি করি।

শংকরাচার্যের মতে বিষ্ণু সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অভিন্ন; অবিদ্যা হেতু তিনি জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকটিত। অবিদ্যার নাশে জগৎ লুপ্ত হলে জীব বিষ্ণুত্ব লাভ করে।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার আচার্য মধুসূদন সরস্বতীও নির্বিশেষাদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে কৃষ্ণই পরম তত্ত্ব—কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে। কৃষ্ণই ব্রহ্মস্বরূপ—তিনিই কখনও সগুণ কখনও নির্গুণ; সগুণ ব্রহ্ম কৃষ্ণে মনঃসংযোগ করতে পারলে নির্গুণভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মধুসূদন সরস্বতীর মত

শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দস্বাদশুদ্ধাশয়াঃ
সংসারাম্বুধিমুত্তরন্তি সহসা পশ্যন্তি পূর্ণং মহঃ।
বেদান্তৈরবধারয়ন্তি পরমং শ্রেয়স্ত্যজন্তি ভ্রমঃ
দ্বৈতং স্বপ্নসমং বিদন্তি বিমলাং বিদন্তি চানন্দতাম্॥[১]

—গোবিন্দচরণমধুর আস্বাদে শুদ্ধচিত্ত উত্তীর্ণ হয়, পূর্ণ জ্যোতি দর্শন করে, বেদান্ত বাক্যের দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করে, ভ্রম ত্যাগ করে, দ্বৈত জ্ঞানকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা জ্ঞান করে এবং পরমানন্দ লাভ করে।

শ্রীধর স্বামী ছিলেন শংকরাচার্যের মতানুসারী। তার মতে ভাগবতের বিষ্ণু-কৃষ্ণ এক অদ্বৈত পরব্রহ্ম, তিনি ছাড়া জগৎ প্রপঞ্চ সবই মিথ্যা, তিনি জগতে অধিষ্ঠিত। তাঁর অধিষ্ঠান হেতুই জগতের সত্যতা। ব্রহ্মে জগৎ বুদ্ধি অধ্যাস বা ভ্রান্তিমাত্র। ভ্রান্তি বা মায়া কৃষ্ণের মধ্যে নেই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীধর স্বামীর মতকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও শ্রীধর স্বামীকে উচ্চাসন দিয়ে থাকেন। বারকরী সম্প্রদায় নামে খ্যাত মহারাষ্ট্রের ভাগবত সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী হওয়া সত্ত্বেও ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী বৈষ্ণব। ভগবান বিট্‌ঠল দেব এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। গীতা এবং ভাগবত পুরাণ তাঁদের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ।

শ্রীধর স্বামীর মত

---

১ গীতাভাষ্য ৯ অধ্যায়ের উপসংহার

এঁরা পঞ্চদেবতার উপাসনায় বিশ্বাস করেন, একাদশী ব্রত পালন করেন এবং তুলসীর মালা গলায় ধারণ করেন। করতাল ও মৃদঙ্গ সহযোগে নৃত্যগীত সহ হরিনাম সংকীর্তনকে বারকরী সম্প্রদায় প্রাধান্য দিতেন। নামদেব, একনাথ, জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। অদ্বৈত-ভাগবতধর্মের আদি প্রবর্তক হিসাবে জ্ঞানেশ্বর (১২৭৫-৯৬ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ। জ্ঞানেশ্বর তাঁর গুরু নিবৃত্তিনাথের পন্থা অনুসরণ করেছেন বলে স্বীকার করেছেন।[১]

বারকরী সম্প্রদায়

আচার্য শংকর প্রাধান্য দিয়েছেন জ্ঞানকে; তাঁর দৃষ্টিতে যোগ এবং ভক্তি জ্ঞানলাভের উপায়, আর দাক্ষিণাত্যের অপর এক বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের মতে জ্ঞান ভক্তির উপায়, ভক্তিই লক্ষ্য। শংকরের মতে ব্রহ্মজ্ঞান হলেই ব্রহ্মে লীন হয় জীব, কিন্তু রামানুজের মতে জ্ঞানের ধ্যান বা ধ্রুবা স্মৃতি থেকে জন্মে ভক্তি, ভক্তিতে থাকে ভগবৎ সেবারূপ ক্রিয়া।[২] তাঁর মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সেব্য ও সেবকের ভাব বিদ্যমান, জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিদ্বস্তু—সম্পর্কে কেবল অণুত্ব ও বিভুত্ব।[৩] রামানুজের সম্প্রদায় শ্রীসম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ, কারণ রামানুজ পন্থীরা বিষ্ণুর সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর যুগলরূপের উপাসনা করে থাকেন। এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, কৃষ্ণ-রুক্মিণী প্রভৃতি যুগল মূর্তির উপাসক।[৪] শ্রী সম্প্রদায়ের মতে পরমাত্মা ও জীব-জড়াত্মক জগৎ অভিন্নরূপে প্রতীত হলেও অভিন্ন নয়। পরমাত্মা সগুণ ও সরূপ—তিনিই ঈশ্বর—জীবাত্মা তাঁর দাস। এই মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। ভক্তদের জন্যে ভগবান অর্চা (প্রতিমা), বিভব (অবতার), ব্যূহ (বাসুদেব প্রভৃতি), সূক্ষ্ম (ষড়্‌গুণাত্মক) ও অন্তর্যামী (জীবের নিয়ন্ত্রী শক্তি)—এই পাঁচরূপে প্রতীয়মান হন। উপাসনাও পাঁচ প্রকার—অভিগমন (দেবগৃহ ও দেবপথ মার্জনা ও অনুলেপন), ইজ্যা (গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা), স্বাধ্যায় (অর্থবোধ সূচক মন্ত্র ও স্তবাদি পাঠ) এবং যোগ (ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা দেবতার এষণা)।[৫]

রামানুজের অভিমত

---

১ ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—পৃঃ ১১৯-২৫
২ আচার্যশংকর ও রামানুজ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—উদ্বোধন—পৃঃ ৪১৯
৩ তদেব—পৃঃ ৪৪০
৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত—পাঠভবন—পৃঃ ২১
৫ তদেব—পৃঃ ১৪

ব্রহ্ম, রুদ্র, শ্রী ও সনক চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্মসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ মধ্বাচার্য। সেইজন্য এই সম্প্রদায়কে মধ্বাচারীও বলা হয়। মধ্বাচার্য ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতে তুলবদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের উদাসীন আচার্যগণ দণ্ডীদের মত যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করেন, মস্তক মুণ্ডন করেন ও গৈরিক বসন পরিধান করেন। এঁরা তিলক ধারণ করেন এবং স্কন্ধে ও বক্ষঃস্থলে তপ্ত লৌহের সাহায্যে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মের চিহ্ন অংকিত করেন। এঁরাও বিষ্ণুকে বিশ্বকারণ পরমেশ্বর বলে স্বীকার করেন।[১]

মাধ্ব সম্প্রদায়

দেবতায় ভক্তি, সাধ্যায়, সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিত্যানিত্য বিবেক ও ভগবদ্ধ্যান দ্বারা শ্রীহরির দর্শন লাভ হয়। কায়িক (অঙ্গে বিষ্ণুর নামাঙ্কন, পুত্রকন্যাদের বিষ্ণুজ্ঞাপক নামকরণ, সৎপাত্রে দান, বিপন্নের ত্রাণ ও শরণাগতের রক্ষা), মানসিক (দীনে দয়া, বাসনাত্যাগ পূর্বক ভগবৎকার্য সম্পাদন এবং গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধা) এবং বাচিক (সাধ্যায়, সত্য, হিত ও প্রিয়কথন)—ত্রিবিধ ভোজনের দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতিলাভ সম্ভব এবং অন্তিমে বিষ্ণুরূপ পরিগ্রহ করে বৈকুণ্ঠে অবস্থান ও বিষ্ণুর সঙ্গে বাস সম্ভব হয়। এই সারূপ্য ও সালোক্যই জীবের মুক্তি।[২] মধ্বাচার্যের মতে ভগবান বিষ্ণু সগুণ অর্থাৎ সকল গুণের আধার এবং স্বশক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত।[৩]

বল্লভাচার্যের অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় কৃচ্ছ্রসাধন বর্জন পূর্বক বালগোপালের উপাসনা করে থাকেন। নিম্বাদিত্য (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিম্বার্ক সম্প্রদায় বা নিমাবৎ নামে পরিচিত। পরবর্তী মোহান্ত শনকের নাম অনুসারে এই সম্প্রদায় শনকাদি সম্প্রদায় নামেও প্রসিদ্ধ। এঁরা ললাটে দুটি গোপীচন্দনের উর্দ্ধরেখা এবং মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ বার্তুলাকার তিলক ও গলায় তুলসীর মালা ধারণ করেন এবং তুলসীর মালা জপ করেন। এঁদের উপাস্য রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ এবং প্রধান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত।[৪] নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভক্তিতে মুক্তি, শ্রীকৃষ্ণে

নিম্বার্ক সম্প্রদায়

১ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত—পাঠভবন—পৃঃ ৮২
২ ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৪৪১
৩ তদেব পৃঃ ৪৫০
৪ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—পৃঃ ২৬

আত্মসমর্পণ ও তাঁর কৃপায় মুক্তিলাভে বিশ্বাস করেন। পাপ ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তিলাভের সামর্থ্য আরাধ্য দেবতার কৃপাতেই সম্ভব।[১]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য থেকে বৈষ্ণব সমাজে একটি বিরাট সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। শ্রীচৈতন্য কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন নি। সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অনুগামী ভক্তবৃন্দ। মহাপ্রভু বিশেষ কোন মতবাদও প্রচার করেছিলেন বলে মনে হয় না। জীবনের শেষভাগে তিনি যেভাবে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কালযাপন করতেন, তাতে তাঁর পক্ষে কোন বিশেষ মতবাদ বা বিশেষ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। বৃন্দাবনদাস, মুরারি গুপ্ত, লোচন দাস, জয়ানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর জীবন ভাষ্যকাররা মহাপ্রভু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সম্প্রদায় বা মতবাদের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামিবৃন্দ শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত মতবাদ এবং শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

ডঃ সুশীলকুমার দে বলেছেন যে শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতে নিম্বার্ক, রামানুজ, বল্লভাচার্য এবং মধ্বাচার্যের কোন প্রভাব পড়ে নি।[২] কিন্তু বারকরী সম্প্রদায়ের নৃত্যগীতসহ হরিনাম সংকীর্তন, রামানুজ সম্প্রদায়ের যুগল উপাসনা ও উপাসনার পঞ্চ পদ্ধতি, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের তুলসীর মালা ধারণ, তুলসীর মালা জপ এবং রাধা-কৃষ্ণের যুগল উপাসনা চৈতন্য-ধর্মে স্থান পেয়েছিল। রামানুজ সম্প্রদায়ের অভিগমন বা দেবগৃহ মার্জন শ্রীচৈতন্যের একটি প্রিয় কর্ম ছিল। তবে একথা সত্য যে মাধবেন্দ্র পুরীর সম্প্রদায় যেমন বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তেমনি চৈতন্য-ধর্মকেও প্রভাবিত করেছিল। শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ছিলেন ঈশ্বরপুরী এবং সন্ন্যাসে দীক্ষার গুরু ছিলেন কেশব ভারতী। ঈশ্বরপুরী এবং কেশব ভারতী ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী মাধবেন্দ্র পুরী মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত। কবি-কর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ের বিবরণে মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরীর উল্লেখ করেছেন। কবিকর্ণপুরের বিবরণে গুরু শিষ্য পরম্পরা: পরব্যোমেশ্বর, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুক, ব্যাসের কাছে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত মধ্বাচার্য, পদ্মনাভাচার্য, নরহরি, মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থক, জ্ঞানসিন্ধু, মহানিধি

---

১ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—পৃঃ ৫৮৪

২ Vaisnava Faith and Movement—p. 13

বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্মা, বিষ্ণুপুরী, জয়ধর্মাশিষ্য পুরুষোত্তম, ব্যাসতীর্থ, লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র, মাধবেন্দ্র শিষ্য অদ্বৈত-রঙ্গপুরী-ঈশ্বরপুরী, ও ঈশ্বরপুরীশিষ্য গৌরাঙ্গ।[১]

মনোহর দাসও শ্রীচৈতন্যকে ব্রহ্ম বা মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন; মহাপ্রভু নিমাই নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম নিমানন্দী।

আদৌ শ্রী মধ্বাচার্য ভাষ্যকার হয়।
মাধ্বভাষ্যে ভক্তিতত্ত্ব করিয়াছে নির্ণয়॥
ঈশ্বরপুরী গোসাঞি পর্যন্ত এই মতে।
মাধ্বসম্প্রদায় বলি জগত বিখ্যাতে॥
শ্রীমহাপ্রভু যবে প্রকট হইলা।
সর্বনাম পূর্বে নাম নিমাই পাইলা॥
সেই পথে মহাপ্রভুর সেচ্ছা অনুক্রমে।
নিমানন্দী সম্প্রদায় হইল নিয়মে॥[২]

শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্তীও মহাপ্রভুকে মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন—

চৈতন্য সম্প্রদায়

প্রভুর এ অলৌকিক লীলা কেবা জানে।
করিলেন ধন্য মাধ্বী সম্প্রদায় আপনে॥[৩]

কোন কোন আধুনিক পণ্ডিতের মতে মধ্বাচার্যের মত অর্থাৎ পাঞ্চরাত্র বা প্রাচীন ভাগবত মতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। "তাঁহারা পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভক্তিতত্ত্বের অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।"[৪] আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন—"মাধ্ব মতের একটি স্রোত বাংলাদেশে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুকে নূতন জীবন দিল।"[৫] M. T. Kennedy একই কথা বলেছেন—"Chaitanya began his religious life as a Madhva."[৬]

কিন্তু ডঃ দে শ্রীচৈতন্যকে শংকরপন্থী সন্ন্যাসীদের দশনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন, যদিও ভক্তিতত্ত্বের দিক থেকে মহাপ্রভু শংকরের

---

১ গৌরগণোদ্দেশ—২১-২৫, বহরমপুর সং, পৃঃ ১০

২ অনুরাগ বল্লী—৮ম মঞ্জরী ৩ ভক্তি রত্নাকর—৫।২১০৮

৪ আচার্য শংকর ও রামানুজ—পৃঃ ৪৪২ ৫ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—পৃঃ ৪৮

৬ The Chaitanya Movement—Oxford University Press—1925, p. 89

অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন নি।[১] ডঃ দে'র মতে মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী শ্রীধরস্বামীর তুল্য শংকরপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন[২] এবং কেশব ভারতী ছিলেন শংকরপন্থীদের ভারতী সম্প্রদায় ভুক্ত। শংকরপন্থীদের একাংশের মধ্যেও ভক্তি-ভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। মাধবেন্দ্র, ঈশ্বরপুরী এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২] শ্রীধর স্বামীর ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা থেকেই শংকরপন্থীদের মধ্যে ভক্তিবাদ প্রবেশ করেছিল। মাধবেন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী ভক্তিবাদী শংকরপন্থীদের গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যের পূর্বেই বাঙ্গলাদেশে ভক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মাধবেন্দ্র পুরী বা চৈতন্যদেবকে মাধ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত: "সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় কিম্বা শ্রীমাধবেন্দ্র সম্প্রদায় বলাই যুক্তিযুক্ত।"[৩] অদ্বৈত আচার্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পদ্মনাভ চক্রবর্তী, শ্রীবাস পণ্ডিত, ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী প্রভৃতি ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্র শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরীর সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর।
প্রেমময় যত সব অশেষ অনুচর॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার॥
যার শিষ্য মহাপ্রভু আচার্য গোসাই।
কি কহিব আর তার প্রেমের বড়াই॥[৪]

বৃন্দাবন আরও বলেছেন,—

মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥
অহর্নিশ কৃষ্ণ প্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়।[৫]

---

১ Chaitanya Faith & Movement—p. 15

২ ibid p. 19

৩ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা—পৃঃ ৫০ ৪ চৈতন্য ভাগবত—আদি ৮ অঃ

৫ চৈতন্য ভাগবত—আদি ৮ অঃ

সুতরাং বৃন্দাবন যে বলেছেন—

ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন বারে বার ॥[১]

তা যথার্থ। শ্রীচৈতন্য ভারতের অর্ধাংশ ব্যাপী যে প্রেম বন্যা এনেছিলেন তার সূচনা করেছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী।

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে বলেছেন, ভক্তি কল্পতরু, মাধবেন্দ্র পুরী কল্পতরুর প্রথম অংকুর; ঈশ্বর পুরীতে অংকুর পুষ্ট হোল, শ্রীচৈতন্য হলেন স্কন্ধ এবং মালী। পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, কেশব পুরী, নৃসিংহানন্দ তীর্থ ও সুখানন্দ পুরী নব মূল।

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি কল্পতরু হইল সিঞ্চি ইচ্ছা পানি ॥
জয় শ্রীমাধব পুরী কৃষ্ণ প্রেমপুর।
ভক্তি কল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥
শ্রী ঈশ্বর পুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধে উপজিল ॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালি হৈয়া স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥
পরমানন্দ আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥
বিষ্ণুপুরী কেশব পুরী পুরী কৃষ্ণদাস।
নৃসিংহানন্দ তীর্থ আর পুরী সুখানন্দ ॥
এ নব মূল বিকসিল বৃক্ষমূলে।
এব নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥[২]

ঈশ্বর পুরী ও কেশব ভারতীর পরিচয় প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ দাস লিখেছেন—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীল কাশীনাথ ভট্টাচার্য
কুলিয়া নিবাসী বিপ্র সর্বগুণে বর্য্য ॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিল সন্ন্যাস।

১ চৈতন্য ভাগবত—আদি ৮ অঃ ২ চৈ. চ. মধ্য ৯ পরি

কেশব ভারতী নামে জগতে প্রকাশ।
ভারতী কেশব আর পুরী শ্রী ঈশ্বর।
একই আত্মা কেবল ভিন্ন কলেবর॥
কেশব ভারতী প্রভুর সন্ন্যাস গুরু হয়।
দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী সকলে জানয়॥[১]

মাধবেন্দ্র শংকরপন্থী হওয়া সত্ত্বেও প্রেমভক্তিতে শংকরের পথ থেকে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। মাধবেন্দ্র শিখাসূত্র ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। বৃন্দাবনের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় তিনি চৈতন্যদেবের মতই ভাবপ্রধান সন্ন্যাসী ছিলেন।[২] মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে অনেকে শংকর পন্থী সন্ন্যাসী বলে মনে করেন। চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু অনেক বার নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলে উল্লেখ করেছেন। পুরী. ভারতী, এবং চৈতন্য তিন প্রকার পদবীই শংকর পন্থী সন্ন্যাসীদের দেখা যায়। শৃঙ্গেরী মঠের অধীনস্থ সন্ন্যাসীগণের উপাধি পুরী। মঠের অধীন ব্রহ্মচারীর পদবী হয় চৈতন্য। সুতরাং কেশব ভারতী শংকর মঠের রীতি অনুসারে তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাখতে পারেন।[৩] লক্ষণীয় এই যে দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে মহাপ্রভু শৃঙ্গেরী মঠেও গমন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসীর শুষ্ক ভাবলেশহীন জীবন যাপন করেন নি, বরঞ্চ তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের আচরণে ভাবাবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই নব বৈষ্ণবতায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং শ্রীমদ্ ভাগবত প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। অবশ্য বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের গান মহাপ্রভুর অত্যন্ত আদরণীয় ছিল।

আলোয়ার সম্প্রদায়

দক্ষিণভারতে তামিল প্রদেশে আলোয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ কৃষ্ণ-গোপীর লীলাগান রচনা করে গান করতেন। এঁদের ধর্মাচারণ ছিল ভাবপ্রবণ। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ এবং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ধর্মাচারণের অধিকার আলোয়ারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এঁদের সাধনায় ভক্তি ও প্রেম ভগবৎ লাভের উপায়

১ প্রেমবিলাস—২৩ বি
২ "তাঁহার ভাবরসময় সাধনধারায় চৈতন্যদেবের ভাবজীবনের পূর্বাভাস পাওয়া যায় —হরপ্রসাদ সম্বর্দ্ধনা লেখমালা—পৃঃ ১২১-২২
৩ ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস—পৃঃ ১৪৯

রূপে গণ্য হয়েছে। আলোয়ারদের ভক্তিগীতিতে রাধার নাম উল্লিখিত না হলেও নাপ্পিনাই নাম্নী গোপী শ্রীরাধার স্থলাভিষিক্ত।[১]

আলোয়ারদের দ্বারা মহাপ্রভু প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না বলা যায় না। দক্ষিণভারত পরিক্রমাকালে তিনি আলোয়ারদের সংস্পর্শে আসতে পারেন। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই তিনি মাধবেন্দ্র পুরী প্রদর্শিত ভাবাত্মক ধর্মচর্যায় নিরত হয়েছিলেন, গোপীভাবের স্ফূরণও প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনেই হয়েছিল।

অনেকের ধারণা শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ভক্তির ধর্মে ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত সুফীমতের প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু শ্রীচৈতন্য যে সুফীমতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন নি, অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো তা প্রতিপাদন করেছেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই দক্ষিণভারত থেকে নামকীর্তনের রীতি বঙ্গদেশে উপনীত হয়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।[২] মহাপ্রভু প্রথম জীবনে কোন সুফী সাধকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এমন

সুফীধর্ম ও চৈতন্যধর্ম

উল্লেখ কোথাও পাই না। অধ্যাপক কানুনগো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "There is not the faintest evidence of Sri Chaitanya's intellectual contact with Islam ......Besides Sri Chaitanya was not an accident in the land of Jaydeva, who had sowed the seeds of neo-vaishnavism before the advent of Islam in Bengal."[৩]

সুফীধর্মের সঙ্গে বেদান্তের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সাদৃশ্য আছে এবং ইসলাম ধর্মে বৈদান্তিক সুফীমতের প্রবর্তক রূমী কীর্তনসদৃশ সমা নামে একধরণের নৃত্যগীত প্রচলিত করেছিলেন। সুফীমতে পরম প্রেয় ঈশ্বরলাভের পথে ৭০ হাজার আবরণ বাধা হয়ে আছে। এই আবরণ ছিন্ন করে ঈশ্বরলাভ

---

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড—পৃঃ ৫০৬

২ The pulsation of this new spiritual life, based on Bhakti and carried on the wings of Nama (name) came from south to Bengal threading its way through Telingana via Orissa. This movement silently prepared the ground for Sri Chaitanya, who was destined to give it a charming orientation and have it a mightier and more enduring force after his death"—Islam and its impact on India,—pp. 28-29.

৩ ibid—p. 29.

করতে হয়। পবিত্রতা, ভক্তি ও দেবত্ব-অর্জন ঈশ্বরলাভের পথ। অনুতাপ, ইন্দ্রিয়সংযম, সংসারত্যাগ, স্বেচ্ছাদারিদ্র্য বরণ ও ঈশ্বরে বিশ্বাস পবিত্রতার উপায়। ধ্যান, ঈশ্বর সান্নিধ্য, প্রেম, ভয়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ঘনিষ্ঠতা, শান্তি, চিন্তা এবং আত্মসমর্পণ ভক্তিলাভের উপায়। নিশ্চয়তা, উদ্দীপন এবং ঈশ্বরানুভূতি দেবত্বলাভের উপায়।[১] গুরুভক্তি সূফিধর্মে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সূফীধর্মের পরিবর্তন

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে সূফীধর্ম সাধনায় গুরুতর পরিবর্তন এসেছিল। সূফী সাধকেরা বেদান্তমত ও ভক্তিধর্মকে গ্রহণ করলেন, পৌত্তলিকতাকে প্রকারান্তরে বরণ করে নিলেন। অনেকে মাংসাহার বর্জন করলেন, অহিংসানীতি তথা সর্বজীবে প্রেমের আদর্শকে স্বীকার করে নিলেন, হজরত মহম্মদ ভাগবতের কৃষ্ণের মত একজন প্রিয় বীরনায়কের মর্যাদা পেলেন।[২] সূফীমতে বেদান্তের প্রভাব সম্পর্কে হীরালাল চোপরা লিখেছেন, "The Vedānta philosophy captured their minds; the Bhakti movement influenced their ideas and in the Panjab, the strong hold of Islam, Muslim mystics held the view that nothing was real except God and everything else was illusion or Maya."[৩]

শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত সূফীমতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অপেক্ষা চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের দ্বারা সূফীমত প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিকতর।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব

বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতানুসারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের প্রবক্তা। অদ্বৈতবাদী আচার্য শংকর জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করেছেন, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে ব্রহ্ম অদ্বয়তত্ত্ব—সর্বপ্রকার ভেদশূন্য—প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তুজগৎ মায়া বা ভ্রান্তিমাত্র। মায়া বা ভ্রান্তি দূর হলে জীব নিজের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করবে, তখন জীব নামক বস্তুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে, বর্তমান থাকবে নির্বিশেষ নিঃশক্তিক ব্রহ্ম। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য রামানুজের মতে চিৎ অর্থাৎ জীব এবং অচিৎ অর্থাৎ মায়া নামে ব্রহ্মস্বরূপের অতিরিক্ত

---

১ Cultural Heritage of India—vol, IV, pp. 594-95

২ ibid—p. 597

৩ ibid—p. 596

অথচ স্বরূপের আশ্রিত দুটি পৃথক বস্তু রয়েছে। এই দুই বস্তু বিশিষ্ট স্বরূপের নাম ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। চিদচিৎ ব্যতিরিক্ত স্বরূপকে ঈশ্বর বলা সম্ভব নয়।

মধ্বাচার্য কিন্তু ভেদবাদী। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্ম দুটি পৃথক তত্ত্ব— পৃথক বস্তু, জীব ব্রহ্মের মতই চিদ্‌বস্তু সমজাতীয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে চিৎ (জীব) ও অচিৎ (মায়া) স্বরূপের শক্তি,—স্বরূপের অতিরিক্ত নয়। জীব গোস্বামী বলেন, আনন্দমাত্র ব্রহ্মের বিশেষ্য, তাঁর শক্তিসমূহ আনন্দের বিশেষণ। শ্রীজীবের মতে চিৎ অচিৎ ব্রহ্মের শক্তি হওয়ায় এই দুই বস্তু ব্রহ্ম থেকে পৃথক হতে পারে না। শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্ন নয়, অংশ আর অংশীর মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীবসহ দৃশ্যমান সকল বস্তুর সঙ্গেই ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। ব্রহ্মের সকল শক্তিই ব্রহ্মের মধ্যে অচ্ছেদ্যভাবে অবস্থিত— "মৃগমদ গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।" শক্তি ও শক্তিমানকে ভিন্ন বলা যেমন ত্রুটিপূর্ণ, একেবারে অভিন্ন বলাও তেমনি ত্রুটিপূর্ণ। এইজন্য শক্তির সঙ্গে শক্তিমান ভেদাভেদ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তর্কাতীত এই ভেদাভেদ সাধন চিন্তায় অসমর্থতাহেতু অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব নামে অভিহিত হয়েছে। মায়িক জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদে অভেদ ও অভেদে ভেদের সম্পর্ক সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। এই দৃশ্যমান মায়িক জগৎ-জীব-ভগবদ্ধাম-লীলাপরিকর প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মের সঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্পর্কে গ্রথিত।[১] পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমা প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধা এক হয়েও দুই—আর দ্বিধা বিভক্ত হয়েও এক অদ্বয়—অচিন্ত্য ভেদাভেদ সূত্রে গ্রথিত। 'না সো রমণ ন হাম রমণী'—সাধকের এই অনুভূতিই অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের সারতত্ত্ব। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেম-সাধনায় তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। চৈতন্য-বিগ্রহে রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় প্রকাশের ব্যাপারেও এই তত্ত্ব পরিস্ফুট।

দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব উচ্চ মার্গের সাধক ভক্তের জন্য। কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের আচরণীয় ধর্ম কি? শ্রীচৈতন্য রচিত শিক্ষাষ্টক ও তাঁর জীবনাচরণ থেকে বৈষ্ণবদের আচরণীয় পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপিত হতে

---

১ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা—রাধাগোবিন্দ নাথ—পৃঃ ৩০৮-১৪

দেখা যায়। এই পাঁচটি বিধি: (১) কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গ; কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা আলোচনায় ভক্তিভাবের স্ফুরণ, (২) কৃষ্ণনাম উচ্চারণ বা জপ, (৩) কৃষ্ণলীলাখ্যান শ্রবণ, (৪) কৃষ্ণলীলার পূতভূমি বৃন্দাবনে দৈহিক, অসম্ভব পক্ষে মানসিক বাস, (৫) কৃষ্ণ-বিগ্রহ-পূজা ও তাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ-নাম গানের উপরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করেছেন, কারণ নাম ও নামী অভিন্ন।[১]

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা

কেউ কেউ মহাপ্রভুকে সহজিয়া সাধক বলে উল্লেখ করেছেন। সকল ইন্দ্রিয় সজাগ ও সক্রিয় রেখে সহজ পথে ঈশ্বরারাধনা সহজ সাধনা। ইন্দ্রিয়সমূহকে অবদমিত না করে নির্বিকার চিত্তে ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে নারী পুরুষের মিলিত সাধনা সহজ সাধনা। Edward C. Dimock শ্রীচৈতন্যকে সহজিয়া সাধক বলে প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীচৈতন্যের সহজিয়াত্বের প্রমাণ হিসাবে তিনি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন:

সহজিয়া সাধনা ও মহাপ্রভু

(এক) শ্রীচৈতন্যকে যে রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় বিগ্রহরূপে গণ্য করা হয় সেই তত্ত্বের মধ্যে আপাতঃ দ্বৈতবাদে অদ্বয়বাদের প্রতিষ্ঠা সহজিয়া ধর্মের বৈশিষ্ট্য।

(দুই) অকিঞ্চন দাস রচিত বিবর্তবিলাস নামক সহজিয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরগণকে সহজিয়া সাধকরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(তিন) মহাপ্রভুর দুই প্রিয় পরিকর রায় রামানন্দ ও নিত্যানন্দ অবধূত ছিলেন সহজিয়া সাধক।

অধ্যাপক ডিমক এই তিনটি প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করেছেন, "So Chaitanya may well have had immediate contact with the Sahajiyā schools through the two men who were among his most intimate and beloved friends and followers."[২]

এই তিনটি যুক্তির মধ্যে প্রথম যুক্তিটি একেবারে অচল। কারণ, মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় বিগ্রহরূপে বৃন্দাবনের ভক্তরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন

---

১ Cultural Heritage of India—vol. IV, p. 195.

২ The Place of the Hidden Moon—University of Chicago Press—1966, p. 55.

এবং প্রচার করেছেন ঠিকই, কিন্তু এই দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে মহাপ্রভুর কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ মহাপ্রভু নিজে এই তত্ত্ব প্রচার করেন নি। সুতরাং এই তত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁকে সহজিয়া প্রতিপন্ন করা নিতান্তই হাস্যকর। এই তত্ত্ব দক্ষিণভারত থেকে মাধবেন্দ্রপুরী ও তৎশিষ্য ঈশ্বরপুরীর মাধ্যমে গৌড়দেশে এসেছে এবং চৈতন্যসাধনায় এবং চৈতন্যতত্ত্বে মূর্ত হয়েছে। ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ এ সম্পর্কে লিখেছেন, "The Bengal Vaiṣṇavas are worshippers, mainly, of Radha-Kṛṣṇa. According to this school, the Radha Kṛṣṇa cult seems to have originated with Madhavendra Puri Goswamin, from whom his disciple Iśwara Puri Goswamin inherited it. He transmitted it to his disciple Sri Chaitanya, whose followers developed it into a full-grown system with a philosophy and theology of its own."[১]

দ্বিতীয় যুক্তিটি একটি সহজিয়া গ্রন্থ নির্ভর। এই গ্রন্থে কেবল শ্রীচৈতন্যকে নয়, তাঁর ভক্ত পরিকরদেরও সহজিয়া সাধকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকের নায়িকার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিবরণটি অত্যন্ত কৌতুককর:

শ্রীরূপ করিলা সাধন মিরার সহিতে।
ভট্ট রঘুনাথ কৈলা কর্ণা বাই সাথে॥
লক্ষ্মীহীরা সনে করিলা গোঁসাই সনাতন।
পিরিতি প্রেমে সেবা সদা আচরণ॥
গোঁসাই লোকনাথ চণ্ডালিনী কন্যা সঙ্গে।
দোহ জন অনুরাগ প্রেমের তরঙ্গে॥
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে ব্রজদেবী সম।
গোঁসাই কৃষ্ণদাস সদাই আচরণ॥
শ্যামা নাপিতিনীর সঙ্গে শ্রীজীব গোঁসাই।
পরম পিরিতি কৈল যার সীমা নাই॥
রঘুনাথ গোস্বামী পিরিতি উল্লাসে।
কিরা বাই সঙ্গে তেঁহ রাধাকুণ্ড বাসে॥

১ Cultural Heritage of India, vol. IV, p. 188.

গৌর প্রিয়া সঙ্গে গোপাল ভট্ট গোঁসাই।
করয়ে সাধন যার অন্য কিছু নাই॥
রায় রামানন্দ যজে দেব কন্যা সঙ্গে।
আরোপেতে স্থিতি তেঁহ ক্রিয়ার তরঙ্গে॥[১]

মহাপ্রভুর সাধন-নায়িকা কে ছিলেন? এ সম্পর্কে বিবর্তবিলাসকার বলেছেন—

মহাপ্রভু মর্ম সাধিলেন যার সাথে।
বিচারিয়ে অনুভব দেখ চরিতামৃতে॥
শাঠিকন্যা সঙ্গে প্রভুর সদা ব্যবহার।
ত্রিভুবনে তুলনা যে নাহিক যাহার॥

এই বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থকার চৈতন্য চরিতামৃতের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—

সার্বভৌম গৃহে প্রভুর ভোজন পরিপাটি।
যাঠীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হোক শাঠী॥
যতেক কহিল যেই দিক্ দরশন।
সেই দ্বারে করিবে ভক্ত রসাস্বাদন॥
বস্তু যৈছে আস্বাদিল নীলাচলে বসি।
সার্বভৌম গৃহে প্রভু তৈছে বিলাসি॥

* * *

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাভাগ্যবান।
যার গৃহে মহাপ্রভু সর্বানুসন্ধান॥
ধন্য শাঠী কন্যা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
যার সঙ্গে মহাপ্রভু সদত বিহরে॥

* * *

শাঠী মায়ের পাদপদ্মে অনন্ত প্রণাম।
কায় মনে ভাবে যেহ চৈতন্যচরণ॥[২]

এই বিবরণ শুধু কৌতুককর নয়, অবিশ্বাস্যও। রূপ, সনাতন, শ্রীজীব,

১ বিবর্তবিলাস ৪ বিলাস ২ বি. বি., ৪ বি.

রঘুনাথ দাস প্রমুখ চৈতন্য ভক্তরা—যাঁরা প্রবল বৈরাগ্য বশে সর্বস্ব ত্যাগ করে দীনভাবে বৃন্দাবনে কাল যাপন করেছেন ও ভক্তি গ্রন্থাদি রচনা করেছেন,—বৃন্দাবনে বসে তাঁরা সকলেই পরকীয়া নায়িকা সহযোগে সহজ সাধনার নামে নারী-সম্ভোগে নিরত থাকবেন—এমন বিবরণ নিতান্তই মনগড়া—অশ্রদ্ধেয়। সুন্দরী যুবতী ভার্যা ত্যাগ করে অসীম বৈরাগ্যবশে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন যিনি নবীন বয়সে, যিনি নারীমুখ দর্শন ও প্রকৃতি সম্ভাষণ অনুচিত কর্ম বলে গণ্য করেছেন,—নারীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণের অপরাধে প্রিয় ভক্তকে বর্জন করেছেন,—সেই চৈতন্যদেব পরস্ত্রীকে নিয়ে সম্ভোগ-সাধন করবেন এ কথা শুধু অবিশ্বাস্য অশ্রদ্ধেয় নয়, সমগ্র চৈতন্য-চরিত্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যকর। সার্বভৌম-নন্দিনী ষাঠীর সঙ্গে সংযোগের যে কাহিনী বিবর্তবিলাসকার রচনা করেছেন, তা নিতান্তই কাল্পনিক। চৈতন্যচরিতামৃত থেকে এরূপ কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। চরিতামৃত-বর্ণিত ঘটনা থেকে এরূপ কাহিনী নির্মাণ উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত সন্দেহ নেই। অদ্বৈতবাদী বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত সার্বভৌম শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে চৈতন্যমত গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের একজন প্রধান ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। সেই ভারত বিশ্রুত সার্বভৌম জামাতা ষাঠীর স্বামী দুষ্ট প্রকৃতির অমোঘ সার্বভৌম কর্তৃক নিমন্ত্রিত চৈতন্যচন্দ্রকে সার্বভৌম ও তাঁর গৃহিণী যখন বিবিধ উপচারে ভোজন করাচ্ছিলেন, সেই সময় সন্ন্যাসীর বিপুল পরিমাণে ভোজন দেখে তাঁকে অপমান করেছিল। সার্বভৌম লাঠি হাতে জামাতাকে তাড়া করেছিলেন এবং বিশিষ্ট অতিথির কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়েছিলেন। একে ত এ দেশে অতিথি নারায়ণরূপে গণ্য, তার উপর সার্বভৌম দম্পতি অনেকের মতই শ্রীচৈতন্যকে ভগবান বা ভগবানের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন—সার্বভৌম স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্যের স্তুতি রচনা করেছেন 'চৈতন্য শতক' নামে। সেই বিশিষ্ট অতিথির আহারে বসার পরে ভোজনকালে জামাতৃ-কৃত অসম্মানে ক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রোধ বশে শ্বশুর যদি জামাতার মৃত্যুকামনা করে থাকেন, যদি বলে থাকেন, আমার কন্যা বিধবা হোক, তাহলে তার মধ্যে কন্যার সঙ্গে অতিথির অবৈধ সংযোগের ইঙ্গিত কোথা থেকে আসে তা আমাদের ধারণার বাইরে। সার্বভৌমের মত বৃদ্ধ পণ্ডিত জামাতা জীবিত থাকতে কন্যাকে এক সন্ন্যাসীর সাধন-সঙ্গিনী করতে রাজি হবেন, তাও সম্ভব নয়। সুতরাং গল্পটি ভিত্তিহীন।

কাল্পনিক উদ্ভট গল্পের উপরে ভিত্তি করে চৈতন্যদেবকে সহজিয়া বলে রায় দেওয়া নিতান্ত অন্যায়।

তৃতীয় যুক্তি সম্পর্কে বলা যায়, রায় রামানন্দ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতকার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে হয়ত তাঁকে সহজিয়া বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব; কিন্তু নিত্যানন্দকে সহজিয়া বলে গণ্য করা নিতান্তই কাল্পনিক। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তাঁর প্রেমধর্ম প্রচারের উদ্দেশে নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আগমন করেছিলেন। তিনি গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা জাহ্নবা ও বসুধাকে বিবাহ করে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেছেন এবং চৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচারের স্থায়ী বংশধারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সে যুগে এক সঙ্গে দুই ভগিনীকে বিবাহ করা অসঙ্গত বা নিন্দনীয় ব্যাপার ছিল না। অধিক বয়সে যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণও সেকালে বিরল ছিল না। কিন্তু এই গার্হস্থ্য ধর্ম পালনে পরকীয়া নায়িকা সহ সাধন ভজনের ইঙ্গিত কোথায়? রামানন্দ ত শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব থেকেই বৈষ্ণবীয় প্রেমসাধনার ব্যাপারে খ্যাতিমান হয়েছিলেন আর রামানন্দ বা নিত্যানন্দ সহজিয়া হলেই চৈতন্যদেবও সহজিয়া হবেন, এ সিদ্ধান্ত অর্থহীন।

সুতরাং বিবর্তবিলাসের বিবরণ বা ডিমক সাহেবের সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে তাঁর সমকালে ও পরবর্তীকালে অনেক মত অনেক তত্ত্ব ভক্তশিষ্যদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। মহাপ্রভুর বয়ীয়ান ভক্ত নরহরি সরকার ও তাঁর শিষ্য লোচন দাস ঠাকুর নদীয়া নাগর ভাবের প্রচার করেছেন, অথচ মহাপ্রভুর কোন ভক্ত, কোন পদকর্তা কোন জীবনীকার তাঁর সহজিয়া ভাবের উল্লেখ করলেন না, বিশেষতঃ বিবর্তবিলাসের মতে যখন তাঁর ভক্তশিষ্যবর্গের অনেকেই সহজিয়া ভাবের ভাবুক—তখন ব্যাপারটা কোন প্রকারেই বিশ্বাস্য মনে হয় না। আর ষাঠীর ব্যাপারটা একেবারেই অবাস্তব। কবিরাজ গোস্বামী জানিয়েছেন যে জামাতা অমোঘের প্রতি সার্বভৌম দম্পতির তাড়ন-ভর্ৎসন দেখে মহাপ্রভু সকৌতুকে নিজের ভুরিভোজন জনিত দোষ স্বীকার করেছেন এবং অমোঘ অসুস্থ হলে মহাপ্রভুর কৃপায় সে রোগমুক্ত হয়ে মহাপ্রভুর ভক্ত হয়েছিল। জামাতা দুর্বৃত্ত হলে মেয়েকে 'রাঁড়ী' হও বা বিধবা হও বলে জামাতাকে গালি দেওয়ার দৃষ্টান্ত একালের বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে কি নিতান্তই দুর্লভ?

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের পথে শেষ পরিণতি সহজযান। সহজযানে মন্ত্র তন্ত্র দেবদেবীর কোন স্থান নেই—তান্ত্রিকতা প্রভাবিত বজ্রযানের সাধনপদ্ধতি স্বীকৃত। সহজযানীদের পরম লক্ষ্য মহাসুখলাভ। নির্বাণলাভে মহসুখপ্রাপ্তি। অজ্ঞানের আবরণ ছিন্ন করতে পারলেই চিত্ত শূন্য বা তথতায় লীন হতে পারে। তখনই লাভ হয় নির্বাণ বা মহাসুখ। মহাসুখ যখন চিত্তজয়ে তখন দেহের মধ্যেই তার অবস্থান। মহাসুখে চিত্ত লীন হলে সকলপ্রকার অনুভূতি সুখসাগরে বিলীন হয়ে যাবে। দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি,—সুতরাং দেহভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ডের অনুভূতি—শিরঃস্থিত সহস্রারে প্রজ্ঞা ও উপায়ের (পার্বতী পরমেশ্বরের) মিলনেই উপলব্ধ হয় মহাসুখ বা চরম আনন্দ। এই আনন্দলাভ হতে পারে চিত্তনিরোধের দ্বারা অথবা স্থূল দেহমধ্যেই শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা। খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ প্রচারিত দোঁহা ও চর্যাগীতিতে এই সহজিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। তত্ত্বগত দিক যাই হোক সহজ সাধনার উপায় সকল ইন্দ্রিয় সজাগ ও সক্রিয় রেখে সহজপথে মহা সুখলাভের প্রয়াসে। ইন্দ্রিয়সমূহকে অবদমিত না করে নির্বিকার চিত্তে ইন্দ্রিয় উপভোগের মাধ্যমে নারীপুরুষের মিলিত সাধনায় নির্বাণমুক্তি বা মহাসুখের অনুভূতি লাভ সহজিয়া সাধকদের গৃহীত পন্থা।

"For realisation of such a state of supreme bliss they adopted a course of sexo-yogic practice. This conception of Mahasukha is the central point round which all the esoteric practices of the Tantric Buddhists grew and developed."

বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি এবং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের সংমিশ্রণের ফলে বৈষ্ণবধর্মে সহজিয়া সাধনা অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সহজিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি প্রবলতর রূপ পরিগ্রহণ করে। সাধনসঙ্গিনী বা নারী শক্তি সহ সাধনা এই প্রক্রিয়ার অনিবার্য হয়ে ওঠে। 'নেড়ানেড়ী' নামে পরিচিত বৌদ্ধ সহজিয়াদের নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করার পরে বৈষ্ণবদের মধ্যে সহজিয়া বৈষ্ণব নামে উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল।

সহজিয়া সাধনার ধারা চৈতন্যদেবের অনেক পূর্ব থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবদের মধ্যে সহজিয়া রীতি প্রচলিত

হয়েছে শ্রীচৈতন্যের অনেক পরে। ডিমক সাহেব নিজেও স্বীকার করেছেন যে চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব সহজিয়া ভজনের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি; যে গ্রন্থগুলি পাওয়া গেছে তা সবই চৈতন্যোত্তরকালের খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত।[১] সুতরাং তিনশত বৎসর পরে যদি কেউ নিজের বা স্বসম্প্রদায়ের আচরণের সমর্থনে চৈতন্যদেব সম্পর্কে অলীক গালগল্প রচনা করে, তাহলে তার উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত করা অনুচিত। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন যে বৈষ্ণবদের মধ্যে সহজিয়া মতের আবির্ভাব হয়েছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পরে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপাদে গোস্বামিমতের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে: "The Sahajiya sect that came into prominence perhaps after the time of Viśwanatha Chakravarti, who flourished during the last quarter of the Seventeenth Century, seems to be an open defiance of the Goswamins."[২]

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই নবদ্বীপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতাররূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন ভক্তবৃন্দের নিকটে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে মুরারির কড়চায় ও কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপেই বর্ণিত হয়েছেন শ্রীচৈতন্য। চৈতন্যচন্দ্রের আত্মপ্রকাশের পূর্বেই অদ্বৈত আচার্য ঘোষণা করেছিলেন, —"করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।"[৩] জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে তৈর্থিক ব্রাহ্মণ অতিথির অন্ন পুনঃ পুনঃ উচ্ছিষ্ট করার পর ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসে শিশু নিমাইকে চতুর্ভুজ কৃষ্ণ-বিষ্ণুরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্য

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজ রূপ॥
এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥[৪]

মাধাই-এর আঘাতে রক্তাপ্লুত নিত্যানন্দকে দেখে মহাপ্রভুর কৃষ্ণভাবাবেশ হয়েছিল। বৃন্দাবন লিখেছেন—

---

[১] Place of the Hidden Moon—p. 38
[২] Cultural Heritage of India—vol. IV, p. 199
[৩] চৈ. ভা. আদি ২ অঃ [৪] চৈ. ভা. আদি ৪ অঃ

রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘন ঘনে ॥[১]

লোচন লিখেছেন—সুদর্শন চক্র বলি স্মরণ করিল।[২] এই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই-এর কাছে চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তিতে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন—

চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥[৩]

মুরারির কড়চা বা চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে চৈতন্যদেব কখনও ভগবান্, কখনও হরি, কখনও বা কৃষ্ণ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। বলরাম রূপে আবির্ভূত নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু যখন ষড়্ভুজ মূর্তি দেখালেন তখন মুরারি বলেছেন—"স দদর্শ ততো রূপং কৃষ্ণস্য ষড়্ভুজং মহৎ।"[৪] বৃন্দাবন সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে শ্রীচৈতন্যই পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ—

বৈরাগ্য সহিতে নিজ ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতনু পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান ॥[৫]

অনেকে মনে করেন যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় ভক্তগণের দৃষ্টিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ তাঁর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু প্রত্যক্ষ করে একটি বিশেষ তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজও মহাপ্রভুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা ও কঠোর ধর্মাচরণের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে মধুর রসের জীবন্ত বিগ্রহ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় বিগ্রহরূপে গ্রহণ করেছেন। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র আলোচনায় তাঁর চরিত্রের দুটি দিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একদিকে দৃঢ়তা, কঠোরতা ও বীরত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন, অন্যদিকে রাধাভাবে কৃষ্ণভজনা,—সাত্ত্বিক ভাবাবেশে অভূতপূর্ব কৃষ্ণবিরহার্তির প্রকাশ। বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের সাধনায় মধ্যে দাস্যভাব ও মধুরভাব—এই দুই ভাবের সাধনাই শ্রীচৈতন্যের সাধনায় প্রকটিত।

---

১ চৈ ভা. মধ্য ১৩ অঃ ২ চৈ. ম মধ্যখণ্ড ৩ চৈ ভা মধ্য ১৩ অঃ
৪ মু. ক.—২।৮।২৭ ৫ চৈ ভা. অন্ত্য. ৩ অঃ

মহাপ্রভুর দাস্যভাব সম্পর্কে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন,—

সেইক্ষণে ধরে প্রভু বৈষ্ণবের পায়॥

দাস্যভাবে শ্রীচৈতন্য

দশনে ধরিয়া তৃণ কররে ক্রন্দন।
কৃষ্ণরে বাপরে তুমি মোহোর জীবন॥
এমত ক্রন্দন করে পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্যভাবে প্রভু কোল করে॥[১]

বৃন্দাবন অন্যত্রও মহাপ্রভুর দাস্যভাবের উল্লেখ করেছেন। নীলাচলে অদ্বৈত আচার্যের প্ররোচনায় ভক্তগণ যখন গৌরাঙ্গ-মহিমা কীর্তন করতে থাকেন, সেই সময়ে মহাপ্রভু বলছেন,

নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার।
মুঞি কৃষ্ণদাস বই না বোলয়ে আর॥
হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহান।
ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে॥[২]

কিন্তু গোপীভাব বা রাধাভাবের প্রকাশই শ্রীচৈতন্যের জীবন-সাধনায় অধিকতর প্রকট। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে দক্ষিণাপথ গমনকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনার ফলস্বরূপ শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধার অলৌকিক ভাবরসে নিমগ্ন হয়ে যান। বৃন্দাবন, মুরারি প্রভৃতি যদিও শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বর্যভাবের চিত্র এঁকেছেন তবু গোপীভাব বা রাধাভাবের উল্লেখ বা বিবরণ তাঁদের রচনাতেও দুর্লভ নয়। বৃন্দাবনের বিবরণে গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেই গৌরচন্দ্রের দেহে সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি কৃষ্ণ-বিরহার্তি যে ভাবে প্রকাশ করেছিলেন, তাতে গোপীভাবের কথাই স্মরণে আসে।

রাধাভাব

বৃন্দাবনের বর্ণনায়—

কোথা গেলে পাইমু সে মুরালীবদন।
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস কররে ক্রন্দন॥[৩]

এই সময়েই মহাপ্রভু গোপী গোপী জপ করতে থাকেন—

গোপী গোপী গোপী মাত্র কোন দিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জলে মহাকোপে॥[৪]

---

১ চৈ. ভা. মধ্য ১৫ অঃ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৯ অঃ ৩ চৈ. ভা. ৪ তদেব অন্ত্য ২৪ অঃ

বৃন্দাবন স্পষ্ট করেই গোপীভাবের উল্লেখ করেছেন—

পূর্বে যেন গোপীসব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার॥[১]

একদিন সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে অধ্যাপনা করার কালে গৌরচন্দ্র ভাবাবেশে গোপী গোপী বলতে থাকেন।

একদিন গোপীভাবে জগত-ঈশ্বর।
বৃন্দাবন গোপী গোপী বলে নিরন্তর॥[২]

সেই সময়ে এক পড়ুয়া তাঁকে বলে,

গোপী কেনে বোল নিমাঞি পণ্ডিত।
গোপী গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ বোলহ ত্বরিত॥[৩]

এই কথা শুনে গৌরচন্দ্র ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ছাত্রটিকে মারতে গিয়েছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীও এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।[৪]

মুরারির কড়চায় গোপীভাবে দাসভাবে এবং ঈশ্বরভাবে শ্রীচৈতন্যের লোক শিক্ষার উল্লেখ আছে।

গোপীভাবৈর্দাস ভাবৈরাশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
আত্মতত্ত্বঃ স্বাত্মরতঃ শিক্ষয়ন্ স্বজনানয়ম্॥[৫]

মুরারির কড়চায় একধিকবার মহাপ্রভু রাধাভাবে ভাবুকতার উল্লেখ আছে।

রাধিকারস বিনোদ গদ্‌গদ প্রেমবারি পরিপূরিত দেহঃ।[৬]

দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমণ কালে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য পরমানন্দপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে পরমানন্দপুরী বলেছিলেন,—

জ্ঞাতোঽসি ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্ত রূপধৃক্।
শ্রীরাধা ভাবমাপন্নো মাধুর্য্যরস লম্পটঃ॥[৭]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ২৪ অঃ   ২ চৈ. চ. মধ্য ২৪ অঃ   ৩ চৈ. ভা. মধ্য ২৪ অঃ
৪ চৈ. চ. আদি ১৭ পরি   ৫ মু. ক.—৩।৩।১৭   ৬ মু. ক.—৩।১৫।১৮
৭ তদেব—৩।১৫।২৩

জানি তুমি শ্রীরাধাভাবে ভাবিত মধুররস ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণভক্তের রূপে স্বয়ং ভগবান।

নীলাচলে অবস্থান কালে রথযাত্রার সময়ে ভক্তগণ সহ কীর্তনানন্দে মগ্ন থাকার সময়ে মহাপ্রভু রাধাপ্রেমে মত্ত হয়ে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, হে নাথ, তুমি এস, ব্রজমণ্ডলে যাব; হে বিভু, বৃন্দাবনে যাব, যেখানে মনোহর বংশীধ্বনি শোনা যাবে।

শ্রীরাধিকাপ্রেমভরাতিমত্তো হসন্ রুদন্ প্রাহ ত্বমেব নাথ
আগচ্ছ যামি ব্রজমণ্ডলং বিভো বৃন্দাবনং যত্র সুবংশিকোধ্বনিঃ ॥[১]

মুরারি এই সময়ে স্পষ্ট করেই মহাপ্রভুকে রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় বিগ্রহ বলেছেন—

বৃন্দারণ্য বিলাসিনো মুররিপোঃ শ্রীরাসলীলাং শুভাং।
সাক্ষাদেব বিলাসলাস্যলহরী পূর্ণাং স্মরন্ শ্রীহরিঃ ॥
শ্রীরাধারসমাধুরীধুরিততনুর্গৌরাঙ্গমূর্তিঃ স্বয়ং।
শ্রীনন্দাত্মজ এব ভক্তিরসিকঃ স্বরাজ্য লক্ষ্মীং দধে ॥[২]

—বৃন্দাবন বিলাসী মুরারির সাক্ষাৎ বিলাস লাস্য লহরীতে পূর্ণ শুভ রাসলীলা স্মরণ করে রাধারস মাধুর্যাশ্রিততনু গৌরাঙ্গমূর্তিধারী ভক্তিরসিক নন্দপুত্র শ্রীহরি স্বয়ং নিজস্ব শোভা ধারণ করেছিলেন।

চৈতন্য চরিত বর্ণনায় শেষভাগে মুরারি বিস্তৃতভাবে রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহের বিবরণ দিয়েছেন। মহাপ্রভু রাসলীলা স্মরণ করে বিলাপ করছেন, চটক পর্বত দর্শন করে গোবর্ধন ভ্রম করছেন, গোপীভাবে কৃষ্ণের অধরা-মৃত আস্বাদন করছেন, মথুরার স্মৃতিতে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় উপনীত হচ্ছেন, সাত্ত্বিকভাবে তাঁর দেহ পূর্ণ হচ্ছে, রামানন্দ স্বরূপের মুখে রাসলীলাগান শুনে রাধাপ্রেমে বিহ্বল হচ্ছেন, এইভাবে সচ্চিদানন্দ রাধাকান্ত হয়েও রাধাভাবে ভাবিত আনন্দ রসে মগ্ন।

সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাত্মা রাধাকান্তোঽপি সর্বদা।
তদ্ভাব ভাবিতানন্দ রসমগ্নো বভূব হ ॥[৩]

প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর রাধাভাব সম্পর্কে লিখেছেন—

সিঞ্চন্ সিঞ্চন্নয়নপয়সা পাণ্ডুগণ্ডস্থলান্তং
মুঞ্চন্ মুঞ্চন্ প্রতিমুহুরহো দীর্ঘনিঃশ্বাসজাতম্।

---

১ মু. ক.—৪।২০।১৪ ২ মু. ক.—৪।২০।১৮-১৯ ৩ মু. ক.—৪।২৪।১১

উচ্চৈঃ ক্রন্দন্ করুণকরুণোদ্গীর্ণ হা হেতি রাবো
গৌরঃ কোঽপি ব্রজবিরহিণী ভাবমগ্নশ্চকাস্তি ॥[১]

—চোখের জলে পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থল সিক্তিত করতে করতে প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘশ্বাস মোচন করতে করতে করুণায় হা হা এই করুণরবে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে গৌরচন্দ্র কোন ব্রজবিরহিনীর ভাবকান্তি প্রকাশ করেছিলেন।

প্রবোধানন্দ সুস্পষ্টভাবে শ্রীচৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহরূপে উল্লেখ করেছেন—"সাক্ষাদ্রাধামধুরিপুর্ভাতি গৌরচন্দ্রঃ।" "একতুতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্ত।"[২]—রাধার সঙ্গে একীভূত মাধবের বিগ্রহ গৌরচন্দ্র তোমাদের রক্ষা করুন।

নিত্যানন্দ দাসের প্রেম বিলাসে মহাপ্রভু লোকনাথকে বলেছিলেন।

রাধিকার ভাব লৈয়া আইনু গৌড়দেশে।
আস্বাদন নহে দুঃখ অশেষ বিশেষে ॥[৩]

নরহরি সরকার একটি পদে রাধাকৃষ্ণরূপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বর্ণনা করেছেন—

মনে মনে অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ তনু তার সাথী।
অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদ্ভুত চৈতন্যের লীলা।
রহি সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জরায় বিলাইতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা ॥[৪]

কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সঙ্গী স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় রাধাভাব আস্বাদনের নিমিত্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের অবতার গ্রহণের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে স্বরূপ দামোদরেরও পূর্বে নরহরি সরকার এই পদটি রচনা করে এই তত্ত্ব প্রথম প্রকাশ করেছিলেন।[৫]

---

১ চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—১০৮ ২ চৈতন্য চন্দ্রামৃতম্—১০৯ ৩ চৈতন্য চন্দ্রামৃতম্—১৩
৪ প্রে. বি —৭ বি ৫ পদকল্পতরু- ২২৫১
৬ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—২য় সং, পৃঃ ৬২

উড়িয়া ভক্ত কানাই খুঁটিয়াও মহাপ্রভুর রাধাভাবের উল্লেখ করেছেন—

ভাবয়ে মজিন কালে কৃষ্ণ আরাধনা।
রাধাভাব ভাবে অটই ধারণা ॥
এ ভাব গুপত এহা অপ্রকট ভাব।
একথা মানঙ্ক কেভে প্রকট না হেব ॥[১]

শ্রীরূপ গোস্বামীও চৈতন্যাষ্টকে মহাপ্রভুর রাধাভাব কান্তি গ্রহণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন,—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥[২]

—প্রণয়িজনের (ব্রজাঙ্গনাদের) অপার রস হরণ করে মধুর রস উপভোগ করতে যে কৌতুকী নিজের দেহে তাঁদের দ্যুতি প্রকাশ করে নিজের রূপ গোপন করেছিলেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাকে অতিশয় কৃপা করুন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নবদ্বীপ, উড়িষ্যা এবং বৃন্দাবনের সকল ভক্তই মহাপ্রভুর গোপীভাব বা রাধাভাব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বাস্তবিকই স্বর্ণবর্ণ দীর্ঘদেহী শ্রীচৈতন্যের ধর্মসাধনায় চিত্তদীর্ণ তীব্র কৃষ্ণবিরহ এত প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে তাঁকে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর অবতার জেনেও ভক্তগণ তাঁর মধ্যে শ্রীরাধার অবতারত্ব অনুভব না করে পারেন নি। সুতরাং সকলের অনুভূত একটি ধারণা ক্রমে ক্রমে দৃঢ় প্রত্যয়রূপে কোন কোন ভক্তের নিকট প্রতিভাত হোল, অবশেষে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের হাতে একটি বিশেষ তত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হলেন একদেহে রাধাকৃষ্ণের অবতার—বাহিরে গৌরবর্ণ রাধা অন্তরে কৃষ্ণ। চৈতন্যাবতার একটি বিশেষ তত্ত্বরূপে প্রতিভাত হওয়ায় প্রয়োজন হোল এই অভিনব অবতারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। চৈতন্যাবতার আর এখন অধর্মের নাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার নয়, এখন রাধাপ্রেমের মাধুর্য প্রকাশের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য গড়ে উঠলো নতুন থিয়োরি। এই থিয়োরির প্রবক্তা বৃন্দাবনের

---

১ মহাভাবপ্রকাশ—২য় বৃত্ত ২ স্তবমালা—চৈতন্যাষ্টকম্—২।৩

গোস্বামিবৃন্দ.—উদ্দেশ্য এক দেহে কৃষ্ণ ও রাধাভাবের হেতু ব্যাখ্যা। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কবিরাজ বলেন, কামগন্ধহীন যে গোপীপ্রেম, সেই প্রেমের অধিকারিণী গোপীগণ কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত পূরণের জন্য পরিপাটি প্রেমসেবা করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা।

সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা॥[১]

মহাভাব স্বরূপিণী কৃষ্ণবল্লভা রাধা কৃষ্ণপ্রাণধন।

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥[২]

কৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবকান্তি নিয়ে মর্তে আবির্ভূত হওয়ার হেতু প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী রূপ গোস্বামীর কড়চা থেকে সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন :

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কী দৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভা-
ত্তদ্‌ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

—শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, আমার প্রেমের অদ্ভুত মাধুর্য তিনি কিভাবে আস্বাদন করেন, আমার সৌখ্য তিনি কিভাবে অনুভব করেন, এই তত্ত্ব জানার লোভে শচীগর্ভ সমুদ্রে হরীন্দু জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হইতে রাধা সুখ শত অধিকাই॥

* * *

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখ-মাধুর্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥

---

১ চৈ. চ. আদি ৪ পরি ২ তদেব

রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগ মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥[১]

কবিরাজ গোস্বামীর মতে তিনটি সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাব-কান্তি গ্রহণ—(১) কৃষ্ণসঙ্গমে রাধার সুখাস্বাদন, (২) রাধাপ্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি এবং (৩) রাগমার্গের সাধনায় ভক্তের ভক্তির স্বরূপ শিক্ষাদান। তিনি রূপ গোস্বামীর কড়চা থেকে অ র একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে শ্রীচৈতন্যের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন। শ্লোকটি এই :

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপম্॥

—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতিরূপা হ্লাদিনী শক্তি, উভয়ে একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও পুরাকালে দুই দেহ ধারণ করেছিলেন। অধুনা সেই দুই দেহ একত্তাপ্রাপ্ত হয়ে চৈতন্য নামে প্রকটিত হয়েছেন। রাধাভাবদ্যুতিতে সুন্দর কৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্যকে নমস্কার।

কবিরাজ গোস্বামী আরও বললেন,

ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম।
শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদ কারণ॥

---

১ চৈ. চ. আদি ৫ পরি

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥[১]

কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত এই তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপিণী হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধা একদেহে চৈতন্যরূপে নিজের লীলারস নিজেই আস্বাদন করেছেন। এই ভেদে অভিন্নরূপ মহাপ্রভু স্বয়ং দেখিয়েছেন রায় রামানন্দকে—

তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ ॥[২]

শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে আর একপ্রকার মতবাদ ভক্তগণের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত। সুতরাং কৃষ্ণভজনা বাদ দিয়ে গৌরাঙ্গ ভজনাই কর্তব্য। শ্রীচৈতন্যই পরম পুরুষ—তিনিই পরম তত্ত্ব—একমাত্র উপাস্য—তিনি উপেয়—কৃষ্ণলাভের উপায় মাত্র নন। এই মতবাদ গৌর পারম্যবাদ নামে প্রচলিত। গৌরপারম্যবাদীরা গোপাল মন্ত্র ত্যাগ করে গৌরমন্ত্র কৌলিক আচার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতে নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই মতের উপাসক।[৩] মুরারি গুপ্তও এই মতাবলম্বী। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণকেই পরম তত্ত্বরূপে উপাসনা করতেন, শ্রীচৈতন্যকে তাঁরা পরমতত্ত্বলাভের উপায় বলে মনে করতেন। গৌরপারম্যবাদীরা শ্রীচৈতন্যের কিশোর মূর্তির অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা নবদ্বীপের কিশোর গৌরাঙ্গকে পূর্ণতম, গয়াপ্রত্যাগত স্বভাববিহ্বল গোরচন্দ্রকে পূর্ণতর এবং সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে পূর্ণ মনে করতেন।[৪]

গৌরপারম্যবাদ

ভক্তগণ গৌরপারম্যবাদে তৃপ্ত না হয়ে আরও ব্যক্তিগতভাবে নিবিড়তর-ভাবে শ্রীচৈতন্যকে লাভ করতে চাইলেন। গৌরপারম্যবাদ আরও একটু রসঘন হয়ে উঠলো এই তত্ত্বে। এই মতানুসারে শ্রীচৈতন্যই পরমতত্ত্ব, তিনিই পরম পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণের মত একমাত্র পুরুষ, বাকী সকল জীবই নারী। সুতরাং ভক্ত নিজেকে নায়িকা বা নাগরী ভেবে পরম পুরুষ বিশৈকগতি

১ চৈ. চ. আদি ৪ পরি ২ চৈ চ. মধ্য ৯ পরি ৩ চৈতন্যচরিতের উপাদান—২য় সং—পৃঃ ১৭৮ ৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—২ খণ্ড, ২য় সং – পৃঃ ২৯০

শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনা করতেন। মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ নরহরি সরকার নদীয়া নাগর ভাবের প্রবর্তক। নরহরিশিষ্য লোচন দাস এই ভাবের বহু পদ রচনা করেছেন। নরহরি লোচন ছাড়াও বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ এবং আরও অনেক ভক্ত নদীয়ানাগর ভাবের বহু আদি রসাত্মক পদ রচনা করেছেন। এই সকল পদে শ্রীগৌরাঙ্গ শৃঙ্গার রসের নায়করূপে চিত্রিত। নদীয়ানাগর ভাব বাঙ্গালার গণ্ডী ছাড়িয়ে কাশী পর্যন্ত ধাবিত হয়েছিল। প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্-এর একটি শ্লোকে গৌর-নাগরের উল্লেখ আছে।

নদীয়ানাগর তত্ত্ব

কোঽয়ং পট্টধটী বিরাজিত কটীদেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্।
ঊর্ধ্বীকৃত্য নিবদ্ধ কুণ্ডলবয়ঃ প্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ॥

—কটিদেশে বিরাজিত পট্টবস্ত্র, করে কঙ্কণ, বক্ষে হার, কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল, পদে নূপুর ধারণ করে চূড়া করে উর্ধ্বে বাঁধা কেশে প্রস্ফুটিত মল্লিকার মালা শোভিত কে এই গৌর নাগর বর নিজ নাম কীর্তন করতে করতে নৃত্য করছেন?

এই সকল পদে নদীয়ার নারীবৃন্দও গৌরাঙ্গের রূপে বিমুগ্ধা পাগলিনী—গৌরাঙ্গের অদর্শনে তাদের মনপ্রাণ ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে—কেউ কেউ স্বপ্নে গৌরহরির সঙ্গে মিলিত হয়। ব্রজগোপীদের মতো নদীয়া-নাগরীদেরও অকৈতব শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গের মনে এতটুকু চাঞ্চল্য বা মা'লন্য দেখা যায় না। নরহরি সরকারের গৌরনাগরভাবের একটি পদ:

বেলা অবসানে ননদিনী সনে জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া কলসী ভাঙ্গিয়া এনু॥
কাঁপে কলেবর গায় আসে জর চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গচাঁদের রূপের পাথারে সাঁতারে না পাই থা॥
দীঘল দীঘল নয়ান যুগল বিষম কুসুম শরে।
রমণী কেমনে ধৈরজ ধরিবে মদন কাঁপয়ে ডরে॥
কহে নরহরি গৌরাঙ্গ-মাধুরী যাহার অন্তরে জাগে।
কুলশীল তার সকলি মজিল গোরাচাঁদের অনুরাগে॥[১]

১ গৌরপদতরঙ্গিনী—৩৯ পদ

অনুরূপ ভাবের লোচন দাসের একটি পদ :

গৌরাঙ্গ-তরঙ্গে নয়ন মজিল কিবা সে করিব সায়।
কলঙ্কের ডালি মাথায়, ঘরে না রহিব আর ॥
সই এবে সে করিব কি ?
গৌরাঙ্গচাঁদের নিছনি লইয়া গৃহে সমাধান দি ॥[১]

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের রচিত নদীয়া নাগর ভাবের পদ :

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার কুলশীলমান, গৌরাঙ্গ আমার গতি ॥
গৌরাঙ্গ আমার পরাণ-পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন, তাহার দাসী যে আমি ॥
হরিনাম রবে কুল মজাইল পাগল করিল মোরে।
যখন সে রব করয়ে বন্ধুয়া রহিতে না পারি ঘরে ॥
গুরুজন বোল কানে না করিব কুলশীল তেয়াগিব।
জ্ঞানদাস কহে বিনি মূলে সেই গৌরপদে বিকাইব ॥[২]

বৃন্দাবনের গোস্বামিবৃন্দ রচিত ভক্তিশাস্ত্রপাঠে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ভিত্তির উপরে হবে ঠিকই, কিন্তু জীবের দুঃখে বিগলিত হয়ে তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যাঁর অবতার তাঁর মধুর মূর্তি বিস্মৃত হয়ে জীব ধর্মশাস্ত্র পাঠে নিমগ্ন হবে, নরহরি এমন অবস্থাটা পছন্দ করতে পারেন নি। মহাপ্রভুর মাধুর্যাশ্রিত লীলাকাহিনী অন্তরঙ্গভাবে আস্বাদন করে মানুষ জ্বালাময় জীবনে শান্তিলাভ করবে, এই ছিল নদীয়ানাগরভাব প্রবর্তনার উদ্দেশ্য।[৩] চৈতন্যলীলায় প্রধান পরিকর মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারের প্রধান সহায়ক নিত্যানন্দকে গৌরাঙ্গপ্রেমে বিভোরা নাগরীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নরহরি রচিত নিতাই নাগরীভাবের একটি পদ :

ভাবে গর গর নিতাই সুন্দর
হেরি গোরাচাঁদের ছটা।
কত উঠে চিতে নারে স্থির হৈতে
প্রতি অঙ্গে নব পুলক ঘটা ॥

২ গৌরপদতরঙ্গিনী—৬২ পদ ৩ গৌরপদতরঙ্গিনী—ভূমিকা—পৃঃ ১১৮

নাগরী নিতাই-এর সঙ্গে নাগর গৌরাঙ্গের মিলন ঘটে :

নিত্যানন্দ কোলে লৈয়া নেত্রজলে
ভাসে কিবা প্রভু প্রেমের রীতি ।
কহে নরহরি শ্রীবাসাদি চারি
পাশে কাঁদে কেহ না ধরে রতি ॥[১]

রাধারমণ চরণদাস বাবাজী (মৃত্যু ১৩১২) ও তৎশিষ্য রামদাস বাবাজী (১২৮৩-১৩৬০) গৌরপারম্যবাদ ও নদীয়া নাগরভাবের উপরে একটু নতুন রঙের পোঁচ বুলিয়ে আর একটি নূতন তত্ত্ব গড়ে তুললেন।

বিবর্তভোগ বিলাসবাদ

এই তত্ত্বকে বিবর্তভোগবিলাসবাদ নামে চিহ্নিত করা যায়। রাধারাণীর কৃপা যেমন কৃষ্ণলাভের উপায়, নিত্যানন্দেরও কৃপা ছাড়া তেমনি গৌরাঙ্গস্বরূপ ধ্যান বা জ্ঞান সম্ভব নয়। সুতরাং 'নিতাই নিতাই' মন্ত্রই গৌরবশীকরণ মন্ত্র। পরস্পরের প্রেমরসাস্বাদনের নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ চৈতন্যতনুতে ও প্রেমবৈচিত্ত্য অর্থাৎ নিত্যমিলনেও বিচ্ছেদের আশংকা ফুটে উঠেছে গৌরচন্দ্রের তীব্র কৃষ্ণবিরহার্তিতে। নিবিড়তম পূর্ণতম মিলনেও অচিন্তনীয় বিরহ বেদনা। রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই 'বিলাস বিবর্তরূপ' বিবর্তরূপে মহাভাব শ্রীরাধা ও রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ একদেহে নবদ্বীপে শ্রীবাসঅঙ্গনরাসমণ্ডলে চৈতন্যপরিকররূপে আবির্ভূত গোপীগণ সহ রাসলীলায় নৃত্য করছেন। কৃষ্ণসখা রাধাসখী ও মঞ্জরীগণ অন্যান্য ব্রজবাসিগণ সহ গৌরলীলায় গৌর পরিকররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সখা সখী ও অন্যান্য ব্রজবাসিগণ— যাঁরা ব্রজে রাসলীলায় অংশ পান নি, যাঁরা রাধাকৃষ্ণের সেবায় নিজেদের সার্থক করে তুলতে পারেন নি, তাঁরাই নাগর নাগরীর মিলিত বিগ্রহ—স্বরূপতঃ একমাত্র পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের রাসে গোপীভাবে অংশ গ্রহণের নিমিত্ত চৈতন্য পরিকররূপে গৌরলীলায় অবতীর্ণ। বিবর্তিততনু গৌরদেহে ভোগাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে। ভোক্তা গৌরাঙ্গ এবং ভোগ্য গৌর-লীলার প্রধান সহায় নিত্যানন্দ। ব্রজের বলরাম নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ। বলদেবের বাসনা ছিল রাসে কৃষ্ণের আলিঙ্গনে সার্থক হবেন। যুগল কিশোরের সেবায় নিরতা অনঙ্গমঞ্জরীর সাধ হোল, তিনি পুরুষরূপে যুগল কিশোরের সেবা করবেন। বলদেব তাই অনঙ্গমঞ্জরীর দেহে প্রবেশ করে পুরুষ নিত্যানন্দ

---

১ গৌরপদতরঙ্গিনী—২৬ পদ

রূপে আবির্ভূত। এখন রসরাজ হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ, আর মহাভাব হলেন নিত্যানন্দ। পরস্পরের ঘটলো মিলন।

গৌরস্বরূপ নিতাই এ দেখে
বাহু পসারি ধরলো বুকে
হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি।

* * *

রসরাজ গৌরাঙ্গ বিহরে
নিতাই দেহ কুঞ্জকুটিরে।

বিবর্ত্তলীলায় মহাভাব নিতাই কখনও পুরুষ কখনও নারী—কখনও নাগর, কখনও বা নাগরী। বিবর্তিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন নাগর-নাগরীর মিলিত বিগ্রহ,—নিতাইও তাই। তাই অপূর্ব মধুররসের লীলায় গৌর নাগর হলে নিতাই হন নাগরী, আর নিতাই নাগর হলে গৌর হন নাগরী।

প্রাণগৌর যখন মানিনী হয়, নিতাই নাগর হয়ে
গললগ্নীকৃতবাসে তার পায়ে ধরে রে।

আবার নিতাইও নাগরী হয়ে—

আধবদনে ঘোমটা টেনে
চেয়ে আড়নয়নে গৌর পানে
আমার প্রাণনাথ বলি ডাকে রে॥

এইভাবে বিবর্তিত দেহে গৌর নিতাই-এর ভোগবাসনা চরিতার্থ হয়।[১] মূর্তিমান গোপিকাপ্রেমই বিবর্তভোগবিলাসবাদের মূল কথা। অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব গৌরপারম্যবাদ ও নদীয়ানাগর ভাবের একত্র সম্মিলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই নূতন তত্ত্ব বিবর্তভোগবিলাসবাদ। বিবর্ত্তভোগবিলাসতত্ত্বে মঞ্জরীতত্ত্বও মিশ্রিত হয়েছে। কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গৌর-পরিকরগণের কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধার পরিচারিকা মঞ্জরীরূপের বিবরণ দিয়েছেন। কবিকর্ণপূরের বিবরণ অনুসারে রূপগোস্বামী বৃন্দাবনে ছিলেন রূপমঞ্জরী, সনাতন লবঙ্গমঞ্জরী, গোপাল ভট্ট অনঙ্গমঞ্জরী মতান্তরে তিনি গুণমঞ্জরী, রঘুনাথ ভট্ট, রাগমঞ্জরী, রঘুনাথ দাস রসমঞ্জরী, লোকনাথ দাস লীলামঞ্জরী প্রভৃতি। বিবর্তবিলাস তত্ত্বে অনঙ্গমঞ্জরী ও বলরাম একদেহ প্রাপ্ত হয়ে চৈতন্যলীলায় নিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং কৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে মিলিত হয়ে—কৃষ্ণভোগবাসনা চরিতার্থ করেছেন।

১ শ্রীগুরুকৃপার দান—রামদাস বাবাজী

বিংশ অধ্যায়

শ্রীচৈতন্যাবদান— সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের উদার ধর্মনীতি, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অনন্যসাধারণ চরিত্র মহিমা ও অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদনা ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে এনেছিল জাগ্রত চেতনা। এই জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির সর্বস্তরে, বাঙ্গালীর জীবনে এসেছিল নবজীবনের ভাববন্যা। এই ভাববন্যা-সঞ্চিত পলিমৃত্তিকা সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও উড়িয়া সাহিত্যের জমিকে উর্বরা করে তুলেছিল। শ্রীচৈতন্যের জীবন কথা অবলম্বনে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষায় কাব্য নাটক প্রশস্তি সঙ্গীতাদি রচিত হতে থাকে। সংস্কৃতভাষায় প্রথম চৈতন্যজীবনী রচনা করলেন শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী বৈদ্য মুরারি গুপ্ত। মুরারির কাব্য (২।৪।২১-২৭) এবং কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য (৬।৪৪-৪৫) অনুসারে মহাপ্রভু স্বয়ং মুরারিকে তাঁর চরিত্র বর্ণনায় অনুমতি দিয়েছিলেন। মুরারির গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছিল ১৪২৫ শকাব্দে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪০৭ শকাব্দে। সুতরাং মুরারির গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনের আঠারো বৎসরের বিবরণ থাকাই সম্ভব। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের তিরোধান পর্যন্ত বিবরণ উক্ত গ্রন্থে থাকায় অনেকে মনে করেন যে মুরারির গ্রন্থে অনেক প্রক্ষেপ আছে। মুরারির কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্। গ্রন্থটি মুরারির কড়চা নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু একটি পুরোপুরি কাব্য বা মহাকাব্যের আকারেই গ্রন্থটি পাওয়া যায়, কড়চা বা দিনপঞ্জীর আকারে নয়। সম্ভবতঃ প্রথমাবস্থায় কড়চার আকারেই মুরারি লিখেছিলেন, পরে একে পূর্ণাঙ্গ কাব্যাকারে রূপান্তরিত করা হয়। মুরারির কাব্য মোট চারটি প্রক্রমে ৭৮টি সর্গে বিভক্ত। চৈতন্যজীবনের প্রাচীনতম আকরগ্রন্থ মুরারির কড়চা। মুরারির পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম প্রশংসনীয়। অবশ্য অলৌকিক ঘটনার বিবরণও নিতান্ত স্বল্প নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের দান

চৈতন্য জীবনী

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর নামে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্য তাঁর নাম দিয়েছিলেন পুরী দাস।

কবিকর্ণপুর উপাধিটি তাঁরই দেওয়া। ১৬৬৪ শকাব্দের (১৫৪২ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসে কবিকর্ণপুর রচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ নামে মহাকাব্য সমাপ্ত হয়। কুড়িটি সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্যে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহস্থালি ও সমকালীন নবদ্বীপের অবস্থা থেকে সমগ্র চৈতন্য জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য অন্ত্যলীলার ঘটনাবলী অত্যন্ত অল্প কথায় শেষ করেছেন কবি। প্রথম সর্গে তিনি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানে ভক্তগণের দুঃখ শোকের বিবরণ দিয়েছেন এবং নবম ও দশম সর্গে মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট শ্রীবাস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গোপী লীলা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং জীবনী অপেক্ষা কবিত্বের দিকেই কবির অধিকতর মনোযোগ নিবিষ্ট হয়েছে। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যজীবনী বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক দশ অংকে সমাপ্ত। শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরে শোকার্ত উৎকলাধীশ প্রতাপরুদ্রদেবের শোক অপনোদনের নিমিত্ত এই নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। সুতরাং প্রতাপরুদ্রদেবের মৃত্যুর (১৫৩০-৪১ খ্রীঃ) পূর্বে এই নাটক রচিত হয়েছিল। যদিও'ভক্তি, বৈরাগ্য, কলি প্রভৃতি কয়েকটি ভাবাত্মক চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবন বর্ণিত হয়েছে, তথাপি নাটকটি অধিকতর তথ্য সমৃদ্ধ এবং মহাকাব্য অপেক্ষা নাটকে পরিণত হস্তের ছাপ আছে।

কবিকর্ণপূরের অন্যান্য রচনা: কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূ কাব্য, অলংকার শাস্ত্রের গ্রন্থ অলংকার কৌস্তুভ, খণ্ড কবিতার সংকলন আর্যাশতক, স্তুতিকাব্য কৃষ্ণার্চিক কৌমুদী এবং গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। শেষোক্ত গ্রন্থে কবিকর্ণপুর চৈতন্য লীলাপার্ষদগণের কৃষ্ণলীলার সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিপাদন করে অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কবিকর্ণপূরের নামে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে অনেকে সংশয় প্রকাশ করে থাকেন।

শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও পার্ষদগণের অনেকে শ্রীচৈতন্যের স্তবস্তুতি ও রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক শ্লোকাবলী রচনা করেছিলেন। এই ধরণের গ্রন্থের মধ্যে বাসুদেব সার্বভৌম রচিত চৈতন্যশতক ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১৪৭ শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের স্তুতি। সঙ্গীতমাধব, বৃন্দাবন মহিমামৃত (শতক কাব্য), গোপাল তাপনীর টীকা বিবেক শতক, আশ্চর্য রাস প্রবন্ধ স্তোত্রকাব্য,

শ্রীশ্রীরাধারস সুধানিধি (২৭২টি শ্লোক সংগ্রহ) প্রভৃতি গ্রন্থাবলী প্রবোধানন্দের নামে প্রচলিত আছে। সঙ্গীতমাধব গীত গোবিন্দের অনুকরণে ২৭টি শ্লোকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য। হরিদাস দাস বাবাজীর মতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্ নামক শতক কাব্যটি প্রবোধানন্দের রচনা।[১]

মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায় সর্বক্ষণের সঙ্গী স্বরূপ দামোদর (পূর্বাশ্রমে পুরুষোত্তম আচার্য) শ্রীচৈতন্যের জীবন সম্পর্কে একটি কড়চা লিখেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। কিন্তু এই গ্রন্থের কোন হদিশ পাওয়া যায় নি।

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম ভক্ত বৃন্দাবনবাসী রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দশক, দানকেলি চিন্তামণি নাটিকা, শ্রীনামচরিত, মুক্তাচরিত্র প্রভৃতির রচয়িতা। রঘুনাথ দাসের স্তবমালা বা স্তবাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে চৈতন্যাষ্টক, গৌরাঙ্গস্তব কল্পতরু, মনঃশিক্ষা, বিলাপকুসুমাঞ্জলি, রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুসুমকেলি, প্রেমপরাবিধ স্তোত্র, বিশাখানন্দ স্তোত্র, ব্রজবিলাসস্তব প্রভৃতি। চৈতন্যাষ্টক ও গৌরাঙ্গস্তব কল্পতরুতে শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার উজ্জ্বল চিত্র আছে। দানকেলিচিন্তামণি রঘুনাথের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মুক্তাচরিত্র দানলীলা জাতীয় চম্পূকাব্য।

ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে তিনি লীলাশুক বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা রচনা করেছিলেন। হরিভক্তিবিলাস নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবীয় স্মৃতিগ্রন্থ গোপাল ভট্টের নামে প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবীয় আচার আচরণ, ধর্মানুষ্ঠান, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া প্রভৃতি পুরাণতন্ত্রের প্রমাণ সহ আলোচিত হয়েছে। হরিভক্তি বিলাসের দ্বিতীয় শ্লোকে গোপাল ভট্ট নিজেকে প্রবোধানন্দ শিষ্য, চৈতন্যপ্রিয়, রঘুনাথ দাস ও রূপসনাতনের সন্তোষবিধানকর্তা বলে উল্লেখ করেছেন। জীব গোস্বামী 'লঘু বৈষ্ণবতোষিণী' টীকার শেষে সনাতনের গ্রন্থ-তালিকায় হরিভক্তিবিলাসের উল্লেখ করেছেন। হরিভক্তিবিলাসের দিগ্‌দর্শনী নামক টীকাটিও সনাতনের রচনা বলে মনে করা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে হরিভক্তিবিলাস সনাতনের রচিত।[২] কবিরাজ বলেছেন, মহাপ্রভু স্বয়ং সনাতনের বৈষ্ণবীয়

---

১ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—পৃঃ ১৩৭ ২ চৈ. চ. অন্ত্য—৫ পরি

স্মৃতি রচনায় আদেশ করেছিলেন এবং সনাতনের অনুরোধে তিনি সূত্রাকারে স্মৃতিগ্রন্থের দিগ্‌দর্শন করেছিলেন।[১] নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন—

গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন ॥[২]

দ্রাবিড়দেশের অধিবাসী নৃসিংহের পৌত্র এবং হরিবংশ ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট কালকৌমুদী, কৃষ্ণবল্লভী এবং রসিকরঞ্জনী নামক তিনখানি বৈষ্ণবের আচার আচরণমূলক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ইনিও ছিলেন চৈতন্যভক্ত ও চৈতন্যতত্ত্বজ্ঞ। অনেকে দুই গোপালকে এক ব্যক্তি মনে করেন।

রূপ সনাতন ও তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর প্রতিভা ও মনীষা সর্বজনবন্দিত। বৃন্দাবন নিবাসী এই তিন সন্ন্যাসী সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ রচনা করে চৈতন্যধর্ম ও তত্ত্বকে প্রসারিত করেছিলেন। রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী কাব্য, নাটক, চম্পু, রসতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরূপ লিখেছিলেন তিনটি নাটক—বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব এবং একটি লোককথাশ্রিত এক অংকের ভাণিকা—দানকেলিকৌমুদী। শ্রীরূপ প্রথমে একটি নাটকে একত্রে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণনা করেছিলেন। পরে মহাপ্রভুর নির্দেশে তিনি নাট্যবস্তুকে দ্বিধা বিভক্ত করে বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামক দুটি নাটক নির্মাণ করেছিলেন। এই নাটকদ্বয়ে রূপের সাহিত্য-প্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করেছে। সাত অংকের নাটক বিদগ্ধ মাধবে বৃন্দাবনলীলা পূর্বরাগ থেকে সম্ভোগ পর্যন্ত এবং দশ অংকের ললিত মাধব নাটকে শ্রীরূপ বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণনা করেছেন। রূপ গোস্বামীর মহত্তম কীর্তি ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রানুসারী অলংকার শাস্ত্র উজ্জ্বলনীলমণি। এ ছাড়াও তিনি নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ নাটকচন্দ্রিকা, ১৪২টি শ্লোকে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দূতকাব্য হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশকাব্য, লঘুভাগবতামৃত, ৬৪টি স্তবের সংকলন স্তবমালা, রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, পর্যাখ্যাতচন্দ্রিকা, কৃষ্ণজন্মতিথি, অষ্টকালিকা, শ্লোকাবলী, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, সামান্যবিরুদলক্ষণ, কৃষ্ণাভিষেক (স্মৃতিগ্রন্থ), গীতাবলী, নিকুঞ্জ-রহস্যস্তব প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ভক্তিরত্নাকরে উক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও

১ চৈ. চ. মধ্য—২৪ পরি ২ ভ. র.—১।৯৮

ছন্দোহষ্টাদশক, উৎকলিকাবল্লী, প্রেমেন্দুসাগর ও মথুরামহিমার নাম উল্লিখিত আছে শ্রীরূপ রচিত গ্রন্থের তালিকায়।[১] শ্রীরূপ সংকলিত পদ্যাবলী একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন গ্রন্থ। প্রাচীন ও নবীন ১২৫ জন কবির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও দ্বৈতবাদী ভক্তিরসাত্মক ৩৮৬টি শ্লোক এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। লক্ষ্মণ সেন, গোবর্ধন আচার্য, শরণ ইত্যাদি থেকে সুরু করে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরূপাদি ভক্তবর্গের রচিত শ্লোকে এই সংকলন সমৃদ্ধ। কবি ও কাব্যরসিক শ্রীরূপ তাঁর এই সংকলনেও যথেষ্ট রসবোধ ও বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীরূপের ১৭টি গ্রন্থের নাম আছে।

সনাতনের রচনা: প্রেমভক্তিতত্ত্ববিষয়ক কাব্য বৃহদ্ ভাগবতামৃত ও লেখকের স্বয়ংকৃত টীকা দিগ্‌দর্শনী, ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা বৈষ্ণবতোষণী, হরিভক্তিবিলাস (?), মেঘদূতের টীকা ও লঘুহরিনামামৃত ব্যাকরণ। জীব গোস্বামীর তালিকা অনুসারে লীলাস্তব বা দশম চরিত নামে একটি গ্রন্থও সনাতনের রচনা। গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। সনাতনের রচনাবলীর মধ্যে বৃহদ্‌ভাগবতামৃত সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

অনুপম বল্লভের পুত্র, রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহুতর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গোপালচম্পূ, সংকল্প কল্পদ্রুম, মাধব মহোৎসব মহাকাব্য, গোপাল বিরুদাবলী কাব্য, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, সূত্রমালিকা (ধাতু সংগ্রহ —ব্যাকরণ গ্রন্থ), ভক্তিরসামৃত শেষ, দুর্গমসঙ্গমণি ও লোচনরোচনী (রসশাস্ত্রবিষয়ক), বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক ভাগবত সন্দর্ভ বা ষট্ সন্দর্ভ, বৈষ্ণব স্মৃতি ও ধর্মতত্ত্ববিষয়ক কৃষ্ণার্চাদীপিকা, ব্রহ্মসংহিতার গোপালতাপনী টীকা, ক্রম সন্দর্ভ ও লঘুতোষণী। তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ ও প্রীতিসন্দর্ভ—এই ছয়খানি সন্দর্ভগ্রন্থ রচনা করে শ্রীজীব বৈষ্ণব দর্শনকে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের পর্যায়ভুক্ত করে তোলেন। ভক্তিরত্নাকর অনুসারে শ্রীজীবের গ্রন্থসংখ্যা পঁচিশ। শ্রীসঙ্কল্পবৃক্ষ, রসামৃতটীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, যোগসারস্তবের টীকা, ও অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীভাষ্য ভক্তিরত্নাকরের তালিকায় শ্রীজীবের গ্রন্থরূপে উল্লিখিত।[২]

---

১ ভক্তিরত্নাকর—১।৭৯১-৯৯ ২ ভ. র —১।৮৩৩-৪২

শ্রীচৈতন্যের পিতৃব্য কংসারি মিশ্রের পুত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী নামে শ্রীচৈতন্যের জীবনী বিষয়ক একটি ক্ষুদ্রকাব্য রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি রচিত হয়েছে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীচৈতন্যের জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য অনেকে গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন।

স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রচিত বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও নীতি বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে আটটি শ্লোক চৈতন্যাষ্টক নামে উদ্ধৃত হয়েছে। রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে ঐ আটটি শ্লোক ছাড়াও আরও তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামৃত নামে একটি সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তিনি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্যের সারঙ্গ রঙ্গদা নামে একটি টীকাও রচনা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ধমান জেলার মাড়গ্রামের অধিবাসী নিত্যানন্দ-বংশীয় রঘুনন্দন গোস্বামী গৌরাঙ্গের জীবনী বিষয়ক চম্পূকাব্য গৌরাঙ্গচম্পূ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ—জগন্নাথের মৃত্যুতে শচীর বিলাপের পরই শেষ হয়ে গেছে। এছাড়াও রঘুনন্দন লিখেছিলেন : গৌরাঙ্গ বিরুদাবলী, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক রাধামাধবোদয়, দেশিকনির্ণয় ও বৈষ্ণবব্রতনির্ণয় নামে দুখানি স্মৃতিগ্রন্থ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অবলম্বনে গীতামালা।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতির ধারক হিসাবে বিচিত্র বিষয়ে বহুবিধ রচনা করেছিলেন। বিশ্বনাথ রচিত গ্রন্থাবলী : সারার্থদর্শনী নামে ভাগবতের টীকা, কৃষ্ণভাবনামৃত খণ্ডকাব্য (১৬৯১), শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা, প্রেমসম্পুট, ব্রজরীতি চিন্তামণি, সংকল্পকল্পদ্রুম (স্তবামৃত লহরীর অন্তর্গত), শ্রীস্বপ্নকথামৃত (আর্যাশতক), শ্রীনিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী, ভক্তিরসামৃত সিন্ধুবিন্দু, উজ্জ্বলনীলমণিকিরণম্ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির সংক্ষিপ্তসার), রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, মাধুর্যকাদম্বিনী, ভাবনাসারসংগ্রহ (৪০টি গ্রন্থ থেকে ৩০০ শ্লোকের সংগ্রহ), চৈতন্যরসায়ন প্রভৃতি। বিশ্বনাথ হরিবল্লভ নামে পদাবলী রচনা করতেন। ক্ষণদাগীতি চিন্তামণি বিশ্বনাথকৃত বিখ্যাত পদাবলী সংকলন। এই সংকলনে বিশ্বনাথ রচিত ৫১টি পদ আছে।

শ্যামানন্দ প্রভুর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বলদেব বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর

প্রথমভাগে বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্য, সাহিত্যকৌমুদী ও কাব্যকৌস্তভের রচয়িতা। গোবিন্দদেব কবি অষ্টাদশ সর্গে গৌরকৃষ্ণোদয় কাব্য রচনা করেছিলেন। বলদেবের গুরু রাধাদামোদর রচনা করেছিলেন ছন্দঃকৌস্তভ। প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ (খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দী) সঙ্গীতমাধব নাটক ও অষ্টকালীয় 'একান্নপদ' রচনা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর টীকা অর্থরত্নাল্পদীপিকা, মধুসূদন সরস্বতীকৃত ভক্তিরসায়নম্, রসিকোত্তংসের প্রেমপত্তন কাব্য (জন্ম ১৬৯৫ বিক্রমাব্দ), রসিকানন্দের শ্যামানন্দ শতক প্রভৃতি চৈতন্যপ্রভাবিত সংস্কৃত সাহিত্য। চৈতন্য প্রভাবিত সংস্কৃত সাহিত্য খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত। হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী (জন্ম ১৮৪৬ খ্রীঃ) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যসন্দর্ভ, শ্রীশ্রীগদাধরসন্দর্ভ ও বৈষ্ণবব্রতদিন নির্ণয় রচনা ও প্রকাশিত করে (১৯২৯-৩১ খ্রীঃ) চৈতন্য প্রভাবিত সংস্কৃত সাহিত্যকে বিংশ শতাব্দীতে উত্তরিত করেছেন।

সাহিত্য দর্শন স্মৃতিগ্রন্থের পাশাপাশি আর এক ধরনের রচনা প্রচলিত হয়। এইগুলি পদ্ধতি গ্রন্থ। অষ্টপ্রহরে বৈষ্ণব ভক্তের স্মরণ-মনন-সাধনাদির নিয়মাবলী সম্পর্কিত গ্রন্থ পদ্ধতিগ্রন্থ। এই বিষয়ে গৌরেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য গোপালগুরু গোস্বামীর প্রণাম স্মরণ পদ্ধতি ও সেবাস্মরণ পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতি গ্রন্থ। চৈতন্যোত্তর যুগে গোপালগুরুর শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর দ্বিতীয় পদ্ধতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নিরূপণ ও সাধনামৃতচন্দ্রিকা নামে দুইভাগে বিভক্ত। তৃতীয় পদ্ধতি রচনা করেন গোবর্ধন নিবাসী কৃষ্ণদাস বাবাজি। মহাপ্রভুর ভক্ত ও নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর সূর্যদাস সরখেলের নামে প্রচলিত ভোগ নির্ণয় পদ্ধতিতে গৌরগোবিন্দের ভোগারাধনার পংক্তি ক্রম নিরূপিত হয়েছে। ঘনশ্যাম দাস বা নরহরি চক্রবর্তী রচনা করেন পদ্ধতি প্রদীপ। হরিমোহন গোস্বামী শিরোমণি হরিভক্তিবিলাস অনুসরণে বৈষ্ণব ব্রত দিন নির্ণয় ও গৌরার্চন প্রয়োগ নামে দুখানি গ্রন্থ লিখেছেন।[১]

শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক দিব্যজীবন বাঙ্গালা সাহিত্যেও নবযৌবনের জোয়ার এনেছিল। বাঙ্গালা সাহিত্য দেবতার স্বর্গলোক ছেড়ে

---

১ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, হরিদাস দাস—২য় খণ্ড,—পৃঃ ৪০৩

নেমে এলো হাসিকান্নায় ভরা মর্ত্যভূমির আঙ্গিনায়। দেবচরিত ছেড়ে দেবোপম মানব চরিত বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠলো বাঙ্গালা সাহিত্য। বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত। আন্তরিক ভক্তিরসপ্রবাহে, তৎকালীন সমাজ চিত্রণে, চৈতন্যচন্দ্রের বাস্তব জীবন বর্ণনায়, সহজ কবিত্বস্ফূরণে বৃন্দাবনের চৈতন্য ভাগবতের তুলনা মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের শেষজীবন বৃন্দাবনের কাব্যে বর্ণিত না হওয়ায় বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধবয়সে বৃন্দাবনে বসে রচনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, সংক্ষেপে চৈতন্য-চরিতামৃত। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র, চৈতন্যতত্ত্ব, জীবনী ও কাব্যের সম্মিলনে চৈতন্যচরিতামৃতও একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। মুরারির কড়চার অনুকরণে চৈতন্যচরিতামৃতের আগেই সম্ভবতঃ লোচন দাস ঠাকুর লিখেছিলেন চৈতন্যমঙ্গল। লোচনের কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা অপেক্ষা কবিত্ব কাল্পনিকতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান জেলার আমাইপুরা নিবাসী সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দও চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং নাকি সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে এসে শিশুর গুহিয়া নাম পরিবর্তন করে জয়ানন্দ রেখেছিলেন। জয়ানন্দও গান করার জন্যই চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা জয়ানন্দের কাব্যেও কম। অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব অদ্ভুত সংবাদ পরিবেষণ করায় জয়ানন্দের কাব্য বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হয় নি। শ্রীচৈতন্যের জীবনী মূলক আর একখানি কাব্য গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই গোবিন্দের কড়চার প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও মহাপ্রভুর দক্ষিণভারত পরিক্রমা সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য এই গ্রন্থে সুলভ। অশিক্ষিত গোবিন্দ কর্মকারের পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব এই গ্রন্থে দুর্লভ নয়, শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে অবিশ্বাস্য ঘটনাও এখানে সন্নিবিষ্ট। নিত্যানন্দ শিষ্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাসের লেখা গৌরাঙ্গ-জীবন কাহিনী অবলম্বনে গৌরাঙ্গ বিজয় নামে একটি কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি আচার্য সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাপ্রভুর প্রভাব

জীবনী কাব্য

শ্রীচৈতন্যের জীবনীর অনুসরণে আরও অনেক অনেক সাধুভক্ত মহাজনের

জীবনী কাব্য রচিত হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের রচিত (?) নিত্যানন্দ চরিতামৃত ও নিত্যানন্দ বংশবিস্তার নামে দুখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, অদ্বৈতবিলাস এবং অদ্বৈতভৃত্য ঈশান নাগরের রচিত অদ্বৈতপ্রকাশ—অদ্বৈতের জীবনী। অদ্বৈতপ্রকাশকে খাঁটি বলে অনেকেই মনে করেন না। অদ্বৈত শিষ্য শ্যামদাস আচার্যের লেখা অদ্বৈতমঙ্গল পাওয়া যায় না। অদ্বৈতের পত্নী সীতা দেবীর জীবনী অবলম্বনে বিষ্ণুদাস আচার্য লিখেছেন সীতাগুণকদম্ব এবং লোকনাথ দাস লিখেছেন সীতাচরিত্র।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মহাজন সাধক দের জীবনী, নানাবিধ বৈষ্ণবীয় স্মৃতি, সাধনরীতি ইত্যাদি রচিত হয়েছে। জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ, মনোহর দাসের অনুরাগবল্লী, গোপীজন বল্লভদাসের রসিকমঙ্গল প্রভৃতি। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশজাত বলরাম দাস বা নিত্যানন্দ দাস নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবার শিষ্য। প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দ দাস শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য ছাড়াও এখানে নরোত্তমদাস-শ্যামানন্দ-জাহ্নবা-বীরচন্দ্রের কাহিনী প্রাধান্যলাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দাস ঠাকুরের কর্তৃত্বাধীনে বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে গোস্বামি-গ্রন্থ আনয়ন, বীর হাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থ অপহরণ, গ্রন্থ-উদ্ধার, সপরিবারে মল্লরাজ বীর হাম্বীর কর্তৃক আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ, নরোত্তম অনুষ্ঠিত খেতরির মহোৎ-সব, জাহ্নবাদেবী, বীরচন্দ্র ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহান্তদের খেতরির মহোৎসবে যোগদান, তাঁদের জীবনের নানা সংবাদ, নরোত্তমের জীবন কথা, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে অবস্থানকালে নবদ্বীপের অবস্থা—মহাপ্রভুর জীবনের কিছু কিছু ঘটনা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও চৈতন্য পার্ষদগণের বিবরণ, অপ্রকট ও বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তথ্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে প্রেমবিলাস বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ।

কাটোয়ার নিকটবর্তী মালিহাটী গ্রামে বৈদ্যবংশে জাত শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতার শিষ্য এবং শ্রীনিবাসের পৌত্র সুবল ঠাকুরের ভক্ত যদুনন্দন দাস পদকর্তা হিসাবে প্রসিদ্ধ। তিনি কর্ণানন্দ, রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব প্রভৃতি কাব্য

রচনা করেছিলেন। যদুনন্দন রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের সারঙ্গ রঙ্গদা টীকা সহ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেছিলেন। কর্ণানন্দের সাতটি নির্যাসে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন কথা ও তাঁর শিষ্য-সম্প্রদায়ের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যানুশিষ্য মনোহর দাস ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন কথা অবলম্বন করে অনুরাগবল্লী রচনা করেন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দের জীবনীও স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রতিবেশী ভক্ত বংশীবদন চট্টের জীবনী বংশীবিলাস বা মুরলীবিলাস রচনা করেছিলেন বংশীবদনের উত্তর পুরুষ রাজবল্লভ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে চৈতন্য-ধর্ম প্রচারে সফলকাম শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রসিক মঙ্গল রচনা করেছিলেন রসিকানন্দের ভক্ত শিষ্য গোপীজনবল্লভ দাস ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে। এই কালেই তিলকরাম দাস নিত্যানন্দ শিষ্য অভিরাম দাসের জীবনচরিত বর্ণনা করেছেন অভিরামলীলামৃতে। এই গ্রন্থগুলিকে শাখা নির্ণয় কাব্য বলা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত শাখা নির্ণয় জাতীয় আর একখানি গ্রন্থ উদ্ধব দাসের ব্রজমঙ্গল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রেমদাস বংশীবদনচট্টের জীবনী অবলম্বনে বংশীশিক্ষা নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই ধরণের গ্রন্থগুলির কাব্য-মূল্য খুববেশী না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য নয়।

পুরুষোত্তম মিশ্র (প্রেমদাস) কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের সরল পদ্যানুবাদ করেছিলেন চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী নামে। রামচন্দ্র গোস্বামীর সমাজ ও শিষ্য বাঘনাপাড়া নিবাসী অকিঞ্চন দাস 'বিবর্তবিলাস' নামক গ্রন্থে বৈষ্ণ[illegible] সমাজ ও সহজিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেষণ করেছেন। অষ্টা[illegible] শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য ও চৈতন্য পরিকরদের জীবনী অবলম্বনে যে সকল[illegible] রচিত হয়েছিল তন্মধ্যে ভগীরথের চৈতন্য সংহিতা, হৃদানন্দের চৈতন[illegible] রামরত্নের চৈতন্য রত্নাবলী, পুরন্দরের চৈতন্যচরিত, দ্বিজ নিত্যানন্দের[illegible] পাঁচালী, রামশরণের চৈতন্যবিলাস, ধূপরাজের গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস[illegible] প্রিয়ামঙ্গল, জগন্নাথ বৈদ্যের শ্রীচৈতন্য পাঁচালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য[illegible] দাসের 'শ্যামানন্দ প্রকাশ'-এ বৈষ্ণবাচার্য শ্যামানন্দের জীবনী[illegible]

হয়েছে। লবনী দাস (১৫২৮-৬০) চৈতন্য ভাগবতের অনুকরণে জগমোহন ভাগবত রচনা করেছিলেন। রাধারমণ দাস রচিত পদকর্তা গঙ্গারাম ঘোষ বা বঙ্কিমের জীবনী বঙ্কিম চরিত্র, কবির দাস বৈষ্ণব রচিত রামকৃষ্ণ গোস্বামীর (১৫৭৬-১৬৫২) জীবনী রামকৃষ্ণ চরিত, মঙ্গলডিহির পাতুঠাকুরের শ্যামচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাহিনী অবলম্বনে জগদানন্দের শ্যামচন্দ্রোদয় প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাত্মদের জীবনীকাব্য।

নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভক্তি রত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস নামক দুখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ভক্তি রত্নাকর শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনকেন্দ্রিক রচনা হলেও বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামী ও বৈষ্ণব সমাজ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে বহুতর মূল্যবান তথ্যের সন্নিবেশে একখানি অমূল্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের জীবনী, বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব তত্ত্বের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে নরহরি মার্গসঙ্গীত সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। দ্বাদশ তরঙ্গে আলোচিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা। নরোত্তমবিলাসে নরোত্তম দাস ঠাকুরের জীবন কথা অবলম্বনে সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এছাড়া নরহরি শ্রীনিবাস চরিত্র নামে স্বরচিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ ভক্তিরত্নাকরে করলেও গ্রন্থটি অদ্যাবধি লোকচক্ষুর গোচরে আসে নি।

নরোত্তম দাস সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা এবং হাটপত্তন নামে দুটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। নরোত্তমের নামে প্রচলিত গ্রন্থাবলী: দেহকড়চা, স্মরণমঙ্গল, স্বরূপ কল্পতরু, ছয়তত্ত্ব মঞ্জরী বা ছয়তত্ত্ববিলাস, বস্তুতত্ত্ব বা বস্তুতত্ত্বসার, ভজন নির্দেশ, আশ্রয় নির্ণয় বা আশ্রয়তত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব বা নবরাধাতত্ত্ব, রাগমালা, ভক্তিলতাবলী, ভক্তিসারাৎসার, প্রেমবিলাস, বৈষ্ণবামৃত, মঙ্গলারতি প্রভৃতি। এইগুলি সবই হয়ত নরোত্তমের রচনা নয়, তবে প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকাকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলা চলে।[১]

জীবনী ও দার্শনিকতত্ত্বমূলক গ্রন্থ ছাড়াও বহুপ্রকার বৈষ্ণবীয় সাধনা নিবন্ধ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। অনেকগুলি সাধনা নিবন্ধ কৃষ্ণদাস

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, পূর্বার্ধ, পৃঃ—৪৪৩-৪৪, অপরার্ধ, ২য় সং—পৃঃ ৪৭-৬১

কবিরাজের নামে প্রচলিত। ডঃ সুকুমার সেন এই সাধনা নিবন্ধগুলির একটি বৃহৎ তালিকা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে[1] প্রদান করেছেন। অদ্বৈত

সাধনা নিবন্ধ

কড়চা সূত্র, চৈতন্য কড়চা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মনিরূপণ, চৈতন্যতত্ত্বসার, জ্ঞানরত্নমালা, রাগময়ীকণা, রাগরত্নাবলী রসকদম্ব কলিকা, চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা প্রভৃতি এই শ্রেণীর রচনা। অন্যান্য নিবন্ধকার মুকুন্দ দেব, রসিক দাস, রঘুনাথ দাস, জীব গোস্বামী, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, শ্রীরূপ, শ্রীস্বরূপ, রাধামোহন দাস, রাধাবল্লভ দাস, শ্যামদাস, যুগলকিশোর দাস, গদাধর দাস, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরগণের সম্পর্কে নানাবিধ গ্রন্থ আধুনিক কালেও রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। রাধাগোবিন্দ নাথের শ্রীগৌরাঙ্গ, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের অমিয় নিমাই রচিত, বিমানবিহারী মজুমদারের চৈতন্যচরিতের উপাদান, গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীর চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য, সতী ঘোষের প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রবীন্দ্রনাথ মাইতির চৈতন্য পরিকর, নরেশচন্দ্র জানার বৃন্দাবনের ষড়্ গোস্বামী, হরিদাস দাসের অসমোর্ধ্ব শ্রীচৈতন্য, হরিদাস গোস্বামীর গম্ভীরায় শ্রীচৈতন্য, গম্ভীরায়বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য : নদীয়া লীলা ও নীলাচল লীলা, সারদাচরণ মিত্রের উৎকলে শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি আজও বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছে। বৈষ্ণবীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়েও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। রাধাগোবিন্দ নাথের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রেমধর্ম, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, হরিদাস দাসের গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় একদিকে যেমন জীবনী ও তত্ত্বমূলক কাব্য অজস্রধারায় বর্ষিত হয়েছে, তেমনি বাঁধাভাঙ্গা বন্যার জলের মত পদাবলী সাহিত্য বিপুল প্রাণবেগে বহুধা বিস্তৃত হয়ে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। প্রাক্-চৈতন্যযুগে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা সূচক কাব্যে রাধাকৃষ্ণের মানবিকতা সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়েছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাই তার প্রমাণ।

পদাবলী সাহিত্য

শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক দিব্য জীবনে ও সাধনায় রাধাভাবের প্রকাশ পদাবলী সাহিত্যে প্রবল প্রাণের বেগ সঞ্চার করে শুধু তাকে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে উত্তরিত করে দিল তাই

১ বা. সা. ই. ১ম অপরাধ, ২ সং পৃঃ ৪৭-৬১

নয়, তাকে এক অভূতপূর্ব অলৌকিক ভাবসম্পদেও সমৃদ্ধ করে তুললো। চৈতন্য-যুগে এবং চৈতন্যোত্তর কালে ভক্ত কবিকুল আরাধ্যের আরতি করলেন পদাবলী রচনা করে। তাই রাধাকৃষ্ণ আর মানব মানবী রইলেন না, রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে মহাভাব স্বরূপিণী আরাধিকা শ্রীরাধার অপার্থিব অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের চিত্র অংকিত হোল,—স্বর্গ ও মর্তের হোল মেলবন্ধন। মুরারিগুপ্ত, শিবানন্দ সেন, নরহরি সরকার, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরামদাস প্রভৃতি থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের পিতা জনমেজয় মিত্রের সংকর্ষণ ভণিতায় সঙ্গীতরসার্ণব এবং রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী পর্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে মহাপ্রভুর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় বিগ্রহরূপে ভক্তহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনার বা গানের পূর্বে রসানুরূপ গৌরচন্দ্র বিষয়ক পদাবলী রচনা বা গাওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয়। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন প্রমুখ ভক্ত কবিবৃন্দ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনা করেছিলেন। রাধার চরিত্রেও শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি প্রকাশ পেল। নরহরি সরকার যথার্থই লিখলেন—

যদি গৌরাঙ্গ না হইত, তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা, জগতে জানাত কে?

চৈতন্যোত্তর সকল বৈষ্ণব কবিই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। গোবিন্দ দাস কবিরাজ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে ১৫৯ জন বৈষ্ণব কবির ৪৬০০টি পদের উল্লেখ থাকলেও আরও অনেক অখ্যাতনামা অথবা স্বল্প খ্যাত কবি ছিলেন বা আছেন, তাতে সন্দেহ নেই। গৌর নাগর ভাবের পদের সংখ্যাও কম নয়।

মহাপ্রভু স্বয়ং বিদ্যাপতির পদাবলীর অত্যন্ত সমাদর করতেন। তাঁর দৃষ্টান্তে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব মহাজনরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্গে বাঙ্গালীমনের গভীর সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ব্রজবুলি ভাষার চর্চা ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজ ব্রজবুলি ভাষার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসাবে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন।

চৈতন্য সংস্কৃতির অন্যতম বাহক নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস ছন্দঃসমুদ্র নামক গ্রন্থে বাঙ্গালা ছন্দের প্রথম ধারাবাহিক আলোচনায় সূত্রপাত করে এই বিষয়ে অগ্রপথিকের গৌরব অর্জন করেছিলেন।

পদসংকলন

পদাবলী রচনায় প্রবল ভাববন্যা যখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলো, তখন সুরু হোল পদাবলী সংকলনের হিড়িক। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্র, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতি চিন্তামণি, রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লী (১৬৭৩ খ্রীঃ), শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য পদকর্তা, গোবিন্দ চক্রবর্তীর বংশধর, রাধামুকুন্দ দাসের মুকুন্দানন্দসংগ্রহ, রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়, গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ, দীনবন্ধুদাসের সংকীর্তনামৃত, নিমানন্দ দাসের পদরস সার (২৭০০ পদের সংকলন), কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকর (১৩৫৮টি পদের সংকলন), জগদ্বন্ধু ভদ্রের গৌরপদ তরঙ্গিণী, গৌরমোহন দাসের পদকল্পলতিকা, সতীশচন্দ্র রায়ের পদরত্নাবলী প্রসাদ দাসের পদচিন্তামণিমালা (১২৮৩ খ্রীঃ), আউল দাস মনোহর দাসের পদসমুদ্র, বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরু (খ্রীঃ ১৮ শতাব্দীতে ১৪০ জন পদকর্তার—৩০০০-এরও অধিক পদ), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ, সতীশচন্দ্র রায়ের পদকল্পতরু প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতে প্রভাব

কেবলমাত্র বৈষ্ণব সাহিত্যেই নয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের বৈষ্ণবীয় প্রভাবে হিংস্রতা অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল। রণরঙ্গিনী ভীষণা চণ্ডী হলেন মঙ্গলচণ্ডী, পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তিনি হলেন বরাভয়দাত্রী অন্নপূর্ণা—অন্নদা। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে শাক্ত সাহিত্য পরিণত হোল শাক্ত পদাবলীতে। বাৎসল্যরসের বৈষ্ণব পদাবলী নবকায়া লাভ করলো শাক্ত পদাবলীতে। বালকৃষ্ণ ও মা যশোদা অথবা বালক নিমাই ও শচীমাতার স্নেহের নিবিড় সম্পর্ক উমা ও মা মেনকার নিবিড় স্নেহ সম্পর্কে-এবং ভক্ত কবি ও আরাধ্যা শ্যামা মায়ের বাৎসল্য মধুর সম্পর্কে পরিণত হোল। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মান ভক্ত কবি ও শ্যামা মায়ের সম্পর্কে নিবিড়তা লাভ করলো। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ছোট ছোট বিষ্ণুপদগুলি মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণব প্রভাবের অভ্রান্ত

সাক্ষ্য। কবি কৃত্তিবাস চৈতন্য পূর্বকালের হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষ্ণবতার প্রবলতা চৈতন্যোত্তর কালে অনুপ্রবেশ করে আপন স্থান করে নিয়েছে বলে অনুমান হয়।

বাউলগানে শ্রীচৈতন্য

বাউল গানে ও বাউলদের সাধনতত্ত্বে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় ধর্মের প্রভাব প্রগাঢ়তর। বাউল সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যকে তাঁদের মহাগুরু বলে বিশ্বাস করেন। তিনি রাধা কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে বাউলদের ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের দিশারী। মা-বরূপে অবতীর্ণ হয়ে মহাপ্রভু বাউল ধর্মের তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমান ফকিররাও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও চৈতন্যতত্ত্ব থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন এবং মহাপ্রভু তাঁদেরও মহাগুরুরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।[১] লালন ফকিরের একটি গানে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক জগাই মাধাই উদ্ধারের উল্লেখ রয়েছে—

গোঁসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে।
আমি পড়ে আছি জঙ্গলে।
(তুমি) কত অধম পাপীতাপী অবহেলে তারিলে॥
জগাই মাধাই দুটি ভাই
কান্দা ফেলে মারলে গায়,
তারে তো নিলে।
আমি পাপী ডাকছি সদায়
দয়া হবে কোন্ কালে।[২]

আর একটি গানে লালন গৌরের কৃপা প্রার্থনা করেছেন—

জানাবো হে এই পাপী হইতে
যদি এস হে গৌর জীবকে তারিতে।
নদীয়া নগরে যত জন
সবারে বিলালে প্রেমধন।
আমি নর-অধম
না জানি মরম,
চাইলে না হে গৌর আমা পানেতে।[৩]

১ বাংলার বাউল ও বাউলগান—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৫৪-৫৫
২ তদেব পৃঃ ৫০৩ ৩ তদেব পৃঃ ৫৫৩

সাহিত্য ছাড়াও বাঙ্গালার সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগেও শ্রীচৈতন্যের দান সামান্য নয়। তিনি নবদ্বীপে অবস্থানকালে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে যে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন তার বিবরণ চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, মুরারির কড়চা, কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য ও নাটকে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হয়েছে। অভিনয়ের প্রকৃতিদৃষ্টে মনে হয়, এই অভিনয় যাত্রাগান ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। পরে তিনি নীলাচলে ও কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নন্দোৎসব অভিনয় করে-ছিলেন। যাত্রাভিনয়ের এত বিস্তৃত বিবরণ কেন, কোন যথার্থ সংবাদও ইতঃপূর্বে আমরা পাই নি। যাত্রাগান অনুষ্ঠানের এই যে রীতির প্রচলন দেখা গেল তা পরবর্তীকালে কী অবস্থায় ছিল জানা না গেলেও অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীদাম-সুবল, প্রেমচাঁদ, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির কৃষ্ণযাত্রায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। কৃষ্ণকমল গোস্বামী পূর্ববঙ্গে বরিশাল অঞ্চলে রাইউন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস ও নিমাই সন্ন্যাস যাত্রাপালা রচনা ও অভিনয় করে শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবনের ভাবামৃতকে মূর্ত করে তুলেছিলেন।[১] নিমাই সন্ন্যাস পালা কৃষ্ণযাত্রায় এবং গীতাভিনয় যাত্রায় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এমন কি চৈতন্যজীবনাখ্যান বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলীলা ও নিমাই সন্ন্যাস অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। মতিরায়ের যাত্রায় নিমাই সন্ন্যাস পালাও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

কৃষ্ণযাত্রা ও শ্রীচৈতন্য

বাঙ্গালার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের অবদানও স্বল্প নয়। কীর্তনগান যদি শ্রীচৈতন্যের স্বয়ংসৃষ্ট না হয়, তাহলেও তা তাঁর প্রেরণাসঞ্জাত। হরিনাম সঙ্কীর্তনই জীবের মুক্তির উপায় বলে মহাপ্রভু প্রচার করেছেন। নিজেও নবদ্বীপে অবস্থানকালে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ হরিনাম সংকীর্তন করতেন। ছাত্রদের তিনি হরিনাম সঙ্কীর্তন করার রীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কীর্তনগান

শিষ্যগণ বলেন কেমন সঙ্কীর্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

---

১ গ্রন্থকারের যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—পৃঃ ২০-২১ দ্রঃ

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদনঃ॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাততালি দিয়া।
আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লইয়া॥[১]

সুতরাং শ্রীচৈতন্যকেই কীর্তনগানের প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে। কবিকর্ণপূরের নাটকে রাজা প্রতাপরুদ্র বলেছেন, এরকম কীর্তনের কৌশল কখনও দেখি নি—ইয়মিয়ং কীর্তন-কৌশলং ক্বাপি ন দৃষ্টম্। উত্তরে বাসুদেব সার্বভৌম বললেন এই কীর্তনকৌশল শ্রীচৈতন্যের সৃষ্টি—ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্যসৃষ্টিঃ।[২]

বৃন্দাবন দাসও বলেছেন,—

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্তন।
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন॥[৩]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম সংকীর্তন।
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্মপ্রচারণ॥[৪]

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "সঙ্ঘবদ্ধভাবে হরিনামকীর্তনের প্রথা তাঁহারই প্রবর্তিত।"[৫] নীলাচলে স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদাবলী গান করে শোনাতেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে লীলাকীর্তনের সূত্রপাত সেখান থেকেই হয়েছিল।[৬]

আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন যে জয়দেব, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী গানে নিমাই মাঝিমাল্লার সুর সংযুক্ত করে নবপ্রাণ সংযোজিত করেছিলেন। তারই ফলে মনোহরশাহী কীর্তনের রীতি প্রচলিত হয়।[৭] অনেকের মতে যথার্থ লীলাকীর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল নরোত্তম দাস প্রবর্তিত খেতরির

---

১ চৈ. ভা. মধ্য—১অঃ ২ চৈ. চন্দ্র. না. ৮ অংক ৩ চৈ. ভা. মধ্য—২৩ অঃ
৪ চৈ. চ. মধ্য—১১ পরি ৫ বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া—পৃঃ ৭৪
৬ বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া—পৃঃ ৭৫

৭ 'But it appears that Nemai gave a new turn to their singing. He resusciated the pastoral time of boatman's songs adding to it a lovely musical mode which was quite original, it sprang from his intense and fervid emotion. This was the origin of the famous Manoharshahi"—Chaitanya and his age—p. 145.

মহোৎসবে। শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে উত্তরবঙ্গে খেতরি গ্রামে ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়ে নরোত্তম যে মহোৎসব করেছিলেন তাতে তিনি গৌরচন্দ্রিকাসহ নূতন ধরনের লীলাকীর্তনের রীতি প্রবর্তিত করেছিলেন। বৃন্দাবনে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ গানের প্রচলন ছিল। নরোত্তম বৃন্দাবনে অবস্থানকালে স্বরূপ দামোদর শ্রীজীব গোস্বামী বা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট থেকে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেছিলেন এবং বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদী রীতিতে কীর্তনগান প্রচলন করেছিলেন খেতরির মহোৎসবে। খেতরী গড়ের হাট বা গরানহাট পরগণায় অবস্থিত হওয়ায় নরোত্তম প্রবর্তিত কীর্তনরীতি গড়েরহাটী বা গড়ানহাটী শৈলী নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এই বিলম্বিত লয়ের কীর্তন-রীতি আয়ত্ত করা কঠিন হওয়ায় কীর্তনগানের আরও চারপ্রকার রীতিব উদ্ভব হয়: মনোহরশাহী, রাণীহাটী বা রেণেটি, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী। বলা বাহুল্য উদ্ভবস্থানের নামানুসারে কীর্তনের শৈলীর নামকরণ হয়েছে। নরোত্তম সৃষ্টি করেছিলেন গড়ানহাটী। গোকুলানন্দ ঠাকুর রেণেটি, বেণীদাস মন্দারিণী, কবীন্দ্র গোকুল ঝাড়খণ্ডী এবং বিপ্রদাস ঘোষ মনোহরশাহী রীতির প্রবর্তক। কীর্তনগানে মণিপুরী রীতি নরোত্তমের রীতির নিকট ঋণী, নরোত্তমই আসামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।'[১]

মনোহরশাহী ঢঙের প্রবর্তক মহাপ্রভু স্বয়ংই হোন, আর বিপ্রদাস ঘোষই হোন, বাঙ্গালার সংস্কৃতির যে অন্যতম প্রধান অঙ্গ কীর্তনগান তা যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সঞ্জাত তাতে সন্দেহ নেই।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ধর্মে, সমাজে ও সাহিত্যসংস্কৃতিতে যে প্রবল প্রাণবন্যার আবির্ভাব হয়েছিল—যে অভাবিতপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়েছিল—যার প্রেরণায় পাঁচশত বৎসরের বাঙ্গালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, পুষ্ট হয়েছে, তার কেন্দ্রে একটিমাত্র ব্যক্তি—যিনি 'বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া' কায়া ধারণ করেছিলেন।

বাঙ্গালার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্যের অবদান সম্পর্কে ডঃ রাধা-গোবিন্দ নাথ লিখেছেন, 'বাঙ্গালার সাহিত্যে' বাঙ্গালার দর্শনে, বাঙ্গালার

১ **Historical Development of Indian Music—Swami Prajnananda —pp. 392-93.**

ভাবধারায়, বাঙ্গালার কৃষ্টিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবদান অতুলনীয়। বাঙ্গালার কৃষ্টি বলিতে মুখ্যতঃ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রভাবে পরিপুষ্ট কৃষ্টিকেই বুঝায়—একথা বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রভাব যে বাঙ্গালার কৃষ্টিকেই এক অপূর্ব রসে পরিসিঞ্চিত করিয়াছে, তাহা নহে; সমগ্র ভারতের কৃষ্টিতেও তাহা সঞ্চারিত হইয়াছে।"[১]

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে উড়িয়া সাহিত্যেও নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পঞ্চসখা নামে প্রসিদ্ধ পাঁচজন উড়িয়া কবি—বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস এবং অচ্যুতানন্দ দাস শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করেছিলেন এবং তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। জগন্নাথ দাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমবয়স্ক ভক্ত। অপর চারজনের কাছে তিনি ছিলেন ধর্মগুরু। ঈশ্বরদাসের চৈতন্যভাগবত অনুসারে তিনি শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অচ্যুতানন্দ প্রথমে শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁকে সনাতনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে উপদেশ দেন।[২] ঈশ্বর দাসের মতে বলরাম দাস চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। দিবাকর দাস বলেন যে, বলরাম সকল সময়েই শ্রীচৈতন্যের নিকটে থেকে তাঁর সেবা করতেন। ঈশ্বরদাসের বিবরণে অনন্ত মহান্তি শ্রীচৈতন্যের নিকট দীক্ষিত হবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে অনুরোধ করেছিলেন জগন্নাথকে দীক্ষা দিতে।[৩] এই পঞ্চসখা বা পঞ্চকবি শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন। অচ্যুতানন্দের মতানুসারে তাঁরা কীর্তনের মিছিলেও যোগদান করতেন।[৪] পঞ্চসখা মহাপ্রভুকে গুরু বা ঈশ্বররূপে দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের মতবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা বৃন্দাবনের প্রেমধর্মের থেকে ভিন্ন। তৎসত্ত্বেও তাঁদের সৃজনী প্রতিভা যে শ্রীচৈতন্যের দিব্য প্রভাবে সঞ্জীবিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।[৫]

উড়িয়া সাহিত্য

---

১ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা—৩য় সং—পৃঃ ৬৪

২ চৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ৪১৩ ৩ চৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ ৪১৩-১৪

৪ History of Gajapati Kings of Orissa—p. 102.

৫ The Chaitanyas presence at Puri was a great, though indirect,

পঞ্চসখার মধ্যে বলরাম দাস (জন্ম ১৪৭২) ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী। শেষ জীবনে গুরু চৈতন্যের মত অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবরাজি তাঁর দেহে স্ফুরিত হোত। তিনি মত্ত বলরাম নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।[১] বলরাম বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন উড়িয়া ভাষায় রামায়ণ রচনা করে। বলরাম বেদান্ত সার গীতা, গুপ্তগীতা, বিরাটগীতা, সপ্তাঙ্গযোগসারটীকা প্রভৃতি তত্ত্বমূলক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। বট অবকাশ গ্রন্থে তিনি জগন্নাথদেবের স্তুতি করেছেন। ১৫০টি স্তবকে ভক্তি ও আন্তরিক আবেগময় লিরিককাব্য ভাবসমুদ্র। মৃগুনীস্তুতি ও লক্ষ্মীপুরাণ সুঅঙ্গ নামক ভক্তি রসাত্মক কাব্যদ্বয় বলরামের অন্যতম সৃষ্টি। বলরামের রামায়ণ, সরলাদাসের মহাভারত ও জগন্নাথদাসের ভাগবত উড়িয়া সাহিত্যের স্তম্ভ স্বরূপ। সরলা দাস পঞ্চসখার অন্তর্গত নন, তিনি এঁদের পথ প্রদর্শক।[২] এই তিনখানি গ্রন্থই উড়িষ্যায় বিপুলভাবে জনপ্রিয়। জগন্নাথ দাসকে কেন্দ্র করে উড়িয়া ভাষায় অনেকগুলি জীবনীকাব্যও রচিত হয়েছে। মহাপ্রভুর উড়িষ্যা আগমনের পূর্বেই জগন্নাথ ভাগবত রচনা করেছিলেন এবং জগন্নাথের ভাগবতপাঠ শুনে মহাপ্রভু মুগ্ধ হয়েছিলেন। পঞ্চসখার অপর দুই কবি বড় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, কবি হিসাবে বিপুল যশেরও অধিকারী হতে পারেন নি। অনন্ত এবং যশোবন্ত তন্ত্র, যোগ এবং ভক্তি সম্পর্কে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[৩] যশোবন্তদাসের গোবিন্দচন্দ্র, বলরামের বৌল গই বা লক্ষ্মীপুরাণ সুঅঙ্গ, জগন্নাথের মৃগুনীস্তুতি গাথা জাতীয় কাব্য। জগন্নাথ দাসের রাসক্রীড়া, বলরাম দাসের বট-অবকাশ ও বিরাটগীতা, যশোবন্ত দাসের শিব স্বরোদয় এবং অচ্যুতানন্দের অনাকার সংহিতা নিরাকার ব্রহ্ম, রাধাকৃষ্ণপূজা ও বত্রিশ অক্ষর জপ সংক্রান্ত তত্ত্বমূলক রচনা।

অচ্যুতানন্দ ছিলেন পঞ্চসখার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি কবি অপেক্ষা সাধক এবং ভবিষ্যৎবক্তা হিসাবেই অধিকতর স্মরণীয় হয়ে আছেন। অচ্যুত'

blessing to the Panchasakha literature in Orissa, there is no doubt.' — History of Oriya Literature—Dr. Mayadhar Mansinha—p. 90.

১ **ibid—p. 91.**

২ **History of Oriya Literature—pp. 92-94.**

৩ **ibid—pp. 97-100.**

নন্দের শূন্যসংহিতা ও অলেখসংহিতা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই দুই গ্রন্থে মহাযান বৌদ্ধমতের প্রভাব আছে। অচ্যুতানন্দের নামে বহু গ্রন্থ প্রচলিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে বলরামের হরিবংশ মৌলিক রচনা। জনশ্রুতি এই যে তিনি উড়িয়া ভাষায় এক লক্ষ গ্রন্থ রচনা করেছেন। অতিবল্লভ মহান্তি বলেছেন যে অচ্যুতানন্দ ৩৬টি সংহিতা, ৭৮টি গীতা, ২৭টি বংশানুচরিত, ৭ খণ্ড হরিবংশ, ১২টি উপপুরাণ, ১০০ মালিকা, কতকগুলি কেলি, চৌতিশা, টীকা, বিলাস, নির্ণয়, ওগল, গুজ্জরি, ভজন প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ডঃ মায়াধর মানসিংহ মনে করেন যে অচ্যুতানন্দ দাস একাধিক ছিলেন।[১] নিরাকার দাসের ঝুমর সংহিতা শূন্যসংহিতা জাতীয় গ্রন্থ।

উড়িষ্যায় চৈতন্য সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ ঈশ্বর দাসের চৈতন্য ভাগবত। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে ঈশ্বরদাস খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের লোক।[২] ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতানুসারে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।[৩] ঈশ্বর দাস শ্রীচৈতন্যকে বুদ্ধ অবতার এবং জগন্নাথের অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন সংবাদও তিনি পরিবেষণ করেছেন। অভিনব সংবাদগুলির অন্যতম শিখগুরু নানকের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের বিবরণ।

উড়িয়া ভাষার অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দিবাকরদাসের জগন্নাথ চরিতামৃত। ডঃ মজুমদারের মতে দিবাকর খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। জগন্নাথ চরিতামৃতের প্রথম সাত অধ্যায়ে কবি শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন। দিবাকর দাস গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে উড়িয়া ভক্তদের বিরোধের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডঃ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেছেন[৪] গোবিন্দদেব নামক উড়িয়া কবি শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়কাব্যম্ নামে সংস্কৃতভাষায় একটি কাব রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদাস কাবরাজের চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের অনুসরণে

১ History of Oriya Literature—p. 103.
২ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩৩৩, ২য় সংখ্যা—পৃঃ ৭৬
৩ শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ৪৯৭
৪ Hist. of Gajapati Kings of Orissa—p. 102.

উড়িয়া ভাষায় মাধব (পট্টনায়ক ?) চৈতন্যবিলাস নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। মাধব ছিলেন চৈতন্য পার্ষদ গদাধরের শিষ্য। চৈতন্য বিলাসের সঙ্গে লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের প্রভূত সাদৃশ্যহেতু ডঃ মজুমদার লোচনকেই মাধবের অনুসারী বলে প্রতিপন্ন করেছেন।[১]

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত কানাই খুঁটিয়া শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে মহাভাব প্রকাশ নামে পদ্যে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ডঃ মজুমদার সুরঙ্গীর রাজার গ্রন্থাগারে রক্ষিত উড়িয়া ভাষায় লেখা শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির পুঁথির উল্লেখ করেছেন :—(১) চৈতন্য চন্দ্রোদয়, (২) চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী, (৩) চৈতন্য ভাগবত, (৪) চৈতন্য সম্প্রদায়, (৫) চৈতন্য পূজামন্ত্র, (৬) ভক্তি চন্দ্রোদয়, (৭) স্বপ্নদাস রচিত বৈষ্ণব সায়োদ্ধার, (৮) গোবিন্দ ভট্ট রচিত চৈতন্যাবলী, (৯) চৈতন্য মহাপ্রভুঙ্কু ঝুলন ছন্দ, (১০) সবঙ্গী শ্রীরাধাকান্ত, (১১) মহাপ্রভুঙ্কু মহিমাসাগর। এ ছাড়া সদানন্দ মোহন কল্পলতা নামক পুঁথির শেষে তাঁর ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল নামক গ্রন্থে চৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনার উল্লেখ করেছেন।[২] অষ্টাদশ শতকের উড়িয়া ভক্ত কবি কবিসূর্য সদানন্দ প্রেম-তরঙ্গিণী কাব্যে চৈতন্যজীবনকথা বর্ণনা করেছেন।

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে রাম ও কৃষ্ণবিষয়ক বহু কাব্য কবিতা রচিত হয়েছে উড়িয়া ভাষায় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে। এই যুগে পুরাণকাব্য, বৈষ্ণব কাব্য এবং বৈষ্ণবীয় নীতি-কবিতা উড়িষ্যার ভাষায় প্রচুর পরিমাণে লিখিত হয়েছে। আলংকারিক বৈষ্ণব কাব্যের কবি দীনকৃষ্ণ, অভিমন্যু, ভক্তচরণ, যাদুমণি, দুর্লভ দেব, ভূপতিপণ্ডিত প্রভৃতি। বৈষ্ণবীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন কবিসূর্য, গোপালকৃষ্ণ, বনমালী প্রভৃতি। বৈষ্ণবীয় গীতি রচয়িতাদের পথ প্রদর্শক উপেন্দ্র। জগন্নাথ দাসের ভাগবত ও চৈতন্য ধর্মের প্রভাব বৈষ্ণবীয় গীতিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। বৃন্দাবতী দাসী গান রচনা করেছিলেন কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে। দীনকৃষ্ণদাস রসকল্লোল এবং আর্ত-ত্রাণচৌতিশা নামে দুখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। রসকল্লোলে দীনকৃষ্ণ মথুরা-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেছেন সরল সুমিষ্ট ভাষায়। অভিমন্যু সামন্ত সিংহ (১৭৫৭-১৮০৭ খ্রীঃ) বৈষ্ণবীয় বিদগ্ধচিন্তামণি রচনা করেছিলেন।

---

১ শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ ২৭৯ ২ তদেব পৃঃ ৫০৫-৬

দীনকৃষ্ণের গ্রন্থে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা ও কংসাদি দানববধের বিবরণ প্রাধান্য পেয়েছে। যাদুমণি মহাপাত্র প্রবন্ধ পূর্ণচন্দ্র-এ কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পরিণয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ভূপতি পণ্ডিত রাসলীলার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রেমপঞ্চামৃতকাব্যে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলাকেন্দ্রিক সঙ্গীত রচিত হয়েছে উড়িয়া ভাষায় প্রচুর। কবিসূর্য বলদেব রথ (মৃত্যু ১৮৪৫) ৫০০ পৃষ্ঠার গীতিধর্মী কাব্য বা সঙ্গীত রচনা করেছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দের আদর্শে কিশোরচন্দ্রানন্দ-চম্পু নামে উড়িয়া ভাষায় গদ্য ও পদ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেছেন কবিসূর্য। কবিসূর্যের মত গোপালকৃষ্ণ শতশত প্রেমগীতি রচনা করেছেন। এঁর কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতীক নন—কবি মানবীয় প্রেমকথাকে আন্তরিক আবেগে অনুভূতির গভীরতায় স্বর্গীয় প্রেমে উত্তরিত করেছেন। গোপালকৃষ্ণ বাল্যপ্রেমকে যৌবনের গভীরতায় পৌঁছে দিয়েছেন। গোপালকৃষ্ণের গীতাবলী এবং সামন্ত সিংহের বিদগ্ধ চিন্তামণি উড়িয়া ভাষায় বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের সম্পদ।[১] ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব চৈতন্যপ্রভাবিত উড়িয়া সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"A useful outcome of this religious up-heaval of the period on account of the cult of love was that Oriya literature received a strong impetus. Various discourses on religious subjects were written, love episodes of Radha Krishna were mainly described in poetry and achievements of Sri Chaitanya were given shape in literature."[২]

অসমীয়া সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব তেমন ব্যাপক না হলেও অনুল্লেখনীয় নয় ভট্টদেব 'সৎ সম্প্রদায় কথা' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের আসাম ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কৃষ্ণভারতীর সন্তনির্ণয় গ্রন্থে কৃষ্ণ আচার্যের সন্ত বংশাবলীতে এবং দীপিকাচান্দ নামে একটি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। আসামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক মহাপুরুষ শঙ্করদেবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে কিম্বদন্তী আছে। কোন কোন অসমীয়া

১ History of Oriya Literature—pp. 135-37, 140.
২ History of Orissa—p. 92.

গ্রন্থেও উক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্য ও শংকরদেব সমসাময়িক হওয়ায় এবং শংকরদেব শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই পুরী গমন করায় এই সাক্ষাৎকার অসম্ভব নয়। শংকরদেব প্রচারিত ধর্মে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য বর্তমান। শংকর শিষ্য দামোদরের মতানুবর্তিগণ শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলে স্বীকার করেন। দামোদর পন্থী ও মহাপুরুষীয়াপন্থীদের গ্রন্থে শংকরদেবের জীবন প্রসংগে শ্রীচৈতন্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। অসমীয়া সাহিত্যে শংকরদেবের প্রভাব যতটা গভীর শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ততটা নয়। কারণ আসামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয়েছিল নরোত্তম দাস ঠাকুরের দ্বারা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। তথাপি অসমীয়া সাহিত্যেও শ্রীচৈতন্য খানিকটা স্থান দখল করে নিয়েছেন, এটাও কম গৌরবের কথা নয়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যেমন ভারতবর্ষের একটা বিশাল ভূখণ্ডে ভাববন্যা এনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, তেমনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ওড়িয়া সাহিত্যের বিপুল বিকাশের কারণ হয়েছিলেন। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকেও কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সঞ্জীবিত করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্যের অবদান সত্যই অপরিমেয়।

একবিংশ অধ্যায়

যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যুগপুরুষ—যুগের প্রয়োজনে তাঁর আবির্ভাব। বাঙ্গালাদেশ যখন ইসলামী শাসনে অত্যাচারে উৎপীড়নে দিশাহারা ভীত কম্পমান—নানা কারণে হিন্দু বৌদ্ধ যখন দলে দলে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করছিল,—ভয়াবহ অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচার রাস্তা না পেয়ে মানুষ যখন তথাকথিত লৌকিক দেবদেবীতে আত্মসমর্পণ করে বাঁচার ব্যর্থ প্রয়াস করছিল, আর একদল বিলাসে ব্যসনে বৃথা অর্থ অপচয় করে প্রকৃত ধর্মকর্ম বিসর্জন দিয়ে প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানে নিরর্থক আমোদ প্রমোদে কালযাপন করছিল—স্মৃতিশাস্ত্র শাসিত হিন্দুসমাজ যখন জাতিভেদের সংকীর্ণ গণ্ডীকে সংকীর্ণতর করে আত্মরক্ষার নামে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল,—সেই যুগসংকটের কালে জাতির পরিত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নীতিহীন, ধর্মহীন, ভক্তিহীন, আত্মঘাতী সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন আত্মবিশ্বাসহীন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের সম্মুখে তিনি আবির্ভূত হলেন বরাভয় হস্তে,—নির্বাধ শক্তি ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন জাতির ত্রাণকর্তা হিসাবে বৈষ্ণব সমাজের তথা সমগ্র জাতির নেতা হিসাবে অটুট মনোবল নিয়ে—ভক্তিহীন দেশে প্রবাহিত করলেন ভক্তির বন্যা—ভক্তিধর্মে আবদ্ধ করলেন আবালবৃদ্ধবণিতা জাতিধর্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষকে। গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে পরিবর্তিত নূতন মানুষ শ্রীগৌরাঙ্গ নেতৃত্ব দিলেন উপেক্ষিত নিপীড়িত বৈষ্ণব সমাজের। রুদ্ধদ্বার গৃহে অদ্বৈত হরিদাস শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগণ সহ করতেন হরিনাম সংকীর্তন রূপেগুণে পাণ্ডিত্যে অনুপম শ্রীগৌরচন্দ্র। ক্রমে ক্রমে আরও অনেকে সমবেত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গের চারিপাশে। শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে বৈষ্ণব সমাজের। দুর্বৃত্ত জগাই মাধাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাবে রূপান্তরিত হোল নূতন মানুষে—ভক্ত বৈরাগীতে। ফলে নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হোল। নবজাগ্রত জনশক্তির প্রতাপ অনুভূত

বৈষ্ণব সমাজের শক্তিবৃদ্ধি

হোল অত্যাচারী শাসকের প্রতিনিধি কাজিকে শাসন করার ঘটনায়। হরিপ্রেমধর্মের প্রভাবে জাগ্রত হয়ে উঠলো নব্য বাঙ্গালার স্তব্ধপ্রায় হৃৎস্পন্দন। বিপুল জনসংঘট্ট মশাল হাতে কাজির বাড়ীর দিকে চলেছে বাদ্যভাণ্ড সহ হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে

মার মার রব তুলে। ভাঙলো তারা গাছপালা আর ঘরের দরজা।

অত্যাচারী শাসক আত্মগোপন করেছে। এই অভিনব দৃশ্যের তাৎপর্য আজ অনুধাবন করা কঠিন কিন্তু সেদিনের মৃতপ্রায় বঙ্গবাসীর ভাঙা মেরুদণ্ডকে সোজা করে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছিলেন জাগ্রত বাঙ্গালার প্রাণপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গদেব। হীনমন্যতার পংককুণ্ড থেকে জেগে উঠলো বাঙ্গালী হিন্দু—জাগলো প্রবল তেজ এবং শক্তি নিয়ে বিপুল গৌরবে আত্মবিশ্বাসে অটল অত্যাচারী পরাক্রান্ত শাসক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অসীম স্পর্ধা নিয়ে। এইভাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালীর নব জাগরণের প্রাণপুরুষ—বাঙ্গালী মানসের নবযুগের উদ্গাতা হয়েছিলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "Bengal had not raised her head in protest against Muslim oppression and in defence of her religion for 300 years; she had silently suffered the depth of humiliation and insults in the shape of demolition of her temples and the destruction of her idols. The leadership of Chaitanya worked wonders."[১]

জনশক্তির জাগরণ

ডঃ মজুমদার আরও লিখেছেন, "The Hindus of Bengal were infused with a new life by the example and ideal of Chaitanya and the moral uplift that he had brought about all round."[২]

বাঙ্গালার প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালার রাজনীতিতে সাহিত্যে সমাজে হোল নবযুগের অভ্যুদয়। মহাপ্রভুর কাজিগৃহ অভিযান এদেশে প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ।

শ্রীচৈতন্য জানতেন, লিখিত ভাবে উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজের আচরণ দিয়ে চারিত্রিক দৃষ্টান্ত দিয়ে জনশিক্ষা দিলে তার উপযোগিতা অনেক বেশী। তাঁর জীবন লোক শিক্ষার পুঁথিশালা। নবদ্বীপে বিষ্ণুমন্দির মার্জন ও নীলাচলে প্রতি বৎসর সগণে গুণ্ডিচামন্দির মার্জনের দ্বারা তিনি কায়িক শ্রমের

---

১ History of Mediaeval Bengal—p. 203.

২ ibid

মর্যাদা স্থাপন করেছেন ; সন্ন্যাসীরও কর্মের প্রয়োজনীয়তা খ্যাপন করেছেন। তাঁর জীবনে সন্ন্যাসীর আচরণীয় বিধি কঠোরভাবে পালন, গভীর মাতৃভক্তি, দরিদ্রের সেবা, সংখ্যা গণনাপূর্বক হরিনাম জপ প্রভৃতি সবই লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যে। জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে তি ন স্পষ্ট ভাবে কিছু না বললেও তাঁর আচরণ থেকেই এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বোঝা যায়।

লোকশিক্ষা

হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মকে অগ্রাহ্য করেন নি শ্রীচৈতন্য অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথাকে বাহ্যতঃ তিনি অস্বীকার করেন নি। যবন হরিদাস নীচকুলে জন্ম বলে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতেন না, এতে মহাপ্রভু সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

জাতিভেদ ও শ্রীচৈতন্য

হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান থানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ॥
জগন্নাথের সেবক মোর স্পর্শ নহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল॥[১]

একবার বৈশাখ মাসে সনাতন এসেছিলেন নীলাচলে। একদিন জ্যৈষ্ঠমাসে মধ্যাহ্ন ভিক্ষার জন্য প্রভু ডেকে পাঠালেন সনাতনকে। যবনরাজের অন্নভোজন ও যবনরাজের সংস্পর্শহেতু সনাতনের মনে ছিল হীনমন্যতা। তিনি মন্দিরের সিংহদ্বার ছেড়ে সমুদ্রের তীরে তীরে তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে এলেন প্রভুর আবাসে আইটোটায়। গরম বালুকার উপর দিয়ে হেঁটে আসার জন্য তাঁর পায়ে ফোস্কা পড়েছে। এত ক্লেশ সহ্য করে বালুকাময় পথে আগমনের কারণ প্রভু জিজ্ঞাসা করায় সনাতন বলেছিলেন পাছে জগন্নাথের সেবকরা তাঁর স্পর্শে অশুচি হয়ে যান, এই আশংকায় তিনি তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে ঘুর পথে এসেছিলেন।

শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা॥[২]

---

১ চৈ. চ. মধ্য ১১ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য ৪ পরি

তিনি বললেন সনাতনকে—

যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব—মর্যাদা-রক্ষণ।
মর্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ॥
মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন।[১]

অদ্বৈতপ্রকাশে একটি গল্প আছে। একদিন বর্ষা বাদলের দিনে নীলাচলে অদ্বৈতের আবাসে অদ্বৈত ও সীতাদেবী মনের সাধ মিটিয়ে চৈতন্য প্রভুকে ভোজন করিয়েছিলেন। সেই সময়ে ঈশান (নাগর) শ্রীচৈতন্যের পা ধুইয়ে দিতে গেলেন, ঈশান লিখেছেন—

গৌরের পাদধৌত লাগি মুঞি কীট গেনু।
তিঁহ কহে রহ রহ বিপ্র বিষ্ণু তনু॥

গৌরাঙ্গ পদ ধৌত করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ক্ষোভে ঈশান যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করে ফেললে গৌরচন্দ্র ঈশানকে তিরস্কার করে পুনরায় যজ্ঞোপবীত পরিয়েছিলেন। ঈশান লিখেছেন—

এত ভাবি যজ্ঞসূত্র ছিণ্ডিনু তখনে॥
তাহা দেখি মোর প্রভু হাসিয়া কহিলা।
কি লাগি ঈশান বিপ্রধর্ম বিনাশিলা॥
দ্বিজাতি যজ্ঞসূত্র চিত্তশুদ্ধি দাতা।
নিরন্তর পরব্রহ্মে হৃদয় নির্যোক্তা॥
এত কহি প্রভু পুন পৈতা দিলা মোরে।[২]

এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ মাত্রকেই উচ্চ মর্যাদা দিতেন, একথা যথার্থ সত্য হয়ে ওঠে।

মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্মকে বহিয়ে চূর্ণ করতে না চাইলেও এর সংকীর্ণতাকে তিনি বিচূর্ণিত করেছিলেন এর মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে। অস্পৃশ্যতার মত

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৪ পরি ২ অ. প্র. ১৮ অঃ

দূষিত ব্যাধি দূরীকরণে এ দেশে প্রথম এবং সফল আন্দোলন সুরু হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তনায়। তিনিই ঘোষণা করেছিলেন—চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ। তিনি বললেন—

চণ্ডালেহো মোহায় শরণ যদি লয়।
সেহো মোর মুক্তি তায় জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে সত্য বলিলুঁ বচন॥[১]

তাঁরই মতাদর্শ বৃন্দাবন দাস ব্যক্ত করেছেন স্পষ্টভাবে—

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎপথে চলে॥[৪]

মথুরায় অবস্থান কালে মহাপ্রভু অনাচরণীয় পতিত সনোডিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রাহ্মণ পাচিত অন্ন গ্রহণ করেছিলেন।

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী করে ভোজন॥[৩]

তিনি কায়স্থ রঘুনাথ দাসকে ব্রাহ্মণের একচ্ছত্র অধিকার খর্ব করতে নিজের পূজিত শালগ্রাম শিলা (গোবর্ধন শিলা) পূজা করতে দিয়েছিলেন।

দীন দরিদ্র মূর্খ পতিত অস্পৃশ্য অশুচি পাপী তাপীর জন্য পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্যের অন্তঃকরণ কেঁদে উঠেছিল। এঁদের মুক্তির জন্যই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাসের পূর্বে তিনি বলেছিলেন—

সন্ন্যাসেনোদ্ধরাম্যেব তেন দুষ্টানপি ক্ষিতৌ।[৪]

মুরারির বিবরণানুসারে তিনি বলেছিলেন—

উদ্ধরামি জনান্ সর্বান্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।[৫]

—সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে সকল লোককে উদ্ধার করবো।

পূর্ব, দক্ষিণ এবং উত্তর ভারত পরিক্রমা করে মহাপ্রভু সর্বত্র হরিনাম প্রচার করেছেন। শেষ দ্বাদশ বৎসর অন্তরঙ্গ ভাবরসে মগ্ন থেকেও তিনি দীন দরিদ্রের কথা বিস্মৃত হন নি। তাই তিনি নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠালেন আচণ্ডাল সকল মানুষকে হরিনাম মহামন্ত্রে মুক্তির পথ দেখাতে।

পতিতের ভগবান

১ চৈ ভা. মধ্য ১৩ অঃ ২ চৈ. ভা. মধ্য ১ অঃ ৩ চৈ. চ. মধ্য ১৭ পরি
৪ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী—৩।১৮ ৫ মু. ক —২।১৪।২২

নিত্যানন্দকে তিনি বললেন—

মূর্খনীচজড়ান্ধাখ্যো যে চ পাতকিনোঽপরে।
তানেব সর্বথা সর্বান্ কুরু প্রেমাধিকারিণঃ॥[১]

—মূর্খ নীচ জড় অন্ধ ও অন্যান্য যারা পাতকী তাঁদের সকলকে সর্বপ্রকারে কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী কর।

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

প্রভু বোলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
ভক্তিরসদাতা তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য সত্য যদি চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥[২]

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে নীলাচল ছেড়ে গৌড়দেশে আগমন করে নীচ অধম পতিতদের হরিনামে মত্ত করে তুলেছিলেন। তিনি সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর বণিককুলকেও উদ্ধার করলেন—

নিতানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার॥

নীলাচলে নিত্যানন্দ গৌড় থেকে এসে মিলিত হলে শ্রীচৈতন্য বলেছিলেন—

নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সভার হইল বিমোচন॥[৪]

---

১ বৃ. ক.—৪।২১।১০ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৫ অঃ ৩ চৈ. ভা. অন্ত্য ৫ অঃ ৪ চৈ. ভা. অন্ত্য ৭ অঃ

অদ্বৈত আচার্যকেও মহাপ্রভু নীলাচলে আচণ্ডাল সকল মানুষকে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ করতে আদেশ করেছিলেন—

আচার্যেরে আজ্ঞা দিলে করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদিরে কহিও কৃষ্ণভক্তি দান ॥[১]

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের দ্বারাই কেবলমাত্র নয়, চৈতন্যদেব স্বয়ং লোকশিক্ষার নিমিত্ত হীন পতিতদের কোল দিয়েছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত চরিত গ্রন্থগুলিতে অপ্রতুল নয়। রায় রামানন্দ জাতিতে শূদ্র বলে মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হলেও মহাপ্রভু অসংকোচে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিলেন।

তেঁহো কহে সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ ॥
তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন।[২]

তখন প্রত্যক্ষদর্শী বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বলেছিলেন—

এই ত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥[৩]

রায় রামানন্দের মত সনাতনও মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে অত্যন্ত কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন আর সনাতন পিছু হটছেন। সনাতন বলছেন,—

মোরে না ছুঁইবে প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায় ॥[৪]

কিন্তু— বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রী অঙ্গে লাগিল ॥[৫]

যবন হরিদাস মহাপ্রভুকে বলেছিলেন—

হীন জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্মে রত মুই অধম পামর ॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে ॥[৬]

হরিদাসের দেহত্যাগের পর মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁকে সমাধিস্থ করে মহোৎসব করেছিলেন। হরিদাসকে সমাধিস্থ করার বিবরণ প্রসঙ্গে কবিরাজ বলেছেন—

১ চৈ চ. মধ্য ১৫ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ৮ পরি ৩ চৈ. চ. মধ্য ৮ পরি
৪ তদেব অন্ত্য. ৪ পরি ৫ তদেব অন্ত্য ৪ পরি ৬ তদেব ১১ পরি

বালুকায় গর্ত্ত করি তাহা শোয়াইল ॥
চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে কীর্ত্তন ॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌর রায়।
আপন শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায় ॥[১]

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি এই অহৈতুকী অপরিসীম কৃপা শ্রীচৈতন্যকে পতিতের ভগবানে পরিণত করেছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং বলতেন—

ন মে ভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥[২]

—চতুর্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত নয়, চণ্ডাল যদি আমার ভক্ত হয়, তাহলেও সে আমার প্রিয়, তাঁকেই দান করা উচিত, তাঁর দানই গ্রহণীয়, আমি যেমন পূজ্য, তিনিও তেমনি পূজ্য।

পরম কারুণিক গৌরচন্দ্র সম্পর্কে কবিকর্ণপূর তাই বললেন—

ন জাতিকুলশীলাশ্রমবিদ্যাকুলাদ্যপেক্ষী হি হরেঃ প্রসাদঃ।[৩]

—শ্রীহরির (গৌরাঙ্গের) প্রসাদ জাতি, শীল, আশ্রম, ধর্ম, বিদ্যা, কুল অপেক্ষা করে না।

লোচন দাসও বলেছেন যথার্থই :—

করুণাসাগর প্রভু সদয়হৃদয়।
আর্ত্তজন দেখি প্রভু তখনি দ্রবয় ॥[৪]

গোবিন্দদাস কবিরাজ একটি পদে লিখেছেন—

পতিত হেরিয়া কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরাতনু
অবনী ঘন গড়ি যায় ॥[৫]

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সর্বব্যাপী করুণা, বিশেষতঃ হীন পতিতের জন্য হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণে মুক্তির আশ্বাস তাঁর সমকালে ও পরবর্তীকালে ভক্তদের

১ চৈ. চ. অন্ত্য ১১ পরি ২ চৈ. চরিতামৃত মহাকাব্য—১৭।১৫ ; চৈ. চন্দ্র. না. ৯ অংক
৩ চৈ. চন্দ্র. না—২।২৬ ৪ চৈ. ম. আদিখণ্ড ৫ গৌরপদতরঙ্গিণী—৩৫৯

দ্বারা বারংবার সপ্রশংসভাবে উল্লিখিত হয়েছে। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত অদ্বৈতবাদী-বৈদান্তিক প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যস্তুতি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

পাত্রাপাত্র বিচারণাং ন স্বং পরং বীক্ষতে
দয়াদেয়বিমর্শকো নহি ন বা কালপ্রীক্ষঃ প্রভুঃ।
সাধ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমনধ্যানাদি দুর্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ॥
পাপীয়ানপি হীনজাতিরপি দুঃশীলোঽপি দুষ্কর্মণাং
সীমাপি স্বপচাধমোঽপি সততং দুর্ব্যসনাঢ্যোঽপি চ।
দুর্দেশপ্রভবোঽপি তত্র বিহিতবাসোঽপি দুঃসঙ্গতো
নষ্টোঽপ্যুদ্ধৃত এব যেন কৃপযা তং গৌরমেবাশ্রয়ে॥[১]

—যে প্রভু পাত্রাপাত্রবিচার না করে, আত্মপর না দেখে, দেয় অদেয় ভেদ না করে, কাল অকাল প্রতীক্ষা না করে শ্রবণ, দর্শন প্রণাম ও ধ্যানাদির দ্বারা দুর্লভ ভক্তিরস দান করেন, সেই ভগবান গৌরই আমার শ্রেষ্ঠ গতি।

পাপী, হীন জাতি, দুর্বৃত্ত, দুষ্কর্মের সীমা অতিক্রমকারী, চণ্ডালের অধম, সতত দুর্ব্যসনে নিরত, কুস্থানে জাত, কুদেশে বসবাসকারী ও কুসঙ্গহেতু বিনষ্ট ও যাঁর কৃপায় উদ্ধার পেয়েছে, সেই গৌরচন্দ্রকে আশ্রয় করি।

রূপগোস্বামী লিখেছেন—

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিতদুষ্কুলোৎপত্তয়া
স্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুরচারুকারুণ্যতঃ॥[২]

—এই পৃথিবীতে যে মানুষ নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করেছে, প্রভূত করুণা-বশে তুমি তাদেরও উদ্ধার করেছ।

অদ্বৈতকে মহাপ্রভু বর প্রার্থনা করতে বললে অদ্বৈতও নীচ দরিদ্রের প্রতি প্রভুর কৃপাবর প্রার্থনা করেছিলেন—

অদ্বৈত বোলয়ে প্রভু মোর এই বর।
মূর্খ নীচ, দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর॥[৩]

উড়িয়াভক্ত কানাই খুঁটিয়া লিখেছেন—

যাহার করুণায়ে পাপী জান্তি তরি।
চণ্ডাল জনমরু মুকতি লাভ করি॥[৪]

১ চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—৭৭-৭৮ ২ স্তবমালা—৫ ৩ চৈ. ভা মধ্য ১০ অঃ
৪ মহাভাবপ্রকাশ—১ম বৃত্ত

লোচনদাস ঠাকুর একটি পদে লিখেছেন—

হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই।
পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই॥[১]

প্রেমানন্দের একটি পদে আছে—

দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শুধিল যাচিঞা যে ঘরে ঘরে॥[২]

হরিদাসের একটি পদ—

দেখি জীব বড় দুঃখী হৈয়া সকরুণ আঁখি
হরিনাম গাঁথি দিল হার।
নিজ গুণ প্রেমধন দিল গোবা জনে জন
পতিতেরে আগে দান করে।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি ফিরে প্রভু গৌরহরি
যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে॥[৩]

লোচনদাস আর একস্থলে বলেছেন—

অবনি মণ্ডলে গোরারূপের অবধি।
বিলাইলা প্রেমধন আচণ্ডাল আদি॥
বাচাল করয়ে গোরা গুণে মূক জনে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তারাগণে॥[৪]

প্রকৃতই অসম্ভব সম্ভব করেছিলেন গোরা। পাপীতাপী দুঃখী নীচজাতি দীনহীন জনে হরিনাম বিতরণ করে, তাদের বৈষ্ণব ধর্মের উদার আঙিনায় স্থান দিয়ে তিনি তাদের মনুষ্যত্ববোধে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হীনপতিতরাও গৌরচন্দ্রের কৃপায় মানুষের মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল। এইভাবে জাতিভেদের তথা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে ধর্মবোধের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মহাপ্রভু হিন্দু তথা ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন। দস্যু তস্করও তাঁর কৃপালাভ করে মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছে। গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা অনুসারে দস্যু নারোজী, পন্থভীল প্রভৃতি তাঁর কৃপালাভ করে দস্যুবৃত্তি

১ গৌরপদতরঙ্গিণী—৩।১৩ ২ গৌরপদতরঙ্গিণী—৩।৪ ৩ গৌরপদতরঙ্গিণী—৩।২৪
৪ চৈ. ম. শেষখণ্ড

ত্যাগ করেছে। গোবিন্দ কর্মকারের বিবরণে যদি কিছু সত্যতা থাকে তাহলে বলতে হবে বারমুখীর মত পতিতা নারী, বিট্‌ঠলদেবের মুরারি নামক পতিতাবৃত্তিধারিণী নারীরাও তাঁর কৃপায় সৎজীবন যাপনে প্রবৃত্ত হয়েছে। জগাই মাধাই-এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। চৈতন্যজীবনীকারেরা তাঁর ভাবজীবন বর্ণনায় এত ব্যস্ত যে এইসব খুঁটিনাটি বিবরণের দিকে ততটা নজর দেন নি।

মুরারি বলেছেন যে গৌড়গমনকালে শ্রীচৈতন্য বাচস্পতি মিশ্রের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করে জড়, অন্ধ, বধির প্রভৃতি সকলকে উদ্ধার করেছিলেন—

দিনং কতিপয়ং কৃষ্ণ উষিত্বা দ্বিজমন্দিরে।
উদ্দধার জনং সর্বং জড়ান্ধবধিরাত্মকম্॥[১]

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

চণ্ডাল যুবকগৃহী বালবৃদ্ধনারী।
নামে মত্ত হয়ে দাণ্ডাইবে সারি সারি॥
বালকে বলিবে হরি বালিকা বলিবে।
পাষণ্ড অঘোরপন্থী নামে মত্ত হবে॥
আকাশ ভেদিয়া নামের পতাকা উড়িবে।
রাজাপ্রজা একসঙ্গে গড়াগড়ি দিবে॥[২]

এই প্রতিজ্ঞা শ্রীচৈতন্য সফল করেছিলেন তাঁর ভক্ত পরিকরগণের মাধ্যমে। তাঁর হরিনাম মহামন্ত্রের পতাকাতলে উৎকলাধীশ্বর প্রতাপরুদ্রদেব, ভারতখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম, বাসুদেবের ভ্রাতা বাচস্পতি মিশ্র, বয়ীয়ান্ সহপাঠী বৈদ্য মুরারিগুপ্ত, বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈত-শ্রীবাস, হরিভক্ত যবন হরিদাস, গৌড়েশ্বরের অমাত্য রূপ সনাতন, পিতৃতুল্য মাতৃস্বসাপতি চন্দ্রশেখর আচার্য, খোলাবেচা দরিদ্র শ্রীধর, উৎকলবাসী রায় রামানন্দ, অচ্যুতানন্দ, কানাই খুঁটিয়া, বলরাম দাস প্রভৃতি সমাজের উচ্চতম পর্যায়ের মানুষ থেকে নিম্নতম পর্যায়ের মানুষ পর্যন্ত সম্মিলিত হয়ে এক মহান্ ঐক্যের আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য হিন্দুসমাজের কাঠামোর মধ্যে এক বিরাট সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

মহাপ্রভু কেবল হরিনাম প্রচারের দ্বারা এবং স্বীয় আচরণের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন তা নয়, তিনি যথার্থই যুগের ত্রাতা হয়ে এসে-

১ মু. ক.—৩।১৭।১৬ ২ গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা—পৃঃ ৮

ছিলেন। তিনি শূদ্র রামানন্দ রায়কে উপদেষ্টার গৌরবে স্থাপন করে তাঁর কাছ থেকে তত্ত্ব কথা শুনেছেন; আবার শূদ্র রূপ ও সনাতনকে ভক্তিশাস্ত্র ও বৈষ্ণবীয় স্মৃতিশাস্ত্র রচনার প্রেরণা দিয়ে শূদ্রকে শাস্ত্রপ্রণেতার মর্যাদা দিয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

শূদ্রের মর্যাদা

সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ করে শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা দাস মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের লীলা॥[১]

চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণবগণও মহাপ্রভুর দৃষ্টান্তে জাতিভেদের মূলোচ্ছেদে ব্রতী হয়েছিলেন। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে সকল বৈষ্ণবেরই উচ্ছিষ্টভোজন করতেন। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ভূমিমালী জাতীয় ঝড়ুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করে গর্তে ফেলা উচ্ছিষ্ট আমের আঁটি চুষে জাতির অহংকার ধূল্যবলুণ্ঠিত করেছিলেন। অব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভক্ত অনায়াসে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর জাতিকে দীক্ষা দান করতে পারতেন। এই নীতি অনুসারেই উত্তরকালে কায়স্থ নরোত্তম দাস (দত্ত), শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ প্রভৃতি অব্রাহ্মণ হয়েও অনেক ব্রাহ্মণসন্তানকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন নি। এইভাবেই শ্রীচৈতন্য জাতিভেদজনিত হীনতাকে সর্বতোভাবে তিরোহিত করার মহত্তর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্বতা মহাপ্রভুর কাছে নিতান্তই নিরর্থক বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তাই একদিকে যেমন নিষ্প্রাণ নিরর্থক আচার অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করে কেবলমাত্র হরিনাম জপ ও কীর্তনের দ্বারা তিনি সহজ ধর্মচর্যার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি জটিলতামুক্ত সহজসরল সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য বৈষ্ণবীয় স্মৃতি রচনায় সনাতনের নিকট সূত্রাকারে দিগ্‌-দর্শন করিয়েছেন, ধর্মচর্যার নামে আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য ও ব্যয় বাহুল্যকে

সহজ ধর্মাচরণ

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৫ পরি

বর্জন করে সহজতম পন্থা হরিনাম আশ্রয় করার পরামর্শ দিয়েই তিনি যথার্থই যুগের প্রবর্তক বা যুগের অবতার হয়ে রইলেন। মুরারি লিখলেন—

কলৌ তু কীর্তনং শ্রেয়ঃ ধর্মঃ সর্বোপকারকঃ।
সর্বশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দ দায়কঃ॥
ইতি নিশ্চিন্ত্য মনসা সাধূনাং সুখমাবহন্।
জাতঃ স্বয়ং পৃথিব্যান্তু শ্রীচৈতন্যো মহাপ্রভুঃ॥
কীর্তনং কারয়ামাস স্বয়ং চক্রে মুদান্বিতঃ।[১]

—কলিযুগে কীর্তনই সকলের উপকারী—সর্বশক্তিময় শ্রেষ্ঠ ধর্ম, পরম আনন্দ-দায়ক, এই মনে চিন্তা করে সাধুব্যক্তির সুখের জন্য পৃথিবীতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আনন্দিত হয়ে তিনি নিজেও কীর্তন করেছিলেন, অপরকেও করিয়েছিলেন।

মহাপ্রভু নিজেই বলেছিলেন—

সংকীর্তন আরম্ভে মোহোর অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্বপতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ যুগে তারাও কান্দিবেক মোর নামে॥
যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ যুগে সভারে॥[২]

গৌড়যাত্রার পথে নবদ্বীপে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে যখন মহাপ্রভু অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে এসে কৃপা প্রার্থনা করে। প্রভু তখনও শুধু কৃষ্ণনাম গান করতে সকলকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্বলোক প্রতি।
আশীর্বাদ করেন কৃষ্ণে হউ মতি॥
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ॥[৩]

১ মু. ক.—১।৪।২৫-২৭ ২ চৈ. ভা. অন্ত্য ৪ অঃ ৩ চৈ. ভা. অন্ত্য. ৩ অঃ

মুরারির কড়চাতেও মহাপ্রভুর মুখে অনুরূপ উক্তি শুনি—

মুষ্মাভিরত্র কর্তব্যং সদৈব হরিকীর্তনম্।
বিমৎসরৈরবিশেষেণ জাগরে হরিবাসরে ॥[১]

—মাৎসর্য্যরহিত হয়ে জাগয়ে হরিবাসরে নির্বিশেষে তোমরা সর্বদাই এখানে হরিনাম সংকীর্তন কর।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বদিনে শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর বিরহ চিন্তায় বিহ্বল কৃষ্ণ নাম জপ ও কৃষ্ণ ভজনা করতেই উপদেশ দিয়েছিলেন।

আজ্ঞা করে প্রভু সভে কৃষ্ণ গাও গিয়া ॥
বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন ॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার।
তবে কৃষ্ণব্যতিরিক্ত না গাইব আর ॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে ॥[২]

শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তনকালে গৌরচন্দ্র অনুরূপ উপদেশই দিয়েছেন।

আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু বোলে কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ ॥[৩]

উপদেশ দিয়ে তিনি নিজেই কীর্তন সুরু করলেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥[৪]

নরহরি চক্রবর্তী লিখেছেন, সন্ন্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু ভক্তদের পরামর্শ দিয়েছিলেন 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করতে এবং দিবারাত্র কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে, কারণ নামজপে কার্যসিদ্ধি এবং পরমানন্দলাভ হবে।[৫]

১ মু. ক —৩।৪।২৬ ২ চৈ. ভা. মধ্য ২৭ অঃ ৩ চৈ. ভা. মধ্য ২৩ অঃ
৪ চৈ. ভা. মধ্য ২৩ অঃ ৫ ভক্তি রত্নাকর—১২।২০৪৭-৫২

ধর্মাচরণের এই সহজতম পন্থাই চৈতন্যধর্মকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেছিল। তাই আবালবৃদ্ধ নরনারী এই সহজপন্থা গ্রহণ করে একসূত্রে গ্রথিত বিচিত্রপুষ্পগ্রথিত মালিকার আকাব ধারণ করেছিল। বিশেষতঃ দীনহীন পতিত শ্রেণীর মানুষ বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয়ে ইসলামী উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পেয়েছিল। এইভাবেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম হিন্দুসমাজকে মহতী বিনষ্টির হাত থেকে বক্ষা করেছিল। মহাপ্রভু যে সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাতে জাতিধর্মের গোঁড়ামি এবং অস্পৃশ্যতার ঘৃণ্যতা খড়কুটোর মত ভেসে গিয়েছিল প্রেমধর্মের বন্যায়।

হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

হিন্দুসমাজকে সর্বপ্রকার বিনাশ থেকে রক্ষার আযোজন চৈতন্য-প্রবর্তিত উদার ধর্মাদর্শের মধ্যেই ছিল। হোসেন শাহের বাল্যকালেব প্রভু সুবুদ্ধি রায কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে একসময়ে হোসেনকে পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করেছিলেন। সেই বেত্রক্ষতচিহ্ন দেখে পরবর্তীকালে গৌড়েশ্বর হোসেনের বেগমের প্রতিহিংসা প্রবল হয়ে ওঠায় বেগমের ইচ্ছানুসারে সুলতান সুবুদ্ধিরাযের জাতিনাশ কবেছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজ থেকে বহির্গমনের পথ খোলা আছে অজস্র, প্রবেশ পথ রুদ্ধ। সুবুদ্ধি বারাণসী এসে পণ্ডিতের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান জিজ্ঞাসা করায পণ্ডিতরা বিধান দিলেন—'তপ্ত ঘৃত খাইঞা ছাড প্রাণে।' এই নিষ্ঠুর বিধান স্বভাবতঃই হিন্দুসমাজের মুমূর্ষু অবস্থার কথা বিজ্ঞাপিত করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা গণেশ ধর্মান্তরিত পুত্রের প্রায়শ্চিত্তেব জন্য স্বর্ণধেনু দান করেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদেব তুষ্ট করতে পারেন নি। মহাপ্রভুর সঙ্গে কাশীতে সাক্ষাৎ করে সুবুদ্ধি পরামর্শ চাইলে মহাপ্রভু সুবুদ্ধিকে পরামর্শ দিলেন বৃন্দাবন গিয়ে কৃষ্ণনাম জপ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে।

প্রভু কহে ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাবে ॥[১]

এই উদারতা সেকালে যে অপ্রত্যাশিত ছিল তাই নয়, সম্ভাব্যতারও

[১] চৈ চ মধ্য ২৫ পরি

অতীত ছিল। এই উদারতাগুণেই চৈতন্যধর্ম হিন্দু সমাজকে বিলুপ্তি দশা থেকে উদ্ধার করেছিল। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বরাহাবতারে বিষ্ণু কর্তৃক নিমজ্জন দশা থেকে ধরণীকে উদ্ধারের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং হিন্দু সমাজের প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে একটা সোচ্চার বিদ্রোহ শ্রীচৈতন্যের মতাদর্শের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

শ্রীচৈতন্যের আদর্শ তাঁর পরিকর ও ভক্তবৃন্দ বহন করে নিয়ে গেছেন উত্তর কালের কাছে। তাঁর আদর্শের বাহক নিত্যানন্দও ছুঁৎমার্গ মেনে চলেন নি। অদ্বৈত আচার্য তাই বলেছিলেন পরিহাসছলে—

চৈতন্য ভক্তদের আদর্শবহন

হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।
জাতি আছে হেন কোন জন বলে তোরে ॥[১]

যবন হরিদাসের লোকান্তরের পর চৈতন্যভক্তবৃন্দ হরিদাসের চরণ বন্দনা করেছিলেন—সর্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ।[২] তাঁরা হরিদাসের পাদোদকও পান করেছিলেন—হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।[৩] এইভাবে মহাপ্রভু শুধু ভক্তমহিমা বৃদ্ধি করেন নি, জাতিভেদের সংকীর্ণ দৃঢ় প্রাচীরটাকেও ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। বৃন্দাবন বলেছেন যে, যে বৈষ্ণব তার যে কুলেই জন্ম হোক না কেন সে সর্বোত্তম ; বৈষ্ণবের কোন জাতি নেই।

যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্বোত্তম সর্বশাস্ত্রে কহে ॥

*　　　*　　　*

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে ॥[২]

যবন হরিদাসকে মহাপ্রভু বলেছিলেন—তোমারে যে শ্রদ্ধা করে সে করে আমারে ॥[৩]

সকল মানুষকেই এক ধর্মসূত্রে বাঁধবার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্যের মনে সক্রিয় ছিল। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কেবলমাত্র হিন্দু সমাজের দিকেই নিবদ্ধ ছিল না, মুসলমান সমাজের প্রতিও তাঁর মানবিক দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল। তিনি যবন হরিদাসকে বলেছিলেন—

১ চৈ ভা. মধ্য ২৪ অ.　　২ চৈ. ভা. মধ্য ৯ অঃ　　৩ চৈ. ভা. মধ্য ৯ অঃ

হরিদাস কলিকালে যবন অপার।
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার॥
শ্রীচৈতন্য ও মুসলমান সমাজ
ইহা সবার কোনমতে হইবে নিস্তার।
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার॥[১]

তিনি যে বলেছিলেন, মুসলমানগণও তাঁর প্রেমধর্মের প্রভাবে চোখের জল ফেলবে তা একেবারে অসত্য বোধ হয় না।

মুসলমান সমাজে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কতটা কার্যকরী হয়েছিল বলা কঠিন, তবে তাঁর প্রেমধর্ম কিছু কিছু মুসলমানকেও যে আকৃষ্ট করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। মুসলমান সমাজেও তাঁর প্রেমধর্ম স্বীকৃতি পেয়েছিল। মুরারি কেবল বলেছেন যে মহাপ্রভু ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতিকে উদ্ধার করেছিলেন—ম্লেচ্ছাদীনুদ্দধারাসৌ।[২] যবন হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর শ্রদ্ধা ও সদয় ব্যবহারের তুলনা হয় না। আরও কয়েকজন ইসলাম ধর্মাবলম্বীর চৈতন্য কৃপালাভের উল্লেখ পাই চরিতগ্রন্থগুলিতেও। কবিকর্ণপূরের নাটকে এক সূচীকর্মজীবী দর্জি যবনের শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব রূপমাধুরী দর্শনে বিমুগ্ধতা ও প্রেমধর্ম গ্রহণের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।[৩]

কবিরাজ গোস্বামী পাঠান বিজুলি খান ও তাঁর অনুচরবর্গের প্রেমধর্ম গ্রহণের বিবরণ দিয়েছেন। মহাপ্রভু তখন মথুরা-বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। প্রয়াগ থেকে গঙ্গার তীরে তীরে গমনকালে এক গোপবালকের বংশীধ্বনি শুনে প্রভুর ভাবাবেশ হওয়ায় তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা ঝরতে থাকে, শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়। সেই সময়ে দশজন পাঠান ঘোড়সওয়ার ঐ পথে যাবার সময়ে ভাবলো যে সন্ন্যাসীর কাছে প্রচুর ধনরত্ন ছিল, তাঁর সঙ্গী পাঁচজন তাঁকে ধুতুরা খাইয়ে সব কেড়ে নিয়েছে।

পাঠান বিজুলিখানের পরিবর্তন

তারা এই ভেবে পাঁচজনকে বন্দী করে। প্রভু চৈতন্যলাভ করে তাঁর মৃগীব্যাধিতে অচেতন হওয়ার কথা তাদের জানান। এই পাঠানদের মধ্যে কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত এক পীর ছিলেন। প্রভু তার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তাকে পরাজিত করেছিলেন। মহাপ্রভুর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ও কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলতায় পীর মহাপ্রভুর কাছ থেকে কৃষ্ণনাম

১ চৈ. চ. অন্ত্য ৩ পরি ২ মু. ক.—২।১৭।১১ ৩ চৈ. চন্দ্র. না.—২।২৪

গ্রহণ করেছিলেন। প্রভু তার নাম রাখলেন রামদাস। এই পাঠানদলের অধিনায়ক তরুণবয়স্ক রাজকুমার বিজুলি খান মহাপ্রভুর চরণে পড়ে তাঁর কৃপাভিক্ষা করেছিলেন। সেই দশজন পাঠানই মহাপ্রভুর প্রভাবে বৈরাগী হয়েছিল। তন্মধ্যে বিজুলীখান পরম বৈষ্ণবরূপে তীর্থে তীর্থে মহাপ্রভুর নাম প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন।

সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্তি॥
সেই বিজুলিখান হৈল মহাভাগবত।
সর্বতীর্থে হইল তার পরম মহত্ত্ব॥[১]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাই বলেছেন,—

ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পশ্চিমে আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥[২]

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী প্রমথনাথ চৌধুরীর মতে বিজুলি খান কাল্পির দুর্গাধিপতি বিহারখান আফ্‌গানের পালিতপুত্র। সুতরাং ঘটনাটি ইতিহাসাশ্রিত।[৩]

কবিরাজ গোস্বামী আরও জানিয়েছেন যে গৌড়দেশে গমনকালে ওড্রদেশের সীমা অতিক্রম করার পর গৌড়েশ্বরের অধীনস্থ পিচ্ছলদা পর্যন্ত ভূভাগের অধিকারী শাসক মহাপ্রভুর অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেম দেখে বিমুগ্ধ হয়ে দীনবেশে মহাপ্রভুর শরণ নিয়েছিল এবং পিচ্ছলদা পর্যন্ত জলপথে চৈতন্যদেবকে পৌঁছে দিয়েছিল।

হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥
দূর হৈতে প্রভু দেখে ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া॥[৪]

হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের ভেদের গণ্ডী রাখেন নি শ্রীচৈতন্যদেব। কৃষ্ণনামের সীমাহীন আকাশের নীচে সকল মানুষেরই স্থান আছে, সেখানে মানুষের একমাত্র পরিচয় কৃষ্ণপ্রেমী—কৃষ্ণভক্ত।

১ চৈ. চ. মধ্য. ১৮ পরি ২ চৈ. চ. মধ্য ১৮ পরি ৩ নানাচর্চা—পৃঃ ১১১-২৭
৪ চৈ. চ. মধ্য ১৬ পরি

মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্ম প্রচারের ভার নিয়েছিলেন অদ্বৈত আচার্য ও তৎপুত্র অচ্যুতানন্দ, নিত্যানন্দ-প্রভু, তৎপত্নী জাহ্নবা দেবী এবং তৎপুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র, পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ, নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রমুখ। এঁরা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করেছিলেন। নিত্যানন্দ দাস বীরচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন—

হরিনাম দিয়া উদ্ধার করে পতিত জন।
হিন্দু মুসলমান কিছু না করে গণন ॥[১]

চৈতন্যোত্তরকালে তাঁর মতাবলম্বী বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রেমধর্ম প্রচারকালে সর্বশ্রেণীর মানুষকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁর পত্নীপুত্র জাতি-ধর্মনির্বিশেষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। শ্যামানন্দ ও ধনী জমিদার মুসলমান দস্যুকে শিষ্য করেছিলেন। গোপীজনবল্লভদাস শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দের জীবনীতে জানিয়াছেন যে রসিকানন্দের ভক্তগণের মধ্যে মুসলমানও ছিল। মেদিনীপুরের কাজি আহম্মদ রসিকানন্দের শিষ্য হয়েছিলেন। লবনী মোহনের জগন্মোহন-ভাগবত অনুসারে জগন্মোহনের (১৫২৮-৬০ খ্রীঃ) কিছু মুসলমান শিষ্য হিন্দু নাম গ্রহণ করেছিলেন।

চৈতন্যোত্তরকালে চৈতন্যধর্ম প্রচার

মনসুর যাঁর নাম হইল মনোহর দাস।
হিম্মৎ যাঁর হৈল নাম হৃদানন্দ দাস ॥
বাণেশ্বর দাস নাম বাহাদুর যাঁর হৈল।
সর্বপরিত্যাগী তিনে বৈরাগ্য করিল ॥[২]

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় সৈয়দ ইব্রাহিম (১৬১৪ খ্রীঃ জীবিত) বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে প্রেমভক্তিমূলক পদাবলী রচনা করেছিলেন।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বহুসংখ্যক বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির কথা জানা গেছে। সম্ভবতঃ এঁরা মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করেন নি। কিন্তু এঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি'

১ প্রেমবিলাস—২৪ বি.
২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন—১ম, অপরার্ধ—পৃঃ ৬৮
৩ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—ক্ষিতিমোহন সেন—পৃঃ ৫০

গ্রন্থে কতকগুলি বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পরিচয় সহ পদাবলী-উদ্ধৃত করেছেন। সৈয়দ মর্তুজা, কাঙ্গালী মীর্জা, মহম্মদ আলী, কএজোল্লা, হবিব, সেরচান্দ, সালবেগ, যোছন আলী প্রভৃতি কবিবৃন্দ বৈষ্ণবপদ রচনা করে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপকতা ও সর্বগ্রাহ্যতার প্রমাণ দৃঢ় করেছেন। সৈয়দ মর্তুজার পদগুলি বৈষ্ণবভাবুকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সৈয়দ মর্তুজা যখন বলেন—

সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥

তখন কবির অকৃত্রিম বৈষ্ণবোচিত কৃষ্ণে শরণাগতি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি না। সাহ আকবর গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে লিখেছেন—

জীউ জীউ মেরে মন-চোর গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়া লিয়া॥
ঐছন পহুঁকৈ যাহু বলিহারী।
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিখারী॥[১]

লাল মামুদ লিখেছেন,—

সোনার মানুষ নদে এল রে।
ভক্ত সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে॥
সোনার মানুষ সোনার বরণ।
সোনার নূপুর সোনার চরণ।
চারিদিকে সোনার কিরণ ছুটছে আলোকিত করে।
কত লোহার মানুষ সোনা হ'ল গৌর অবতারে॥[২]

১ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি—পৃঃ ৪১-৪২
২ ঐ তদেব পৃঃ ৩১

উক্ত পদদ্বয়ে কবিদ্বয়ের গৌরাঙ্গভক্তির অকৃত্রিমতায় সংশয় প্রকাশ করার কোন হেতু নেই। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম কিভাবে হিন্দু মুসলমান সকলকেই প্রভাবিত করেছিল তার নিদর্শন মুসলমান বৈষ্ণব কবিবৃন্দ।

লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মের শেষভাগে যে সকল বৌদ্ধ হিন্দুধর্মে স্থান পান নি—ইসলাম ধর্মও গ্রহণ করতে পারেন নি,—নেড়ানেড়ি নামে যাঁরা উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হয়ে কাল যাপন করতেন বীরচন্দ্র প্রভু তাঁদের খড়দহে এনে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এইটি ছিল বীরচন্দ্রের মহত্তম কীর্তি।

কেবলমাত্র গৌড় বা বাঙ্গালাদেশ নয়, বৃন্দাবন, মথুরা, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারত মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছিল। ফলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

দক্ষিণভারতে চৈতন্যপ্রভাব

কৃষ্ণদাস কবিরাজ দক্ষিণভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার সম্পর্কে লিখেছেন—এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ।[১] হয়ত সমস্ত দক্ষিণদেশের চৈতন্যপন্থী হওয়ার উল্লেখে অতিশয়োক্তি আছে, তবে দাক্ষিণাত্যে যে মহাপ্রভুর প্রভাব স্বল্প ছিল না, কবিকর্ণপূরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক থেকে তা জানা যায়। মহাপ্রভু পুরী থেকে যখন দক্ষিণভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সেই সময় মল্লভট্ট মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে জানালেন যে শৈব পাষণ্ড, জ্ঞানমার্গী, কর্মমার্গী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব মত পরিত্যাগ করে চৈতন্যমত গ্রহণ করেছিল।[২] দক্ষিণভারতে মহাপ্রভুর স্থায়ী প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বৈষ্ণবতার ব্যাপ্তিতে, দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তিগীতিতে এবং ভক্তিতত্ত্বের সাধক তুকারামের (আঃ ১৬০৮—৫০ খ্রীঃ) চৈতন্যপন্থীদের গুরুরূপে স্বীকৃতিতে। সাধু তুকারামের গুরুর নাম ছিল কেশব চৈতন্য বা বাবাজী চৈতন্য। সুতরাং চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে তুকারামের সংযোগ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডঃ সুশীল কুমার দে দক্ষিণ ভারতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে লিখেছেন—"One important result, however, of Chaitanya's visit might have been that at many points his living faith touched, stimulated and left its general impress upon southern and western vaisnavism, its tendency towards a more emotional form of

১ চৈ. চ. মধ্য. ৭ পরি ২ চৈ. চন্দ্র. নাটক—৭ অংক

worship. A reference is sometimes made to contemporaneous outburst of Kanarese hymnology......and emotional singing in the south, obtaining from the time of the Tāmil Alvars may have received a fresh impetus from the personal example of Chaitanya. It is probable also that he left behind some general influence in the Maratha country, which survived as it did through a century to the days of Tukarām, who acknowledges his debt to Chaitanya teachers.[১]

বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবস্থান বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্মাণ, স্নানের ঘাট নির্মাণ ইত্যাদির ফলে বৃন্দাবন কৃষ্ণলীলার পীঠস্থান হিসাবে সর্বভারতীয় তীর্থরূপে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতিরও পীঠস্থান। পুরাতন বৃন্দাবন সম্ভবতঃ লুপ্ত হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে নূতন বৃন্দাবন নগরী গড়ে উঠলো—শ্রীচৈতন্যের পদরেণু দ্বারা পবিত্র চৈতন্যভক্ত জ্ঞানী গুণী সন্ন্যাসীদের অবস্থানের মহিমায় নূতন বৃন্দাবন পবিত্রতা ও নবগৌরবের আধার হয়ে উঠেছিল। চৈতন্য সংস্কৃতি দক্ষিণ-ভারত উড়িষ্যা গৌড়বঙ্গ থেকে বৃন্দাবন মথুরা পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় ভারতের এক বিশাল অংশ অখণ্ড সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তী কালে নরোত্তম শ্রীনিবাস ইত্যাদির চেষ্টায় আসাম মণিপুর পর্যন্ত চৈতন্য ধর্ম ব্যাপ্তি লাভ করেছিল।

বৃন্দাবন—বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র

আসামে অবতার পুরুষ রূপে কীর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শ্রীমন্ত শংকর দেবের সঙ্গে পুরীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার চৈতন্য-শংকর মিলন সম্পর্কে রামকান্তের গুরুলীলা, রামচন্দ্র ঠাকুর, দৈত্যারি ঠাকুর, ভূষণ দ্বিজ কবি, দ্বিজ রাম রায়ের গুরু লীলা, কৃষ্ণ ভারতীর সন্ত নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান (২য় সং, পৃঃ ৪৯) গ্রন্থে। শংকরদেবের উপরে মহাপ্রভুর প্রভাব কতটা কার্যকরী হয়েছিল তা বলা

শংকরদেব ও শ্রীচৈতন্য

[১] Vaisnava Faith and Movement—P. 92.

সহজ না হলেও চৈতন্যদেবের ধর্মমতের সঙ্গে শংকরদেবের ধর্মমতের গভীর সাদৃশ্য চোখে না পড়ে পারে না। শংকরদেব মহাপ্রভুর মতই হরিনামকে কলি যুগে একমাত্র ধর্ম বলে ঘোষণা করেছিলেন; তাঁর মতেও নাম ও নামী অভিন্ন শংকরদেবের উপদেশ—

যিটো দেব ভগবন্ত বেদে যাক ন জানন্ত
তেন্তে নিজ কীর্তনত বশ্য।
জানি মাধবর নাম কীর্তন করিয়ো সদা
ইটো সবে শাস্ত্রর রহস্য ॥[১]

শংকরদেব বলেন—

হরিনাম হরিনাম এ মূলমন্ত্র।
কলিত নাহি তপ যজ্ঞ যন্ত্র ॥[২]

তাঁর মতে ভগবানের সহস্রনামের মধ্যে কৃষ্ণ নামই সার—

সহস্রেক নাম জপি পাবে যত ফল।
এক কৃষ্ণনাম জপি পাব ত সকল ॥[৩]

শংকরদেবও মহাপ্রভুর মতই জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তাঁর ভাগবত ধর্মে অধিকার দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব এবং রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা শংকরদেব স্বীকার করেন নি, কিন্তু সদা কৃষ্ণনাম কীর্তনের দ্বারা সর্বসাধারণের সহজ ধর্মাচরণের উপদেশ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবপুষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়।

নানক ও চৈতন্য

উড়িয়া কবি ঈশ্বরদাসের চৈতন্য ভাগবতে শিখগুরু নানকের শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রাপ্তির উপাখ্যান ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্ভব বলে মনে করলেও[৪] জাতিধর্মনির্বিশেষে স্বীয় ধর্মমত প্রচার করা এবং সর্বধর্মের মানুষকে শিখধর্মে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া নানকের ধর্মমতে চৈতন্যপ্রভাব লক্ষিত হয় না।

নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে গুঞ্জামালী নামে বৃন্দাবনবাসী এক গুজরাটী

---

১ শ্রীমন্ত শংকর—হরমোহন দাস—গুয়াহাটী—পৃঃ ২০
২ তদেব পৃঃ ২৯
৩ তদেব পৃঃ ৫৫
৪ চৈ. চ. উ. ২য় সং—পৃঃ ৫০০

চৈতন্যভক্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভক্তমালে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী নামে একজন পাঞ্জাবী ভক্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুজরাটে মহাপ্রভুর গাদি বড় গৌড়ীয়া এবং অদ্বৈতশাখাভুক্ত চক্রপাণি প্রতিষ্ঠিত গাদির নাম ছোট গৌড়ীয়া। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার বলেন যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃষ্ণদাসের বাঙ্গালা ভক্ত মাল রচনাকালে মূলতান, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও গুজরাটে বহু ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শিষ্য হয়েছিলেন।[১] অমৃতসরে দুর্গামন্দিরের নিকটস্থ হনুমানজীর মন্দিরে এখনও শ্রীচৈতন্যের চিত্রপট আছে, সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে চৈতন্যভক্তরা হরিনাম সংকীর্তন করেন।[২]

পশ্চিমভারতে চৈতন্যভক্ত

চৈতন্যচরিতামৃতে নীলাচলে চৈতন্যশাখাভুক্ত চৈতন্যভক্ত কামাভট্ট (কাম ভট্ট), সিঙ্গাভট্ট (সিংহভট্ট), হাব ভট্ট (?) ও শিবানন্দ দস্তুরের নাম উল্লিখিত আছে।[৩] ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের অনুমান, এই ভট্টত্রয় ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় এবং শিবানন্দ দস্তুর খুব সম্ভবতঃ গুজরাটী, কারণ দস্তুর উপাধি গুজরাটের পার্শি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়।[৪]

মহাপ্রভুর ব্যাপক প্রভাব সম্পর্কে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন, "রাজপুতানার বৈষ্ণবদের উপরও চৈতন্যমতের বেশ প্রভাব লক্ষিত হয়। সুরত জেলায় বলসার প্রভৃতি স্থানের বানিয়াদের মধ্যে সুদূর পাঞ্জাবে ডেরা-ইস্মাইল খাঁ-বাসীদের মধ্যেও গৌড়ীয়ভাবের বৈষ্ণব দেখিয়াছি। তাঁহারা বৃন্দাবন ও নবদ্বীপকে মহাতীর্থ মনে করেন। তাঁহারা ভক্তিভাবে দু একটি গৌড়ীয় পদকীর্তনও করেন।"[৫]

আচার্য সেন আরও জানিয়েছেন যে আসাম-মাজুলির চারিধামের গোঁসাইরা বাঙ্গালায় ভাব প্রচার করতেন।[৬] বিখ্যাত ভজন গায়িকা ও গীতি-রচয়িত্রী মীরাবাঈ রবিদাসের শিষ্যারূপে খ্যাতা হলেও জীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে এবং অনেকের ধারণা মীরা বাঈর উপরে গৌড়ীয় মতের প্রভাবও ছিল।[৭]

---

১ চৈ. চ উ. ২য় সং—পৃঃ ৫২৩ ২ চারুচন্দ্র পাকড়াশীর নিকট শ্রুত

৩ চৈ. চ. আদি ১০ পরি ৪ চৈ. চ. উ.—পৃঃ ৬০৪

৫ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—পৃঃ ৪৯

৬ তদেব ৭ তদেব

জীবের দুঃখে কাতর হয়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জীবের মুক্তির যে সহজতর পথ প্রদর্শন করেছিলেন তাতে কেবলমাত্র 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়' নি, ভারতবর্ষের এক বিশাল ভূভাগও ভেসে গিয়েছিল। সর্বব্যাপী এক সাম্য ও ঐক্যের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে, জেগে উঠেছিল নূতন প্রাণ—নূতন শক্তি—হারানো আত্মপ্রত্যয়,—সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি।

এমনি এক ভাববন্যা সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করে দেশ দেশান্তরে উপনীত হয়েছিল আরও বহুকাল পূর্বে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় দুহাজার বৎসর আগে। জীবের দুঃখে কাতর হয়ে জীবের মুক্তির পথ অন্বেষণে সর্বত্যাগ করে কঠোর তপশ্চর্যায় বোধি অর্জন করে জীবকে জরাব্যাধি-মৃত্যু থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে সাম্য মৈত্রী ও করুণার মন্ত্রের উদ্‌গাতা কপিলাবস্তুর রাজকুমার গৌতম বুদ্ধ যুগাবতাররূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবও তৎকালে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্যাকে অর্থাৎ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানকে নিন্দা করে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য সহজতর ধর্মাচরণের পথ নির্দেশ করেছিলেন। জরা ব্যাধি মৃত্যুর মত জীবের দুঃখের মূল উৎপাটন অর্থাৎ নির্বাণলাভ ছিল বুদ্ধদেবের উপদেশের লক্ষ্য। তাঁর উপলব্ধি হোল: জরামরণের মূল জাতিপ্রত্যয় বা জীবন ধারণ, জাতির মূল ভবপ্রত্যয় বা জন্ম, জন্মের মূল পৃথিব্যাদি ধাতু, ধাতুর মূল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার মূল বেদনা, বেদনার মূল স্পর্শ, স্পর্শের মূল ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের মূল নামরূপ, নামরূপের মূল বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মূল সংস্কার ও সংস্কারের মূল অবিদ্যা। এই অবিদ্যানাশেই জীবের নির্বাণ বা মুক্তি। গুরুর শরণ গ্রহণ বা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকেই মানুষ আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে সত্যজ্ঞান লাভ করে অবিদ্যা বিনাশ করে মুক্তিলাভ করতে পারে।[১] সংসার বা ক্রমাগত জন্ম মৃত্যুর কারণ তৃষ্ণা বা আসক্তি। এই তৃষ্ণাজাত জরা ব্যাধি মৃত্যু,—যার মূলে আছে অবিদ্যা তা থেকে মুক্তি পেতে হলে বুদ্ধের মতে নৈতিকবিধি বা শীলধর্ম পালন করে সমাধি বা মনঃসংযম অভ্যাস করতে হবে। সমাধি অভ্যাসের দ্বারা লাভ করতে হবে পঞ্ঞা বা প্রজ্ঞা। শীলধর্মের মধ্যে আছে পঞ্চনীতি, অষ্টনীতি, নবনীতি, দশনীতি,

শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধ

১ শ্রীশ্রীবুদ্ধ যশোধরা—ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—পৃঃ ৪৭-৪৮

আজীবট্ঠমকশীল অর্থাৎ সদাচরণ এবং চতুপরিসুদ্ধিশীল অর্থাৎ পবিত্র আচরণ। জীবহত্যা, পরস্বাপহরণ পরকীয়া নারীর সংসর্গ, মিথ্যাভাষণ ও মদ্যপান ত্যাগ—পঞ্চনীতির অন্তর্গত। অষ্টনীতিতে উক্ত পঞ্চনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে মধ্যাহ্নের পর খাদ্যগ্রহণ, নৃত্যগীতবাদ্যাদি বর্জন, গন্ধমাল্যপুষ্পপ্রসাধন বর্জন ও আরামপ্রদ শয্যায় শয়ন বা উপবেশন বর্জন। নবনীতিতে অষ্টনীতির সঙ্গে সদিচ্ছা সংযুক্ত এবং দশনীতিতে নবনীতির সঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকার বর্জন বিহিত। অপরশীলধর্মগুলি শ্রমণদের আচরণীয়।[১]

বুদ্ধদেব অগণিত মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন আপন ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বব্যাপী করুণা বর্ষণের দ্বারা। তিনি মানুষের মধ্যে কৃত্রিম ভেদ দূর করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাম্য, নূতন ধর্মনীতি প্রবর্তন করে ধর্মের জগতে এনেছিলেন বিপ্লব।

ধর্মে বিপ্লব আনয়ন করে অসীম করুণাধারা বর্ষণ করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও সাম্যের ও প্রেমের পতাকাতলে মিলিত করেছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষকে ভেদের গণ্ডী অগ্রাহ্য করে। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্মের করুণা মৈত্রী প্রেম চৈতন্যধর্মে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু বুদ্ধের আত্মজিজ্ঞাসায় পথে সমাধির সাহায্যে প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত হয়ে অবিদ্যা নাশ করার ব্রত অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যের হরিনাম কীর্তনের দ্বারা মুক্তিলাভের পন্থা অনেক সহজতর,—বুদ্ধের জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা চৈতন্যের প্রেমভক্তির পথ সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী। তবে যুগের প্রয়োজনে ধর্মাচার্যের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীচৈতন্য তাঁর যুগে দেশের ধর্ম, সমাজ ও মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সমাজকে তথা মানবসমাজকে বাঁচাতে সহজতম সরলতম পন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের মতই চারিত্রনীতি, জীবে প্রেম ও সর্বব্যাপী করুণার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেও তিনি কেবলমাত্র হরিনাম জপ ও হরিনামকীর্তনকে সর্বোচ্চস্থান দিয়ে কেবল সমকালের নয়, সর্বকালের সকল মানুষের পরিত্রাতা আসন লাভ করেছেন। আজ তাই গৌড়ীয় মিশনের চেষ্টায় চৈতন্যধর্ম বিশ্বমানবকে আকর্ষণ করতে পেরেছে। বিম্বিসার, অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন, ধর্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি সার্বভৌম নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রচার অভিযানের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে বিশ্বের নানা স্থানে শ্রদ্ধার সঙ্গে বৃত হয়েছে। চৈতন্য

---

১ বুদ্ধ—উ মু—ক. বি.—পৃঃ ৪৭-৫১

ধর্ম অনুরূপ ভূপতিবর্গের সহায়তালাভের সুযোগ না পেলেও আপন মহিমায় ও সর্বগ্রাহ্যতার গুণে বিশ্বমানবের মনে আসন পেতেছে। সমাজ সংস্কারক না না হওয়া সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালী সমাজে যে সংস্কার সাধিত হয়েছিল সে সম্পর্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস লিখেছেন, "জাতি ভেদ রহিত, অসবর্ণ বিবাহ, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় সামাজিক পরিবর্ত্তনের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ সর্বদা চীৎকার ও অনেক টেবল থাবড়াইয়াও সত্য বলিলে কিছুই করিতে পারিতেছেন না, চৈতন্য এ সকল কর্তব্যবিশেষের জন্য কিছুমাত্র যত্ন না করিয়া একমাত্র ধর্মপ্রচারের দ্বারা অনেকাংশ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।"

সমাজ সংস্কার

শুধু পুরুষ নয়, নারীজাগরণও হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে। যদিও মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর পক্ষে নারীসংস্পর্শ বর্জনকেই শ্রেয়ঃ মনে করতেন, তথাপি তাঁর ভক্ত ছিলেন অনেক বাঙ্গালী ও উড়িয়া নারী। শিবানন্দ সেনের পত্নী প্রতি বৎসর স্বামীর সঙ্গে রথযাত্রার সময় পুরী যেতেন মহাপ্রভুকে দেখতে। সীতাদেবী, মালিনীদেবী প্রমুখ বৈষ্ণব-পত্নীরাও আসতেন। ফলে অবরোধে বন্দিনী নারীরা মুক্তির আস্বাদ লাভ করেছিলেন। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী, শ্রীবাসপত্নী মালিনী, নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা প্রভৃতি বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয়া হয়েছিলেন, অনেককে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যও নিত্যানন্দের অপ্রকটের পরে জাহ্নবীদেবী বৈষ্ণব সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নরোত্তম আয়োজিত খেতরির মহোৎসবে। এইভাবে শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনে নারীমুক্তিরও সূচনা হয়েছিল।

নারী জাগরণ

অনেকে মনে করেন যে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবতার প্রভাবে বাঙ্গালী বীর্যহীন দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা যে কতটা ভ্রান্ত তা বোঝা যাবে শ্রীচৈতন্যের কঠোর জীবনাচরণ ও ধর্মমতের পর্যা-লোচনায়। বিধর্মী রাজপুরুষের অন্যায় শাসন উপেক্ষা করার শক্তি চৈতন্যদেবই বাঙ্গালীকে যুগিয়েছিলেন। জগাই-মাধাই উদ্ধার ও কাজি শাসনের ব্যাপারে শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিকা বীর্যহীন

চৈতন্যপ্রভাবে বাঙ্গালীর বীর্যহীনতা?

১ চৈতন্য—বঙ্গদর্শন, ৪র্থ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২৮২ ন্যাশনাল লিটারেচার কোং-এর দ্বারা পুনর্মুদ্রিত (১৩৪৩)—পৃঃ ২৬১

কাপুরুষতার লক্ষণ নয়। সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে কঠোর বৈরাগীর জীবনাচরণ,—কোন আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করে ঈশ্বরলাভের কঠোর সাধনা বলহীন ব্যক্তির আয়ত্তাধীন নয়। তৃণ অপেক্ষাও দীন, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু অমানী হয়ে মানীয় সম্মান প্রদানের যে দৃঢ়তা তাও নির্বীর্যের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন, "চৈতন্যের বৈরাগ্যধর্ম কর্মবিমুখ ভিক্ষুকের নয়। এ ধর্ম অত্যন্ত কঠিন বীর্যবানেরই আচরণীয়।"[১] তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের অভিযোগের উত্তরে আরও বলেছেন, "চৈতন্য বাঙ্গালীকে নির্বীর্য করেন নাই। বাঙ্গালীর বীর্যহীনতা বলিতে যাহা বোঝায় তাহা তাহার দেশ-সমাজ-সংসারের পরিবেশ। অল্পায়াসলভ্য শস্য, গ্রাম-নিবদ্ধ নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা, পরস্পর সহনশীলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীনতা—এই সব মিলিয়া বাঙ্গালীকে ঘরপোষা ও নিরুদ্যম করিয়াছিল। বীর্যহীনতা যদি কিছু থাকে তবে তা নিরুদ্যমের সূত্রে আসত।"[২]

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যের বিশাল কীর্তির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন, "রাজকীয় সহায়তা নাই, আইনের বাধ্যতা নাই, অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনা নাই, বলপ্রয়োগের ভীতি নাই, যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের যাদুদণ্ডস্পর্শে বাঙ্গালায় একটা মঙ্গলময় রূপান্তর ঘটিয়া গেল। একজন কৌপীনসম্বল পুরুষের অঙ্গুলী-হেলনে কোটি কোটি বাঙ্গালীর এই জাতীয় অভ্যুত্থান।"[৩]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্পষ্টভাবে চৈতন্য পরবর্তী যুগে উড়িষ্যার পতনের জন্য শ্রীচৈতন্যকে দায়ী করে লিখেছেন, "Suddenly from the beginning of the 16th century a decline set in the power and prestige of Orissa, with a corresponding decline in the military spirit of the people. The decline is intimately connected with the long residence of the Bengali Vaisnava Saint Chaitanya in the country. If we accept the truth of what the Sanskrit and Bengali biographies of Saint state about his influence over Prataparudra and the people of the country, even then, we must admit that Chaitanya was one

উড়িষ্যার পতনে শ্রীচৈতন্যের দায়িত্ব

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৩১৪
২ বা. সা. ই. ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ৩১৪ ৩ বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া—পৃঃ ১৬৮

of the principal causes of political decline of the empire and the people of Orissa. Not only that acceptance of vaisnavism rather Neo-Vaisnavism was the cause of the Muslim conquest of Orissa in twenty-eighth year after the death of Prataparudra."[১]

রাখাল দাসের অভিমত অন্যান্য অনেক পণ্ডিতই গ্রহণ করেছেন। ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাবও এই মতানুসারী হয়ে বলেছেন, "A doctrine that preaches inaction and sentimentalism is harmful to the ordinary man in his daily walk of life and it is simply fatal to administrator who holds the destiny of millions. The attempt to make the Bhakti cult a mass religion and to influence the king and his officers by its sweet pessimistic philosophy had no doubt been fatal to the social political life of the country."[২]

জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ থেকে বিরত করেছিলেন।

প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশা।
শুনিঞা গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাসা॥
চৈতন্যদেবের রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল॥
কাল যবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর।
সিংহ শার্দূল দেখ কতেক আস্থর॥
ওড্রদেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবেক এতদিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।[৩]

কিন্তু জয়ানন্দের এই বাক্যে যুক্তিযুক্তভাবেই সংশয় প্রকাশ করেছেন ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। যে বিষয়-বিরক্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যবিষয়ীর সংস্পর্শ ভয়ে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে স্বীকৃত হন নি তিনি প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ-বিগ্রহাদি রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করবেন, তা সম্ভাব্য বিবেচিত হয় না।

১ History of Orissa—Vol. I—P. 330.
২ History of Orissa—p. 92 ৩ চৈতন্যমঙ্গল—বিজয়—২।২৮-৩২

বিশেষতঃ মহাপ্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর যেভাবে আত্মভাবমগ্ন থাকতেন, তাতে বিষয়কর্মে পরামর্শদান তাঁর পক্ষে সম্ভব বলেও মনে হয় না।

রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের দুই লক্ষ কাহন কড়ি আত্মসাৎ করায় চাঙ্গে চড়িয়ে তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়েছিল। মাচার উপর থেকে খড়্গের উপরে ফেলে বধ করাকে চাঙ্গে চড়ানো বলা হয়। লোকজন এসে এই সংবাদ মহাপ্রভুকে দিলে—

প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহে কি করিব॥[১]

রামানন্দের গোষ্ঠী প্রভুর ভক্ত, সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রভুর উদাসীন থাকা উচিত নয় বলে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করলে তিনি বললেন যে, তিনি পাঁচগণ্ডার ভিক্ষুক, দুইলক্ষ কাহন তাঁকে রাজা ভিক্ষা দেবেন কেন? লোকে এসে মহাপ্রভুকে জানাচ্ছে, গোপীনাথকে খড়্গের উপরে রেখেছে। মহাপ্রভু জানালেন, তাঁর কিছুই করণীয় নেই, জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করলে, তিনিই রক্ষা করতে পারেন। তখন সার্বভৌমতনয় হরিচন্দনের চেষ্টায় গোপীনাথের প্রাণরক্ষা পায়। বাণীনাথকেও রাজার লোক বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। বন্দীশালায় বাণীনাথ হরেকৃষ্ণ নাম জপ করেছিলেন শুনে প্রভু সন্তুষ্ট হলেন। তিনি কাশী মিশ্রকে বললেন যে তিনি পুরীতে থাকবেন না কারণ এখানে বিষয়ীর উপদ্রব, বারবার লোক এসে তাঁকে দুঃখ দিয়েছেন, বিষয়ীর কথায় তাঁর মন ক্ষুব্ধ হয়।

ইহা রহিতে নারি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রবে ইহা না পাই সোয়াথ॥
* * *
বিষয়ীর বার্তা শুনি ক্ষোভ হয় মন।
তাতে ইহা রহি মোর নাই প্রয়োজন॥[২]

প্রতাপরুদ্রগুরু কাশীনাথ তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—

তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত॥[৩]

বিষয়ীর স্পর্শ যাঁর এতই কষ্টকর ছিল, তিনি প্রতাপরুদ্রকে রাজ্যজয়ে বা যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে যে পরামর্শ দেবেন, তা মনে হয় না।

১ চৈ. চ. অন্ত্য. ৯ পরি ২ চৈ. চ. অন্ত্য. ৯ পরি ৩ চৈ. চ. অন্ত্য ৯ পরি

জয়ানন্দ বলেছেন যে মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বাঙ্গালা দেশের পরিবর্তে কাঞ্চী জয় করতে। এ ঘটনাও সত্য নয়। প্রত্নলিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৫১৩ ও ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব দক্ষিণদেশে সসৈন্যে যাত্রা করেছিলেন কাঞ্চীর রাজধানী চন্দ্রগিরি জয়ের উদ্দেশ্যে নয় বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আক্রমণ থেকে স্বরাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন, তখন প্রতাপরুদ্রদেব পুরীতে ছিলেন না, তিনি রাজধানীতে রাজকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৃষ্ণদেবরায়ের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে ও শর্ত হিসাবে কন্যার বিয়ে দিতে বাধ্য হন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্রদেব রাজকার্যে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু অসম্মানজনক সন্ধি ও সাহসী বীর যুবক পুত্র বীরভদ্রের অকাল মৃত্যু তাঁকে ভগ্নোত্তম করে তুলেছিল। তাঁর অপর দুই পুত্র ছিল অপদার্থ। সুতরাং ভগ্ন-হৃদয় রাজা ধর্মের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে রাখলেন। এমন কি কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পরও প্রতাপরুদ্র হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন প্রয়াস করেন নি। হোসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন মহম্মদ শাহ্ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। গিয়াসুদ্দিনের রক্তাপ্লুত রাজত্বকাল তাকে অপ্রিয় করে তুলেছিল। এই সুযোগে প্রতাপরুদ্রদেব হোসেন শাহ কর্তৃক বিজিত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কোন প্রয়াসই করলেন না।[১]

প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুরাগী ভক্ত হলেও চৈতন্যধর্ম বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। শ্রীচৈতন্যও পুরীতে আত্ম-ভাবরসে নিমগ্ন থাকতেন। প্রতাপরুদ্র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ্বাস হয়ে জীবনের শেষদিকে একপ্রকার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং এই সময়ে তিনি ধর্মের দিকে অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় শ্রীচৈতন্যের প্রতিও অধিকতর পরিমাণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সুযোগে সীমান্ত প্রদেশের শক্তিশালী সামন্ত রাজারা কার্যতঃ স্বাধীন হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণকোটের শাসক বাহুবলেন্দ্র এবং নন্দপুরের শাসক বিশ্বনাথ দেও প্রাধান্য অর্জন করে রাজকীয় শাসন উপেক্ষা করে-ছিলেন। গোলকুণ্ডার শাহ কুলি কুতুব বিনা বাধায় কোণ্ডপল্লী দখল করলেন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর অল্প পরেই গোদাবরী কৃষ্ণার অববাহিকা উড়িষ্যার হাতছাড়া হয়ে গেল। সুতরাং উড়িষ্যার দুর্বলতার ও মুসলমান অধিকারের

১ Gajapati Kings of Orissa—pp. 91-92.

জন্য শ্রীচৈতন্যকে দায়ী করা সমীচীন নয়। উড়িষ্যার পতনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী প্রতাপরুদ্রের বংশধরদের দুর্বলতা। ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "R. D. Banerjee has done great injustice to the memory of the great saint by holding him responsible for military decline of Orissa in the reign of Pratapa Rudra."[১]

আচার্য সুকুমার সেন এ সম্পর্কে লিখেছেন, "কেহ কেহ এমনও ইঙ্গিত করিয়া থাকেন যে চৈতন্যের প্রভাবেই বীর্যবান উড়িয়ারা স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। এসব ভাবনা অলস কল্পনামাত্র, ইতিহাস সমর্থিত যুক্তিযুক্ত চিন্তা নয়। উড়িষ্যার গজপতি রাজা দুই পুরুষ—পুরুষোত্তম ও প্রতাপরুদ্র—ক্রমে ক্রমে রাজ্যাংশ হারাইতেছিলেন। চৈতন্য নীলাচলে যাইবার ঠিক আগেই বাঙ্গালা-উড়িষ্যা সীমান্তে হোসেন সাহার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে উড়িষ্যা সীমান্তের কিছু অংশ মুসলমান অধিকারে আসে। চৈতন্যের গতায়াতের দ্বারাই উড়িষ্যা-বাঙ্গালার উপকূল সীমান্তপথ আবার খুলিয়া যায় এবং চৈতন্য নীলাচলে থাকার ফলেই বাঙ্গালার সুলতানের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের আর সংঘর্ষ বাধে নাই। চৈতন্যের তিরোধানের আট নয় বৎসর পরে তবে উড়িষ্যা মুসলমান শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরে উড়িষ্যার অবনতি চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণবভাবের জন্য নয়। তাহার সাক্ষাৎ কারণ রাজসভায় ষড়যন্ত্র এবং রাজপুত্রদের যোগ্যতাহীনতা।"[২]

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর প্রেমধর্ম বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ক্ষতিসাধন করেনি। বরঞ্চ সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে নবযুগ আনয়ন করেছিল। তাঁর অলৌকিক শক্তি ও অবতারত্বে কেউ কেউ অবিশ্বাস করতে পারেন[৩] কিন্তু তাঁর জীবন সাধনা ও সর্বব্যাপী কালাতিশায়ী প্রভাব তাঁকে প্রকৃতই যুগাবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুকে যুগাবতাররূপেই উল্লেখ করেছেন—যুগাবতারং বিজ্ঞায় স্তুত্বা নত্বা চ ভক্তিতঃ।[৪] জয়ানন্দও তাঁকে যুগাবতার বলে ঘোষণা করলেন—ধর্মাস্থাপনা হেতু যুগ অবতার।[৫]

যুগাবতাররূপে প্রতিষ্ঠা

---

১ Gajapati Kings of Orissa—p. 107.

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ৩১৪

৩ চৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা—সত্যপদ সাহিত্যাচার্য

৪ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী—৩।৪৮ ৫ চৈতন্যমঙ্গল—আদি—৭।১৩

পরিশিষ্ট

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রচিত শ্লোকাবলী :—

(রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী থেকে সংকলিত)

১। চেতো দর্পণমার্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচান্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্॥

—চিত্তদর্পণের মালিন্যনাশকারী, সংসাব রূপ মহাদাবানলের নির্বাণকারী, কল্যাণরূপী কুমুদে জ্যোৎস্না বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসাগরের বৃদ্ধিকারী, প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনরূপী, সমগ্র আত্মাব স্নিগ্ধকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন জয়যুক্ত হোক।

২। নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা খিলগুরো স্মরণে ন কালম্।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

—হে ভগবন্! তুমি নিজের অনেক রকমের নাম করেছ, নিজের সমস্ত শক্তি সেই নামে অর্পণ করেছ, হে অখিল জগতের গুরু, তোমার নাম স্মরণে কোন কালবিচার নেই, তোমার এতাদৃশী কৃপা, আমার এমন দুর্দৈব যে তোমার নামে আমার কোন অনুরাগ জন্মাচ্ছে না।

৩। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি॥

—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, মানশূন্য ও অপরের সম্মান -দাতা ব্যক্তির দ্বারা হরি সর্বদা কীর্তনীয়।

৪। অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজ-
স্থিতধূলি সদৃশং বিভাবয়॥

—হে নন্দনন্দন কৃষ্ণ! ভয়ঙ্কর ভবসাগরে পতিত তোমার কিঙ্কর আমাকে কৃপা করে তোমার পাদপঙ্কজস্থিত ধূলির মত মনে কর।

৫। নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

—হে কৃষ্ণ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার চোখ গলিত অশ্রুধারায়, মুখ গদ্‌গদ রুদ্ধ বাক্যে, দেহ পুলকরোমাঞ্চে পূর্ণ হবে?

৬। ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।

—হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী বা কবিতা চাই না, কেবল জন্মে জন্মে ঈশ্বরে তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকুক।

৭। দধিমথন নিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমাগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখ কমল সমীরৈ রাশু নির্বাপ্য দীপান্
কবলিত নবনীতঃ পাতু মাং বাল কৃষ্ণঃ॥

—দধিমন্থনের শব্দে নিদ্রাত্যাগ করে প্রভাতে নিঃশব্দ পদে গোপিকাদের গৃহে প্রবেশ করে মুখপদ্মের বায়ুর (ফুৎকারের দ্বারা) সত্বর দীপ নির্বাপিত করে যিনি নবনী হস্তগত করেছিলেন সেই বালক কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন।

৮। সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিনীদাম ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দং মন্দং বিহস্য।
অক্ষোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখীর্বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥

—বাঁ হাতে কিঙ্কিনীদাম ধারণ করে শব্দ নিবারণ করে, কুঁজো হয়ে পদের অগ্রভাগের সাহায্যে গমন করে মন্দ মন্দ হেসে চোখের ভঙ্গী দ্বারা হাস্যমুখী সম্মুখস্থ গোপীদের নিবৃত্ত করে মায়ের পশ্চাৎ থেকে হরি কোন সময়ে ননী চুরি করেছিলেন।

৯। যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥

—গোবিন্দের বিরহে আমার এক নিমেষ মনে হচ্ছে যুগ, চোখে নেমেছে বর্ষা, সমস্ত জগৎ শূন্য মনে হচ্ছে।

১০। আশ্লিষ্য বা পদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা যথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

—তাঁর চরণে অনুরক্তা আমাকে আলিঙ্গন করে পিষ্ট করুন, অথবা অদর্শনের দ্বারা আমাকে মর্মাহত করুন, সেই লম্পট যা যা ইচ্ছা তাই করুন, কিন্তু তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেউ নয়।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্য রচিত একটি শ্লোক আছে। বারাণসীর সন্ন্যাসীরা নীলাচল সন্ন্যাসীর যোগ্যক্ষেত্র নয়, বারাণসীই সন্ন্যাসীর বসবাসের যোগ্য স্থান এই মর্মে একখানি পত্র মহাপ্রভুর কাছে প্রেরণ করলে মহাপ্রভু হেঁয়ালির ধরণে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি রচনা করে বারাণসীতে প্রেরণ করেছিলেন। শ্লোকটির বাহ্যিক অর্থ অনুসারে বিরক্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের রচনা কিনা সন্দেহ হয়।

(চৈ. ম. প্রকাশ—২০)

সিংহোবলী দ্বিরদ শূকরমাংসভোগী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোগী
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোহত্র হেতুঃ॥

—শূকর ও হস্তীর মাংসভোজনকারী বলবান্ সিংহ বৎসরে একবার মাত্র রতিক্রিয়া করে, পাথরের কুচা শস্যের কণা খেয়ে পারাবত সারাদিনই কামী হয়ে থাকে, এর হেতু কি বল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যের রাশিচক্রে ধর্মভাববিশ্লেষণ

—অধ্যাপক ডঃ রামজীবন আচার্য

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যচন্দ্র এক বিমূর্তবিস্ময়। বঙ্গাব্দ ৮৯২, শকাব্দ ১৪০৭, ২৩শে ফাল্গুন, খ্রীষ্টাব্দ ১৪৮৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁর আবির্ভাব সমগ্র জাতির নিকট পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের মতোই সুখপ্রদ। ফাল্গুনী রাকাতিথিতে তাঁর শুভ আবির্ভাব। বৈষ্ণব মহাজন বাসু ঘোষ তাঁর একপদের প্রাঞ্জল পয়ারে তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ করে লিখলেন :

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যে রাশিচক্র আমাদের হাতে এসেছে তা এরূপ :
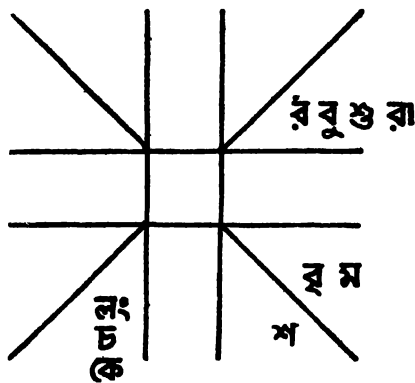
লগ্ন ও রাশির নবম গৃহ থেকে ধর্মভাবের সাধারণ বিচার করতে হয়। শ্রীচৈতন্যের সিংহলগ্ন ও সিংহরাশি হওয়ায় ধর্মস্থান একটিই হয়েছে—তা মেষ। মেষ রাশি মঙ্গলের মূলত্রিকোণ রবির তুঙ্গস্থান। ধর্মস্থানপতি মঙ্গল পঞ্চম কোণে বৃহস্পতিসন্নিধানে ধনুরাশিতে থেকে জাতককে করেছেন গুরুমুখী ও অপার আলোকের অভিযাত্রী। মঙ্গল যেখানেই থাকুন গুরু-বৃহস্পতির দ্বারা দৃষ্ট বা যুক্ত হ'লে তিনি অশেষ শুভফলপ্রদ হন। ধর্মপতি মঙ্গল বৃহস্পতিক্ষেত্রে বৃহস্পতিযুক্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যের ধর্মভাব নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে যে সকল সন্ন্যাসযোগের উল্লেখ আছে তার একটি হলো এই যে চার, পাঁচ বা ছয়টি গ্রহ যদি এক গৃহস্থ হন তবে ভোগদায়ক রাজযোগ নষ্ট হয়, সৃষ্ট হয় প্রব্রজ্যা যোগ :

গ্রহৈশ্চতুর্ভির্যদি পঞ্চভির্বা ষড়্ভিস্তথৈকালয়সংস্থিতৈশ্চ।
নশ্যন্তি সর্বে খলু রাজযোগাঃ প্রাব্রাজিকো যোগ ইতি প্রদিষ্টঃ॥

লগ্নের সপ্তমে রবি, বুধ, শুক্র, রাহুপ্রমুখ চারিটি গ্রহের একত্রাবস্থান শ্রীচৈতন্যকে সন্ন্যাসযোগে দীক্ষিত করেছিল।

আর এক সূত্র এখানে উল্লেখ্য। যদি বলবান ধর্মপতি কেন্দ্রকোণস্থ হন এবং বলবান লগ্নপতি লগ্নদর্শী হন তবে জাতক ভোগসুখাভিলাষ পরিত্যাগ করে তাপসব্রত গ্রহণ করেন :

বলবতি শুভনাথে কেন্দ্রকোণোপযাতে শুভ শতমুপযাতি স্বামিদৃষ্টে বিলগ্নে।
সুরগুরু নবভাগত্রিংশদংশত্রিভাগে দশমভবনপে বা বীতভোগস্তপস্বী॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নবমপতি মঙ্গল বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বৃহস্পতিসন্নিধানে পঞ্চমে থেকে বলবান। লগ্নপতি রবি সপ্তমে থেকে লগ্নদর্শী। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগসুখবর্জন ও তপশ্চর্য্যা। ভাগ্য বা ধর্মস্থানপতির পঞ্চমাবস্থান বিষয়ে জ্যোতিষবচন এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ভাগ্যপতি যদি পঞ্চমে থাকেন তবে তিনি জাতককে গুরুভক্তিরত, ধীর, ধীরগুণসমন্বিত, ভাগ্যবান ইত্যাদি ক'রে থাকেন :

ভাগ্যেশে পঞ্চমে লাভে ভাগ্যবান জনবল্লভঃ।
গুরুভক্তিরতো মানী, ধীরো ধীরৈ গুণৈর্যুতঃ॥

আর লগ্নে সৌম্যগ্রহ সোম সংযুক্ত কেতু জাতককে অধ্যাত্মচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, চতুর্থে ষষ্ঠ-সপ্তমপতি ত্যাগপর গ্রহ শনি জাতককে সংসার সুখ বর্জনে সহায়তা করেছেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও ধর্মভাবচিন্তার আরো নানা সূত্র তাঁর রাশিচক্র থেকে মিললেও একয়টি যথেষ্ট সাহায্য করবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। শ্রীচৈতন্যের রাশিচক্রে ধর্মভাব বিশ্লেষণ প্রয়াস আমার প্রতি তাঁরই কৃপাকটাক্ষ মাত্র ব'লে মনে করি। জয় চৈতন্য জয় চৈতন্য।

———